বাংলা একাঙ্ক নাটক সঙ্কলন

আদান-প্রদান

বাংলা একাঙ্ক নাটক সঙ্কলন

সঙ্কলন ও সম্পাদনা

কুমার রায়

ন্যাশনাল বুক ট্রাস্ট, ইণ্ডিয়া

ISBN 81-237-3508-1

2001 (শক 1923)

মূল্য : 110.00 টাকা

Bangla Ekanko Natak Sankalan *(Bangla)*

নির্দেশক, ন্যাশনাল বুক ট্রাস্ট, ইণ্ডিয়া, এ-5 গ্রীন পার্ক
নয়াদিল্লি-110 016 কর্তৃক প্রকাশিত

সূচি

একাঙ্ক নাটক, বাংলা একাঙ্ক ও এই সঙ্কলন প্রসঙ্গে

বাংলা ভাষায় লেখা ছোটমাপের নাটক, যাকে সাধারণত নাটিকা বলা হত এবং পরবর্তী একটা সময় থেকে পশ্চিমী নাট্যসংজ্ঞার সঙ্গে মিলিয়ে আমরা একাঙ্ক বলতে শুরু করি—তার রূপ-বৈশিষ্ট্য কী? এটা ঠিক, সংস্কৃত নাট্যশাস্ত্রে 'দশরূপক'-এর আলোচনায় 'ব্যয়োগ', 'বীথি', 'অঙ্ক' ও 'ভাণ'-এর যে বিশ্লেষণ রয়েছে—এইসূত্রে সে প্রসঙ্গ টেনে আনতে পারব না। নাট্যশাস্ত্রে, সুনির্দিষ্টভাবে দৃশ্যকাব্যের শ্রেণীবিভাগ করা হলেও, ধারাবাহিকতা না থাকায় তার উত্তরাধিকার আমরা পাইনি। সংস্কৃত নাটকের আলোচনায় ভাস বিরচিত *'মধ্যম ব্যয়োগ', 'দূত ঘটোৎকচ', 'কর্ণভার', 'উরুভঙ্গম্'*-কে একাঙ্ক শ্রেণীর নাটক বলে চিহ্নিত করেছি মাত্র। বাংলা নাটকে তার প্রভাব পড়েনি। আর বাংলা নাট্যসাহিত্য ও মঞ্চাভিনয়ের ইতিহাস তো মাত্র একশ ছেষট্টি বছরের—১৮৩৩ সালের নবীন বসুর বাড়িতে *বিদ্যাসুন্দর* অভিনয় থেকে ধরে, কিংবা আরো সঠিকভাবে, ১৮৫৭ সালে *কুলীন-কুল-সর্বস্ব* নাটকের অভিনয়ে সূত্রপাত ধরলে—একশ বিয়াল্লিশ বছরের। সে কালে বাংলা নাটক চালিত হয়েছিল পশ্চিমী ধারায় : সেই পশ্চিমী ধারার অনুকরণেই আমাদের নাটক আদর্শায়িত হয়েছে,—নাট্যাভিনয় নিয়ন্ত্রিত হয়েছে। সেই অনুসারেই ঊনবিংশ শতাব্দীতে পাঁচ অঙ্কের নাটক লেখা শুরু হয়েছিল—সংস্কৃত নাটকের পঞ্চসন্ধি মেনে নয়,—পশ্চিমী নাট্যদেহ গঠন ও বিন্যাসরীতি অনুসরণ করে—Exposition, Rising Action, Climax, Falling Action এবং Catastrophe বা Denouement ইত্যাদিকে মান্য করে।

ঊনবিংশ শতাব্দীর বাংলা নাটকের অভিনয়কাল পাঁচঘণ্টা কি চারঘণ্টা সময় থেকে কমতে কমতে এখন, বর্তমানে খুব বেশী, দুই থেকে আড়াই ঘণ্টায় দাঁড়িয়েছে। কিন্তু একটা সময়, যখন কলকাতার কর্পোরেশনের রাস্তায় জল দেওয়ার ফট্‌ফট্ শব্দ এবং প্রথম ট্রামের ঘড়ঘড় আওয়াজের সঙ্গে সাধারণ রঙ্গালয়ের যবনিকা পড়ত, তখন পাঁচ-ছ ঘণ্টা নাটকের অভিনয় না হলে দর্শক তৃপ্ত হত না। ফলে অবস্থার চাপে সেকালে ছোটমাপের চুটকি, পঞ্চরঙ, ব্যঙ্গ, কৌতুকময় তামাশা হিসেবে ছোট ছোট নাটক জুড়ে দেওয়া হত, বড় নাটকের আগে কিংবা যবনিকা পতনের পরে। সময় পাল্টাবার সঙ্গে সঙ্গে এই উদ্বাস্তু-যুগের রীতি যে পাল্টাবে, সেটাই স্বাভাবিক। সে আমলে সাধারণ রঙ্গালয়ের দর্শকরুচি এবং দাবী মিটিয়েই গিরিশচন্দ্র ঘোষ (১৮৪৪-১৯১২) অর্দ্ধেন্দু শেখর মুস্তাফী (১৮৫০-১৯০৯) অমৃতলাল বসু (১৮৫৩-১৯২৯)

লিখেছিলেন,—'সপ্তমীতে বিসর্জন', 'বেল্লিক বাজার', 'বড়দিনের বক্‌শিষ্‌,' 'মুস্তাফী সাহেব কা পাক্কা তামাশা', 'চোরের ওপর বাটপাড়ি', 'চাটুজ্যে ও বাঁড়ুজ্যে', 'কৃপণের ধন'-এর মত প্রচুর ছোটমাপের কৌতুকনাট্য বা প্রহসন জাতীয় নাটিকা। পূর্ণাঙ্গ নাটক রচনার পাশে পাশে, এ সবই পশ্চিমের অনুকরণ।

এইসব রচনার দাবী অবশ্যই তখনকার সমাজনীতি, অর্থনীতি, মানুষের অবসর ইত্যাদির বিবেচনার সঙ্গে যুক্ত।

সুদূর অতীতে, আদিমযুগে, ছিল কি কোনও অভিনয় কলা? সে সম্পর্কে আমরা জানি স্বল্পই, তবু কল্পনা করেই বলা হয়েছে—সরল সংক্ষিপ্ত একটা কাহিনীবৃত্ত। সে কাহিনী সদ্য ঘটে যাওয়া জীবনেরই অভিজ্ঞতা হয়তো। জীবনধারণের, সেই সঙ্গে আত্মরক্ষার তাগাদাই ছিল এই সমস্ত প্রকাশের প্রেরণা। স্থান-কাল-পাত্রের ধারণা খুব একটা জটিল ছিল না—থাকার কথাও নয়। অভিনয়ের জন্যে যে কাহিনী, সেটা কল্পনায় সমৃদ্ধ কোনো রচনা নয়। হয়তো সেই আদিম আরণ্যক সমাজের গুটিকয় মানুষের সমাবেশে—রাত্রিবেলায়, মাঝখানে আগুন জ্বালিয়ে, চারপাশে গোল হয়ে বসে—সেদিনকার শিকার করে পাওয়া পশুর মাংস ঝল্‌সে নিচ্ছে। একজন. সেদিনকার পশু শিকারের অভিজ্ঞতা বর্ণনা করছে, বলতে বলতে সেই কথক দাঁড়িয়ে উঠে, সেই উত্তেজনাপূর্ণ ঘটনার পুঙ্খানুপুঙ্খ অনুক্রম ধরে অনুকরণ করতে শুরু করেছে। হঠাৎ সে হয়তো তার সঙ্গীকে মৃত পশুর ছাড়ানো চামড়াটা জড়িয়ে নিয়ে পশু সাজতে বলল,—তার সেই শিকারের সময়ে পশুটির ক্রিয়াকলাপ অনুকরণ করতে বলল। তারা দুজনে সেই আক্রমণ, প্রতি-আক্রমণ, আত্মরক্ষার নানারকম কৌশল দেখিয়ে অবশেষে পশুটির হনন-ক্রিয়া সম্পন্ন করল। সংক্ষিপ্ত অনুক্রমে অভিজ্ঞতার চিত্রণ ঘটল।

সংক্ষিপ্ত অনুক্রমে, একটি অভিজ্ঞতার সেই বিশেষ ক্রিয়াটির সমাপ্তি ঘটল। এটাই তো একাঙ্কিকার আদর্শ।

খৃষ্টপূর্বকালে গ্রীক থিয়েটারে এসে ত্রি-ঐক্যের সূত্রে তৈরী হল—স্থান-কাল-ঘটনার ঐক্যবোধ। গ্রীক নাটকগুলি, আজও যা টিকে আছে, সবই স্বল্পদৈর্ঘ্যের এবং স্বল্পায়তন তার বৃত্ত। জটিল কাহিনীবৃত্তের সঙ্গে সঙ্গে নাটকও বড় হতে লাগল—অঙ্কবিভাগ হল, দৃশ্যবিভাগও। এইসব পরিবর্তনের সঙ্গেও, সমাজ, মানুষ,—তার বাঁচার ধরন, তার অর্থনৈতিক বিন্যাস যুক্ত হয়ে আছে। সমাজের চেহারা জটিল হচ্ছে—সম্পর্ক জটিলতর হচ্ছে—মানুষের মন বহুস্তর-বিশিষ্ট হয়ে দেখা দিচ্ছে—আর তাই নাট্যবৃত্তও সংক্ষিপ্ত থেকে প্রসারিত হচ্ছে। জটিল হচ্ছে।

গ্রীক নাটকে অঙ্কবিভাগ ছিলই না। ইউরোপে রেনেশাঁশ-পরবর্তীকালে ক্রমশই স্বল্পায়তন কাহিনীবৃত্তের অবলুপ্তি ঘটল। একটা কথা ঠিক,—গ্রীক নাটক একাঙ্কও নয়, পঞ্চাঙ্কও নয়। তবু ওই ত্রি-ঐক্যের সম্মেলনে এবং পরিসর ছোট হওয়ার সুবাদে গ্রীক নাটককে একাঙ্কের পর্যায়ে ফেলা যায়। স্বল্পায়তন বৃত্তের নাটক ছোট হলেও তা

organic whole হিসাবে বিবেচিত হয়েছে—সে 'সমগ্র'; তার আদি আছে, মধ্য আছে, অন্ত আছে। একাঙ্ক নাটকের স্বরূপ বিশ্লেষণের সুযোগে সে আলোচনা করা যাবে।

ট্র্যাজেডি ও কমেডি—এই বিভাজনের পর, প্রাচীন ভারতে এসে দেখি ট্র্যাজেডি, কমেডি, ফার্স নয়,—দশরূপক আলোচনাশীর্ষকে রূপক নাটককে দশটি শ্রেণীতে ভাগ করা হয়েছে। সেখানে, সেই শ্রেণীবিভাগে একাঙ্ক নাটকের সমগোত্রীয় লক্ষণযুক্ত নাটকও আছে। কিন্তু যেহেতু পশ্চিমে আরিস্ততলের সংজ্ঞা নির্ণয়ের পর ধারাবাহিকতা বজায় রেখে—গ্রীস থেকে ইতালী, ফ্রান্স, স্পেন, ইংল্যাণ্ড—পরে সমগ্র ইউরোপে ধারাবাহিক নাট্যচর্চা অব্যাহত ছিল এবং আছে—এবং ঘটনাক্রমে ইউরোপের একটি দেশের উপনিবেশ হয়ে আমরা নাটকের ক্ষেত্রে শিকড় হারিয়ে নাট্যচর্চা করেছি বহুকাল—তাই আজকের বাংলা থিয়েটার বা নাটকের আলোচনায়, কিংবা স্বরূপ নির্ধারণে, —পশ্চিমী দিক্‌দর্শনেই আমাদের পথ খুঁজতে হবে। একাঙ্কের ক্ষেত্রে আপাতত, সেই কারণেই, অনুসরণ করতে হবে সেই মানদণ্ড।

ইউরোপে জার্মান নাট্যকার লেসিঙ্‌ একাঙ্ক রচনা করেন ১৭৫৫ খৃষ্টাব্দে। দীর্ঘকাল বাদে আবার ১৮৮৭ সালে ফ্রান্সে, ১৮৮৯ সালে বার্লিনে, ১৮৯১ সালে লণ্ডনে, ১৯০৪ সালে ডাব্‌লিনে এবং ১৯০৬ সালে শিকাগোতে একাঙ্ক নাটক অভিনয়ের নিদর্শন পাওয়া যাচ্ছে—অবশ্যই short play হিসাবে। রেনেশাঁসের সূচনা পর্বে স্বল্পায়তন প্রহসন এবং বড় নাটকের মাঝে, বিরতির সময় ইণ্টারল্যুড্‌ হিসেবে ছোট নাটিকা অভিনীত হয়েছে যেমন, তেমনি কার্টেন রেইজার বা আফ্‌টার-পিস্‌ও রচিত হয়েছে। এ সবই পেশাদারী মঞ্চের চৌহদ্দীতে স্বীকৃতি লাভ করে। কিন্তু এ স্বীকৃতি সম্মানের নয়—নেহাৎই আবশ্যকের, সমস্তটাই দর্শক বিনোদনের আয়োজন।

একাঙ্কের শিল্পিত রূপের উন্মেষ ঘটেছিল প্রধানত ঊনবিংশ শতাব্দীতে—যেমন ছোটগল্পেরও। ছোটগল্পকে তো বলাই হয় peculiar product of the Nineteenth Century। ছোটগল্প ব্যাপকভাবেই, এবং সহজেই প্রতিষ্ঠা পেয়ে গেল—আজও তার জয়যাত্রা সমস্ত বিশ্বে অবারিত। তার জন্যে অঙ্গন প্রসারিত আছে,—প্রকাশকের দপ্তরে—সাময়িক ও দৈনিক পত্রিকার পাতায়। এই আশ্রয় এবং প্রশ্রয় না পেলে বোধহয় ছোটগল্পের এই ব্যাপ্তি লাভ কঠিন হত। একাঙ্ক নাটক—একই কালে, একই কার্যকারণের ফসল। তখন সমাজে উৎপাদন ও বণ্টন ব্যবস্থায় ব্যক্তির শ্রেণীচেতনা ও স্বাতন্ত্র্যবোধ জেগে উঠছে—বিকশিত হচ্ছে, ব্যক্তিজীবন অধিকতর গুরুত্ব পাচ্ছে, ব্যক্তিজীবনের ছোট ছোট সুখ, দুঃখ, রহস্য প্রকাশের একটা প্রবণতা দেখা দিচ্ছে সমাজে, সেইসঙ্গে ব্যক্তিজীবনের বিচিত্র আচরণ পর্যবেক্ষণের প্রবণতা দেখা দিচ্ছে। এ সবই যখন বহুমুখী জীবন-জিজ্ঞাসার পরিণতি হিসেবে বিবেচিত হচ্ছে, তখন ছোটগল্পের সাজি আশ্রয় পাচ্ছে, বৃদ্ধি ঘটছে এবং বৈচিত্র্যে সমৃদ্ধ হয়ে ওঠার অবকাশ পাচ্ছে। সেই তুলনায়, একই অবস্থার ফসল, একাঙ্ক নাটক লেখার প্রবণতা থাকলেও, তার

আশ্রয় যে মঞ্চ এবং নাট্যদল, সেই দলের অভিনয়ের চাহিদা! —সেখানেই তার বিকাশ সীমিত থেকে যাচ্ছে।

জীবনের বিশেষ নাটকীয় মুহূর্তে, ঘটনা-পরম্পরায়, অবশ্যম্ভাবী পরিণতিতে অকস্মাৎ বিদ্যুৎ বিকাশের মত জীবনসত্যের উন্মেষ,—এসব ছোটগল্পের বৈশিষ্ট্য। একাঙ্কের লক্ষণও যে প্রায় অনুরূপ।

একটা কথা এই প্রসঙ্গে স্মরণীয় যে, একাঙ্ক নাটকের প্রতিষ্ঠার সঙ্গে এক-একটা আন্দোলনের যোগ খুঁজে পাওয়া অসম্ভব নয়। অন্ততঃ তার প্রসারের সময়টা বিবেচনা করলে, এই সত্যটা ধরা পড়ে। শুধু আমাদের দেশেই নয়—পশ্চিমেও। পেশাদারী বা ব্যবসায়ী নাট্য প্রয়াসের বাইরে যখন কোনও আন্দোলন গড়ে ওঠে, তখন একাঙ্ক নাটক রচিত হয়—অভিনীত হয়। ১৮৮৭ থেকে ১৯১৫—এই সময়কালে, ইউরোপ আমেরিকায় স্বাধীন নাট্যগোষ্ঠী, অপেশাদার নাট্যদল, প্রগতিশীল নাট্য আন্দোলন গড়ে তোলে—তাতে একাঙ্ক নাটকের মধ্যেই পরীক্ষা-নিরীক্ষার সুযোগ ঘটে। নতুনভাবে জীবনের সমালোচনায়, নতুন জীবনাদর্শ প্রতিষ্ঠার কালে, নতুন নাট্যদল তৈরী হয় ও একাঙ্ক নাটকের অনুশীলন হয়। সেখানে জীবনকে দেখতে এবং দেখাতে চেষ্টা করেছে শিল্পীর দল। বাধাবিপর্যয়হীন জীবনকে প্রতিষ্ঠা দিতে চেয়েছে। জেকবের Monkey's Paw, মেটারলিঙ্কের A Miracle of St. Antony, আনাতোল ফাঁস-এর The Man who Married a Dumb Wife, ক্লিফোর্ড ওডেট্স-এর Waiting for Lefty, লেডি গ্রেগরির Rising of the Moon, উইলিয়ম কোঝ্লেঙ্কোর The Earth is Ours, জে. এম. ব্যারির The Will, উল্ক্ ম্যাঙ্কোভিৎস-এর The Bespoke Overcoat ইত্যাদি তার প্রকৃষ্ট উদাহরণ। একের অধিক দৃশ্য থাকলেই তাকে একাঙ্কের তালিকা থেকে বাদ দিতে হবে তার কোনও মানে নেই। ডাব্লিনের লিট্ল্ থিয়েটার (১৮৮৯) অ্যাবি থিয়েটার (১৯০৬) প্যারিসের থিয়েতর ভিউ কলম্বিয়া (১৯১৪) নিউইয়র্কের থিয়েটার গিল্ড (১৯১৯) ফেডারেল থিয়েটার (১৯৩৫) প্রভৃতি মঞ্চের আশ্রয় একাঙ্কের নিরীক্ষাকেন্দ্র হয়েছিল। নানান জায়গায় কমিউনিটি থিয়েটারের প্রবর্তনার ফলেও একাঙ্ক নাটকের সমাদর ঘটে।

পাশ্চাত্যে একাঙ্ক নাটক আন্দোলনে যে সমাজচেতনা ছিল, বাংলা নাট্যচর্চার একটা পর্বে, সেই চেতনারই ফসল ফলল একাঙ্ক নাটকের রূপে। সে কথা পরে আসবে।

আদিম যুগের কথাটা আমরা অনুমান করে উল্লেখ করেছি মাত্র—কিন্তু সেইসঙ্গে উল্লেখ করেছি স্বল্পায়তন বৃত্তের কথা, স্থান-কাল-কার্য-ঐক্য-এর উদ্ভব কোন অচেতন প্রক্রিয়ায় ঘটে গিয়েছিল সেকথা, তাদের স্বল্প অভিজ্ঞতার কথা। আজ যখন একাঙ্ক নাটকের আলোচনা করছি—তখন দেখতে পাচ্ছি আধুনিক একাঙ্ক নাটকের আধুনিক বৃত্ত বহু অভিজ্ঞতায়, সংহতরূপের সচেতন প্রয়াসে গড়ে উঠেছে। এ কল্পনার দৈন্য নয়, সংযমের ফসল।

বাংলা একাঙ্ক নাটকের কথা বলবার আগে—সংক্ষেপে হলেও, একাঙ্ক নাটকের সংজ্ঞা ও স্বরূপ নির্ণয় করে নেওয়া যাক্।

ছোট বলেই এই শিল্প-সামগ্রী খণ্ড নয়, সম্পূর্ণ। স্বতন্ত্র মর্যাদা দেওয়া হয়েছে শিল্পরূপগত সমগ্রতার জন্যেই, যে সমগ্রের মধ্যে আদি-মধ্য-অন্ত আছে। উদ্ধৃতি-কণ্টকিত স্বরূপ-সংজ্ঞা নির্ণয় না করে, শুধু বুঝে নেবার জন্যে কিছু সাধারণ কথা বলে নিতে চাইছি।

ছোটগল্পের মূল কথাটি যেমন একক প্রতীতি (সিঙ্গল ইম্প্রেসন) একাঙ্কেরও তাই। বিস্তার-বিহীনতা ও বাহুল্যবর্জন তার আর একটি লক্ষণ। স্বল্প চরিত্র, মিতায়তন, এবং সাধারণভাবে এক অঙ্কবিশিষ্ট নাটকই হল একাঙ্ক নাটক। ওই মিতায়তনের মধ্যেই থাকতে হবে নাট্যিক পঞ্চসন্ধির নির্যাস : সূত্রপাত, ঘটনারোহণ, শীর্ষবিন্দু ঘটনার অবরোহন ও পরিণামের চমক,—নির্যাস আকারেই থাকবে। এবং থাকবে অনির্দেশ্য থেকেই।

নাটককে আমরা দৃশ্যকাব্য বলি,—একাঙ্ক নাটক সেই দৃশ্যকাব্যের এক প্রজাতি : দৃশ্যকাব্যের লক্ষণ মিলিয়ে একে চিনে নেওয়া যায়, কেননা আয়তনের স্বল্পতা ছাড়া সবই এখানে পাওয়া যাবে। মনে রাখতে হবে একাঙ্কত্ব ও স্বল্পায়নত্ব—একাঙ্কিকার বৈশেষিক লক্ষণ। 'অবিচ্ছিন্নতা, পরিমিত আয়তন, দ্বন্দ্বসংক্ষুব্ধতা, ভাবনিবিড়তা, ঘনীভূত রসময়তা'—এসব একাঙ্কের বৈশেষিক লক্ষণ নয়, আসলে এ সবই তো সাধারণভাবে নাটকমাত্রেরই সাধারণ লক্ষণ। তাহলে একাঙ্ক নাটককে পৃথক করা যায় কীভাবে? সে ওই বিশেষ লক্ষণ,—ওই যে বলা হয়—একক প্রতীতি বা single dominant dramatic situation আর পরিণামে থাকবে single effect—তাই দিয়ে। চাই নাট্যিক প্রবাহ আর পরিণামের এককত্ব। একাঙ্ক নাটক জন্মলগ্ন থেকে এই বিশেষ লক্ষণের ওপর দাঁড়িয়ে আছে। শুরুর সংলাপ থেকেই নাটক শুরু হয়ে যাবে। নাটকের উপকরণ ও উপাদানের বাহুল্য বর্জিত হতে হবে। বাক্-সংক্ষিপ্তি এবং নাটকের শীর্ষবিন্দু বা মহামুকহূর্তের এককত্ব জরুরী। এই এককত্ব বা singleness-এর জন্যেই গতিময়তার দ্রুতি ঘটে। এই গতিময়তা অবশ্য পূর্ণাঙ্গ নাটকের ক্ষেত্রেও নিঃসন্দেহে জরুরী লক্ষণ।

এ সব লক্ষণ সিদ্ধ বলে ধরে নিয়েও সমস্যায় পড়তে হয় নাট্যকারকে। দ্রুত পরিবর্তমান সমাজের নানান লক্ষণকে, সামাজিক ও রাজনৈতিক বক্তব্যকে রূপ দেওয়া,—এই সংজ্ঞার খাঁচায় হয়তো ধরা যাচ্ছে না। তখন বেড়া তো ভাঙতেই হয়! আমরা তো নিছক আঙ্গিকবাদী হতে চাই না। বিষয়বস্তুর জন্যে রূপরীতি তো ভাঙাই যায়। এটা তো আমরা জানি সংজ্ঞা অনুযায়ী মানুষের জীবন চলে না—বরং জীবন অনুযায়ী সংজ্ঞার রচনা। কেউ তর্ক করবার জন্যে বলতেই পারেন—বর্তমান সমাজের বা মানুষের জটিল অবস্থা ধরবার জন্যে একাঙ্কের আশ্রয় নিতে হবে তার কি মানে?

তিন অঙ্ক, পাঁচ অঙ্ক তো আছেই—ধরাও না তাতে তোমার জটিল সমাজ, জটিলতর মানুষ! তা হয় না,—কেননা জীবনের জটিলতা যেমন থামিয়ে দেয়, তেমনি আবার থামবার উপায়ও রাখে না যে, কারণ, সময় যে অল্প। আমাদের জীবনই যেন আদেশ করছে—যা করবার ভেবে কর,—এবং দ্রুত কর। এই স্ববিরোধ ও দ্বন্দ্বিকতা আমাদের জীবনেই রয়ে গেছে। একাঙ্ক নাটক এই দ্বন্দ্বকে এড়িয়ে যেতে পারে না। দ্রুত পরিসমাপ্তির পর একাঙ্ক নাটক ভাবায়। একাঙ্কে ভাবনার অবকাশ নেই—এ কথাটা তাই ভুল। হ্যাঁ, নাটক চলাকালীন ভাবনার অবকাশ হয়তো দেয় না, কিন্তু শেষে? পূর্ণাঙ্গ নাটকেও কি এ অভিজ্ঞতা হয় না? হয়। আবার রীতি ভাঙার কথায় বলি, আধুনিক নাট্যকাররা অনেকেই, এমনকি শেক্‌সপীয়ারও অনেক প্রচলিত নাট্যরীতি ভেঙেও নাট্যকারই থেকে গেছেন। তাঁদের অনেকে ক্রিয়ার ঐক্যটাকেই মেনেছেন। অন্যগুলি ভেঙ্গেছেন।

সংস্কৃত নাট্যসাহিত্যে মহাকবি ভাস-এর কিছু রচনা একাঙ্ক লক্ষণাক্রান্ত : তিনি নাটকগুলিতে,—একটিমাত্র দৃশ্যে, একটিমাত্র কালপর্বে, একটিমাত্র ঘটনাকে অবিচ্ছিন্ন কালধারায় উপস্থাপিত করে, আদর্শ সমন্বয়ের উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত স্থাপন করে গেছেন।

আসলে একাঙ্ক নাটকের সংজ্ঞা নয়,—রূপরীতি ও গঠন প্রণালীর স্বরূপই বিবেচ্য, কেননা মতধারিকদের মতের অমিলটাই সংজ্ঞা আলোচনায় ধরা পড়ে।

একাঙ্ক নাটকের স্বরূপ কী? আগেই বলা হয়েছে, ছোট হলেও একাঙ্ক একটি সমগ্র কার্য—আরম্ভ এবং উপসংহারের মধ্যে অবিচ্ছেদ্যযোগে যুক্ত,—কার্যকারণ নিয়মসূত্রে আবদ্ধ,—ঘটনা পরম্পরায় সমগ্রতা-মণ্ডিত।

একাঙ্কের ক্ষেত্রে ঐক্যসূত্র অপরিহার্য কিনা—এই ধরণের সংশয় নিরসনে বলতে হচ্ছে, ভঙ্গীগত কারণেই একাঙ্ক নাটক কেন্দ্রীভূত হতে বাধ্য। গভীর এবং গূঢ় মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণের অবকাশ এখানে নেই : একটিমাত্র উদ্দেশ্য নিয়ে এর পরিক্রমণ,—শাখা প্রশাখা নেই ঘটনার, একটিমাত্র আইডিয়াকে অবলম্বন করে দ্রুতগতিতে এগিয়ে যাওয়াই এর ধর্ম। সংজ্ঞা অনুযায়ী এ ট্র্যাজেডি নয়, কমেডি নয়, ফার্সও নয়,—অথচ একাঙ্কের মধ্যে মানুষের জীবনের বিপর্যয় দেখানো যায়, আনন্দ ও কৌতুকমণ্ডিত জীবন দেখানো যায়, অনাবিল হাস্যরসের খোরাকও যোগান দেওয়া যায়।

বাংলা নাটকের চাহিদা, স্বভাবতই পূর্ণাঙ্গ নাটকের। আমরা দেখেছি উনবিংশ ও বিংশ শতাব্দীর সূচনাকালে বাংলা থিয়েটারে পূর্ণাঙ্গ নাটকের অনুষঙ্গেই ছোট নাটিকার চল হয়েছিল। পশ্চিমদেশেও এইরকমই হয়েছিল। অবশ্য দেখতে হবে সেই রূপধর্ম কীভাবে, কখন থেকে স্বতন্ত্র মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত হল বাংলা নাট্যক্ষেত্রে। প্রথমত, সাধারণ রঙ্গালয় প্রতিষ্ঠার আগে প্রহসন জাতীয় নাটকে এই রূপধর্ম মুক্তি পেয়েছিল : আমি মাইকেল মধুসূদনের (১৮২৪-১৮৭৩) কথা বলছি। সেই সৃষ্টি,—বড় নাটকের দর্শককে প্রেক্ষাগৃহে বসিয়ে রাখার জন্যে যে প্রয়াস, তার থেকে স্বতন্ত্র,—পূর্বগামী তো

বটেই। তাঁর মিতায়তন প্রহসন দুটি একস্ট্রাভাগানজা জাতীয় নয়, 'বুড়ো শালিকের ঘাড়ে রোঁ', একাঙ্কের লক্ষণাক্রান্ত—'একেই কি বলে সভ্যতা'-ও তাই। সমাজকে বিদ্ধ করার আয়োজনও বটে। আবার জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮৪৯-১৯২৫), রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮৬১-১৯৪১) ও দ্বিজেন্দ্রলাল রায় (১৮৬৩-১৯১৩) তাঁদের রচিত একাধিক পূর্ণাঙ্গ নাটকের শোভাযাত্রার মধ্যেও একাঙ্ক নাটকেরও ভিত্তি রচনা করে গেছেন। আমরা বলি বিংশ শতাব্দীই একাঙ্ক নাটকের কাল,—এই সময়কালে একাঙ্ক নাটকের যে প্রসার ঘটেছে,—এঁদের কাজের ভিত্তির ওপরেই তা দাঁড়িয়ে আছে। যদিও অনেক কার্যকারণে প্রচার, প্রসার ও প্রদর্শনের সংখ্যাধিক্য দেখা গেছে পরবর্তীকালে। যথাকালে সে আলোচনা হবে।

বিংশ শতাব্দীর বিশের দশকে বাংলা কথাসাহিত্যের নতুন ভাবনার কালে,—স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষার তীব্রতার কালে, দুই বিশ্বযুদ্ধের মধ্যবর্তীকালে, গণনাট্য আন্দোলনের কালে এবং স্বাধীনোত্তর কালে রাজনৈতিক থিয়েটারের আবহাওয়ায় এক-একরকম ভাবে একাঙ্ক নাটকের ধরন পালটেছে, বক্তব্য পালটেছে। কালের বা যুগের সংশয়, সংকট এবং জীবন-জিজ্ঞাসা নিয়েই একাঙ্ক নাটক দেখা দিয়েছে। সচেতন শিল্পীর হাতে নিজস্ব শিল্পরূপ খুঁজে পাবার নিরন্তর প্রয়াস পেয়েছে, বিষয়বস্তুও পালটে পালটে গেছে, একটা পর্বে লেখাও হয়েছে অভাবিত সংখ্যায়—তবু কালের কষ্টিপাথরে একাঙ্ক নাট্যের শিল্পরূপ সংখ্যা বিচারে বিরাট নয়। মূলত, শিল্পীর অন্তরের তাগিদে, এবং একটা পর্বে প্রয়োজনের অনুরোধে বাংলা একাঙ্ক নাটক রচিত হয়েছে। অন্তরের সঙ্গে বাইরের তাগাদাও ছিল অনেকের রচনার উৎস। ভয়ংকর এক অস্থিরতা ও জীবন-যন্ত্রণার কালে নাট্যরচনায় তাড়িত করেছে নাট্যকারদের। যুদ্ধ, দুর্ভিক্ষ, বন্যা, ফ্যাসিবিরোধী লেখক শিল্পীদের প্রকাশ আকুলতার একটা পর্ব গেছে।

যদি মধুসূদনের কালটাকে নাটকের প্রস্তাবনা দৃশ্য বলি, এবং জ্যোতিরিন্দ্রনাথ, রবীন্দ্রনাথ, দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের সময়টাকে প্রথম অঙ্ক বিবেচনা করি, তাহলে দ্বিতীয় অঙ্ক হল—দুই বিশ্বযুদ্ধের মধ্যবর্তীকাল। স্বাধীনতার অব্যবহিত আগের দুর্যোগের কালকে তৃতীয় অঙ্ক হিসেবে চিহ্নিত করতে পারি। দ্বিতীয় অঙ্কের কুশীলব,—ঔপন্যাসিক গল্পকার কবি, তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, বুদ্ধদেব বসু, অচিন্ত্য কুমার সেনগুপ্ত, বনফুল, শিবরাম চক্রবর্তী, নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় প্রমুখ সাহিত্যিকেরা। সেই সঙ্গে অবশ্যই থাকছেন, নাট্যকারদের মধ্যে মন্মথ রায়, বিধায়ক ভট্টাচার্য। তৃতীয় অঙ্কে থাকছেন বিজন ভট্টাচার্য (১৯১৭-১৯৭৮) দিগিন্দ্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় (১৯০৮-১৯৯০) তুলসী লাহিড়ী (১৮৯৭-১৯৫৯), সলিল সেন প্রমুখ নাট্যকার। চতুর্থ অঙ্কের শুরু স্বাধীনোত্তর কালে। ঠিক আগের পর্বের নাট্যকাররা এই পর্বেও সক্রিয়। দেশভাগ, উদ্বাস্তুদের মর্মন্তুদ দুর্দশা, সাম্প্রদায়িকতা, যুদ্ধের সময়কার মানবিকতা ও নৈতিকতার যে অবমূল্যায়ন ঘটেছিল—সে সব কিছুর জের চলছিল তখন প্রকট ভাবেই। কাজেই নাট্যকারদের

সংবেদনশীল মনকে নাড়া দিয়েছিল। পূর্ণাঙ্গের পাশাপাশি একাঙ্ক রচনাতেও তাঁরা প্রচুর পরিমাণে সক্রিয় ছিলেন। এই পর্বে নবাগতদের সংখ্যাও অনেক।

পঞ্চম অঙ্ক হিসেবে যে কালকে আমি চিহ্নিত করতে চাই—তাও অবশ্য স্বাধীনোত্তর কাল। এই পর্ব কয়েকটি কার্য-কারণের জন্যে একাঙ্ক নাটকের প্রসারের কালও বটে। একাঙ্ক রচনায় প্রেরণা দানে, অন্তরের তাগাদার চেয়ে বোধকরি তখন অন্য কতকগুলো কারণ ঘটেছিল। এই সময়ে যে নাট্যকাররা এলেন, তাঁরা পূর্ণাঙ্গ নয়—একাঙ্ক রচনাতেই মনোনিবেশ করলেন। বাংলা সাহিত্যে একাঙ্ক নাটক রচনা ও প্রযোজনায় পাশ্চাত্যের অভিজ্ঞতার বদলে এইসময় দেশজ অভিজ্ঞতা কাজে লাগল। একাঙ্ক নাটকের উৎসব সংগঠনের ফলে এই পর্বে একাঙ্কের প্রসার ঘটল। পঞ্চাশের দশকে একাঙ্ক নাটকের প্রতিযোগিতা শুরু হল 'থিয়েটার সেন্টারে', তরুণ রায়ের উদ্যোগে। এরপর থেকেই নানা জায়গায় একাঙ্ক নাটকের প্রতিযোগিতা শুরু হয়ে যায়। তাতে রচনা ও প্রযোজনার আগ্রহ বেড়ে চলল। 'লোক ও নাটক' নাট্যগোষ্ঠীর 'আজকের নাটক' শিরোনামে উৎসব ও প্রতিযোগিতাও একটা উপলক্ষ্য তৈরী করে দিল। মিনার্ভা থিয়েটারে 'গন্ধর্ব' নাট্যগোষ্ঠী 'নবনাট্যোৎসব' নামে যে নাট্যোৎসবের আয়োজন করে, সেখানে বারোটি একাঙ্কিকা মঞ্চস্থ হয়। ধনঞ্জয় বৈরাগী, কিরণ মৈত্র, অমরেশ দাশগুপ্ত, মনোজ মিত্র, এমনকি সাহিত্যিক বিমল করের লেখা একাঙ্ক নাটকও অভিনীত হয়। অন্যান্য যাঁদের একাঙ্ক এখানে অভিনীত হয় তাঁরা হলেন সুনীল দত্ত, বিভূতি মুখোপাধ্যায়, রমেন লাহিড়ী, রবীন্দ্র ভট্টাচার্য, মনোরঞ্জন বিশ্বাস, পার্থ বন্দ্যোপাধ্যায়, জ্যোতু বন্দ্যোপাধ্যায় ও চিত্তরঞ্জন ঘোষ।

বিশ্বরূপা নাট্য-উন্নয়ন পরিকল্পনা পরিষদও একাঙ্ক নাট্য প্রতিযোগিতা শুরু করে। সে প্রতিযোগিতা বেশ কয়েক বছর চলেছিল—বহু একাঙ্ক নাটকের নাট্যকারকে অনুপ্রাণিত করেছিল। এইসব প্রতিযোগিতা কেবল কলকাতায় নয়—চিত্তরঞ্জন, আসানসোল এমনকি বাংলার বাইরে জব্বলপুর, বিলাসপুরেও পরিব্যাপ্ত হয়েছিল। বঙ্গীয় নাট্যসংসদ (১৯৫৬)-এর ভূমিকাও বাংলা একাঙ্ক নাট্যচর্চার অনুকূলে গেল। প্রতিযোগিতার আসরে পুরস্কার দেওয়ার রীতি এই পর্বকে অনুপ্রাণিত করেছে। তাছাড়া একাধিক নাট্যসম্মেলন একাঙ্ক নাটকের নাট্যকারদের উৎসাহ জুগিয়েছে। একদিকে অসংখ্য নাট্যকারের নাটক যেমন ছিল, তেমনি এইসব সংগঠনের পক্ষ থেকে প্রদর্শনীর ব্যবস্থাও ছিল সেই প্রসারের মূলে। এই জোয়ারের মধ্যে ও বাইরে যাঁদের পেয়েছি তাঁদের অন্যতম,—রতন কুমার ঘোষ, অমল রায়, অমর গঙ্গোপাধ্যায়, রাধারমণ ঘোষ, চন্দন সেন, দেবাশিস মজুমদার প্রমুখ নাট্যকার।

বাংলা একাঙ্ক রচনার আর একটি প্রেরণা রাজনৈতিক আন্দোলন, যা সমাজ পরিবর্তনেরই আন্দোলন হিসেবে খ্যাত, সে সম্পর্কে কোন সন্দেহ নেই। গ্রামে-গঞ্জে, শহরে-বন্দরে এর ব্যাপ্তি। এই দু'দশকে কিছুটা ভাঁটা হয়তো পড়েছে তবু সংখ্যাবিচারে,

ফল কিছু কম নয়। উৎপল দত্ত (১৯২৯-১৯৯৩) এ ব্যাপারে অনেকেরই আদর্শ। এই পর্বের অসংখ্য একাঙ্ক নাটকের উদ্দেশ্য নির্ধারিত হয়েছে—সহজ উপায়ে একটা আদর্শের কথা পৌঁছে দেওয়ার এবং সরল উপস্থাপনা রীতিতে। এদের প্রকরণ পথনাটিকার সমগোত্রীয়।

নাট্যপ্রযোজনার সঙ্গে যুক্ত থেকে যিনি বাংলা থিয়েটারের গৌরববৃদ্ধি করেছেন, ইতিহাস রচনা করেছেন, সেই শম্ভু মিত্র (১৯১৫-১৯৯৭) অনেকগুলি একাঙ্ক নাটক রচনা করেছিলেন। উৎপল দত্তের রচনার সঙ্গে একাঙ্ক নাটকের মিছিলে যুক্ত হয়েছে বাদল সরকার, মোহিত চট্টোপাধ্যায়, মনোজ মিত্রের রচনাও। অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায় ও অজিত গঙ্গোপাধ্যায় তাঁদের কালে বিদেশী নাটকের অনুবাদ ও ভাবানুবাদ করে এই ধারাকে সমৃদ্ধ করেছেন।

একাঙ্ক নাট্যরচনার মূলে অন্তরের তাগিদটাকেই প্রাধান্য দেওয়া উচিত বলে আমি মনে করি। উৎসবে পুরস্কারের আশায় লেখা অসংখ্য নাটকে সৃষ্টির উন্মাদনা তথা প্রেরণা বোধকরি অনুপস্থিত থাকে।

সংক্ষেপে বাংলা নাট্যসাহিত্যে একাঙ্ক নাটকের ইতিহাস পর্যালোচনা সূত্রে মূল প্রবণতার কথা বলা হল।

বর্তমান সংকলন প্রসঙ্গে

অনেকের বিরাগভাজন হওয়ার ঝুঁকি নিয়েই এ-কাজ করতে হচ্ছে। এই বাস্তব সত্যকে মেনে নিতে হচ্ছে যে, যে কোনও সংকলনই কোনও কালেই সকলকে খুশী করতে পারে না—বরং পক্ষপাতের দিকটি তুলাদণ্ডে ঝুঁকেই থাকে। প্রথাসিদ্ধ নির্বিশেষ মান নির্ণয় এবং ব্যক্তিগত মূল্যবোধের দ্বন্দ্বে অনিশ্চিতও লাগে। আসলে এক্ষেত্রে কোনও একটি বিশেষ বিচারের মানদণ্ডে এই সংকলন সম্ভব হয়নি। ভেবেছিলাম জন্মের তারিখ, রচনার তারিখ ও নাট্যমননের আধুনিকতা—এর যে কোনও একটি ক্রমে সাজানো যাবে, কিন্তু সেটাও সম্ভব হয়নি। এক-আধটি ক্ষেত্রে তার ব্যত্যয় ঘটে গেছে। বাংলা নাটকের ইতিহাস-ভূগোলের বিস্তৃত ক্ষেত্রে বিচরণ অবলীলায় ঘটেনি আমারই সাধনা ও সময়ের অভাবে,—তার দরুণ হয়তো, কোনো কোনো যোগ্য নাট্যকারের লেখা এ-সংকলনে অনুপস্থিত থেকে গেল।

ইতিপূর্বে আলোচনা সূত্রে উনবিংশ শতাব্দীর ক্ষীণ উল্লেখ করেছি। বাংলা একাঙ্ক নাটক বিংশ শতাব্দীর সমাজমানসের ফসল—সে কথা মনে রেখে সেই সময়ের রচনাই এখানে সংকলিত হল। ১৯৬০ সালে ড: সাধনকুমার ভট্টাচার্য ও ড: অজিতকুমার ঘোষ যৌথ উদ্যোগে একাঙ্ক নাটকের সংকলন করেছিলেন—অনেকের কাছে তা আদর্শ হয়ে আছে। তাঁদের উদ্যোগে এরকম সংকলন, বোধকরি প্রথম সংগঠিত প্রচেষ্টা। সে ঘটনাটা মনে রেখেছি।

বাংলা থিয়েটারের ইতিহাসকে টেনেটুনে দু'শো বছরে স্থাপনা করার একটা চেষ্টা চলেছিল। আসলে সেই ইতিহাসের চলমানতা ১৮৫৭ সাল থেকে ধরে একশো তেতাল্লিশ বছরের। এই সংকলনের প্রথমে রবীন্দ্রনাথকেই (১৮৬১-১৯৪১) বেছে নেওয়া হল।

১৮৮৫ থেকে ১৮৯৪—এই সময়কালে 'বালক' ও 'ভারতী' পত্রিকায় রবীন্দ্রনাথের বেশ কয়েকখানি ক্ষুদ্র নাটিকা প্রকাশ পায়। ১৯০৭ সালে সেইসব নাটিকা 'হাস্যকৌতুক' ও 'ব্যঙ্গকৌতুক' নামে সংকলিত হয়েছিল। ব্যঙ্গকৌতুকের অন্তর্গত নাটিকা (তখন তো একাঙ্ক নাটক কথাটি চালু হয়নি) 'স্বর্গীয় প্রহসন' (১৮৯৪) আমাদের সংকলনের প্রথম নাটক। ষাট বছরের নাট্যকার জীবনে, রবীন্দ্রনাথ বিভিন্ন শ্রেণীর নাটক রচনা করে গেছেন। পৃথিবীর সব শ্রেণীর নাটকের রস যেন তিনি আস্বাদন করতে চেয়েছেন। হাস্যকৌতুকের নাটিকাগুলিকে ফ্রান্সের 'শারাড' (Charade) জাতীয় বলে তিনি উল্লেখ করেছেন, লিখেছেন,—'কতকটা তাহারই অনুকরণে এগুলি লেখা হয়।' হয়তো তাই, কিন্তু 'ব্যঙ্গকৌতুকে'র রচনাগুলো ভিন্ন জাতের, সেখানে কৌতুকের আবরণে কিছু কথা, অনুভবের কথাও পাওয়া যায়। ব্যঙ্গকৌতুকের গ্রন্থিত 'স্বর্গীয় প্রহসনে'র অব্যবহিত পূর্বের নাটিকা (একোক্তি) 'অরসিকের স্বর্গপ্রাপ্তি',—যেন স্বর্গীয় প্রহসনের আগমনী গান। গোকুলনাথ দত্তের স্বর্গে গিয়ে যে বোধোদয়, সেটা এইরকম—'এঁরা সেই-যে এক সামবেদের গাথা নিয়ে পড়েছেন। এর বেশি আর ইন্টেলেকচুয়াল্ মুভ্মেন্ট অগ্রসর হল না। পৃথিবী দ্রুতবেগে চলছে, কিন্তু স্বর্গ যেমন ছিল তেমনিই রয়েছে। কনসারভেটিভ্ যতদূর হতে হয়।' সেই কনসার্ভেটিভ্ স্বর্গলোকে—একদল নরলোকে নির্বাচিত দেবদেবীদের সাদরে আহ্বান করা হয়েছে 'স্বর্গীয় প্রহসনে'। সেই থেকেই নাট্যসংকট। এই নাটিকায় দেবরাজ ইন্দ্র অনেক বেশী বাস্তববাদী—মর্ত্যের সঙ্গে যোগপ্রবাহ রক্ষার দায় যে তাঁরই! অন্য সব দেবতাদের—যেমন, বৃহস্পতি, শচী, বীণাপাণি প্রমুখের আভিজাত্যে ঘা লাগছে দেবলোকের নবাগত মনসা, শীতলা, ঘেঁটু, ওলাবিবি নামধারী অজ্ঞাতকুলশীল নবনব লৌকিক দেবদেবীর আচরণে। স্বর্গলোক বিপর্যস্ত। দেবভাষার পাশে লৌকিক অ-সংস্কৃত ভাষার প্রয়োগে সংস্কৃতির কমলবন শূন্য করে দিয়েছে। এ যেন সংস্কৃতি বনাম অ-সংস্কৃতির লড়াই। এরা যেন প্রতিষ্ঠিত ব্যবস্থাটাই ভেঙে দেবে। রবীন্দ্রনাথের এই নাটিকাকে একালের নাট্যরসিক দু'ভাবে ব্যাখ্যা করতে পারেন। রবীন্দ্রনাথ কী ভেবে লিখেছিলেন সেটা তো জানা যাচ্ছে না, কাজেই ব্যাখ্যা হতেই পারে—এবং প্রযোজনার ঝোঁকের বদল ঘটতেই পারে। সংস্কৃতির জগতে অপ-সংস্কৃতি বা অ-সংস্কৃতির অনুপ্রবেশে কী ঘটতে পারে সেটা ভেবে নিয়ে সংস্কৃতির কমলবন সংরক্ষণের চেষ্টার কথা ভাবতে পারেন, অন্যদিকে অভিজাত, কনসার্ভেটিভ্ সমাজে—অনভিজাত নিম্নবর্গের মানুষের অধিকার রক্ষার ব্যাখ্যাও কেউ দিতে পারেন। মোটকথা মিতায়তনের দিক থেকে ঐক্য বজায় রাখার নিদর্শনে, দ্বন্দ্ব ও

সমস্যার অবতারণা করে সমাধান ঘটিয়ে 'স্বর্গীয় প্রহসন' এক আদর্শ একাঙ্ক।

নাটকে রঙ্গচিত্র এঁকেছেন রবীন্দ্রনাথ। এ ব্যাপারেও তাঁর অনন্যতা অনস্বীকার্য। প্রথম পর্বের, 'খ্যাতির বিড়ম্বনা' (১৮৭৭), 'বৈকুণ্ঠের খাতা' (১৮৯৭), প্রভৃতি অনেকগুলি ছোট নাটক রচনাকালেই Social Skit হিসেবে আনন্দ বিতরণে সক্ষম হয়েছে।

জন্মসাল হিসেবে এ সংকলনে এর পরের নির্বাচিত নাট্যকারদের মধ্যে তুলসী লাহিড়ী (১৮৯৭-১৯৫৯) এবং তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের (১৮৯৮-১৯৭১) আসা উচিত। কিন্তু নাট্যকার মন্মথ রায় এসেছেন। এই ক্রম-উল্লঙ্ঘনের বিশেষ কারণটি জানা যাবে পরবর্তী বিবরণ থেকে।

রবীন্দ্রনাথের, কৌতুকময় প্রশ্ন জাগানো নাটিকার পরেই, ভিন্নধর্মী আদ্যন্ত রোম্যাণ্টিক নাটক 'মুক্তির ডাক' অন্তর্ভুক্ত করা হল। মন্মথ রায় (১৮৯৯-১৯৮৮)-এর অল্প বয়েসে লেখা এই নাটিকা। সে-আমলের পৌরাণিক নাটকে উপজীব্য ছিল, ভক্তিরস : রামায়ণ, মহাভারত ও পুরাণ আশ্রিত সে সব নাট্যকাহিনী। সে ধারা ক্রমশ ক্ষীয়মান হয়ে আসছিল—ভক্তি বিশ্বাসের আবেগ নাট্যকারদের মনে আর দৃঢ় প্রতীতিতে দানা বাঁধতে পারছিল না।

'মুক্তির ডাক'-এর নাট্যকাহিনীর অবলম্বন ছিল বৌদ্ধ আখ্যায়িকা, তবে নাটক কাল্পনিক, 'অস্পষ্ট ইতিহাসের ছায়াপাতে রচিত'। এর জাত আলাদা—সুর আলাদা। মনে রাখতে চাই, পরবর্তীকালে মন্মথ রায় পুরাণ আশ্রিত যত নাটক লিখেছেন—সেখানে মনস্তাত্ত্বিক সমস্যা, তার ঘাত-প্রতিঘাত ও অর্ন্তদ্বন্দ্ব, সমকালের রাজনৈতিক চিন্তাকে আশ্রয় করে গড়ে উঠেছিল। তাঁর সব নাটকে জীবন-চেতনার আভাস পাওয়া যাবে। তাঁর রচিত একাঙ্ক নাটকের সংখ্যাই প্রায় আড়াইশো—দেড়ঘণ্টা থেকে পাঁচ মিনিটের ক্ষুদ্র নাটকও রচনা করেছেন। তাতে শিল্পরীতির বৈচিত্র্য ও সম্ভাবনা, দুই-ই বেড়েছে। পূর্ণাঙ্গ নাটকের সংখ্যাও কম নয়—পঞ্চাশের বেশী। মানের তারতম্য থাকবেই এই বিপুল রচনাসম্ভারে।

'মুক্তির ডাক' নাটকের শুরুতেই স্থান-কাল নির্দেশ করতে নাট্যকার লিখেছেন—'মগধ/বৌদ্ধযুগ/বিম্বিসারের রাজত্বকাল। গিরিশ ঘোষ রচিত বুদ্ধদেব-চরিত (১৮৮৫)-কে বাদ দিলে বৌদ্ধযুগ নিয়ে এর আগে নাটক রচিত হয়নি। গিরিশ ঘোষের নাটক অবতারত্বের অঙ্গীকারে আবদ্ধ ছিল।

'মুক্তির ডাক' রোম্যাণ্টিক নাটক একথা আগেই বলেছি। বারাঙ্গনা শ্রেষ্ঠা অম্বা, মগধাধিপতি বিম্বিসার, হৃতসর্বস্ব শ্রেষ্ঠী যুবক সুন্দরক, তার পত্নী পদ্মা আর ভিক্ষু সুচিত্র—এদের নিয়েই নাটক। নাটকের শেষে বুদ্ধের আবির্ভাব। স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্কহীনতা, অম্বার প্রতি বিম্বিসার ও সুন্দরকের প্রণয়াসক্তি—এইসব নিয়ে নাট্যসংকট তৈরী হয়েছে। সে আমলের অন্য নাটকের তুলনায় এ নাটকের সংলাপ আধুনিক। সম্পর্কের জটিলতায়, জটিলতার মোচনে, নাটক সমাপ্তির দিকে এগিয়ে যায়। পদ্মার

সংলাপ—'তুমি না শুধু আমার বিভব সম্পদ বিবাহ করেছ?...কিন্তু আমার দেহ-মনকে বিবাহ করনি'..., কিংবা অম্বার সংলাপ—'হ্যাঁ, আমার সতীত্ব। চমকে উঠো না রাজা। সতীত্ব শুধু দেহের ধর্ম নয়—আত্মার একনিষ্ঠাই তার প্রকৃত প্রাণ।' তখন তাঁকে আধুনিক মনন-সম্পন্ন নাট্যকার হিসেবে চিনতে অসুবিধে হয় না। বস্তুতঃ তা-ই, নাট্যকার তখন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের তরুণ ছাত্র, রচনাকাল বিংশ শতাব্দীর বিশের দশক। কাহিনী উন্মোচনে পরতে পরতে চমক সৃষ্টির উপাদান—কুশল বিন্যাসে উজ্জ্বল।

অন্য একটি প্রসঙ্গ উত্থাপন করে এ প্রসঙ্গ শেষ করবো। দৈবাৎ যোগাযোগে সেই তরুণ ছাত্রের লেখা নাটিকাটি কলকাতার ষ্টার রঙ্গমঞ্চে অপরেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় রচিত পঞ্চাঙ্ক নাটক 'কর্ণার্জুন'-এর সঙ্গে অভিনীত হয়, বড় নাটকের লেজুড় হিসেবে নয়, সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র মর্যাদায়। এইখানেই এর ঐতিহাসিকতা। অচিরে নাটিকাটি প্রকাশিত হয় নামী প্রকাশকের পৃষ্ঠপোষকতায়—আদৃতও হয় গুণীজনদের দরবারে। বাংলা সাহিত্যের 'বীরবল'—সমালোচকশ্রেষ্ঠ প্রমথ চৌধুরী মন্তব্য করেছিলেন—'এখানি যথার্থই একখানি drama। বাংলা সাহিত্যে ও জিনিষ একান্ত দুর্লভ।' গুরুত্ব পাবার জন্যে এসব ঘটনাই যথেষ্ট ছিল, কিন্তু সত্তর দশকে, যখন মন্মথ রায় যথেষ্ট সম্মানিত নাট্যকার, কিছু মানুষ তাঁকে এই নাটকের সুবাদে, 'বাংলা ভাষায় একাঙ্ক নাটকের জনক' বলে আখ্যাত করেন। এই সংকলনে এর অন্তর্ভুক্তিতে সে সব কথা মেনে নেবার কোন দরকার নেই। কেন?—সে প্রসঙ্গ ইতিমধ্যেই উল্লেখ করা হয়েছে বাংলা একাঙ্ক নাটকের আলোচনায়।

মন্মথ রায়ের অগ্রজ নাট্যকার তুলসী লাহিড়ী (১৮৯৭-১৯৫৯)-র বেশ কিছু সংখ্যক একাঙ্কের মধ্যে 'দেবী' সর্বশ্রেষ্ঠ হিসেবে গণ্য। 'দেবী' সম্পর্কে বলার আগে, এই সময়কার গল্পকার ও নাট্যকারদের সময়টা নিয়ে একটু আলোচনা দরকার।

প্রথম মহাযুদ্ধের সময় থেকেই তখনকার সচেতন মানুষদের চিন্তা ও চেতনার এক নতুন বোধের জন্ম হয়। ব্যক্তিত্ব, যুক্তি ও বুদ্ধির চর্চা এই পর্বে প্রাধান্য পায়। স্বাধীনতা আন্দোলনের নানান উত্থান-পতনের প্রতিক্রিয়া শিল্প-সাহিত্যের ওপর পড়েছিল। কবি-ঔপন্যাসিক অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত সেই সময়টিকে এইভাবে চিত্রিত করেছেন, 'আদর্শবাদী যুবক প্রতিকূল জীবনের প্রতিঘাতে নিবারিত হচ্ছে। এই যন্ত্রণাটা সেই যুগের যন্ত্রণা। শুধু বন্ধ দরজায় মাথা খুঁড়ছে। কোথাও আশ্রয় খুঁজে পাচ্ছে না, কিংবা যে জায়গায় পাচ্ছে, তার আত্মার আনুপাতিক নয়—এই অসন্তোষ, এই অসম্পূর্ণতায় সে ছিন্ন ভিন্ন। বাইরে যেখানে তার বাধা নেই—সেখানে বাধা তার মনে, তার স্বপ্নের সঙ্গে বাস্তবের অ-বনিবানায়। তাই একদিকে যেমন তার বিপ্লবের অস্থিরতা, অন্যদিকে তেমনি বিফলতার অবসাদ'। সময়টাকে একরকমভাবে ধরবার চেষ্টা করেছিলেন অচিন্ত্যকুমার। তিনিও তো সেই কল্লোল যুগের মানসিকতার শরিক।

তুলসী লাহিড়ী অবশ্য সেই অর্থে, কল্লোল যুগের সাহিত্য ভাবনার অংশীদার ছিলেন না। সেই যুগে, সঙ্গীতচর্চা এবং চলচ্চিত্রের প্রতি তাঁর আকর্ষণ সুবিদিত। কিন্তু সেখান থেকে চলে আসেন সাধারণ মানুষের সংস্কৃতি-অঙ্গনে,—নাট্যচর্চার পরিমণ্ডলে। সেই সময় তিনি লিখেছিলেন, 'যুদ্ধোত্তর যুগে যাদের হাতে অর্থ এল, তারা যা ভালবাসে তা-ই বাজারে চলতে লাগল। বহুদিনের পরীক্ষা-নিরীক্ষার ফলে শিল্প-সংস্কৃতি যে সামাজিক দায়িত্ব পালন করে দেশের রুচি, নীতিবোধ, রসবোধকে উন্নীত কচ্ছিল—তাও বিকৃত হতে লাগল।' আসলে দ্বিতীয়. বিশ্বযুদ্ধ, দুর্ভিক্ষ, দেশভাগ, মহামারী,—পরপর ঘটে যাওয়া ঘটনা, দেশকে ক্ষত-বিক্ষত করেছিল—তুলসী লাহিড়ীর মনকেও। অবশ্য নাট্যকার হিসেবে তাঁর খ্যাতি তাঁর যুদ্ধোত্তর কালের রচনায়। 'দুঃখীর ইমান', 'পথিক', 'ছেঁড়াতার', 'বাংলার মাটি' প্রভৃতি পূর্ণাঙ্গ জনপ্রিয় নাটকগুলো দশ বছরের ফসল। সেই সময় একাঙ্ক নাটকও তিনি রচনা করে চলেছেন। তারই একটি 'দেবী',—এই সংকলনে চয়ন করা হল।

সাধারণ মানুষের প্রতি গভীর মমতা দেখি 'দেবী' নাটকের মূলে। 'ছেঁড়াতার'-এর ধ্রুপদী সংলাপ—'মান আর হুঁস্ নিয়ে মানুষ'—সে কথা যেন এযুগে ঠাট্টা বলে মনে হচ্ছে। এখন মান, হুঁস্ বাদ দিয়েই দরিদ্র মানুষদের বাঁচতে হয়—সেই চিত্রকে স্পষ্ট করে তুলেও তুলসী লাহিড়ী 'মানুষকেই' বড় করেছেন। এ নাটকে জঙ্গলের বাউরী মেয়ে শুখ্নি জঙ্গলের বাঘের সঙ্গে অন্ধকার রাতে যুদ্ধ করে,—বাঘটাকে মেরে ফেলে নিজেও নিঃশেষ হয়ে যায়। ভবিষ্যতে 'বাঘিনীর' আক্রমণে মৃত্যুর মুখ থেকে অনেক মানুষকে বাঁচিয়ে দিয়েছে, শেষপর্যন্ত লড়াই করে glorious exit নিয়েছে সংসার-মঞ্চ থেকে। কিন্তু জঙ্গলের মানুষজন যাকে এতকাল 'দেবী' বলে এসেছে, সে হল জঙ্গলের বাঘিনী। ঘটনার পরিণতিতে সেই পশুর বদলে এক জংলী মানবী 'দেবী' হয়ে গেল। শুখ্নি, কামিনের কাজ করে কয়লাখাদে—মজুরী দৈনিক চার আনা। অন্ধকার রাত্রে, কয়লা খাদের ম্যানেজারের বাংলোর পথে দারোগাবাবুর গাড়ি খারাপ হয়ে গেছে—গাড়ি থেকে মালপত্র মাথায় বয়ে নিয়ে আসতে রাজী হয় সে, কেননা সে কাজের মজুরী দু'টাকা। বঘের ভয় নেই তার, দু' টাকার জন্যে বাবুদের প্রমোদ-সঙ্গিনী হতেও আপত্তি নেই। 'বেহায়া নষ্টা বিটিছেইলা' বলে তার তো দুর্নামও আছে। ছেলে আর বুড়ি শাশুড়ি, কটা পেট তাকেই ভরাতে হয় যে। জঙ্গলে ও জীবনে সে বে-পরোয়া। কয়লাখাদের ডাকবাংলোয়—খাদের ম্যানেজার, শহর থেকে আসা দারোগা চৌকিদার আর শুখ্নিকে নিয়ে সেই আরণ্যক পরিবেশে নাটক গড়ে ওঠে। জীবনাকৃতি আর আত্ম-অবমাননায় দীর্ণ, দরিদ্র অরণ্যচারী মানবীকে তুলসী লাহিড়ী বড় মমতার সঙ্গে গড়ে তুলেছেন স্বল্প পরিসরেই। সংলাপের দ্যুতি,—তীক্ষ্ণ ও ইঙ্গিতময়তায় সৃষ্ট নাট্যঘটনা, নাট্যকারের সিদ্ধিকে চিহ্নিত করে দেয়। দারিদ্র্যের প্রবল চাপে নিষ্পেষিত এক নারী আপন অস্তিত্ব রক্ষার সংগ্রামে নিজের জীবন বিসর্জন দিয়ে, দারোগাবাবুর

মনে এক মহত্তর উপলব্ধি এনে দিল। এও একটা নাটকীয় মোচড়।

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮৯৮-১৯৭১) ও 'বনফুল' ওরফে ডা: বলাইচাঁদ মুখোপাধ্যায় (১৮৯৯-১৯৭৯) সমবয়সী—সাহিত্যজগতে দুজনেই প্রতিষ্ঠিত ঔপন্যাসিক, গল্পকার হিসেবে। নাটক তাঁদের প্রথম প্রেম নয়,—তবু তাঁরা নাটক লিখেছেন—সমাদৃতও হয়েছেন। সাধারণভাবে দুটি শাখায় কোনও বিরোধ নেই, তবে প্রত্যাশা থাকে নাট্যকারের লেখায় নাট্যগুণ থাকবে বেশী, আর অন্য শাখার রচনায় সাহিত্যমূল্য। বর্তমান সংকলনে অবশ্য এই পার্থক্য ধরা পড়বে না। নাট্যগুণ ও সাহিত্যমূল্য সম্পর্কে সচেতন থেকেই সংকলিত হয়েছে নাটিকাগুলি। এই পর্বের নাট্যকারদের উপর সময়ের প্রভাব তো পড়েইছে, সেইসঙ্গে ইবসেনের নাট্যধর্ম, যা সেই সময়, বাংলা নাটকে আত্মসাৎ করার চেষ্টা হয়েছিল, তার লক্ষণও সুস্পষ্ট। নাট্যসাহিত্যের আঙ্গিকে, বক্তব্যে এক বৈপ্লবিক চিন্তাধারা এনেছিলেন হেনরিক ইবসেন (১৮২৮-১৯০৬)। সেইসঙ্গে এসেছে বিস্তৃত মঞ্চনির্দেশ, বাস্তব পরিবেশ সৃজনের প্রবণতা, শব্দ ও বাক্যপ্রয়োগের কৌশলে তীব্র বেগসম্পন্ন নাটকীয়তার নির্মাণ। তাঁর কাছ থেকেই পাওয়া গেছে চরিত্রের মানসিক ভাব, ক্রিয়া ও অভিব্যক্তি সম্পর্কিত নির্দেশের রীতি। তারাশঙ্কর, বনফুল, অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্তের লেখায় এইসব প্রভাব দেখতে পাই। এঁদের লেখা নাট্যগুণ-বিরহিত নয়। এই দলে আছেন—প্রেমেন্দ্র মিত্র, বুদ্ধদেব বসু, শিবরাম চক্রবর্তী প্রমুখ বিশিষ্ট সাহিত্যিক। এঁরা প্রত্যেকেই নিজস্ব ক্ষেত্রের বাইরে নাটক নিয়ে চর্চা করেছেন। আরও একটি দিকে আমি দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই। নাট্যাচার্য শিশিরকুমার ভাদুড়ী এবং অন্যান্য সহযোগিদের আবির্ভাবও এই একই লগ্নে। বাংলা থিয়েটারে তাঁদের কাজ নতুন দিগন্ত খুলে দিয়েছিল। বিশেষ করে এই সব সাহিত্যিকরা শিশিরকুমারের নাট্যাদর্শে অনুপ্রাণিতও হয়েছিলেন।

তারাশঙ্কর একজন শ্রেষ্ঠ জীবনশিল্পী। তাঁর রচিত একাঙ্ক,—'বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা'। তারাশঙ্করের গল্প-উপন্যাসে নাটকীয় উপাদান অনেক। তাঁর নাটক, 'কালিন্দী', 'দুই পুরুষ', 'পথের ডাক', 'দ্বীপান্তর', 'বিংশ শতাব্দী' সুস্পষ্ট নাট্যপ্রাণতায় সমৃদ্ধ। ভুলতে চাই না যে তারাশঙ্কর মঞ্চ-ঐতিহ্যের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে পরিচিত ছিলেন—মঞ্চাভিনয়ের কথা মনে রেখেই তিনি নাট্যরচনা করেছিলেন। তাঁর লেখা ছোট নাটিকাও একাধিক—তার মধ্যে 'বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা' অন্যতম সুন্দর রচনা। ডোম, বাগদী, কাহার, বেদে ও যাযাবর মানুষের প্রতি তাঁর আকর্ষণ,—আকর্ষণ বোষ্টম বোষ্টুমী, আখড়ার প্রতিও।

এক বোষ্টমের আখড়ার কাহিনী নিয়ে 'বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা'। মঞ্চনির্দেশে দৃশ্যপটের বিবরণ পুঙ্খানুপুঙ্খ। আখড়ার মোহান্ত কুৎসিতদর্শন গোবিন্দদাস। অজয় নদের পাড়ে সেই 'আশ্রমে',—'অজয়ের জলের ছলছলানির মধ্যে জয়দেবপ্রভুর পদ' শুনতে পায় গাঁয়ের মানুষ। আখড়ার গোবিন্দদাস বলে—'আমি বাবা কাণা খোঁড়া কালার দলে। অজয়ের জলে গ্রীষ্মকালে শুনি—কুলকুল-কুলকুল-কুল, আবার বর্ষায় শুনি কুল ভাঙ্

কুল ভাঙ্। জোড়হাত করে অজয়কে বলি—আমার ঘর বাদে বাবা, আমার ঘর বাদে'। শুরুতেই যেন ধরতাই পাওয়া যায় নাট্যঘটনার—নাট্যকৌতূহলও জাগিয়ে দেয়। বোষ্টম হলেও সে 'সুদী' কারবারী—'ভক্তিপথের মহাজনি' তার নয়—'দেনাপাওনার মহাজনি' তার। বৈষ্ণব হয়েও সে ধান পুঁতেছে, চাষ খেটেছে অন্য একটি আখড়া যখন নিলেমে উঠেছে, তখন সে আশ্রম সে কিনে নিতে চায়,—না,—আশ্রমের বিগ্রহ ও দিশেহারা বোষ্টমীর কথা ভেবে নেয়। সে বোষ্টুমী যে রসিকা। গোবিন্দের কথায়, 'বামুনের ঘরে জন্ম, বৈষ্ণবের প্রেমে দীক্ষা, রসিক হওয়ারই কথা।' কিন্তু তার যে আবার অন্য স্তরের উপলব্ধি : 'টাকার কারবারে রস নেই, ও হল শুকনো কারবার'। সে একবার পাগল হয়ে গিয়েছিল সে কথাটা সময় বুঝে গাঁয়ের লোকদের শুনিয়ে দেয়। তাতে তার একটা,—যাকে বলে, একটা ইমেজ তৈরী হয়। পাশের ওই আখড়া সে কিনে নেয়—দখল নেয়। কিন্তু আখড়ার বোষ্টুমীর আবির্ভাবে পরমাশ্চর্য এক নাটক তৈরী হয়। অভাবিত এক চমকও। বোষ্টমী আর বিগ্রহের ব্যবস্থা তো গোবিন্দ দাসকেই করতে হবে। এই দুই চরিত্র হৃদয়ের আনন্দবেদনা রসে অভিষিক্ত। কাহিনী ও চরিত্রের জীবনের রসমূর্তির এক ট্র্যাজিক পরিণতি। বোষ্টম-বোষ্টুমীর প্রবৃত্তিময় জীবনেও এক সরলতা, যা তারাশঙ্করকে আকৃষ্ট করে।

বনফুল-এর 'শিককাবাব'ও প্রবৃত্তিময় জীবনের নাটক—তবে সে প্রবৃত্তি নিম্নগামী। নৈতিকতাভ্রষ্ট সমাজের বড়লোকদের এই কাহিনীতে জটিলতা নেই কিন্তু নাটকীয় চমক আছে।

ছোটগল্পকার হিসেবে বাংলা সাহিত্যে ইতিহাস সৃষ্টি করেছেন বনফুল, সেসব কাহিনীবুননে যে চমৎকারিত্ব তা হয়তো একাঙ্ক নাটকে নেই তবু নাট্যকাহিনীর বুনটের মুন্সীয়ানায় বনফুলকে চিনে নেওয়া যায়। ১৯৪৪ সালে প্রকাশিত হয় তাঁর একাঙ্ক সংকলন 'দশভাণ'। 'ভাণ' শব্দটি তিনি গ্রহণ করেছেন সংস্কৃত নাট্যশাস্ত্রের অনুষঙ্গেই—চরিত্র লক্ষণও বজায় রেখেছেন সংকলিত একাঙ্কগুলোতে।

একটা ফিউডাল চেহারা আছে 'শিককাবাব' নাটকে। জমিদার, মোসায়েব, বিলাসকুঞ্জ,—সেখানে মদ-মাংসের সঙ্গে অনুষঙ্গ মেয়েমানুষও আছে। শুরু হয় এই সব অ-মানুষদের ব্যঙ্গাত্মক চিত্রনির্মিতি দিয়ে, বড়লোকের বিকৃত ও মানসিকতার চিত্র তো বটেই। একটা ট্র্যাজিক চেতনা কাজ করে এ নাটকে—সে চেতনাটা নাট্যকার বনফুলের। নারী মাংসলোলুপ মানুষের সমাবেশ : শ্বাপদের মত তাদের লোভ ও উৎকণ্ঠা—আর এই দুইয়ের সংঘাতে নাট্যকৌতূহল বজায় রেখে নাট্যবৃত্ত তৈরী হয়।

'কই রে শিবু, শিকগুলো নিয়ে আয়।' এই শুরুর প্রথম সংলাপ থেকেই নাটক শুরু হয়ে যায়। শিকের মধ্যে কাবাবের মাংস গাঁথা হবে—তারপরে শিককাবাব তৈরী হবে আগুনের আঁচে। এ এক প্রতীক্ষা—আর এক প্রতীক্ষা সেই মেয়েমানুষের জন্যে, যাকে পর্দার আড়ালে বসিয়ে রাখা হয়েছে। জমিদারবাবু মোসাহেব-এর প্রবেশের পর,

যে মেয়েটিকে আনা হয়েছে ভোগের জন্যে, তার ইতিবৃত্ত শোনা হয়,—'আনুপূর্বিক সব কাহিনীটি'। শুনতে শুনতে জমিদার বলে ওঠে—'এ যে রীতিমত উপন্যাস করে তুললে বাবা।' মাঝে মাঝেই সে খবর নেয়—'শিককাবাবের কতদূর?' সেই শিককাবাব এল, স্বাদ গ্রহণের জন্যে : সে স্বাদ জিভ পুড়ে যাওয়া গরমের—যা মদের নেশা ছুটিয়ে দেয়। নেশা ছুটিয়ে দেবার জন্যে, অন্য এক শীতল ঘটনা তখন অপেক্ষা করছে পর্দা ঢাকা পাশের ঘরে। মর্মান্তিক এই নাটকীয় মোচড়।

১৯২৪ সালে কল্লোল পত্রিকায় 'মুক্তি' আর ১৯২৫ সালে 'কেয়ার কাঁটা' নামে দুটি একাঙ্ক প্রকাশিত হয়েছিল : নাট্যকার কল্লোল গোষ্ঠীর অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত (১৯০৩-১৯৭৬)। পরবর্তীকালে কবি, ঔপন্যাসিক এবং শেষ বয়েসে 'পরমপুরুষ রামকৃষ্ণ' নামের জীবনী লেখক হিসেবে সমধিক খ্যাতিমান। নাট্যপ্রেমী হিসেবেও তাঁর খ্যাতি ছিল। প্রথম যৌবনে নাট্যাচার্য শিশিরকুমারের ইতিহাস সৃষ্টিকারী প্রযোজনা 'সীতা' দেখে তার মুগ্ধতাকে প্রকাশ করেছিলেন কবিতা লিখে। তার একাঙ্ক নাটকের সংকলন 'নতুন তারা' প্রকাশিত হয়েছিল ১৯৪৪ সালে—প্রথম সংস্করণে ছিল সাতটি একাঙ্ক : ১৯৫৯ সালের দ্বিতীয় সংস্করণ থেকে 'নতুন তারা' বেছে নেওয়া হল।

একটা ব্যক্তিগত অনুভূতি কিংবা কল্পনা-প্রবণতার প্রলেপ থাকে অচিন্ত্যকুমারের লেখায়। আবার ব্যঙ্গ-কৌতুক রসের মিশ্রণে আনন্দদায়ক অভিজ্ঞতাও হয়ে ওঠে তাঁর নাটক। ব্যক্তিজীবনের পুরোনো ব্যর্থতাবোধ যেন নতুন তারার দেশে যাওয়ার মুহূর্তে একটা গভীর দীর্ঘশ্বাসের পতন ঘটায়। 'নতুন তারা'র চরিত্র সংখ্যায় চারজন,—দু'জোড়া স্বামী স্ত্রী জয়ন্ত-প্রতিমা আর নির্মল-সুধা। আছে ইবসেনীয় কায়দায় দীর্ঘ মঞ্চনির্দেশ, খুঁটিনাটির বিবরণ শেষে নাটক শুরু হয়। আচমকা এক নাট্যসংকটের প্রস্তুতি। নির্মল আর সুধার সম্পর্ক নাটকের শেষে উদ্‌ঘাটিত হয়ে আর এক নাটকীয়তা সৃষ্টি করে। পুরোনো প্রেমিক নির্মল হাজির হয় বিবাহিতা প্রতিমার বাড়ি। প্রতিমা তখন নতুন বিবাহিত জীবনের স্বাদ পেয়েছে। সে ভয় পায়, তার স্বামী এখনি আপিস থেকে ফিরে আসবে। এসেও পড়ে জয়ন্ত এবং বিশ্রী ব্যাপার ঘটে যেতে থাকে। জয়ন্ত একসময় নির্মলকে জিজ্ঞাসা করে, সে প্রতিমাকে একসময় ভালবাসত কিনা। নির্মল বলে—'যাঁকে ভালবাসতাম তিনি ইনি নন।' জয়ন্তের জেরার উত্তরে বলে, আপনি ল অফ্ আইডেন্টিটি-তে বিশ্বাস করেন? তাতে বলে : 'সক্রেটিস্ সব সময়েই সক্রেটিস্, এক তার অর্থ। আমি বিশ্বাস করিনা। আজকের প্রতিমা আর সাতবছর আগের প্রতিমা সমান নয়।'

এ নাটক যেন জেগে স্বপ্ন দেখার মত। নাটক শেষে 'বনফুলে'র একটি সংলাপ মনে করিয়ে দেয়—'আমি যেন ঠুংরি শুনছিলাম'।

প্রেম-ই এ নাটকের প্রধান নাট্যবিষয়—ফ্রয়েডীয় মনঃসমীক্ষণ যেন। বলার ধরন আলাদা। রোম্যান্টিকতার আবেশ, ভাষার কারুকার্য, তির্যক সংলাপ—সর্বোপরি কাহিনী

গ্রন্থনার পারিপাট্য চমৎকৃত করে। সে সময় বাংলা গল্পে যে রোম্যাণ্টিকতার নিদর্শন মিলত—এটি তার সমগোত্রীয়। সে সময়ের স্বাদ এতে লেগে আছে। হয়তো বস্তুনিষ্ঠ নয় তারাশঙ্কর কি বনফুল-এর মত, কিন্তু জীবন ভাবনায় উদ্বুদ্ধ নিঃসন্দেহে।

আমরা একটা পর্ব শেষ করে এবারে পর্বান্তরে প্রবেশ করবো। ১৯৪৩-৪৪ সালে একটা বিশেষ সময়ের আঘাতে অন্যতর নাট্যভাবনার যুগে পৌঁছে গেলাম আমরা। বাংলার বুকে নেমে এসেছিল ঘোর দুঃসময়ের কালোছায়া। যুদ্ধ, মানুষের তৈরী দুর্ভিক্ষ, বন্যা, স্বাধীনতা আন্দোলনের চরমক্ষণ, ঘটে-যাওয়া সব বীভৎস ঘটনা। সেই সময়ের মুখোমুখি দাঁড় করিয়ে দিয়েছে সচেতন বাঙালী নাট্যকারদের। গণনাট্য আন্দোলনের ঐতিহাসিক পর্ব সেটা। 'নবান্ন' নাটকের নাট্যকার বিজন ভট্টাচার্য ও 'নবান্ন' প্রযোজনার অন্যতম স্রষ্টা শম্ভু মিত্র,—তাঁদের দুটি নাটক গ্রথিত হবে এবার।

বিজন ভট্টাচার্য (১৯১৭-১৯৭৮) বলেছিলেন, 'বাস্তববাদী হলেও আমি স্বপ্ন দেখতে ভালবাসি—উজ্জ্বল এক ভবিষ্যৎ জীবনের স্বপ্ন।' ১৯৪৩-৪৪ সালের অনেক লেখক ঘটমান বাস্তবের ধাক্কায়, সচেতন মানসিকতা নিয়ে, সময়টাকে ধরবার চেষ্টা করেছেন তাঁদের সৃজন-সম্ভারে। আন্তর্জাতিক পরিপ্রেক্ষিতে ফ্যাসিবাদের ভয়ঙ্কর রূপ তখন প্রকট হয়ে উঠেছে। আত্মনাশ ও বহু মানুষের সর্বনাশের কথা জানিয়ে দিয়েও, লেখকরা দায়িত্ব নিয়েছিলেন মহত্তর বাঁচার কথাটা উচ্চারণ করার। মন্বন্তরের করাল ধ্বংসলীলার মধ্যেও বেঁচে থাকার আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ পায়। ১৯৪৫ সালে দুর্ভিক্ষ তদন্ত কমিশনের সুচিন্তিত অভিমত প্রকাশ পেয়েছিল এইভাবে যে, 'এ দুর্ভিক্ষ অন্য যে কোনও নিয়তি-আদিষ্ট দুর্ভিক্ষের সগোত্র নয়।' তাঁরা বলেছিলেন, 'বাংলাদেশের পনেরো লক্ষ দরিদ্র নর-নারী যে সর্বনাশের সন্মুখীন হয়েছিলেন, তার জন্যে তাঁরা নিজেরা দায়ী ছিলেন না।' সমাজ তার দরিদ্র মানুষদের বাঁচাবার কোনও ব্যবস্থা করেনি। প্রশাসনিক বিপর্যয়ের সঙ্গে সঙ্গেই এসেছিল নৈতিক ও সামাজিক বিপর্যয়।

সেদিনকার সাংবাদিক বিজন ভট্টাচার্যের—সে সময়ের সাহিত্যচর্চার মুখ্যপ্রদেশ ছিল ছোটগল্প। সময়ের দাবী তাঁকে নাট্যকার করে তুলেছিল। ছোটগল্পের জগৎ থেকে অর্জিত প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা তাঁকে 'আগুন' ও 'জবানবন্দী' (১৯৪৩) লিখতে প্ররোচিত করেছিল। গ্রাম-বাংলার ডায়লেক্ট্-এর প্রথম নাট্যীয় প্রয়োগ 'জবানবন্দী' নাটকে লক্ষ্য করা গেল।

দুর্ভিক্ষের যন্ত্রণার তীব্রতায় গ্রামের বৃদ্ধ পরাণ মণ্ডল দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলে, 'হায় পরমেশ্বর।' বেন্দা প্রতিবাদ করে, 'থাকো থাকো, মাঝখানে ঐ নাম্ডা উচ্চারণ করে খাম্খা হাম্লে ওঠ কেন বলদিনি। হুঁ।' ঝগড়া বেধে যায়। গ্রাম ছাড়ে সবাই, চলে আসে শহরে আস্তানা গাড়তে। সেখানে শহরের আত্মতৃপ্ত উদাসীনতার সম্মুখীন সবাই। নিজেদের মধ্যেও তিক্ত বিবাদ বেধে যায়। অভাবের কান্না শুধু নয়—তার সঙ্গে পারিবারিক সম্পর্ক, বন্ধনের ক্ষয়ের মধ্যে যে ভয়ংকর পতন তারই ক্লিনিক্যাল

বিশ্লেষণ পাই বিজন ভট্টাচার্যের এই নাটকে। সেই সময়টার মৃত্যুর আইরনি রচিত হয় নাটকে। দৃশ্য শেষ হয়, মানববোধের সংকটের স্তরেই। শেষ দৃশ্যে ডিলিরিয়াস্ স্বপ্ন— গ্রামে ফিরে যাবার অমোঘ নির্দেশ। 'জবানবন্দী' নাটকে অব্যাহত গ্রাম-জীবন ও শস্যের অনন্ত ইতিহাসে, দুর্ভিক্ষকে যুক্ত করেও, মানুষের সংকল্পকে দুর্ভিক্ষের চেয়ে বলীয়ান করে তুলেছে। পরেব পূর্ণাঙ্গ নাটক ইতিহাস সৃষ্টিকারী 'নবান্ন'-তে তার পরিণতি ঘটেছে। এই ঐতিহাসিক সত্যকে মনে রাখতে চাই। সেই কারণেই বয়েসের দিক থেকে বড় হলেও শম্ভু মিত্রের 'বিভাব' নাটিকাকে 'জবানবন্দী'র পরবর্তী ক্রমে রাখা হল।

শম্ভু মিত্র (১৯১৫-১৯৯৭) 'বিভাব' লেখেন স্বাধীনতা উত্তর কালে : বহুরূপী প্রযোজিত এই নাটক সেই সময়ে শুধু নয়—পরবর্তীকালে নানা উপলক্ষ্যে দর্শকদের মধ্যে নতুন চমক সৃষ্টি করেছিল। চমক ছিল প্রযোজনায়—নাটিকার পাঠ-অংশে সে বিষয়ে ইঙ্গিত আছে : প্রস্তাধনায় বলা হয়েছে—'আপনারা একে 'অভাব' নাটকও বলতে পারেন—কারণ অভাব থেকেই এর উৎপত্তি।'

নির্দেশনা ও অভিনয়গুণে—যে কোনও সময়ে, যে কোনও জায়গায়, মানুষের স্মৃতি, অভিজ্ঞতা ও কল্পনায় যা-কিছু ছোঁয়া যায়, তাই মূর্ত্ত হয়ে উঠতে পারে এ নাটকে। 'বিভাব' লেখা হয়েছিল ১৯৫১ সালে, অভিনয়ের জন্যে লেখা, বলা ভাল এই স্কেচটি, নিতান্ত বৈঠকী আঙ্গিকে গড়ে উঠেছে। চরিত্রসংখ্যা তিন—শম্ভুদা, বৌদি, অমর।

'বাঙালী হাসতে ভুলে গেছে'—এমন এক অপবাদ, স্বাধীন ভারতে, সর্দার প্যাটেল দিল্লির মস্‌নদে বসে বলে ফেলেছিলেন। তাই এই নাটিকার কুশীলবেরা রাস্তায় বেরিয়ে পড়েছিল হাসির খোরাক জোগাড় করতে। হাসি তামাশার ব্যাপার করার জন্যেই যেন উদ্‌যোগ। এ নাটকে আমাদের জীবনের ছোটখাট অসঙ্গতি, ভণ্ডামি নিয়ে, কখনও স্নিগ্ধ কৌতুক, কোথাও ভর্ৎসনা। ওস্তাদের মার আছে শেষে।

আঙ্গিক অভিনয়ের দক্ষতা 'বিভাব'-কে অভিনেয় করে তোলে। মঞ্চসজ্জা, পোষাক-আশাক আর আলোক সম্পাতের কায়দা বাদ দিয়েই এ নাটক করা যায়—ওই দর্শকের কল্পনাশক্তির ওপর নির্ভর করেই। সংস্কৃত নাটকে, জাপানী 'নো' নাটকে, ভারতীয় লোকনাটকে এসব আছে। প্রস্তাবনায় অভিনেতা সে সব আলোচনা করেই বিনা চেয়ার-টেবিলে বসা, চা খাওয়া, ট্রেতে চা আনা (ট্রে, কাপ, ডিস, কিন্তু নেই), বিনা সিঁড়িতেই সিঁড়ি দিয়ে ওঠা-নামা করে অতঃপর রাস্তায় এসে চলা শুরু করেন। সেখানে ট্যাকসি যায়, ট্রাম চলে আর একেবারে শেষে আসে ভুখা মানুষদের এক মিছিল। তারপরই বিস্ময়কর এক পরিণতি—যা চাবুকের মত এসে পড়ে আমাদের—সবার মুখে।

'নবান্ন' প্রযোজনার দুই শিল্পী বিজন ভট্টাচার্য ও শম্ভু মিত্র। সময়ের অন্তরে

তাঁদের লেখা দুটি নাটিকা সেই সত্যকেই প্রতিপন্ন করে যে—'নাটক নেয় জীবন থেকে আবার জীবনও নেয় নাটক থেকে।'

বাদল সরকার (১৯২৫)—যাঁকে 'এবং ইন্দ্রজিৎ' নাটক ও থার্ড থিয়েটারের নতুন ভাবনা, সর্বভারতীয় খ্যাতি এনে দিয়েছে—তিনি একসময় একাঙ্ক নাটকও লিখেছেন কিছু। এখনো তিনি অঙ্গনমঞ্চের নাট্যচর্চা অব্যাহত রেখেছেন। তাঁর নতুন নাট্যপ্রয়োগ চিন্তাতে ভার্বাল টেকস্ট-এর গুরুত্ব কমেছে—বেড়েছে দেহের অভিব্যক্তি ও অঙ্গ সঞ্চালনের গুরুত্ব এবং প্রসেনিয়ম মঞ্চের চৌহদ্দীর বাইরের অভিনয় আঙ্গিকের। কিন্তু তিনি যে মধ্যবিত্ত বাঙালী চরিত্র সৃষ্টিতে, ছোট ছোট গণ্ডীর মধ্যে ছোট ছোট ইতিহাস তৈরী করে দিতে, ব্যক্তিগত ইতিহাস তৈরী করতে পারঙ্গম, তার নমুনা তাঁর আগের লেখা সব নাটকে বর্তমান। তাঁর লেখা 'শনিবার' উল্লেখযোগ্য একাঙ্ক।

আমরা সবাই তো আমাদের বাঁচাটাকে ন্যায্য বলে প্রতিপন্ন করতে চাই। আমার যে বাঁচার অধিকার আছে, ভালবাসার অধিকার আছে—এটা বড় গলা করে বলতে চাই কিন্তু পারিনা—কিংবা বলতে পারি কেবলমাত্র স্বপ্নে। আমাদের ছোট ছোট আকাঙক্ষা—যেগুলো নুড়ির মত, পাটকাঠির মত,—তাই দিয়ে আমরা ঘর গড়ে তুলি; আকাঙক্ষার সেই সব ঘর বারেবারেই ভেঙে ভেঙে যায়। তবু আমরা বাঁচি। 'শনিবার' নাটকের দিব্যেন্দুও মা-বাবা, ছোট ছোট ভাই-বোনকে নিয়ে বাঁচে। বাঁচে আপিসের বড় সাহেবের অনেক অবুঝ হুকুম তামিল করে। শনিবারেও আপিসের কাজ বাড়িতে আনতে হয়। রবিবারে সে-সব কাজ গুছিয়ে নিয়ে বড় সাহেবের সঙ্গে আপিস করতে হয়। ছুটির আনন্দ আহ্লাদ সব মাটি। মা বলে—'মুখপোড়া সাহেবের একটু আক্কেল নেই? হপ্তায় একটা দিন ধীরে সুস্থে একটু ভালো করে খাবে তা-না। সেই নাকে মুখে গুঁজে ছোটো? মুখপোড়া সাহেবের মরণ হয় না?' মরণ হয়, দিব্যেন্দুর হাতের রিভলবারের গুলিতে—বাস্তবে নয়, স্বপ্নে। এই স্বপ্ন বারেবারে দেখতে হয় দিবোন্দুকে—এ নাটকে তবলা লহরা আর আলোর কারসাজির মধ্যে। এই পৌনঃপুনিকতা একটা অর্থ পেয়ে যায়। দিব্যেন্দুদের মত মানুষের যে স্বপ্ন ছাড়া বেঁচে থাকার উপায় নেই। মায়ের হাতে দুধের গ্লাস আর জনে জনে দুধ খাওয়ার অনুরোধের মধ্যেও পুনরপি পৌনঃপুনিকতা,—বড় অর্থময়,—সেটা স্বপ্ন নয়। কত ছোট একটি আকাঙক্ষার পূরণ নাটকের শেষে; প্রমোসন নয়, প্রেম নয়,—শুধু সেই খবরটা—রবিবারে আপিস যেতে হবে না—শনিবারের অতিরিক্ত কাজটা করতে হবে না।

কিরণ মৈত্র (১৯২৪) নাট্য আন্দোলন এবং 'একাঙ্ক নাট্য-উৎসব' আয়োজনকালের নাট্যকার। পূর্ণাঙ্গ ও একাঙ্ক দু'রকম নাটক রচনাতেই তিনি স্বচ্ছন্দ। তাঁর নাটকে বিশেষ কোনও রাজনৈতিক মতবাদের প্রকাশ ঘটেনি। প্রচারধর্মিতার কারণে তিনি জনপ্রিয় হননি, তাঁর নাটক জনপ্রিয় হয়েছে—মঞ্চসাফল্যের জন্যে। আঙ্গিকের পরীক্ষা নিরীক্ষার ব্যাপারে তাঁর আগ্রহ দেখা গেছে তাঁর নাটকগুলোতে। তিনি নিজে অভিনেতা

ও নাট্যনির্দেশক—সে অভিজ্ঞতা তিনি কাজে লাগিয়েছেন নাট্যরচনায়, 'নাটক নয়', 'বারোঘণ্টা', 'বুদবুদ', 'নাম নেই', 'চোরাবালি'-র মত 'কোথায় গেল' একাঙ্কটিও সমধিক পরিচিত নাট্যদর্শকদের কাছে।

মানুষের মনের গভীরে—অতি জটিল আর গূঢ় রহস্য আছে—সেটা উদ্‌ঘাটিত হয়েছে 'কোথায় গেল' নাটিকাতে। গহন গভীর মানবমন—সেই মনের গভীরের অন্ধকারের মতই নাট্যদৃশ্যটি। অবহেলিত, দুর্গত নিগৃহীত দুটি মানুষকে নাট্যকার এনেছেন অন্ধকারে আচ্ছন্ন ভাঙা পোড়ো বাড়ির একটি ঘরে। নিমাই আর অতুল—অনাহারে ক্লিষ্ট কিন্তু তাদের বুকের মধ্যেকার ভালবাসাটা শুকিয়ে যায়নি। ওরা দুজনেই বাঁচতে চায়। খালি পেটে তারা এই ভুতুড়ে বাড়ির অন্ধকার ঘরে যেন দশহাজার টাকা পেয়েছে—অতুল বলে, 'গাঁয়ে ফিরে যাব। ছোট্ট একটা ঘর তুলব, তারপর দুজনে মিলে একটা দোকান দেব।' এ পর্যন্ত জটিল নয় কাহিনীটা—বেশ সরল ও স্বাভাবিক। সহানুভূতির সামর্থ্যেই,—নাট্যকার জানেন, বোঝেন এই হতদরিদ্র, পেটে-কিল-মেরে পড়ে থাকা মানুষগুলিকে। কিন্তু তাঁকে যে দেখাতে হবে অজানা মনের গভীর অন্ধকারটাকে—তাই সেই অন্ধকার ঘরের কোণে খুঁজে পেয়ে যায় সত্যিই একটা টাকার পুঁটলি। খানিকটা তর্কের পরে তারা বলে, 'কেন টাকার মালিক তো আমরা দুজনেই।' পরমুহূর্তেই তাদের মনে হয় আধাআধি ভাগ করে নেওয়া যাক্ টাকাটা। চুরি জোচ্চুরি কথাটা আর তারা ভাবছে না। আপাত স্বস্তিতে, ঘুম আর জাগরণের মধ্যে বেরিয়ে পড়ে—তাদের মনের অন্ধকার—অন্ধকার ঘরেই যার সামঞ্জস্য। পরিবর্তিত পারস্পরিক সম্পর্কে হিংস্রতা, নীচতা, সংশয় ও অবিশ্বাসের ছবি দেখিয়েও এই অভাবী দুটি মানুষের জন্যে নাট্যকারের সহানুভূতি প্রকাশ পায় নাটকের শেষ সংলাপে—'হঠাৎ আমরা কত ছোট হয়ে গিয়েছিলাম না?' নাট্যকারের কিস্তির চালে মুন্সীয়ানার যে চমক সেটাও নাটক শেষের ক্ষণপূর্বে প্রকাশিত হয়ে গেছে।

একাঙ্ক নাটক যেমন অঙ্ক শেষেই সমাপ্ত হয়ে যায়, তেমনি মধ্যবিত্ত সমাজে অর্থনৈতিক সমস্যা কণ্টকিত জীবন ও যৌবন শেষ হয়ে যায় জীবনের প্রথম অঙ্কেই। কিন্তু না,—'জীবন-যৌবন' একাঙ্কে, নাট্যকার অমর গঙ্গোপাধ্যায় (১৯৩০) নায়কের মুখ দিয়ে ঘোষণা করেন যে সে জীবনের শেষ নাটক লিখবে। কিন্তু তাতে কিছু রক্তের দাগ লেগে থাকবে। জীবনভাবনায় সমুজ্জ্বল, গাঢ় এক বেদনার রঙে রাঙানো এই নাটক।

এ নাটক এক নাট্যকারের জীবন-সংগ্রামের নাটক—যে জীবন একদিন সুস্থ সুন্দর, জীবনের স্বপ্ন দেখেছিল। আজ সে রুগ্ন, রুগ্ন তার বোন। তার বাবা এইসব দুর্বিপাকের মধ্যেও বিশ্বাস হারান না। আর এক আশ্চর্য চরিত্র সৃষ্টি, রাজীব, যে মানসিক দিক থেকে সুস্থ নয়, কিন্তু নাট্যকারের সৃজন কুশলতায় এ চরিত্র হঠাৎ-হঠাৎ বিচারের দৃশ্য কল্পনা করে সওয়াল শুরু করে দেয়। আর সেই সওয়ালের মধ্যে দিয়ে নাট্যকার

সুকৌশলে সমাজের চেহারাটা ধরিয়ে দেন। অথচ আরোপিত মনে হয় না। সমাজটাকে পাল্টে ফেলার আহ্বান থাকে সংলাপে—কিন্তু সেটা প্রচারসর্বস্ব নাটকের চেহারা পায় না। মানসিক ভারসাম্যহীন মানুষটা সব হারিয়ে, আজ পথে ঘাটে রেস্টুরেণ্টে একটিমাত্র মোকদ্দমায় সওয়াল করে চলেছে—'বিচার করুন ধর্মাবতার। সত্যাসত্যের মানদণ্ডে সৎ ও অসত্যের বিচার করুন।' এটাই তার সওয়াল। নাট্যঘটনার বিস্তার পাড়ার একটি রেস্টুরেণ্টের ভেতরে। যে পরিবেশ, আমাদের সবার পরিচিত। অথচ সেই চেনা পরিবেশেই—চেনা লোকগুলোর কথোপকথনের মধ্যেই জীবনের মূল্যবোধের এক আশ্চর্য বৈপরীত্য এ নাটকে আলো অন্ধকার তৈরী করে দেয়। জীবননৌকার পাল ছিঁড়ে গেলে কি হালটাও ছেড়ে দিতে হবে? এই প্রশ্নটাই অতি সূক্ষ্মভাবে উঠে এসেছে 'জীবন-যৌবন'-এ। নাট্যকার অমর গঙ্গোপাধ্যায়ের একাধিক নাটকে সামাজিক ও রাজনৈতিক সমস্যার প্রখর আলোয় জীবনের গূঢ়তম সমস্যাকে চিনে নিতে চান। 'জীবন-যৌবন' সেই অন্বেষণের ফসল।

'ক্ষুধার কাছে ইজ্জত দাঁড়াতে পারে না। আমার তুলনা নেই'—এই শেষ সংলাপ—সুলতান খাঁ-এর—যে সত্যিই তুলনাহীন। মুম্বাই সিনেমা জগতের ফাইট মাস্টার সুলতান তার কার্য্যকালে তুলনাহীনই ছিল। দৈহিক কসরতে অদ্বিতীয় লোহার ভীমসদৃশ তার শক্তি এবং কৌশল।

উৎপল দত্ত (১৯২৯-১৯৯৩) নাট্যকার, অভিনেতা, সংগঠক, রাজনৈতিক নাটকের প্রবক্তা এসব সংবাদ আমাদের অজানা নয়। হিন্দী ফিল্মের দৌলতে মুম্বাই চলচ্চিত্র জগতের সঙ্গে তাঁর পরিচয় ঘনিষ্ঠ। সেই পরিচয়ে তিনি চিনেছিলেন এইসব অবজ্ঞাত অথচ অসমসাহসী কোটি টাকার নায়কদের ডামি এবং ফাইট-মাস্টারদের জীবনকে। তাদের একজনকে নিয়েই কঠিন এবং নির্মম বাস্তবকে তিনি কল্পনায় গড়ে তুলেছেন এই 'লোহার ভীম' একাঙ্কে। সুলতান খাঁ-এর অতীত ও বর্তমান জীবনকে একই সঙ্গে দেখাতে এই নাটকে নাট্যকার অন্যতর কৌশল অবলম্বন করেছেন। এবং বলেই নিয়েছেন—'এ নাটক দর্শকের কল্পনাশক্তির ওপর নির্ভরশীল।'

নিঃসঙ্গ এক দড়ি পাকানো চেহারা নিয়ে, চেয়ারে বসে থাকা সুলতান খাঁ-র আত্মসংলাপ দিয়ে নাটকের শুরু। সে যে আজ অতীতের ছায়ামাত্র। কিন্তু সেই অতীতকে মঞ্চে বাঙ্ময় করে তুলতে উৎপল দত্ত এক অভিনব নাট্যকৌশল অবলম্বন করেছেন। কিন্তু সে সব তো প্রযোজকের জন্যে। অসামান্য নাট্যকৌতূহলের মধ্যে দিয়ে সুলতান খাঁ—মুম্বাই ফিল্মের ফাইট মাস্টার-এর জীবন পরিণতিতে পৌঁছেছে। সেই পরিণতি দেখে দর্শক বা পাঠক গভীর বেদনাবোধ করবে কিন্তু উৎপল দত্ত সৃষ্ট সুলতান খাঁ—খুব সহজে যেন মেনে নিয়েছে, তার জীবনের ট্র্যাজেডিকে। তাই তার মুখে সংলাপ বসান উৎপল দত্ত, 'কাজ ছাড়া তো লোক বাঁচেনা। এই অবস্থাতেও কাজ আমি করেই চলেছি। আমার তুলনা নেই।'

সংগ্রামী মানুষের সংগ্রাম শেষ হয় না,—ক্ষুধার কাছে ইজ্জতের দামও নেই। সে সহজ মনেই প্রতিদিন সন্ধ্যের শো-এর আগে সিনেমা হলের সামনে খোঁড়া পা নিয়ে ভিক্ষে করতে বসে। তার এককালের 'বস' প্রযোজক চিমনভাই—যিনি আজ বারোটা সিনেমাহলের মালিক—তার কাছে সে কৃতজ্ঞ, পুলিশকে বলে ভিক্ষে করার এই সুযোগটা করে দিয়েছে বলে : 'চিমনভাই তাঁর এই ভাঙা লোহার ভীমকে এখনো ভালবাসেন, ভিক্ষে করার বাঁধা জায়গাটা নাহলে পেতামই না।' নাটকের এই অন্তিম উক্তি যেন চাবুকের মত এসে পড়ে। 'ইস্কাবনের টেক্কা', 'পিস্তলওয়ালি', 'নশীন', 'মওৎ-কে রাত' সব সুপার-সুপার হিট বই। চল্লিশ টাকা থেকে বাড়তে বাড়তে সেদিন পাঁচশ টাকা তার মাস মাইনে হল যে দৃশ্যের পর—সেটা বড় কঠিন কাজ ছিল ফাইট মাস্টারের। সেই 'হারেম' ছবির দৃশ্যটার সংখ্যা ছিল—সীন হাণ্ড্রেড অ্যাণ্ড টু, শট ফর্টিসেভেন, টেক ওয়ান। সেই দৃশ্যের চিত্রায়নের পর সুলতান খাঁ বসে গেছে। এখন সে হেসে হেসে বলে—'আমার কপাল ভাঙলো। ধৃতরাষ্ট্রের আলিঙ্গনে লোহার ভীম চূর্ণ হলো।'

ধনবাদী সমাজে যারা ব্যবহৃত হয় ধন-উৎপাদনের কাজে—একদিন তারা ছিবড়ে হয়েই যায়।

কোনও এক কল্পিত যুদ্ধক্ষেত্রের পরিবেশে পার্থ বন্দ্যোপাধ্যায়ের (১৯৩১-১৯৮২) লেখা 'সিজফায়ার' নাটিকাতে যুদ্ধক্ষেত্রের দুটি সৈনিক শিবিরের ঘটনা চিত্রিত হয়েছে। যুদ্ধ এবং যুদ্ধশেষে বাড়ি ফেরার কল্পনা করে সেই ক্যাম্পে দু'জন, কয়েক ঘণ্টা অবসর যাপনের মধ্যে। সব শ্রেণীর, সব ধর্মের মানুষ সৈনিক হয়ে এই রণাঙ্গনে এসেছে : ঘাঁটি দখলের পরিকল্পনা চলে—ঘাঁটি দখল করতে যায়ও সকালে। কিন্তু পরিকল্পনার অভাবে বিফল হয় তারা, হতাহত হয় নিজেদের পক্ষে। আহত সৈনিক নানজিংকে বাড়ি পৌঁছে দেবার প্রস্তাব দেয় তেজবাহাদুর। কিন্তু নানজিংয়ের গাঁয়ে ফেরার উপায় নেই। প্রসঙ্গত জানা যায়, তার গ্রাম কেন্টাক্ পাহাড়ে। সঙ্গী তেজবাহাদুরের কী হল এই কেন্টাক্ পাহাড়ের নাম শুনে? অদ্ভুত এক মোড় নেয় নাট্যঘটনা। বীর বাহাদুরের ছেলে তেজবাহাদুর আজ প্রতিশোধ নেবে তার পিতার হন্তারককে মেরে। কিন্তু নানজিংয়ের সেই সংলাপ : 'যখনই তোমার মনে হবে, তুমি একটি অক্ষম লোককে মেরেছো, তখন নিজের ওপর তোমার ঘেন্না ধরে যাবে তেজ বাহাদুর! লড়াইয়ের নেশায় আমরা শান্তির পথ থেকে দূরে সরে যাচ্ছি। তেজবাহাদুর, বৃহত্তর লড়াই থেমেছে। হয়তো কাল সকলেই A-Army সিজ্‌ফায়ার declare করবে। তখন যুদ্ধের ফলাফল দেখে আঁৎকে উঠবে দুই দেশ, ভাববে, এ ধ্বংসের কি প্রয়োজন ছিল? আর আমাকে মেরে তুমি কেন্টাকের মানুষের লড়াইয়ের নেশা আরও বাড়িয়ে দেবে। অথচ আজ যদি আমরা দু'জনে একসাথে কেন্টাকে যাই, সবাই জানবে তেজ বাহাদুর—নানজিংকে বাঁচিয়েছে। পিতৃহত্যার অপরাধ ক্ষমা করেছে।'

যুদ্ধের ভয়াবহ পরিবেশে এই ব্যক্তিগত প্রতিহিংসা যেন অন্যমাত্রা যোগ করে।

শুধু এক আদর্শবাদের নাটক হয়ে থেমে যায় না। এইখানেই নাট্যকারের মননশীলতার প্রকাশ।

একসময় রবীন্দ্র ভট্টাচার্যের (১৯৩৪) একাঙ্ক নাটক পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন প্রতিযোগিতার মঞ্চে এত অভিনীত হয়েছে যা অন্য নাট্যকারের পক্ষে ঈর্ষণীয় হতে পারতো। রচনা, প্রযোজনা, অভিনয়—সব দিকে থেকে সে সময় পুরস্কারভূষিত হয়েছে। নাট্যকার সমাজ সচেতন, শ্রেণীদ্বন্দ্বে বিশ্বাসী—বিশ্বাস যাই হোক—তিনি নাট্যধর্মে সচেতন, ফর্ম বিষয়েও সতর্ক। 'হরিপদ কেরানী' ফর্মসচেতন একাঙ্ক নাটক। তাই বলে বিষয়বস্তুর অভিনবত্বের জন্যে তাঁর সমাজচেতনা কখনোই ক্ষুণ্ণ হয়নি—এ নাটকেও নয়। রবীন্দ্রনাথের লেখা দুটি কবিতা, 'কিনু গোয়ালার গলি'-র হরিপদ কেরানী এবং 'সাধারণ মেয়ে'-র মালতীকে নিয়ে লেখা একোক্তি-র নাটক। অন্য চরিত্রের সংলাপ নেপথ্যভাষণ, নাট্যকার বলে দিয়েছেন। কবিতার জীবন আর এদের এই দু'জনের বাস্তবজীবন আপাতদৃষ্টিতে কখনো কখনো মিশে যায়—আর তখনই চরিত্র কবিতার মিল ভেঙে বেরিয়ে আসার জন্য সচেতন—নিজের কৃতিত্বকে তখন বড় বলে মনে হয়। কবিতার চরিত্রকে নামিয়ে আনতে চায় নিজেদের সমতলে। প্রকারান্তরে নাট্যকার যেন শেষপর্যন্ত মেনে নেন কবিকল্পনার রাজত্বকে—সৃষ্টিকে। কেননা, হরিপদ, কবির যে ভাবনাটাতে একদা হাসি পায়—বলেছিল, সেইটাই যে তাদের জীবনে মর্মান্তিক সত্য হয়ে দেখা দিল। আর নিতান্ত সাধারণ মেয়ের মত মালতীর জীবনও অচরিতার্থতার ভারে নুয়ে পড়ল।

শিশিরকুমার দাশ (১৯৩৬) তাঁর নিজস্ব ক্ষেত্রের বাইরে নাট্যচর্চার সঙ্গে তাঁর যুক্ততা আনন্দের ব্যাপার। প্রচলিত কাহিনীসর্বস্ব বা শ্লোগান-ধর্মী নাট্যরচনায় তাঁর বিশ্বাস নেই। দিল্লি প্রবাসী এই নাট্যকার মানুষের মনের কিছু সত্য উদ্‌ঘাটনে সবিশেষ যত্নবান। সংলাপের কারুকার্য, বাস্তব-অবাস্তবের অনায়াস মেলামেশা দুর্লক্ষ্য নয় তাঁর নাটকে। সেই মন্ত্র নিয়ে শিশির দাশের বলা-বলি, যা আমাদের দেবে সম্পূর্ণ বাস্তববোধ, অবিচ্ছিন্ন স্মৃতি, কৌতুকরসের মোড়কে চোখে জ্বালা-ধরা অনুভূতি। ছোট নাটকেও তাঁর স্বাতন্ত্র্য দেখতে পাই।

'খেলা'—এক প্রতীক্ষার কাহিনী যেন—'শতাব্দীর ব্যাধি'তেও সেই প্রতীক্ষা। বুড়ো বুড়ির প্রতীক্ষা। এদের, এই বয়েসে, যাদের দেখার কথা তারা সব বিদেশে। একাকীত্বের সমস্যা। এ সময়টা শুধু 'কেনা-বেচা', 'লেন-দেন নিয়ে'। সংসারটাও তাই, এই কথা তো, সেই অতীত দিনের বুড়ো বুড়িরা বোঝে না। তাদের 'রিকোয়ারমেণ্ট' কি কেনা-বেচা যায়? তা পূর্ণ করা যায়? এ নাটকে অন্ধ মায়ের প্রতীক্ষা যার জন্যে—সে তার ছেলে অশোক। অশোকের 'এসেনসিয়াল ডাটা' সংগ্রহ করতে পারলে তো শিখিয়ে-পড়িয়ে একজন অশোককে এনে হাজির করা যায় এই ইণ্টারনেট-কম্পিউটারের যুগে। এমনি এক সূক্ষ্ম ইয়ার্কি অনায়াসে বুনে দিয়েছেন শিশির দাস—এই

নাটকে। এটা প্রতারণা নয়—খেলা, সবাই মিলে এক খেলা, এই দৃষ্টিহীন বৃদ্ধা মহিলার 'রিকোয়ারমেন্ট' মেটাতে। রিকোয়ারমেন্ট মিটেছিল হয়তো, কিন্তু স্মৃতিভ্রষ্টা বৃদ্ধাও যেন এই খেলাটা শেষ পর্যন্ত উপভোগ করেন। এখানেই নাট্যকারের শ্লেষ আমাদের বিদ্ধ করে।

শিশিরকুমার দাশের 'খেলা'-র অনুরূপ নয়, ভিন্নতর আর এক খেলার খবর পাই মোহিত চট্টোপাধ্যায় (১৯৩৫)-এর লেখা 'অক্‌টোপাস লিমিটেড'-এ। মোহিতের সব লেখাতেই বিশেষ করে সাম্প্রতিক কালে রচিত নাটকে আমরা পাই সময়ের আঘাত-প্রত্যাঘাত। আর তা থেকেই বেরিয়ে আসে কবির লড়াইয়ের মত নানা নাট্যখেলা। খেলা বলেই তীব্র কষাঘাত নেই—কিন্তু কাণামাছি খেলার ছুঁয়ে দেওয়া আছে, সেই ছোঁয়ায় জ্বালা আছে। নুনের ছিটে আছে।

মোহিত চট্টোপাধ্যায় সাম্প্রতিক কালের নানা ঘটনায় বিচলিত বোধ করেন স্বাভাবিক মানুষ হিসেবেই। নিজের যত বিরক্তি, দগ্ধ উত্তাপ—সরাসরি প্রকাশ করতে তাঁর দ্বিধা নেই। তাঁর ভঙ্গীতে একটা নির্বিকার চেহারা থাকে—কিন্তু তিনি যে নিরপেক্ষ নন, সেটা স্পষ্ট বুঝিয়ে দেন—রাগ দেখিয়ে নয়, কৌতুকের আবরণে। সেই ভয়ংকর কৌতুকবোধ থেকেই আজকের এই বিপণন কর্মশালায় বিক্রেতাদের বিক্রম দেখিয়েছেন। সমাজটাই আজ ক্রেতা হয়ে গেছে বিক্রীওয়ালার/বিকনেওয়ালারা কী দাপটে বাজার মাৎ করে দিচ্ছে। লঘু পরিহাসচ্ছলে এই স্পন্সরশিপের সময়টাকে চিনিয়ে দিয়েছেন, 'ছেলেটি' এবং 'মেয়েটি'-র বিয়ে দেওয়ার স্পন্সরশিপের এজেন্ট-এর খেলার মধ্যে দিয়ে। খেলার মাঠ থেকে কুস্তির আখড়া, পপ মিউজিকের আসর, ডিস্কো ড্যান্সের উদ্দাম নৃত্যের মঞ্চে ও খেলার মাঠে,—সর্বত্র স্পন্সরশিপের 'লোগো' ব্যবহৃত। বিয়ের দুটি টোপরে, শাড়ি-পাঞ্জাবীতেও 'লোগো' থাকবে, এতে আশ্চর্য হবার কী আছে? কেননা, এ নাটকের বিয়েটাও যে দিচ্ছে স্পন্সররা।

অন্ততঃ সেই অবাক না-হওয়ার সম্ভাবনাটা মোহিতের এই নাটকের বিষয়বস্তু। স্বর্ণসন্ধানীদের ভিড়ে প্রতিযোগিতাও চলে। এক এজেন্ট বলে—'এ টোপর পছন্দ হচ্ছে না?' হবু বর বলে—'অক্‌টোপাস লিমিটেড নাম্বার দুই-এর তরফে ওদের টোপর আসছে।' তারপরেই তো নিলামে চড়ানো হয় বর-কনের বিয়েটাকে। বিয়ে স্পন্সর-করণে ওয়ালাদের এজেন্টদের নিলামের ডাকে ক্রমশ দর চড়তে থাকে—নাটকও শেষ হয়। মোহিত চট্টোপাধ্যায়কে বাঙলা নাট্যসাহিত্যে অ্যাবসার্ড নাট্যরীতির প্রবর্তক বলে একসময় ধুয়ো তোলা হয়েছিল। বিশ্বনাট্যধারার এই নাট্যরীতির সঙ্গে আঙ্গিক ক্ষেত্রে মিল থাকলেও মোহিতের নাটক কখনো জীবন-বিরহী হয়ে ওঠেনি, জীবনকে মূল্যহীন ভাবতে শেখায়নি। তাই তার নাটক, বিশেষ করে শেষের দিকে লেখা নাটক কখনোই শিকড়হীন ব্যক্তিমানুষের ছবি হয়ে ওঠেনি, বরং ফ্যানটাসির সাহায্যে সময়ের, সমাজের জটিলতাগুলোকে ধরিয়ে দিয়েছে—কখনো কৌতুকরসের

মধ্যে দিয়ে—কখনো বা শাণিত ব্যঙ্গের মধ্যে দিয়ে। 'অক্টোপাস লিমিটেড'-এ এই সময়ের একটা ভয়ঙ্কর অর্থনৈতিক প্রবণতার কথা বলা হয়েছে, সেই বলার মধ্যে নাট্যকারের মনের অসহায়তা ও যন্ত্রণা বেরিয়ে পড়ে অব্যর্থভাবে।

মনোজ মিত্র (১৯৩৮) বর্তমান কালে জনপ্রিয় নাট্যকার, অসংখ্য পূর্ণাঙ্গ নাটকের রচয়িতা হিসেবে বাঙলা ভাষার নাট্যচর্চা কেন্দ্রগুলোতে তাঁর পরিচিতি সুবিদিত। পাশাপাশি একাঙ্ক নাটক রচনাও করেছেন। তাঁর অনেকগুলো পূর্ণাঙ্গ নাটকের খসড়া একাঙ্ক নাটকে পাওয়া যাবে।

মনোজ মিত্রের নাট্যকৃতিতে মানুষের মনের প্রকাশ ঘটে বড় সহজ সুরে। তাঁর সিদ্ধি—নাটকের সংলাপ রচনায়, নাট্যঘটনার চমৎকারিত্বে।

'পাখি'—নিম্নবিত্ত সংসারে জীবনের সোনালী স্বপ্ন ভেঙে যাওয়ার কাহিনী। স্বামী-স্ত্রীর সংসার। নীতিশ ও শ্যামা। মাঝে মধ্যে দৈনন্দিন একঘেঁয়ে জীবনে একটু-আধটু আনন্দ টেনেটুনে না আনলে কি ভালো লাগে। তা সে যত টানাটানির সংসারই হোক না কেন। তাই নীতিশের পরিকল্পনায় তাদের বিবাহ-বার্ষিকীর অনুষ্ঠান। এই নিরানন্দ পারিপার্শ্বিক—এই ঘোলা জলের জীবনে কী করে আনন্দ আসবে? তাকে খুঁজে পাওয়াই তো মুশকিল। তাই শ্যামা-নীতুর দারিদ্র্যের সংসারে অনেক ঝঞ্ঝাটের পর যখন ঘোলা জল থিতিয়ে আসে, চোখের জলের স্নিগ্ধতায় তখনই বুঝি—ওরা বোঝে বিবাহ-বার্ষিকীর সার্থকতা কোথায়? সর্বগ্রাসী অভাবও বুঝি ওদের প্রেম কেড়ে নিতে পারে না। বেডকভারে বিয়ের পরপরই শ্যামার হাতের কাজ সেই জোড়া পাখি। 'একডালে দুই পাখি। একটা নীতু, একটা শ্যামা'—দেখে একদিন বলেছিলেন নীতুর ছোড়দি। আজ হঠাৎ আবিষ্কার হোক না যে, একটা পাখি পোকায় কেটে দিয়েছে—তবুও শ্যামা ও নীতুর প্রেম নষ্ট হয়ে যায় না। সব আয়োজন ব্যর্থ হলেও লোডশেডিংয়ের অন্ধকারে মোমবাতির আলোয় ওদের মুখে হাসি ফুটে ওঠে।

'একটি অবাস্তব গল্প', বিমল বন্দ্যোপাধ্যায়ের (১৯৪০) লেখা নাটিকা। একটি বিদেশী ছোটগল্পের প্রভাব থাকলেও—এই নাটক মৌলিক রচনা হিসেবেই এই সংকলনে গৃহীত : আর মৌলিকতা কাহিনীর বুননে।

দেশের অর্থনৈতিক অগ্রগতির যে বিজ্ঞপ্তি অহরহ দেখতে পাওয়া যায়—তারই এক পটভূমিকায় এক দরিদ্রজনের কাহিনী নিয়ে এই নাটিকা, কল্পকাহিনীও বলা যায়। অন্ততঃ নাটকের রূপের আভাসে সেই কল্পকাহিনীর নক্সা। প্রযোজনার নানা কৌশল, এ নাটকের মঞ্চায়ন প্রযোজকদের প্রলুব্ধ করে। বস্তুতঃ এই নাটিকার বহুল অভিনয়ও হয়েছে—লিপিকুশলতার জন্যে স্বীকৃতি এনে দিয়েছে বিমল বন্দ্যোপাধ্যায়কে।

অনাহারের জ্বালায় ক্ষিপ্ত হয়ে ক-মণ্ডল স্ত্রীকে হত্যা করে, সেই দায়ে ফাঁসিকাঠে ঝুলতে চলেছে। ফাঁসিকাঠে ঝোলাবে যে জেলার—সেও যে আর এক হত্যাকাণ্ডের আসামী হয়ে গেল! নাট্যকার, সমাজের এক বৈষম্যকে—এক অসঙ্গতিকে একেবারে

মূলে আঘাত করতে চেয়েছেন। কেউ কেউ শাস্তি হিসেবে ফাঁসির উপযোগিতার প্রশ্নটাও ভাবতে পারেন এ নাটকের সূত্রে।

ফাঁসিতে ঝোলানোর পর দেখা গেল ক-মণ্ডল জীবিত। নাটকের সমস্যার শুরু এখান থেকেই। মৃত্যুর মুখ থেকে ফিরে এসেই ক-মণ্ডল জানতে চায়—'বাঁচা কি? আমরা কি বেঁচে আছি?'—এই প্রশ্নের জবাব দেবে কে? জেলার, ডাক্তার, বাচস্পতি কেউ যে জানেনা এ প্রশ্নের উত্তর! কিন্তু উত্তর খুঁজতে গিয়ে ওরা নাটকের মধ্যে আর এক নাটক গড়ে তোলে—বিভিন্ন ভূমিকায় জেলার, ডাক্তার, বাচস্পতিরা নানা ভূমিকায় পার্ট করতে শুরু করে। ক-মণ্ডলের স্ত্রী, ছেলেমেয়ে, ইউনিয়ন লীডার—নানা ভূমিকায় পার্ট করতে শুর করে। এ-সব আয়োজন ক-মণ্ডলের স্মৃতিকে ফিবিয়ে আনার জন্যে। এই করতে করতে ক-মণ্ডলের স্ত্রীর ভূমিকায় অভিনয় করছিল যে বাচস্পতি—সে খুন হয়ে গেল জেলারের হাতে। এখন কে বাঁচাবে জেলারকে? কিন্তু বেঁচে গেল। ক-মণ্ডলের জীবন-বৃত্তান্ত বলা হয়ে গেলে, নাট্যকাহিনীর নটে গাছটি মুড়িয়ে যায়।

অনেকদিন আগে নাট্যকার মন্মথ রায় রুশদেশের ইউক্রেনের পল্লীবাসী চিত্রশিল্পী ও লোককবি তারাশ শেভ্চেঙেকো'র জীবন নিয়ে, ওই নামেই একটি নাটক লিখেছিলেন বাঙলা ভাষায়। কোনও অনুবাদ নাটক নয়—নাট্যকার উদ্বোধিত হয়েছিলেন, ভূমিদাস প্রথার বিরুদ্ধে বিদ্রোহের আগুন ছড়িয়ে দিতে সেই লোককবির সক্রিয় কর্মকাণ্ডের ইতিবৃত্ত শুনে। প্রসঙ্গত স্মরণীয় যে, ওই নাটক পরে ইউক্রেনীয় ভাষায় অনূদিত হয়ে মন্মথ রায়কে 'সোভিয়েত ল্যাণ্ড' পুরস্কারে ভূষিত করে। সে একটা ইতিহাস।

চন্দন সেন (১৯৪৪) রুশ কবি আলেকজান্দার পুশ্কিনের জীবনের শেষ দুটি দিনকে অবলম্বন করে তেমনি একটি মৌলিক একাঙ্ক 'ঝড়ের পাখি' রচনা করেন। শেষ দু'দিনের বিবরণ সংগৃহীত হয় পুশকিনের জীবনী থেকে—তার সঙ্গে বঙ্গজ নাট্যকারের আপন কল্পনা মিশ্রিত হয়ে নাট্যসৃষ্টি হয়েছে। দুঃখ, আর্থিক অনটন, সাংসারিক বেদনা, রাজনৈতিক চাপ—এ সবের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করেছেন কবি—কিন্তু দ্বন্দ্বযুদ্ধে যে অস্বাভাবিক অবস্থায় তাঁকে মৃত্যুবরণ করতে হয়েছিল—আজও মানুষের মনে তা এক মর্মান্তিক বেদনা বহন করে আনে। জীবনের এই ট্র্যাজেডি, পুশকিনকে মানুষের হৃদয়ে স্থায়ী আসন করে দিয়েছে। সেই জীবন নিয়ে, জীবনের শেষ দুদিন নিয়েই এ নাটক—বিচিত্র তো বটেই, সেই সঙ্গে নাটকীয়ও।

'ঝড়ের পাখি'র একটি চরিত্র গোর্কান—যার ছেলের সঙ্গে পুশকিনের দ্বৈরথ—সে বলে— '...আর পুশকিনের জয় মানেই, আবার উদ্বেগজনক কবিতা, সাইবেরিয়া কিংবা অ্যারিসন জাতীয় বিদ্রোহ-উদ্দীপক গান, এককথায় ঝড়ের পাখিকে ঝোড়ো গান শোনাবার সুযোগ করে দেওয়া—।' উনিশ শতকের রাশিয়ায় এই ঝড়ের পাখিকে বাঁচিয়ে রাখা চলে না, নিষ্ঠুরতার যুগের পরে স্বাধীনতার গান শুনিয়েছিলেন যে কবি,—আমাদের কোনও নাট্যকারের রূপকল্পে তিনি বন্দী হবেন—তাতে অবাক হই মা।

রবীন্দ্রনাথকে দিয়ে এ-সংকলন শুরু হয়েছে। প্রায় শতাব্দী পার করে জন্মেছেন এমন এক নাট্যকারের নাটক দিয়ে তার সমাপ্তি। দেবাশিস মজুমদার (১৯৫০) আমাদের চমকে দিয়েছিলেন 'অমিতাক্ষর' নাটকখানি লিখে ও প্রযোজনা করে। অচিরে তাঁর অন্য অনেক নাটক আমাদের ভাবিয়েছে, দেবাশিসের স্বাতন্ত্র্য সম্পর্কে আমাদের সজাগ করেছে। হিন্দীতে অনুবাদের সুবাদে ('তাম্রপত্র', 'হওয়াই মহারাজ', 'অসমাপ্ত') নাট্যকারের সর্বভারতীয় পরিচিতি হয়েছে।

'ইমন-কল্যাণ' তাঁর সাম্প্রতিক একাঙ্কের মধ্যে অন্যতম। এও মধ্যবিত্ত জীবনের আর এক ছবি। বাড়িতে গানের আসর বসাবার এক দুরূহ পরিকল্পনা; দুরূহ কেন না, আসর বসাবার জায়গার অভাব। আসরকে মনোমত করে সাজাবার আকাঙ্ক্ষা যেন বারেবারে ভেঙে ভেঙে যায়। বাড়ির ছেলে শৌভি-র আকাঙ্ক্ষাটাই যেন আকাশছোঁয়া—আসলে আয়োজন সামান্যই। উপকরণও সামান্য। তবু সাজানো যাচ্ছে না। মা আর বৌদিকে অন্য বাড়িতে পাঠিয়ে শৌভি আর তার বান্ধবী মধুরাই আপ্রাণ চেষ্টা করে। শৌভি যে স্বপ্ন দেখে, সে বলে, 'সে যদি একটা স্বপ্ন দেখে তাকে নিজের ঘরের মধ্যে আনতে পারাটাই চ্যালেঞ্জ।' প্রচলিত অভ্যাস ওকে গ্রাস করুক। তা সে চায়নি।

ওস্তাদ যামিনী গোস্বামী আসবেন আজ এই বাড়িতে—যে বাড়িতে যে ঘরে শৌভির সাতাশ বছর কেটে গেছে। মধুরাইকে ছুঁয়ে আজ আর অচেনা মনে হচ্ছে না—কিছু হারিয়ে যাওয়া সব ছবি যেন জেগে উঠছে।। শৌভি তার অধিকারের জায়গাটা খুঁজছে, আর মেয়েটি বলে, 'শিকড়হীন স্বপ্নকে তার বড় ভয়।'

তবু দরজায় কড়া নাড়ার শব্দ। যামিনীদার আসার সময় হয়েছে—তাকে স্বাগত জানানোর সময় সমাগত। ওই অগোছাল ঘরে, আবছা অন্ধকারে, হাজার হাজার সোনার সুরের ঢেউ ভেঙে দেবে ঘরের চারটে দেওয়ালের বাধা, এমন প্রত্যাশা নিয়েই বোধ হয় জেগে ওঠে ইমন-কল্যাণের সুর।

* * *

এই শতাব্দীর সমান বয়সী হয়ে গেল এই সংকলনের নাট্যসম্ভার। ১৮৯৪ সালের রচনা দিয়ে শুরু করে শেষ রচনাটির কাল ১৯৯৮ সাল। রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে তাঁর উত্তরাধিকারীদের প্রভেদ আছে একথা মেনে নিয়েই এ সংকলনে তাঁকেই প্রথম স্থান করে দিতে হয়েছে। অনেক পরের, অনেকের একাঙ্ক নাট্য রচনায় সুপরিস্ফুট হয়েছে দ্বন্দ্বময়তা এবং আত্মসচেতনতার লক্ষণ। জিজ্ঞাসা জাগিয়ে তোলা লেখাও আছে এবং সেখানে কথ্য উচ্চারণের পক্ষে প্রাত্যহিকতাও যুক্ত হয়েছে। হয়তো কোনও অলৌকিক ঘটনা ঘটেনা কিন্তু অনেকের অনেক বাস্তববাদী নাট্যরচনায় স্বপ্ন চলে এসেছে অনায়াসে। নাটকে মিরর ইমেজ-এর খোঁজ আমি করিনি নাট্যনির্বাচনে। যেখানে মনের সঙ্গে বাইরের একটা সম্পর্ক দেখেছি—প্রতিদিনের জীবনের স্থূলতার মধ্যে চিত্তের আবরণ উন্মোচনের সম্ভাবনাই আমাকে আকৃষ্ট করেছে। মানসিক বৃত্তিগুলি

যে তখন বাস্তবসত্তার সঙ্গে যুক্ত হয়ে জীবনের মহৎ মূল্যকে ধরিয়ে দেয়। একাঙ্ক নাটকের স্বল্প পরিসরে বেশি চাওয়াও যে যায় না।

রচনার মাননির্ণয় এবং সংকলকের ব্যক্তিগত মূল্যবোধের দ্বন্দ্ব হয়তো থেকেই গেল। সেটা স্বীকার করে নিতে আমার কোনোও অসুবিধে নেই।

যাঁরা অনুমতি দিয়েছেন তাঁদের কাছে কৃতজ্ঞ। অধ্যাপক ড: বিষ্ণু বসু এবং অধ্যাপক ড: রঞ্জিত মুখোপাধ্যায় নানা ভাবে সহায়তা করেছেন। তাঁদের ধন্যবাদ।

কুমার রায়

এম/৭, বেলগাছিয়া ভিলা
কলকাতা-৭০০০৩৭

স্বর্গীয় প্রহসন

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

(১৮৬১-১৯৪১)

চরিত্র

বৃহস্পতি
ইন্দ্র
চন্দ্র
দূত

ইন্দ্রসভা

বৃহস্পতি—হে সৌম্য, তেত্রিশ কোটি দেবতাতেও কি ইন্দ্রলোক পূর্ণ হয় নাই? আরো কি নূতন দেবতা আমন্ত্রণের আবশ্যক আছে? হে প্রিয়দর্শন, স্মরণ রাখিয়ো, জন্মমৃত্যুর দ্বারা মর্তলোকে লোকসংখ্যা নিয়মশাসনে থাকে, কিন্তু স্বর্গলোকে মৃত্যুর অভাবে দেবসংখ্যা হ্রাস করিবার কোনো উপায় নাই; অতএব সংখ্যা বৃদ্ধি করিবার পূর্বে সবিশেষ বিবেচনা করিয়া দেখা কর্তব্য।

ইন্দ্র—হে সুরগুরো, স্বর্গের পথ দুর্গম করিবার জন্য স্বর্গাধিপতির চেষ্টার ত্রুটি নাই এ কথা সর্বজনবিদিত।

বৃহস্পতি—পাকশাসন নাকপতে, তবে কেন অধুনা দেবলোকে মনসা শীতলা ঘেঁটু-নামধারী অজ্ঞাতকুলশীল নব নব দেবতার অভিষেক হইতেছে?

ইন্দ্র—দ্বিজোত্তম, আমরা দেবতাগণ ত্রিভুবনের কর্তৃত্বভার প্রাপ্ত হইয়াছি বটে, কিন্তু সে কেবল ত্রিভুবনের সম্মতিক্রমে। এ কথা গুরুদেবের অগোচর নাই যে, মর্তলোকেই দেবতাদের নির্বাচন হইয়া থাকে। এক কালে আর্যাবর্তের সমস্ত ব্রাহ্মণ হোতাগণ আমাকেই স্বর্গের প্রধান পদ দিয়াছিলেন এবং তৎকালে সরস্বতী-দৃশদ্বতী তীরের প্রত্যেক যজ্ঞহুতাশনে আমার উদ্দেশে অহরহ যে হবি সমর্পিত হইত তাহার হোমধূমে আমার সহস্রলোচন হইতে নিরন্তর অশ্রু প্রবাহিত হইত। অদ্য নরলোকে হবিঘৃত কেবলমাত্র জঠরযজ্ঞে ক্ষুধাসুরের উদ্দেশেই উপহৃত হইয়া থাকে এবং শুনিতে পাই যে ঘৃতও বিশুদ্ধ নহে।

বৃহস্পতি—বৃত্রনিসূদন, সেই অপবিত্র বিমিশ্র ঘৃতপানে, শুনিতে পাই, ক্ষুধাসুর মৃতপ্রায় হইয়া আসিয়াছে। হে শক্র, দেবতাদের প্রতি দেবদেবের বিশেষ কৃপা আছে, সেইজন্যেই নরলোকে হোমাগ্নি নির্বাপিত হইয়াছে, নতুবা নব্য গব্য পরিপাক করিতে হইলে, ভো পাকশাসন, দেবজঠরের সমস্ত অমৃতরস সুতীব্র অম্লরসে পরিণত হইত, অগ্নিদেবের মন্দাগ্নি এবং বায়ুদেবের বায়ুপরিবর্তন আবশ্যক হইত, এবং সমস্ত দেবতার অমরবক্ষে অসহ্য শূলবেদনা অমর হইয়া বাস করিত।

ইন্দ্র—হে জ্ঞানীশ্রেষ্ঠ, উক্ত ঘৃতের গুণাগুণ আমার অবিদিত নাই, যেহেতু যমরাজের নিকট সর্বদাই তাহার বিবরণ শুনিতে পাই। অতএব হব্য পদার্থে আমার কিছুমাত্র লোভ নাই, এবং হোমাগ্নির তিরোধান সম্বন্ধেও আমি আক্ষেপ করিতেছি না। আমার বক্তব্য এই যে, যেমন পুষ্প হইতে সৌরভ উত্থিত হয় তেমনি মর্তের ভক্তি হইতেই স্বর্গ ঊর্ধ্বলোকে উদ্‌বাহিত হইতে থাকে; সেই ভক্তিপুষ্প যদি শুষ্ক হইয়া

যায় তবে, হে দ্বিজসত্তম, তেত্রিশ কোটি দেবতাও আমার এই পারিজাতমোদিত নন্দন-বনবেষ্টিত স্বর্গলোক রক্ষা করিতে পারিবে না। সেই কারণে, মর্তের সহিত যোগপ্রবাহ রক্ষা করিবার জন্য মাঝে মাঝে নরলোকের নবনির্বাচিত দেবতাগুলিকে সাদরে স্বর্গে আবাহন করিয়া আনিতে হয়। হে ত্রিকালজ্ঞ, স্বর্গের ইতিহাসে এমন ঘটনা ইতিপূর্বেও ঘটিয়াছে।

বৃহস্পতি—মেঘবাহন, সে-সমস্ত ইতিহাস আমার অগোচর নাই। কিন্তু ইতিপূর্বে যে-সকল নূতন দেবতা মর্ত হইতে স্বর্গলোকে উন্নীত হইয়াছিলেন তাঁহারা অভিজাত দেবগণের সহিত একাসনে বসিবার উপযুক্ত। সম্প্রতি, ঘেঁটুপ্রমুখ যে-সমস্ত দেবতাগণ তোমার নিমন্ত্রণে স্বর্গে আসিয়া আশ্রয় লইয়াছেন তাঁহারা সুরসভার দিব্যজ্যোতি ম্লান করিয়া দিয়াছেন। অদিতিনন্দন, আমার প্রস্তাব এই যে, তাঁহাদের জন্য একটি উপদেবলোক সৃজন করিবার জন্য বিশ্বকর্মার প্রতি বিশেষ ভারার্পণ করা হয়।

ইন্দ্র—বুধপ্রবর, তাহা হইলে সেই উপস্বর্গই স্বর্গ হইয়া দাঁড়াইবে এবং স্বর্গ উপসর্গ হইবে মাত্র। একমাত্র বেদমন্ত্রের উপর আমাদের স্বর্গ প্রতিষ্ঠিত। জর্মনদেশীয় পণ্ডিতগণের বহুল চেষ্টা সত্ত্বেও সে মন্ত্র এবং তাহার অর্থ সকলে বিস্মৃত হইয়া আসিয়াছে। কিন্তু আমাদের নূতন-আমন্ত্রিত দেবদেবীগণ, সায়নাচার্যের ভাষ্য, পাশ্চাত্য ঐতিহাসিকদের পুরাতত্ত্ব অথবা তাঁহাদের প্রাচ্যশিষ্যবর্গের বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যার উপর নির্ভর করিতেছেন না, তাঁহারা প্রতিদিনের সদ্য-আহরিত পূজা প্রাপ্ত হইয়া উপবাসী পুরাতন দেবতাদের অপেক্ষা অনেকগুণে প্রবল হইয়া উঠিয়াছেন। তাঁহাদিগকে স্বপক্ষে পাইলে আমরা নূতন বল লাভ করিতে পারিব। অতএব, গুরুদেব, প্রসন্নচিত্তে তাঁহাদের কণ্ঠে দেবমাল্য অর্পণ করিয়া তাঁহাদিগকে স্বর্গলোকে বরণ করিয়া লউন।

বৃহস্পতি—অহো দুর্বৃত্তা নিয়তি! মর্তলোকের প্রসাদ-লাভলালসায় কত পুরাতন দেবকুলপ্রদীপ ক্রমশ আপন দেবমর্যাদা বিসর্জন দিয়াছেন। দেবসেনাপতি কার্তিকেয় বীরবেশ পরিত্যাগ করিয়া সূক্ষ্মবসন লম্বকচ্ছে কামিনীমনোমোহন নির্লজ্জ নাগরমূর্তি ধারণ করিয়াছেন। গম্ভীরপ্রকৃতি গণপতি কদলীতরুর সহিত গোপন পরিণয়পাশে বদ্ধ হইয়াছেন এবং মহাযোগী মহেশ্বর গঞ্জিকা-ধুস্তুর-সিদ্ধিপানে উন্মত্ত হইয়া মহাদেবীর সহিত অশ্রাব্য ভাষায় কলহ করিয়া নীচজাতীয় স্ত্রী-পল্লীর মধ্যে আপনি বিহারক্ষেত্র বিস্তার করিয়াছেন। সেই সমস্তই যখন একে একে সহ্য করিতে পারিয়াছি তখন, বোধ করি, দেবাসনে উপদেবতাগণের অধিরোহণদৃশ্যও এই বৃদ্ধ ব্রাহ্মণের ধৈর্যকঠিন বক্ষঃস্থল বিদীর্ণ করিতে পারিবে না।

[চন্দ্রের প্রবেশ]

ইন্দ্র—ভগবন্ উড়ুপতে, স্বর্গলোকে তো কৃষ্ণপক্ষের প্রভাব নাই, তবে অদ্য কেন তোমার সৌম্যসুন্দর প্রফুল্ল মুখচ্ছবি অন্ধকার দেখিতেছি।

চন্দ্র—দেব সহস্রলোচন, স্বর্গে কৃষ্ণপক্ষ থাকিলে অমাবস্যার ছায়ায় আমি আনন্দে আশ্রয় গ্রহণ করিতে পারিতাম। দেবরাজ, দেবী শীতলার প্রসন্নদৃষ্টি হইতে আমাকে নিষ্কৃতি দান করো। তিনি স্বর্গে পদার্পণ করিয়া অবধি আমার প্রতি যে বিশেষ পক্ষপাত প্রকাশ করিতেছেন, আমি একাকী তাহার যোগ্য নহি। তাঁহার সেই প্রচুর অনুগ্রহ দেবসাধারণের মধ্যে সমভাগে বিভক্ত হইলে কাহারো প্রতি অন্যায় হয় না।

ইন্দ্র—সুধাংশুমালিন্, সুহৃদ্গণের সহিত ভাগ করিয়া ভোগ করিলে অধিকাংশ আনন্দই বৃদ্ধি পাইয়া থাকে সন্দেহ নাই, কিন্তু রমণীয় অনুগ্রহ সে-জাতীয় নহে।

চন্দ্র—ভগবন্, তবে সে আনন্দ তুমিই সম্পূর্ণ গ্রহণ করো। তুমি সুরশ্রেষ্ঠ, এ সুখাবেগ তুমি ব্যতীত আর কেহ একাকী সম্বরণ করিতে পারিবে না।

ইন্দ্র—প্রিয়সখে, অন্যের নিকট যাহা পাওয়া যায় তাহা বন্ধুকে দান করা কঠিন নহে; কিন্তু প্রেম সেরূপ সামগ্রী নহে; তুমি যাহা পাইয়াছ তাহা তুমি অনাদরে ফেলিয়া দিতে পারো, কিন্তু প্রিয়তম বন্ধুর অত্যাবশ্যক পূরণ করিবার জন্যও তাহা দান করিতে পারো না।

চন্দ্র—যদি ফেলিয়া দিতে পারিতাম তবে বিপন্নভাবে তোমার দ্বারস্থ হইতাম না। সুরপতে, অনেক সৌভাগ্য আছে যাহা দূরে নিক্ষেপ করিলেও নিকটে সংলগ্ন হইয়া থাকে।

ইন্দ্র—শশলাঞ্ছন, তুমি কি অপযশের ভয় করিতেছ?

চন্দ্র—সখে, সত্য বলিতেছি, কলঙ্কের ভয় আমার নাই।

ইন্দ্র—কলানাথ, তবে কি তুমি তোমার অন্তঃপুরলক্ষ্মী প্রিয়তমার অসূয়া আশঙ্কা করিতেছ?

চন্দ্র—বন্ধো, তোমার অবিদিত নাই, সপ্তবিংশতি নক্ষত্রনারী লইয়া আমার অন্তঃপুর। তাহারা প্রত্যেকেই সমস্ত রাত্রি অনিমেষ নেত্রে জাগ্রত থাকিয়া আমার গতিবিধি নিরীক্ষণ করিয়া থাকে, তথাপি এ-পর্যন্ত নক্ষত্রলোকে কোনোরূপ অশান্তির কারণ ঘটে নাই। সপ্তবিংশতির উপর আর-একটি যোগ করিতে আমি ভীত নহি।

ইন্দ্র—সখে, ধন্য তোমার সাহস। তবে তোমার ভয় কিসের?

[শশব্যস্ত হইয়া দেবদূতের প্রবেশ]

দূত—জয়োস্তু! দেবরাজ, বাণী বীণাপাণি স্বর্গপরিত্যাগের কল্পনা করিতেছেন!

ইন্দ্র—(সসম্ভ্রমে) কেন? দেবগণ তাঁহার নিকট কী কারণে অপরাধী হইয়াছে?

দূত—মনসা শীতলা মঙ্গলচণ্ডী-নাম্নী দেবীগণ সরস্বতীর কমলবনে চিঙ্গটী-নামক কর্দমচর ক্ষুদ্র মৎস্যের সন্ধানে গিয়াছিলেন। কৃতকার্য না হইয়া কমলকলিকায় অঞ্চল পূর্ণ করিয়া তিন্তিড়ী-সংযোগে কটুতৈলে অম্লব্যঞ্জন রন্ধনপূর্বক তীরে বসিয়া প্রচুর পরিমাণে আহার করিয়াছেন এবং পিত্তলস্থালী সরোবরের জলে মার্জনপূর্বক স্ব স্ব স্থানে

ফিরিয়া আসিয়াছেন। এ-পর্যন্ত মানসসরোবরের পদ্মকলিকা দেব দানব কেহই ভক্ষ্যরূপে ব্যবহার করে নাই।

[দেবগণের পরস্পর মুখাবলোকন। ঘেঁটু মনসা প্রভৃতি দেবদেবীগণের প্রবেশ]

ইন্দ্র—(আসন ছাড়িয়া উঠিয়া) দেবগণ, দেবীগণ, স্বাগত! আপনাদের কুশল? স্বর্গলোকে আপনাদের কোনোরূপ অভাব নাই? অনুচরগণ সমাহিত হইয়া সর্বদা আপনাদের আদেশ পালনের জন্য অপেক্ষা করিয়া থাকে? সিদ্ধগন্ধর্বগণ নৃত্যশালায় নৃত্যগীতাদির দ্বারা আপনাদের মনোরঞ্জন করে? কামধেনুর দুগ্ধ এবং অমৃতরস যথাকালে আপনাদের সম্মুখে আহরিত হইয়া থাকে? নন্দনবনে সুগন্ধ সমীরণ আপনাদের ইচ্ছানুগামী হইয়া বাতায়নপথে প্রবাহিত হইতে থাকে? আপনাদের লতানিকুঞ্জে পারিজাত সর্বদাই প্রস্ফুটিত থাকিয়া শোভাদান করে?

[দেবীগণের উচ্চহাস্য]

মনসা—(ঘেঁটুর প্রতি) মিন্‌সে কী বকছে ভাই?

ঘেঁটু—পুরুতঠাকুরের মতো মন্তর পড়ে যাচ্ছে। (ইন্দ্রের প্রতি) ওহে, তুমি বুঝি কর্তা? তোমার মন্তর পড়া হয়ে গিয়ে থাকে তো গোটাকতক কথা বলি!

ইন্দ্র—হে ঘেঁটো, আপনকার—

ঘেঁটু—ঘেঁটো কী! আমি কি তোমার বাগানের মালী? বাপের জন্মে এমন অভদ্দর মানুষ তো দেখি নি গা। ঘেঁটো—আমি যদি তোমাকে ইন্দির না বলে ইন্দিরে বলি!

মনসা—তা হলেই চিত্তির হয়!

[দেবীগণের উচ্চহাস্য]

ইন্দ্র—(হাস্যে যোগদান করিবার চেষ্টা করিয়া) কুন্দাভদন্তি, বহু তপস্যা দ্বারা স্বর্গলোক লাভ করিয়াছিলাম, কিন্তু কোন সুকৃতিফলে আপনকার সকলের স্মিতদশনময়ূখে স্বর্গলোক অকস্মাৎ অতিমাত্র আলোকিত হইয়া উঠিল এখনো তাহা ধারণা করিতে পারিলাম না।

ঘেঁটু—আরে রাখো, ও-সব বাজে কথা রাখো। তোমার পেয়াদাগুলো আমাকে সোনার ভাঁড়ে করে কী-সব এনে দেয় সে আমি ছুঁতে পারি নে। তোমার শচী গিন্নিকে বলে দিয়ো আমার জন্যে রোজ এক থাল গোবরের লাড়ু তৈরি করে পাঠিয়ে দেন।

ইন্দ্র—তথাস্তু। স্বর্গে আমাদের কল্পধেনু আছেন। তিনি সকলের সকল কামনাই পূরণ করিয়া থাকেন। বোধ করি আপনার প্রার্থনা পূর্ণ করা তাঁহার পক্ষে দুঃসাধ্য না হইতে পারে।

শীতলা—(চন্দ্রকে এক কোণে গুপ্তপ্রায় দেখিয়া নিকটে গিয়া) মাইরি! তুমি এত ছলও জানো ভাই। আমাকে আচ্ছা ভোগ ভুগিয়েছ যা হোক। আমি বলি, তুমি বুঝি অন্দরমহলে আছ। ঢুকে দেখি, অশ্লেষা আর মঘা নবাবপুত্রীর মতো বসে

আছেন—আমাকে দেখে অবাক হয়ে রইলেন। আমার সহ্য হল না। আমি বললুম, বলি ও বড়োমানুষের ঝি, তোমাদের গতর খাটিয়ে খেতে হয় না বলে বুঝি দেমাকে মাটিতে পা পড়ে না? যা বলতে হয় তা বলেছি। ধুন্ধুমার বাধিয়ে দিয়ে এসেছি।

চন্দ্র—(জনান্তিকে ইন্দ্রের প্রতি) সপ্তবিংশতির উপর অষ্টবিংশতিতম যোগ হইলে কিরূপ দুর্যোগ উপস্থিত হইতে পারে তাহা, হে শচীপতে, সহজেই অনুভব করিতে পারিবেন। (শীতলার প্রতি) অয়ি অনবদ্যে—

শীতলা—(হাসিয়া অস্থির হইয়া) মা গো মা, তুমি এত হাসাতেও পারো! আদর করে বেশ নামটি দিয়েছ যা হোক—আনো বদ্যি! কিন্তু বদ্যিতে করবে কী ভাই? কত বদ্যির সাত পুরুষকে আমি সাত ঘাটের জল খাইয়ে এসেছি—আমি কি তেমনি মেয়ে!

ঘেঁটু—(ইন্দ্রের গায়ের কাছে গিয়া তাঁহার পৃষ্ঠে হাত দিয়া) কী গো, ইন্দিরদা! মুখে যে রা'টি নেই? রেতের বেলা গিন্নির সঙ্গে বকাবকি চুলোচুলি হয়ে গেছে নাকি?

ইন্দ্র—(সসংকোচে সরিয়া গিয়া দূরস্থ আসন নির্দেশপূর্বক) দেব, আসনগ্রহণে অনুমতি হউক।

ঘেঁটু—এই যে এখানে ঢের জায়গা আছে। (ইন্দ্রের সহিত একাসনে উপবেশন) দাদা, আমার সঙ্গে তুমি নৌকোতা কোরো না। আজ থেকে তুমি আমার দাদা, আমি তোমার ছোটো ভাই ঘেঁটু।

[বাহুদ্বারা ইন্দ্রের গলবেষ্টন এবং ইন্দ্রকর্তৃক অব্যক্ত কাতরধ্বনি উচ্চারণ]

শীতলা—(চন্দ্রের প্রতি) তুমি যাও কোথায়?

চন্দ্র—মনোজ্ঞে, অদ্য অন্তঃপুরে দেবীগণ ভর্তৃপ্রসাদনব্রতে তাঁহাদের এই সেবকাধমকে স্মরণ করিয়াছেন—অতএব যদি অনুমতি হয় তবে, হে হরিণশালীননয়নে—

শীতলা—কী বললে! শালী? তা ভাই, তাই সই। তোমার চাঁদমুখে সবই মিষ্টি লাগে। তা, শালী যদি বললে তবে কানমলাটিও খাও।

[চন্দ্রের পার্শ্বে একাসনে বসিয়া চন্দ্রের কর্ণপীড়ন]

ইন্দ্র—(চন্দ্রের প্রতি) ভগবন্ সিতকিরণমালিন্, তুমিই ধন্য। করুণস্পর্শে তরুণীকরকিসলয়ের অরুণরাগ এখনো তোমার কর্ণমূলে সংলগ্ন হইয়া আছে।

শীতলা—(মনসার প্রতি লক্ষ্য করিয়া স্বাগত) মোলো মোলো! আমাদের মন্‌সে হিংসেয় ফেটে মোলো! আমি চাঁদের পাশে বসেছি এ আর ওঁর গায়ে সইল না। ঘুর্ ঘুর্ করে বেড়াচ্ছে দেখো-না। এতগুলো পুরুষমানুষের সামনে লজ্জাও নেই। মাগী এবার পাড়ায় গিয়ে কত কানাঘুষোই করবে। উনিও বড়ো কসুর করেন নি। কার্তিক ঠাকুরটিকে নিয়ে যেরকম নিলজ্জপনা করেছে আমি দেখে লজ্জায় মরে

যাই আর-কি। কার্তিক কোথায় নুকোবে ভেবে পায় না। ঐ তো চেহারা—ঐ নিয়ে এত ভঙ্গিও করে! মাগো মাগো মাগো! (প্রকাশ্যে) আ মর্ মাগী! চাঁদের সামনে দিয়ে অমন বেহায়ার মতো আনাগোনা করছিস কেন? যেন সাপ খেলিয়ে বেড়াচ্ছে! কার্তিকের ওখানে ঠাঁই হল না নাকি?

[সুরসভার মধ্যে মনসার ও শীতলার গ্রাম্য ভাষায় তুমুল কলহ]

ইন্দ্র—(শশব্যস্ত হইয়া একবার মনসা ও একবার শীতলার প্রতি) ক্রোধ সম্বরণ করো। ক্রোধ সম্বরণ করো। অয়ি অসূয়াতাম্রলোচনে, অয়ি গলদ্‌বেণীবন্ধে, অয়ি বিগলিতদুকূলবসনে, অয়ি কোকিলজিতকূজিতে, তারতর সপ্তম স্বরকে পঞ্চম স্বরে নম্র করিয়া আনো। অয়ি কোপনে—

ঘেঁটু—(উত্তরীয় ধরিয়া ইন্দ্রকে আসনে বসাইয়া) তুমি এত ব্যস্ত হও কেন দাদা? ওদের এমন রোজ হয়ে থাকে। থাকত ওলাবিবি, তা হলে আরো জমত। তার কি খাবার গোল হয়েছে, তাই সে শচীর সঙ্গে ঝগড়া করতে গেছে।

ইন্দ্র—(ব্যাকুলভাবে) হা সুরেন্দ্রবক্ষোবিহারিণী দেবী পৌলোমী!

[মনসার দ্রুতবেগে সভা ত্যাগ এবং শীতলার পুনশ্চ চন্দ্রের পার্শ্বে উপবেশন, বীণাপাণির প্রবেশ]

বীণাপাণি—দেবরাজ, কর্কশ কোলাহলে আমার দেববীণার স্বরস্খলন হইতেছে, আমার কমলবন শূন্যপ্রায়, আমি দেবলোক হইতে বিদায় গ্রহণ করিলাম।

[প্রস্থান]

বৃহস্পতি—আমিও জননী বাণীর অনুগমন করি।

[প্রস্থান]

[অশ্লেষা ও মঘার সভাপ্রবেশ]

অশ্লেষা ও মঘা—(চন্দ্রের একাসনে শীতলাকে দেখিয়া) আজ অপরূপ অভিনব সপ্তদশ কলায় দেব শশধরকে সমধিকতর শোভমান দেখিতেছি।

চন্দ্র—দেবীগণ, এই হতভাগ্যকে অকরুণ পরিহাসে বিড়ম্বিত করিবেন না। পুরুষরাহু আমাকে কেবল ক্ষণমাত্রকাল পরাভব করিতে পারে, সেই আক্রোশে ঈর্ষান্বিত ভগবান একটি স্ত্রীরাহু সৃজন করিয়াছেন; ইঁহার পূর্ণগ্রাস হইতে আমি বহু চেষ্টায় আপনাকে মুক্ত করিতে পারিতেছি না।

অশ্লেষা—আর্যপুত্র, এই ভদ্রললনা অনতিপূর্বে তোমার অন্তঃপুরে প্রবেশপূর্বক তোমার শ্বশুরকুলকে ঊর্ধ্বতন চতুর্দশ পুরুষ পর্যন্ত অশ্রুতপূর্ব কুৎসা দ্বারা লাঞ্ছিত করিয়া আসিয়াছেন। দেবীর সেই আশ্চর্য ব্যবহারকে আমরা অধিকারবহির্ভূত উপদ্রব জ্ঞান করিয়া বিস্ময়ান্বিত হইয়াছিলাম। এক্ষণে, স্পষ্ট বুঝিতে পারিতেছি সৌভাগ্যবতী তোমারই হস্তে সেই অবমাননের অধিকার প্রাপ্ত হইয়াছেন। এখন, আর্যপুত্রকে তাঁহার নবতর শ্বশুরকুলে বরণ করিয়া আমরা নক্ষত্রলোক হইতে

বিচ্যুতিলাভের জন্য চলিলাম। (শীতলার প্রতি) ভদ্রে, কল্যাণি, তোমার সৌভাগ্য অক্ষয় হউক।

[অশ্লেষার প্রস্থান এবং শচীর প্রবেশ]

ইন্দ্র—(সসম্ভ্রমে আসন ত্যাগ করিয়া) আর্যে, শুভ আগমন হউক।

ঘেঁটু—(উত্তরীয় ধরিয়া ইন্দ্রকে সবলে আসনে উপবেশন করাইয়া) ইস! ভারি খাতির যে! মাইরি দাদা, ঢের ঢের পুরুষমানুষ দেখেছি, কিন্তু তোর মতো এমন স্ত্রৈণ আমি দেখিনি।

[ঘেঁটুকে ইন্দ্রের বামপার্শ্বে শচীর নির্দিষ্ট স্থানে বসিতে দেখিয়া দূরে এক কোণে শচীদেবীকর্তৃক সামান্য এক আসন গ্রহণ]

ঘেঁটু—(শচীর অনতিদূরে গমন করিয়া সহাস্যে) বউঠাকরুন, আমার দাদাকে কী মন্তর পড়ে দিয়েছ বলো দেখি। একেবারে শ্রীচরণের গোলাম করে রেখেছ! তুমি উঠলে ওঠে, তুমি বসলে বসে। বলি, একটা কথাই কও। (গান) কথা কইতে দোষ কি আছে বিধুমুখী!

ইন্দ্র—দেব ঘেঁটো, কিঞ্চিৎ অবসর দিতে অনুমতি হউক। দেবীর নিকট কিছু নিবেদন আছে।

ঘেঁটু—ইস্! দেখো দেখো! একটু কাছে এসে বসেছি, তোমার যে আর গায়ে সইল না—এতটা বাড়াবাড়ি কিছু নয়—কথায় বলে অতিভক্তি চোরের লক্ষণ। কাজ নেই ভাই, আবার শাপ দেবে। তোমরা দুজনে বোসো, আমি যাই।

[বলপূর্বক ইন্দ্রকে শচীর আসনে বসাইবার চেষ্টা]

ইন্দ্র—(ঘেঁটুকে দূরে অপসারণ করিয়া) দেব, তুমি আত্মবিস্মৃত হইতেছ।

[ওলাবিবির প্রবেশ]

ওলাবিবি—(শচীর প্রতি) তাই বলি, যায় কোথায়! অমনি বুঝি সোয়ামির কাছে নাগাতে এসেছ! তা নাগাও-না। তোমার সোয়ামিকে আমি ডরাই নে।

শচী—(আসন হইতে উঠিয়া ইন্দ্রের প্রতি) দেবরাজ, আমি জয়ন্তকে সঙ্গে লইয়া বিষ্ণুলোকে কিছুকাল লক্ষ্মীদেবীর আলয়ে বাস করিবার সংকল্প করিয়াছি। বহুকাল দেবীদর্শন ঘটে নাই।

ইন্দ্র—আর্যে, আমিও দেবীর অনুসরণ করিতেছি। বহুকাল পূজার অনবসর-ক্রমে চক্রপাণির নিকট অপরাধী হইয়া আছি।

[উভয়ের প্রস্থান]

চন্দ্র—দেব সহস্রলোচন, বিষ্ণুলোকে আমারও বিশেষ আবশ্যক আছে—লক্ষ্মীদেবী—হায়, বিপৎকালে বান্ধবেরাও ত্যাগ করিয়া যায়।

শীতলা—অমন হাঁড়িপানা মুখ করে আছ্ কেন? অমন করে থাক তো ফের কানমলা খাবে।

চন্দ্র—স্ফুরৎকনকপ্রভে, বিষ্ণুলোকে আমার বিস্তর বিলম্ব হইবে না, যদি অনুমতি কর তো দাস—

শীতলা—ফের কানমলা খাবে!

[কান মলিতে উদ্যত, মনসার পুনঃপ্রবেশ, শীতলার সহিত পুনরায় কলহারম্ভ। ঘেঁটু ওলা মঙ্গলচণ্ডী প্রভৃতি সকলের তাহাতে যোগদান]

চন্দ্র—আপনারা তবে ততক্ষণ মিষ্টালাপ করুন, দাস বিষ্ণুলোক-অভিমুখে প্রয়াণ করিতে ইচ্ছা করে।

[দ্রুতপদে প্রস্থান]

□

মুক্তির ডাক

মন্মথ রায়

(১৮৯৯-১৯৮৮)

চরিত্র

শ্রীবুদ্ধ	
বিম্বিসার	মগধাধিপতি
সুন্দরক	হৃত সর্বস্ব শ্রেষ্ঠীযুবক
সুচিত্র	ভিক্ষু
অম্বা	বারাঙ্গনা-শ্রেষ্ঠা
পদ্মা	সুচিত্র-নন্দিনী (সুন্দরক পত্নী)

সংযোগস্থল সুন্দরক শ্রেষ্ঠীর 'বিলাস-কুঞ্জ'

দৃশ্য

[শ্রেষ্ঠী ভবন। শাল-তাল-পিয়াল পরিবেষ্টিত দ্বিতল প্রাসাদের নিম্নতলে মাঝখানে উপবেশন কক্ষ। তাহার দক্ষিণ ও বামপার্শ্বে তদপেক্ষা ক্ষুদ্রায়তন আর দুইটি কক্ষ। পশ্চাতে বিস্তৃত অলিন্দ। শেষোক্ত কক্ষ দুইটির দুইটি দরজা—একটি উপবেশন কক্ষে ও অন্যটি অলিন্দের সহিত যুক্ত। অলিন্দ হইতে দ্বিতলে যাইবার জন্য প্রশস্ত সোপান শ্রেণী। প্রাসাদের সম্মুখে পাষাণ বাঁধান আঁকা বাঁকা সরু পথের ধারে ধারে কুঞ্জ বীথি।

গৃহস্বামী এক তরুণ শ্রেষ্ঠী যুবক, নাম 'সুন্দরক'। গৃহস্বামিনী এক কিশোরী, নাম 'পদ্মা'।

প্রাসাদে কারুকার্যের অভাব নাই। বাসভবন হইলেও ইহা 'বিলাস কুঞ্জ' নামে খ্যাত ছিল।

চৈত্রের সন্ধ্যারাত। পূর্ণিমার চাঁদ তাল পাতার ফাঁকে ফাঁকে সবে মাত্র জ্যোৎস্না ছড়াইয়াছে। দখিন হাওয়া তাহার সঙ্গে যোগ দিয়াছে।

ঐ প্রাসাদের নিম্নতলের একধারের একটি কক্ষে উন্মুক্ত বাতায়ন পার্শ্বে এক পালঙ্কের উপর অর্দ্ধশয়ানা পদ্মা।

পদ্মা বাতায়ন পথে, মলয়-চঞ্চল তাল পত্রের আড়ালে আড়ালে চাঁদের লুকোচুরি খেলা দেখিতে ছিলেন—আর গাহিতে ছিলেন—]

গান

মম ব্যর্থ জীবন গতিহীন।
কাঁদে বন্ধর মাঝে নিশিদিন॥
হেথা ক্ষুণ্ণ দিগন্তর ঘেরি—
সদা মন্দ্রিত ক্রন্দন ভেরী
মম চিত্ত মুকুল ফুল কুঞ্জে
ব্যথা মর্মরি নির্মম গুঞ্জে,—
ক্ষুব্ধ ক্ষুধিত প্রেম বঞ্চিত অন্তরে,
স্বপ্ন বিফল দুঃখ পুঞ্জে,—
গাহে আঁখিনীরে, ধীরে হৃদিবীণ॥

[উপবেশন কক্ষে দর্পণ সম্মুখে তাঁহার স্বামী 'সুন্দরক' প্রসাধন রত ছিলেন। তাঁহার ভাব ভঙ্গীতে কি জানি একটা ব্যস্ততা লক্ষিত হইতেছিল।]

সুন্দরক—(প্রসাধনান্তে ধীরে ধীরে পদ্মার পাশে আসিয়া বসিয়া তাঁহার হাত দুখানি নিজের হাতের মধ্যে আনিয়া মিনতিপূর্ণ স্বরে)....পদ্মা।

পদ্মা—কি?

সুন্দরক—রাগ করেছ?

পদ্মা—(সুন্দরকের দিকে তাকাইয়া ছিলেন, কিন্তু তাঁহার কথা শুনিয়াই মুখ ফিরাইয়া বাতায়ন পথে তাকাইয়া) রাগ করে লাভ?

সুন্দরক—(পদ্মার দেহলতার উপর হেলিয়া পড়িয়া তাঁহার মুখোমুখী হইয়া) লাভ লোকসান বুঝিনে। রাগ করেছ কিনা সেইটে জানতে চাই—

পদ্মা—(আনত চক্ষে, ধীর স্বরে) যাও আর বিরক্ত করো না—

সুন্দরক—(অবিচলিত ভাবে) আমি কি তোমার চক্ষুশূল?

পদ্মা—(নীরবে রহিলেন)

সুন্দরক—তবে আমাকে বিবাহ করেছিলে কেন পদ্মা?

পদ্মা—(তথাপি নীরবে রহিলেন)

সুন্দরক—(পদ্মাকে ঝাকি দিয়া) বল-বল তোমায় বল্‌তে হবে—

পদ্মা—জানো আমার শরীর ভাল নয়—

সুন্দরক—তা আমি বৈদ্য ডেকে আনছি...এখনি আনছি...তোমার সিন্দুকের চাবিটা দাও।

পদ্মা—সিন্দুকের চাবি কেন?

সুন্দরক—বৈদ্যের দর্শনী, ঔষধের মূল্য...

পদ্মা—আমার চিকিৎসার প্রয়োজন নেই।

সুন্দরক—ও...তুমি তবে আমায় বিশ্বাস কর্চ্ছনা?

পদ্মা—বহুবার যে ঠেকে শিখেছে...বিশ্বাস যদি আজ সে না কর্ত্তে পারে, তবে...

সুন্দরক—বটে! বেশ, তবে আমি খোলাখুলিই বলছি—আজ রাত্রেই আমার দশ সহস্র স্বর্ণ মুদ্রার প্রয়োজন—এ আমার চাই-ই চাই...না পেলেই হবে না।

পদ্মা—তা একথা আমাকে বলে লাভ?

সুন্দরক—এ অর্থ তোমাকেই দিতে হবে।

পদ্মা—(সবিস্ময়ে) আমাকে দিতে হবে?

সুন্দরক—হাঁ।

পদ্মা—কেন?

সুন্দরক—আমি একজনকে নিমন্ত্রণ করেছি। শুধু আজ নয়—বহুদিনই করেছি, কিন্তু এতদিন সে তাতে কর্ণপাত করেনি—আজ আমার বহুভাগ্যে সে সে-নিমন্ত্রণ রক্ষা কর্ত্তে সম্মত হয়েছে—এ অর্থ তার অভ্যর্থনার জন্য প্রয়োজন—

পদ্মা—কে সে যার অভার্থনার মূল্য দশ সহস্র স্বর্ণমুদ্রা?

সুন্দরক—তুমি না হয় তা নাই শুনলে।

পদ্মা—মহারাজ বিম্বিসার?

সুন্দরক—মহারাজ বিম্বিসার তার অভ্যর্থনার জন্য রাজ সিংহাসন দক্ষিণা দান করেন—

পদ্মা—কে সে?

সুন্দরক—বুঝে দেখ কে সে। আজ এইরূপ এক মহা সম্মানিত অতিথির জন্য আমি তোমার নিকট হাত পাতছি—। স্ত্রী তুমি...স্বামীর মর্যাদা রক্ষা কর—

পদ্মা—আগে বল কে সে?

সুন্দরক—তবে দেবে?

পদ্মা—হয়ত দেব—

সুন্দরক—তার নাম অম্বা—

পদ্মা—সেই বেশ্যা?

সুন্দরক—সেই বিশ্ব-বন্দিতা—

পদ্মা—(নীরব রহিলেন)

সুন্দরক—দাও...

পদ্মা—সে তোমার অতিথি—আমার নয়। আমি দেব না।

সুন্দরক—কিন্তু আমি দেব কোথা হতে? চরিত্র দোষে আমি আজ কপর্দ্দক হীন—কিন্তু তোমাকে স্ত্রীরূপে পেয়েছি বলে আজো আমার লক্ষ্মীর সংসার—আমার বড় আশা, আমি নিরাশ হবনা—

পদ্মা—শুনেছিলাম অতি বড় সে কাপুরুষ...সেও স্ত্রীধন গ্রহণ করে না—

সুন্দরক—আমি তোমার নিকট ভিক্ষা চাইছি—পদ্মা! এ তোমায় দিতেই হবে...না দিলে আমি কিছুতেই ছাড়বোনা—এ তুমি ঠিক জেনো—।

পদ্মা—দেখ তোমার ঐ ভিক্ষা চাওয়ার অত্যাচার আমার আর সহ্য হয় না—

সুন্দরক—সহ্য না হলে কি কর্ব্বে!

পদ্মা—মর্ত্তে বসেছি—মর্ব্ব।

সুন্দরক—মুখের কথায়—যদি মরা যেত—তবে—

পদ্মা—মুখের কথা! তুমি কি বোঝনা যে আমি তিল তিল করে আজ জীবনের শেষ ধাপে পা বাড়িয়েছি। দুই বৎসব পূর্ব্বে তুমি নিশীথে আমার পিতৃগৃহে অবৈধ প্রবেশের জন্য ধৃত হয়েছিলে—তোমার জীবন মৃত্যুর সেই সন্ধিক্ষণে তোমার অশ্রুভারাবনত সেই তরুণ মুখশ্রী দেখে আমি মুগ্ধ হয়েছিলাম। তার পর পিতার নিকট নতজানু হয়ে তোমার মুক্তি ভিক্ষা চেয়ে চোখের জলে পিতার সম্মতি আদায় করে যে দিন তোমার কণ্ঠে আমি বরমাল্য অর্পণ করেছিলাম—সেইদিন—সেই দিনই আমি আমার অজ্ঞাতেই বিষপান করেছি।—যাও, আর কথাতে কাজ নেই—তোমার উৎসবের সময় হয়ে এসেছে...(বাতায়ন পথে তাকাইয়া) কি সুন্দর ঐ জ্যোৎস্না!—না সহ্য হয় না। (অন্য দিকে মুখ ফিরাইলেন)।

সুন্দরক—যেতে বলছ...যাচ্ছি। কিন্তু স্বর্ণ মুদ্রা সঙ্গে না নিয়ে যে যেতে পারছি না পদ্মা—

পদ্মা—আমি এক কপর্দ্দকও দেব না—

সুন্দরক—দেবে না?

পদ্মা—কখ্খনো নয়।

সুন্দরক—(ক্রুদ্ধ হইলেও আত্মসংবরণ করিয়া) দেবে না?

পদ্মা—কি স্বত্বে তুমি আমার নিকট এ অর্থ দাবী কচ্ছ?

সুন্দরক—তবে শোন...লুকোচুরি করে লাভ নেই। সেই বিবাহ-বাসরে কি মন্ত্র পাঠ করে তোমায় গ্রহণ করেছিলাম জানি না; কিন্তু যদি বিবাহই করে থাকি—তবে তোমার দেহ মনকে নয়—পিতার উত্তরাধিকারিণী রূপে তোমার ধনৈশ্বর্য যা কিছু ছিল...তাই! আমার সোজা কথা—

পদ্মা—(বিস্মিত হইয়া, পরে সহজভাবে) এই কথা; (পালঙ্ক হইতে উঠিয়া) তা এটা এতদিন আমায় মুখ ফুটে বলনি কেন?

সুন্দরক—অন্ততঃ তোমার পিতার প্রব্রজ্যা গ্রহণের পর, আমার কথায়, কাজে, আমার ভাবে, ভঙ্গিমায় এ কথা তোমার আপনা হতেই বোঝা উচিত ছিল!

পদ্মা—তা বটে! হাঁ তবে, না...আচ্ছা, আজকের মত তুমি যা চাইছ—আমি দিচ্ছি। কিন্তু, তার পর কি কর্ব্ব বলতে পারি না।

[অলিন্দ সংলগ্ন দ্বার পথে দ্বিতলে প্রস্থান]

সুন্দরক—(প্রস্থান পরায়ণা পদ্মার দিকে তাকাইয়া রহিলেন—পদ্মা প্রস্থান করিলে পর) কি কর্ব্ব। উপায় নেই। সে যখন আমার নিকট স্বর্ণমুদ্রার এই দক্ষিণা চেয়েছে—আমাকে দিতেই হবে—আমি দেব। তাকে আমি আমার প্রণয় নিবেদন করেছি—সে প্রত্যাখ্যান করেছে। এর পূর্ব্বে কতদিন নিমন্ত্রণ করেছি—সে গ্রহণ করেনি। আজ যখন আমার উপর তার অনুগ্রহ হয়েছে...সে অনুগ্রহ আমি বরণ কর্ব্ব...অন্ততঃ একটি রাত্রের জন্যও আমি সেই বিশ্ববাঞ্ছিতা নারীকে পূজা কর্ব্বার সৌভাগ্য ক্রয় কর্ব্ব। আমি তাকে যখন আমার অর্ঘ্য দান কর্ব্ব—সে কি সস্মিত দৃষ্টিতে আমার পানে একটিবার চাইবে না? আমি তাকে যখন আমার নৈবেদ্য দান কর্ব্ব—সে কি আবেগে একটি গান গাইবে না?

[বাহিরের দ্বারে মৃদু করাঘাত]

সুন্দরক—(ত্বরিৎ পদে দ্বারদেশে যাইয়া)...কে? (উত্তর আসিল..'আমি')।

সুন্দরক—(বিচলিত হইয়া) অম্বা? (উত্তর আসিল—'দোর খুলেই দেখ না—')

সুন্দরক—(একটু ভাবিয়া) আচ্ছা—এস।

[দ্বারোদ্ঘাটন করিলেন—মহার্ঘ সাজ সজ্জা ভূষিতা বারাঙ্গনা-শ্রেষ্ঠা অম্বা প্রবেশ করিলেন]

সুন্দরক—(সাগ্রহে তাঁহাকে অভ্যর্থনা করিয়া সানুনয়ে) আমার একি সৌভাগ্য! বড় বিলম্ব হয়ে গেছে—না?—আমি এখনি যাচ্ছিলাম—বড় কষ্ট দিয়েছি—

অম্বা—গৃহে নব যুবতী স্ত্রী—বিলম্ব যে হবে তা আমি জানতাম। কাজেই ব্যর্থ প্রতীক্ষার ব্যথা সইনি—নিজেই চলে এলাম।

সুন্দরক—কিন্তু নিমন্ত্রিত অতিথিরা...বিশেষতঃ মহারাজ বিম্বিসার?

অম্বা—তাঁদের ঘুম পাড়িয়ে রেখে এসেছি। তাঁরা এখন নেশায় রঙ্গীন হয়ে স্বপ্নলোকে খেলা কর্চ্ছে। অভিসারের আনন্দ বহুদিন পাইনি—আমি চুপি চুপি তোমার এখানে চলে এলাম।

সুন্দরক—বেশ হয়েছে। তবে এসো অম্বা, আজ এই দরিদ্রের ভবনই তোমার নুপুর গুঞ্জনে—তোমার কল হাস্যে মুখরিত হোক্—তোমার চরণ রেণু বুকে নিয়ে এই কক্ষের পাষাণে প্রাণ প্রতিষ্ঠা হোক্—

[অম্বার হাত ধরিলেন]

অম্বা—কিন্তু আমার মুখে যে আর কথা ফুটছে না সুন্দরক! এখানে যে আমার দম আটকে আসছে বন্ধু!

সুন্দরক—কেন অম্বা?

অম্বা—(বিস্ফারিত নেত্রে) পায়ের তলের ঐ পাষাণ...ওতো মৃত নয়...নীচে কি আগুন জ্বলছে? চারিদিকের এই প্রাচীর—ওতো অচল নয়...সুন্দরক। সুন্দরক! ওরা কি আমায় গ্রাস কর্ত্তে আসছে?

সুন্দরক—সে কি?

অম্বা—তাইত! তাইত! এ কি!

সুন্দরক—তুমি আজ নেশায় ভরপুর দেখছি!

অম্বা—(চমকিয়া উঠিয়া) তাই কি? (পরে তাঁহার দিকে স্থির নেত্রে চাহিয়া) ঠিক বলেছ। হাঃ হাঃ হাঃ...

সুন্দরক—চল, আমার প্রমোদ কক্ষে চল—

অম্বা—তোমার স্ত্রী কোথায়, সুন্দর?—তাকে আমায় একবার দেখাতে পার?—দেখতে চাই...কি সে যার জন্য তুমি আমায় নিমন্ত্রণ করেও আমায় অভ্যর্থনা করে আনতে যাও নি? সে কি এতই সুন্দর?—আমারো চেয়ে?

সুন্দরক—বোধ হয় তোমারো চেয়ে—

অম্বা—আমার মত তার মুখ? আমার মত তার চোখ?

সুন্দরক—ঠিক তোমার মত তার মুখ—ঠিক তোমার মত তার চোখ—

অম্বা—তবে তুমি আমার পায়ে পায়ে ঘুরে বেড়াও কেন সুন্দরক?

সুন্দরক—তুমি যে অম্বা—আর সে যে পদ্মা...

অম্বা—অর্থাৎ?

সুন্দরক—এর আর অর্থাৎ নেই। যদি থাকতো, তবে পতঙ্গ প্রদীপের আগুনে ঝাপ দিতে না ছুটে ঐ নীলাকাশে চাঁদের পানে চেয়ে ছুটতো—

অম্বা—হুঁ! সুন্দর, আমি অতিথি, অতিথির দক্ষিণা দাও।

সুন্দরক—অবশ্য দেব...একটু অপেক্ষা কর অম্বা।

অম্বা—না এখনি চাই! আমি আর বিলম্ব কর্ত্তে পাচ্ছিনে...

সুন্দরক—এখনি?

অম্বা—এখনি। এই মুহূর্তে। তোমার প্রদীপের তেল ফুরিয়ে গেছে।

সুন্দরক—এই জন্যই কি আমি স্ত্রী পর্যন্ত ত্যাগ করতে উদ্যত হয়েছি?

অম্বা—এই কথা! (শ্লেষ পরিপূর্ণ হাস্য) সুভদ্রকে এ কথা বলো না কিন্তু —খবরদার—সে আমার জন্য, তার স্ত্রীর খাদ্যে তার অজ্ঞাতে বিষ মিশিয়ে দিয়ে নিষ্কণ্টক হয়েছিল।...জানো?

সুন্দরক—(মাথা নত করিয়া নীরব রহিলেন)

অম্বা—...দেখো...কুলীরক যেন তোমার এই অপূর্ব আত্মত্যাগের কথা না জানতে পারে! তবে সে বড়ই লজ্জা পাবে। সে আমার জন্য তার বৃদ্ধ পিতা কর্ত্তৃক নিত্য তিরস্কৃত হওয়াতে তার বুকে নিজহাতে ছুরী বসিয়েছিল।...জানো?

সুন্দরক—(নীরব রহিলেন)

অম্বা—আর আমি আমার প্রথম প্রণয়াস্পদের জন্য কি করেছিলুম জানো?

সুন্দরক—তুমি!

অম্বা—হাঁ, আমি! তিনি ছিলেন এক নিঃসহায় দরিদ্র রাজপুত্র। তাঁর বৈমাত্রেয় ভ্রাতা তাঁর সিংহাসন লাভের প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বী ছিল। তাঁর ঐ অনিশ্চিত সিংহাসনকে সুনিশ্চিত করবার জন্য অর্থের প্রয়োজন। এ দিকে আমার পিতার প্রতিশ্রুতি অনুসারে পিতৃবন্ধু এক পুত্রের সঙ্গে নিজের সম্পূর্ণ অনিচ্ছা সত্ত্বেও যখন আমাকে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হতে হল—তখন, বিবাহের পূর্ব হতেই যাঁকে হৃদয় মন ইহকাল পরকাল সমর্পণ করেছিলুম—আমার সেই জীবন-দেবতার সাহায্যের জন্য আমার বিবাহিত স্বামীর ধনরত্নের বিপুল ঐশ্বর্য, প্রতি নিশীথে ক্রমে ক্রমে চুরি করে, তাঁর হাতে তুলে দিয়ে শেষে একদিন স্বামীর হাতে ধরা পড়ি।

সুন্দরক—(রুদ্ধ নিঃশ্বাসে)—তার পর?

অম্বা—বিজয়িনী অম্বার মনোবাসনা ষোলকলায় পূর্ণ হল। স্বামী মনোদুঃখে গৃহ ত্যাগ করলেন। আমি আমার প্রণয়াস্পদকে দুই সিংহাসনেই সুপ্রতিষ্ঠিত করতে পারলুম...এক সিংহাসন রাজসভায়, আর এক সিংহাসন আমার শয়ন কক্ষে।

সুন্দরক—আর তোমার স্বামী? তাঁকে কি তুমি? হত্যা...?

অম্বা—না প্রয়োজন হয়নি। যে মনোদুঃখে গৃহ ত্যাগ করে সে কৃপার পাত্র—হত্যার নয়।

সুন্দরক—অম্বা! স্ত্রীকে ভালবাসি কিনা জানি না—কিন্তু তবু আমি মুক্তকণ্ঠেই বলব—সে আমার সতী সাধ্বী স্ত্রী। আদর যত্ন সোহাগ, সে আমার কাছে কিছুই পায়নি—যদি

কিছু পেয়ে থাকে তবে সে শুধু নির্যাতন! তবু স্ত্রী হয়েও আমার মনস্তুষ্টির জন্য আমার পাপ—প্রবৃত্তির ঘৃতাহুতির মূল্য এতদিন সেই-ই যুগিয়ে এসেছে—আজও—

[পদ্মার প্রবেশ]

পদ্মা—...না, আজ আর নয়।

[সকলেই সচকিত হইয়া উঠিলেন]

সুন্দরক—ছিঃ পদ্মা...

পদ্মা—নির্লজ্জ! লম্পট! লজ্জা করে না—তোমার পিতৃ-পিতামহদের এই পুণ্যপূত দেবায়তনে এক বার-বিলাসিনীকে...

অম্বা—...সুন্দরক—(চোখে আগুন জ্বলিতে লাগিল।)

সুন্দরক—সাবধান পদ্মা...। উনি অতিথি—অতিথির অপমান আমি সইব না। ভাল চাও তো দশ সহস্র স্বর্ণমুদ্রা রেখে চলে যাও—

পদ্মা—আমি এক কপর্দ্দকও দেব না।

সুন্দরক—আবার...

পদ্মা—আবার নয়, সহস্রবার। আমি দেব না—

সুন্দরক—অবশ্য দিতে হবে। কেন তুমি দেবে না?

পদ্মা—তুমি না শুধু আমার বিভব সম্পদ বিবাহ করেছ? স্বীকার করলুম—অধিকার আছে তোমার তার উপর,—যেখান হতে পার তুমি তা গ্রহণ কর। কিন্তু যখন আমার দেহ মনকে বিবাহ কর নি, তখন আমার দেওয়া না দেওয়ার ইচ্ছার উপর তোমার কি হাত আছে?

সুন্দরক—এই কি স্ত্রীর কর্তব্য?

পদ্মা—আর একটা গণিকাকে স্ত্রীর পবিত্র অন্তঃপুরে এনে তার সম্মুখে স্ত্রীকে চোখ রাঙ্গানই কি স্বামীর কর্তব্য?—দূর করে দাও—দূর করে দাও ওকে—

[বাহিরের দরজার প্রতি হস্ত নির্দ্দেশ করিলেন]

অম্বা—(তাহার দুই চোখ হইতে আগুন বাহির হইতেছিল)—সুন্দরক—আমি না তোমার নিমন্ত্রিত অতিথি? তুমি কি আমাকে এই অপমানের জন্যই এখানে অপেক্ষা কর্ত্তে অনুরোধ করেছিলে?—বল—বল—

সুন্দরক—অম্বা! কিছু মনে কোর না। তোমার এ অপমানের প্রায়শ্চিত্ত আমি এখনি কর্ব্ব। আজ আমি আমার এই প্রাসাদ-ভবন ঈশ্বর সাক্ষী করে তোমাকে নিবেদন করছি। আজ হতে আমি এর সমস্ত স্বত্ব ত্যাগ করলুম। তুমি এই মুহূর্ত হতে এ গৃহের অধিশ্বরী—আমায় ক্ষমা কর অম্বা—

অম্বা—(বিজয় দৃপ্তা হইয়া সগৌরবে পদ্মার প্রতি) এখন যদি তোমাকে আমার গৃহ হতে পদাঘাত করে দূর করে দিই?

পদ্মা—(অম্বার প্রতি ক্রুদ্ধ দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া) কি! এতদূর—বেশ! (সুন্দরকের

প্রতি সহজ ভাবে) তুমি আমায় তাড়িয়ে দিচ্ছ?

অম্বা—যাঁর গৃহ—তিনি দিচ্ছেন বটে।

পদ্মা—স্বামী তুমি—, তুমি আমায় এই ঘৃণিত অপমান থেকে রক্ষা করবে না? তোমার নিকট আমার মাথা রাখবার ঠাঁইটুকুও কি মিলবে না?

অম্বা—সে প্রার্থনা যদি এখন কারো কাছে কর্ত্তে হয় তবে ওখানে নয়—এইখানে—আমার কাছে—

পদ্মা—(তাহাতে কর্ণপাত না করিয়া—সুন্দরকের প্রতি) তুমি আমার কথার উত্তর দাও—

সুন্দরক—(নীরব রহিলেন)

অম্বা—উত্তর তুমি পেয়েছ।

পদ্মা—বেশ! তবে.. (আর বাক্য স্ফুরণ হইল না—হঠাৎ ঘুরিয়া দ্বিতলের পথে চলিয়া গেলেন) (সুন্দরক ও অম্বা ক্ষণকাল স্তব্ধ হইয়া রহিলেন—পরে অম্বা সে স্তব্ধতা ভঙ্গ করিয়া কহিলেন)

অম্বা—ঠিক বলেছ সুন্দরক! এ নারী আমারই প্রতিবিম্ব। দেখে আমারই ভুল হয়েছিল... আমার চোখ ঝল্‌সে গিয়েছিল।

সুন্দরক—শুধু চোখে, মুখে, চেহারায় ও তোমার প্রতিবিম্ব নয়—তেজে, অভিমানে—ও তোমারই ছবি।

অম্বা—কিন্তু ওকে যে আমার জড়িয়ে ধর্ত্তে ইচ্ছে হচ্ছে সুন্দরক! কৈ, সুরা কৈ?—সুরা আনো। আজ এ আমার দুঃখের রাত—কি আনন্দের রাত বুঝতে পাচ্ছি না!—আমায় তুমি মাতাল করে রাখ বন্ধু!

সুন্দরক—এস পালঙ্কে এসে বস (তাঁহাকে পালঙ্কে লইয়া বসাইলেন)

অম্বা—উঃ! আমার চোখ ঝল্‌সে গেছে। আমার চোখ ঝল্‌সে গেছে। উঃ কি আলো—! কি দীপ্তি!

সুন্দরক—কোথায় অম্বা?

অম্বা—তার চোখে,—তার মুখে (সহসা প্রকৃতস্থ হইয়া) —না না, এই কক্ষে। উঃ, প্রদীপ নিবিয়ে দাও—নিবিয়ে দাও—

সুন্দরক—দিচ্ছি। (দীপ নির্বাণ। বাতায়ন পথে সমুজ্জ্বল চন্দ্রালোক কক্ষ পরিপ্লাবিত করিল)

অম্বা—কি সুন্দর জ্যোৎস্না! (বাহিরে চাহিয়া) তাই তো! (চন্দ্রের পানে সন্দিগ্ধ দৃষ্টিতে) চাঁদের মুখে কি আজ জয়ের হাসি? (হঠাৎ পালঙ্ক হইতে উঠিয়া দাঁড়াইয়া) সুন্দরক! সুরা আনো, বীণা আনো...ঐ লতা কুঞ্জে চল... (সুন্দরকের হাত ধরিয়া) আর—আর—বিম্বিসারকে একবার খবর দাও। শোন সুন্দরক—আজ রূপে, রসে, গানে, গন্ধে চাঁদের ঐ দীপ্ত গরিমার সঙ্গে প্রতিযোগিতা কর্ব্ব।

[অম্বার গান]

শুধু গাও ঢেলে দাও প্রাণে ভালবাসা।
জাগায়ে তোল প্রাণে আকুল পিয়াসা ॥
যামিনী যে আজ উল্লাসে হাসে—
বিশ্ব বিহ্বল আনন্দে ভাসে—
বহে মন্দ সমীরণ মুগ্ধ ত্রিভুবন
কানন কুসুম গন্ধে!—
আনো সুরা আনো শুধু নাচ গাও,
নিখিল চরাচর লুপ্ত করে দাও,—
জাগাও জীবন ছন্দে;—
ঢেলে দাও যৌবন মিলন দুরাশা ॥

[গাহিতে গাহিতে সুন্দরক সহ প্রস্থান]

[অলিন্দ পথে পদ্মা ও তাঁহার দাসীর প্রবেশ]

পদ্মা—(দাসীর প্রতি) এই মুহূর্তে আমার পিতৃ ভবনে গিয়ে এই পত্রখানি আমার বৃদ্ধা ধাত্রীর হাতে দাও—

[পত্র লইয়া অভিবাদনান্তে দাসীর প্রস্থান]

[অন্য দ্বার পথে নৃপতি বিম্বিসারের প্রবেশ]

বিম্বিসার—অম্বা! তুমি আমাকে নেশায় অজ্ঞান দেখে আমাকে ফেলে রেখে এখানে চলে এসেছ!

পদ্মা—(সবিস্ময়ে) মহারাজ!

বিম্বিসার—(সবিস্ময়ে) এ কি! এ কি অপূর্ব্ব মূর্ত্তি! আজ এই পরিপূর্ণ জ্যোৎস্নায় ঐ আলো-ছায়ার মাঝখানে একি এক অস্পষ্ট রহস্যে আবার তুমি সেই তরুণী মূর্ত্তিতে আমার চোখের সামনে উদয় হয়েছ অম্বা যেমন ঠিক চতুর্দ্দশ বর্ষ পূর্বে—

পদ্মা—এ কি মহারাজ! আপনিও আমার অপমান করছেন? এই বুঝি আপনার মনুষ্যত্ব? এই কি রাজধর্ম?

বিম্বিসার—আজ আবার তোমার একি খেলা প্রেয়সী?

পদ্মা—রাজা—রাজা—আমি পরস্ত্রী—

বিম্বিসার—হাঁ, তা জানি—তুমি আজ সুন্দরক শ্রেষ্ঠীর প্রিয়তমা প্রেয়সী। কিন্তু—

পদ্মা—এ—কথা জেনেও আপনি আমার অপমান করছেন? হা ভগবান—

[বসনাঞ্চলে মুখ ঢাকিলেন]

বিম্বিসার—(সবিস্ময়ে) কাঁদছ! সে কি!—কে তোমার অপমান করেছে?

পদ্মা—(আনত মুখে) কে না করেছে!

বিম্বিসার—তবু শুনি,—কে?

পদ্মা—শুনে আর কি হবে? প্রতিবিধান তার কি আছে? যখন মহারাজ...

বিম্বিসার—হাঁ, আমি রাজা, আমি বিচার কর্ব্ব!

পদ্মা—(নীরব রহিলেন)

বিম্বিসার—বল—আমি বিচার কর্ব্ব...

পদ্মা—করবেন?

বিম্বিসার—শপথ কচ্ছি, কর্ব্ব। বল—কে?

পদ্মা—প্রথম—সুন্দরক।

বিম্বিসার—সাক্ষী?

পদ্মা—ঈশ্বর—

বিম্বিসার—কোথায় সে?

[অম্বা ও সুন্দরকের প্রবেশ, দীপ জ্বলিয়া উঠিল]

পদ্মা—ঐ—

সুন্দরক—কে?

বিম্বিসার—আমি। এ কি! এ আবার কি! তুমি অম্বা—ওর সঙ্গে,— (পদ্মার পানে তাকাইয়া) তবে— তাইতো!—একি?

অম্বা—কে? রাজা?

বিম্বিসার—হাঁ, রাজা। কিন্তু আমি কি স্বপ্ন দেখছিলুম? এ ও কি সম্ভব?

পদ্মা—বিচার যে সম্ভব নয়—রাজার শপথের যে কোনও মূল্য নেই—তা আমি জানতুম রাজা...।

বিম্বিসার—(পদ্মার পানে তাকাইয়া) না, না, আমি বিচার কর্ব্ব—সত্য বিচার কর্ব্ব। তোমার চোখের জল এখনও জ্বল জ্বল করছে...আমি ও জল মুছে দেব।—কেন জানিনে, আমার মনে হচ্ছে যেন তুমি আমার—তুমি আমার—

পদ্মা—(বিম্বিসারের কথা শেষ না হইতেই তাঁহার মুখের কথা কাড়িয়া লইয়া)—প্রজা—নিঃসহায়া, নির্যাতিতা প্রজা।

বিম্বিসার—হাঁ, আমি রাজা...প্রজার পিতৃতুল্য রাজা...আমি বিচার কর্ব্ব।—শোন সুন্দরক—আজ হতে তুমি আমার রাজ্য হতে নির্বাসিত।

অম্বা—(উন্নত গ্রীবায় দৃপ্ত কণ্ঠে) কেন?

বিম্বিসার—বিচার।

অম্বা—(শ্লেষ পূর্ণ স্বরে)—বিচার?

বিম্বিসার—বেশ!—না হয় রাজ-আজ্ঞা।

অম্বা—(চোখ রাঙ্গাইয়া)—রাজা, সাবধান—

বিম্বিসার—কাকে চোখ রাঙাচ্ছ অম্বা?

অম্বা—তোমাকে।

বিম্বিসার—(গম্ভীর স্বরে) কি স্পর্দ্ধায়?

অম্বা—(ধীর স্থির স্পষ্টস্বরে) তোমার উপর আমার অধিকারের স্পর্দ্ধায়—

বিম্বিসার—(উত্তর শুনিয়া প্রথমে স্তম্ভিত হইলেন। পরে ধীর গম্ভীর স্বরে) ঠিক্। তোমার অধিকার আমি অস্বীকার করি না।—কেমন করে কর্ব্ব! আজ পর্যন্ত আমার ক্ষীণ রাজশক্তিকে তুমিই তোমার কৃপাদত্ত অর্থে পুষ্ট ক'রে রেখেছ। তোমার ঘৃণ্য দানের উপরই আমার রাজসিংহাসন প্রতিষ্ঠিত। তুমি তোমার রূপ যৌবন দিয়ে আমার শত্রু মিত্র সবাইকে বশীভূত করে রেখেছ।—কিন্তু আর নয়। পাপ যথেষ্ট হয়েছে। আজ তার প্রায়শ্চিত্ত কর্ব্বার জন্য আহ্বান এসেছে। এখন এই ঘৃণ্য কলুষিত রাজত্ব ত্যাগ করে আমাকে সেই আহ্বান মান্য করতে হবে।

অম্বা—(বিদ্রূপ স্বরে) প্রায়শ্চিত্তের আহ্বান এসেছে?—কোথা থেকে এলো?—কে আনলো?

বিম্বিসার—(হঠাৎ পদ্মার হাত ধরিয়া)—এনেছে এই বালিকা। অম্বা এই নাও তোমার দান—আমার রাজদণ্ড—

সুন্দরক—মহারাজ! এ কি!

পদ্মা—(সুন্দরকের প্রতি) পুরুষ হয়ে তুমি জন্মেছিলে কেন? যদি পুরুষ হয়ে জন্মেছিলে—তবে বিবাহ করে এক স্ত্রীর দায়িত্ব ঘাড়ে নিয়েছিলে কেন—কাপুরুষ?

অম্বা—(বিম্বিসারের প্রতি) বিম্বিসার—তুমি যা বলছ—আমাকে কি তা সত্য বলে বিশ্বাস কর্ত্তে হবে? আমি পরিহাস ভালবাসি না রাজা—

বিম্বিসার—আর রাজা নই—সে স্বপ্ন ভেঙ্গেছে। এই মুহূর্তে আমি রাজদণ্ড ত্যাগ করছি।

অম্বা—তবে কি আমি এই বুঝব যে—এই বালিকার জন্য—আমার এ রাজ্য তুমি ত্যাগ করছ?

বিম্বিসার—(অবিচলিত ভাবে) হাঁ,—কর্চ্ছি।

অম্বা—বুঝে দেখ, জীবনের কতখানি ইতিহাস এর সঙ্গে জড়ানো—কত যুদ্ধ, কত আত্মত্যাগ—

বিম্বিসার—অন্ধনারী—তুমি বুঝে দেখ। আমি ঠিক বুঝেছি—ঠিক ধরেছি।

অম্বা—(অবিচলিত স্বরে, দৃঢ় হৃদয়ে) কাপুরুষ—তবে দাও, রাজদণ্ড আমার হাতে দাও—

বিম্বিসার—নাও (অম্বার হাতে রাজদণ্ড তুলিয়া দিলেন।—পরে পদ্মাকে কহিলেন)—এস লক্ষ্মী—আমার সঙ্গে এস।

অম্বা—সাবধান বিম্বিসার! এখনও সংযত হও। রক্ষী—

[রক্ষীগণের প্রবেশ]

(পদ্মাকে দেখাইয়া) ঐ নারীকে বন্দী কর (রক্ষীগণ ছুটিয়া যাইয়া পদ্মাকে শৃঙ্খলিত

করিল) (বিম্বিসারের প্রতি) রাজা! এইবার পার ত ঐ নারী—যার জন্য রাজত্ব ত্যাগ করলে—তোমার সঙ্গে নাও।—চলে এস—সুন্দরক। (সুন্দরকের হাত ধরিয়া টানিয়া লইয়া অলিন্দ সংলগ্ন দ্বিতলের সোপান শ্রেণীতে পা দিলেন)

বিম্বিসার—জান না—জান না অম্বা তুমি কি কর্চ্ছ! উন্মাদিনী—এখনও নিবৃত্ত হও—নইলে একদিন এর জন্য তোমাকে অনুতাপ কর্ত্তে হবে।

অম্বা—(মুখ ফিরাইয়া, বিম্বিসারের কথা শুনিলেন—শুনিয়াই থমকিয়া দাঁড়াইলেন। বিম্বিসারের দিকে ঘুরিয়া দাঁড়াইয়া বলিলেন)—অনুতাপ! (শ্লেষ হাস্যে) প্রতিদ্বন্দিনীকে বন্দী কর্ব্ব—তার জন্য অনুতাপ!—অনুতাপ কর্ব্বে সে—যে নূতন প্রেমের পূর্ণপাত্র মুখে ধরেও পান কর্ত্তে পারল না! (বলিয়াই পুনরায় সগর্বে উপরে উঠিতে লাগিলেন)

বিম্বিসার—দাঁড়াও প্রগল্‌ভানারী। এখনো বলছি সাবধান।—বরং আমায় বন্দী করে এই বালিকাকে মুক্ত করে দাও—শোন—

অম্বা—(বিম্বিসার কথা বলিতেই তাঁহার দিকে মুখ ফিরাইয়া কান পাতিয়া তাহা শুনিলেন। তাঁহার কথা শেষ হইতেই দুই ধাপ নীচে নামিয়া আসিয়া বলিলেন) বটে! এত প্রেম! এত দরদ! (সহসা সম্রাজ্ঞীর মত আদেশসূচক স্বরে)—সুন্দরক! আমার হাতে এই রাজদণ্ড—এই রাজদণ্ড হাতে নিয়ে মগধের অধিশ্বরী আমি—আমি আদেশ করছি—ঐ কুক্কুরীকে এখনি হত্যা করে আমার নিকট ওর ছিন্নশির নিয়ে এস (আদেশ দিয়াই সদর্পে উপরে উঠিতে লাগিলেন)

সুন্দরক—আমি হত্যা করব?

অম্বা—(ঘুরিয়া) হাঁ, তুমি।—যাও, নিয়ে যাও—ছিন্নশির—ছিন্নশির—আমি ওর ছিন্নশির চাই— [প্রস্থান]

[স্তম্ভিত ভাবে সুন্দরক যথাস্থানে দাঁড়াইয়া রহিলেন; রক্ষীগণ শাণিত ছুরিকা কোষমুক্ত করিল]

বিম্বিসার—(চীৎকার করিয়া) অম্বা—অম্বা!—আদেশ প্রত্যাহার কর! ফের—ফের, দেখে যাও কক্ষগাত্রে কার ঐ চিত্র! তারপর পারত আদেশ কোরো। অম্বা—অম্বা দেওয়ালের এই ছবির দিকে তাকাও দেখ কার ঐ প্রতিমূর্তি...দেখে, তারপর আদেশ কোরো—

পদ্মা—(কক্ষগাত্রে সংলগ্ন প্রতিমূর্তির পানে চাহিয়া) বাবা—বাবা—আজ তোমার কন্যা আর জামাতাকে দেখে তোমার ছবি হেসে উঠেছে—না—চোখের জল ফেলছে? (সহসা সুন্দরকের প্রতি) তুমি কি বল স্বামী?

সুন্দরক—(সুন্দরক এই প্রশ্নে চমকিয়া উঠিয়া বিচলিত হইলেন, রক্ষীগণের প্রতি কহিলেন) ক্ষণেক অপেক্ষা কর (এই বলিয়াই দ্রুত উপরে উঠিতে লাগিলেন—কিন্তু মাত্র দুই ধাপ উঠিয়াই পরে ঘুরিয়া নামিয়া একেবারে পদ্মার সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইলেন) পদ্মা—একটা কথা—শুধু একটা কথা—

পদ্মা—বল—

সুন্দরক—বিবাহ-বাসরে যেরূপ পরিপূর্ণ নির্ভরে আমার নিকট আত্মসমর্পণ করেছিলে, আজো কি তেমনি অকম্পিত অবিচলিত হৃদয়ে আমার নিকট আত্মসমর্পণ কর্ত্তে পার?

পদ্মা—আমার শ্মশানে দাঁড়িয়ে আজ আবার সে কথা কেন?

সুন্দরক—কথা কয়ো না—পার তুমি?

পদ্মা—জীবনে যদি তোমার হাত ধরতে পেরেছিলাম তবে মরণে পারবনা কেন স্বামী—?

সুন্দরক—চুপ্! আর কথাটি কয়ো না—চলে এস—(রক্ষীগণের প্রতি) আমার অনুসরণ কর—

[বিম্বিসার ব্যতীত সকলে বাহিরের দুয়ার দিয়া প্রস্থান করিলেন]

বিম্বিসার—(মুখ নত করিয়া কি ভাবিলেন—পরে ধীরে ধীরে মুখ তুলিয়া প্রতিমূর্ত্তির পানে তাকাইয়া)...হে ক্ষমাশীল মহাপুরুষ—তুমি আমায় ক্ষমা কোর না—তুমি আমায় অভিশাপ দাও।—আমার সকল বীভৎসতা, সকল ব্যভিচার তোমার ঐ প্রতিমূর্ত্তির মধ্য দিয়ে তোমার মর্ম্মস্পর্শ করেছে—তবু তুমি মূক—স্থির—অচঞ্চল—। তোমার এ ক্ষমার দয়া যে আর সইতে পারি না—তুমি আমায় অভিশাপ দাও যে—(সোপানে পদধ্বনি শুনিতে পাইয়া চমকিয়া উঠিয়া)—কে?

[ধীরে ধীরে অম্বা সোপান পথে অবতরণ করিতেছিলেন]

অম্বা—মগধের মহারাণী—। বিম্বিসার—

বিম্বিসার—আদেশ কর—

অম্বা—আদেশ কর! এতদূর!—ভালো, পারবে আদেশ পালন কর্ত্তে?

বিম্বিসার—যে এতদিন আদেশ করে এসেছে সে আদেশ পালন কর্ত্তেও শিখেছে—। কি আদেশ বল—

অম্বা—বেশ, আদেশ কর্ব্ব...কিন্তু এখন নয়,—একটু পরে—আগে তার ছিন্ন শির আসুক—

বিম্বিসার—(নতজানু হইয়া) আমার একটি অনুরোধ রাখ—এখনো তারা বধ্যভূমিতে পৌঁছেনি—সে বালিকা, সম্পূর্ণ নিরপরাধ—আমি সমস্ত তোমাকে খুলে বলব—কিন্তু আগে তার প্রাণভিক্ষা দান কর—তোমার আদেশ প্রত্যাহার কর...আমি মুক্তির বারতা নিয়ে অশ্বারোহণে ছুটে যাই...

অম্বা—অম্বা যা একবার আদেশ করে তা আর প্রত্যাহার করে না। আর, হত্যা এতক্ষণ শেষ!—আমি আমার চক্ষুর সম্মুখে সেই শোণিত উৎস দেখতে পাচ্ছি—কি রক্ত! কি রং! কি লাল!—বিম্বিসার ও তো রক্ত নয়...ও যে আগুন...সরে দাঁড়াও—সরে দাঁড়াও—আগুন আমাদের গ্রাস কর্ত্তে আসছে—

বিম্বিসার—নারী...তোমার এই অবিবেচনার জন্য তোমাকে জীবন ভ'রে অনুশোচনা কর্ত্তে হবে—আর সে অনুশোচনা আরম্ভ হয়েছে—

অম্বা—মিথ্যা কথা—। অনুশোচনা নয়—এ আমার জয়োল্লাস! হাঃ হাঃ হাঃ। অকৃতজ্ঞ রাজা! স্পর্দ্ধা তোমার, আমার সম্মুখে ঐ বালিকাকে...ওঃ মানুষের স্মৃতি কি এতই ক্ষীণ—তার চিত্ত কি এতই দুর্বল?—বিম্বিসার—, আজ একবার—শুধু একবার, মনে কর দেখি তোমার শৈশবের সাথী—সেই সুরূপাকে—মনে পড়ে?

বিম্বিসার—না পড়ার কারণ ত কিছু দেখি না।

অম্বা—তারপর, সুরূপা যখন কিশোরী হ'ল তখন অন্যের সঙ্গে বিবাহ হবে শুনেই সে তোমাকে সঙ্গে নিয়ে দূর বনান্তে পালিয়ে যাবার জন্য নিশীথে এসে তোমার দুয়ারে করাঘাত করেছিল—মনে পড়ে? সে দিনও চাঁদনী রাত ছিল—

বিম্বিসার—মনে পড়ে। আমি দুয়ার খুলতেই তুমি মূর্তিমতী জ্যোৎস্নার মত আমার কক্ষখানি উদ্ভাসিত করে দিলে—

অম্বা—তোমার সিংহাসন লাভের বিষম প্রতিদ্বন্দ্বী,—তোমার বৈমাত্রেয় ভ্রাতার পক্ষীয় সভাসদগণকে উৎকোচ দিয়ে বশীভূত কর্ত্তে যে বিপুল অর্থের প্রয়োজন ছিল—তা তোমার না থাকায় তুমি নিজের অদৃষ্টকে ধিক্কার দিয়ে সেই রাত্রে চোখের জল ফেলেছিলে—মনে আছে?

বিম্বিসার—আছে।

অম্বা—(শ্লেষহাস্যে)—আছে? তারপর বুঝি আর কিছু মনে নাই?

বিম্বিসার—কেন থাকবে না—অম্বা? তুমি আমার চোখের জল সইতে পারতে না—সেদিনও পারনি। তুমি আমার চোখের জল মুছে দিয়ে বলেছিলে অর্থের জন্য আমার কোন ভাবনা নেই।

অম্বা—তুমি তখন অবিশ্বাসের হাসি হেসেছিলে—ভেবেছিলে—এক হৃতসর্বস্ব বণিকের কন্যার মুখে ও-কথা—শুধু একটা মিথ্যা আশ্বাস মাত্র! যাক্—তারপর কি হ'ল?

বিম্বিসার—তারপর—না, সে কথা থাক্।

অম্বা—না-না...থাকবে কেন? আজ নূতন প্রেমের আস্বাদ পেয়ে সে কথা ভুলে গেলে চলবে কেন? তবে আমি বলি—তুমি শোন।—তারপর সেই প্রৌঢ় ধনকুবের সুচিত্র শ্রেষ্ঠীকে হঠাৎ আমি বিবাহ করতে সম্মত হলুম। তখন সকলের চেয়ে বিস্মিত হয়েছিলে তুমি—রাগ করে আমার সঙ্গে বিবাহের পূর্বে আর দেখাই করনি—

বিম্বিসার—কখনই যদি আর না করতুম।

অম্বা—(শ্লেষহাস্যে) কেন? কেন বিম্বিসার?

বিম্বিসার—তবে আজ বিবেকের এই দারুণ কষাঘাত হতে রক্ষা পেতুম।

অম্বা—(শ্লেষপূর্ণ স্বরে) কিন্তু—সিংহাসন—

বিম্বিসার—তুচ্ছ সিংহাসন—যার জন্য—

অম্বা—যার জন্য,—বল—বল—

বিম্বিসার—যার জন্য এক পত্নীকে দিয়ে তার পতির পূর্ণভাণ্ডার শূন্য করতে কোন বাধা দিইনি—বরং আনন্দিত হয়েছি।

অম্বা—বিম্বিসার—

বিম্বিসার—শুধু তাই নয়, যার জন্য সেই পত্নীগত প্রাণ স্বামী—তাঁর সহধর্মিণীর এই নিষ্ঠুর কৃতঘ্নতা দেখে অভিমানে তাঁর সাধের সংসার ত্যাগ করে সন্ন্যাসী হয়েছিল!

অম্বা—বিম্বিসার...

বিম্বিসার—হাঁ, তুমি সেই পাপিষ্ঠা সুরূপা—যে তোমার স্বামীর সেই প্রব্রজ্যা কালে আমার এক জারজ কন্যা গর্ভে ধারণ করেছিলে—তারপর ভগবান বুদ্ধের আদেশে তোমার স্বামী যখন গৃহে প্রত্যাবৃত্ত হলেন—তখন তাঁর ভয়ে সেই কন্যাকে বৃদ্ধা ধাত্রীর ক্রোড়ে ফেলে নির্মমা রাক্ষসীর মত কুলত্যাগ করে পরে—'অম্বা' নামে রূপ যৌবনের পসরা নিয়ে গণিকা বৃত্তি অবলম্বন করেছিলে—

অম্বা—নির্লজ্জ বিম্বিসার! কুণ্ঠা হল না তোমার ও কথা বলতে? (হঠাৎ তাঁহার মুখোমুখী হইয়া) ভালো—কার জন্য আমি আমার দেহ বিক্রয় করেছিলাম?

বিম্বিসার—স্বীকার করি—তুমি নগরের সকল ধনবান শ্রেষ্ঠী—যুবকের রক্ত-শোষণ করে ধনরত্নে আমার দীন ভাণ্ডারই পূর্ণ করে এসেছ—কিন্তু তবু...

অম্বা—(রোষে ও ক্ষোভে) কিন্তু, তবু দুঃখ এই যে তোমার প্রতি আমার আজীবন একনিষ্ঠ প্রেমের প্রতিদানে আজ তুমি আমাকে ঘৃণায় পরিত্যাগ করেছ! বিম্বিসার—বিম্বিসার—আমার আত্মার সেই একনিষ্ঠ সতীত্বের অপমান কর্তে তোমার আজ এতটুকুও দ্বিধা দেখলুম না—কিন্তু বারাঙ্গণা হলেও আমি নারী—আমার সতীত্ব—সে কি এতই তুচ্ছ?

বিম্বিসার—সতীত্ব!—তোমার সতীত্ব!

অম্বা—হাঁ, আমার সতীত্ব...চমকে উঠোনা রাজা। সতীত্ব শুধু দেহের ধর্ম নয়—আত্মার একনিষ্ঠাই তার প্রকৃত প্রাণ। শৈশবে আর সকল খেলার সাথী ছেড়ে যার সঙ্গে খেলা কর্তে ছুটতাম—কৈশোরে আর সকলের প্রণয় উপেক্ষা করে যাকে ভাল বেসেছিলাম—যৌবনে পরস্ত্রী হয়েও যাকে আমার জীবন-মন ইহকাল পরকাল কায়মনোবাক্যে নিবেদন করেছিলাম—আমার সেই একমাত্র আরাধ্য দেবতার মুখে হাসিটি দেখবার জন্য,—আমার সেই হৃদয়েশ্বরকে রাজ্যেশ্বর রূপে অধিষ্ঠিত করবার জন্য—আমি কিনা করেছি! আমি আমার ঘৃণিত এক প্রৌঢ়ের গলে বরমাল্য দান করেছি—সিংহাসন ক্রয় করিবার জন্য সেই স্বামীর ধনাগার লুণ্ঠন করেছি—পরে তাঁকে তাঁর লক্ষ্মীর সংসার হতে বিতাড়িত করেছি—। তারপর—সিংহাসন সুদৃঢ় করবার জন্য অগণিত অর্থের প্রয়োজন দেখে আত্ম-সম্মান, মনুষ্যত্বের মর্য্যাদা সমস্ত বিসর্জ্জন দিয়ে হাস্যমুখে এই দেহ...এই রূপ-যৌবন বিক্রয় করে কত পশুর

রাক্ষসী ক্ষুধা তৃপ্ত করেছি! যখন দুঃখে হাসি পেয়েছে—তখন অভিমানের অশ্রু চোখ হতে জোর করে নিংড়ে বের কর্ত্তে হয়েছে! যখন কষ্টে কান্না পেয়েছে—তখন অট্টহাস্যে তাদের সুখী কর্ত্তে হয়েছে—! এই যে নরকের যন্ত্রণা—কেন? কার জন্য?—কেমন করে এ ব্যথা আমি সয়ে থাকি?—কার হাস্যমুখের দীপ্ত ছবিখানি হৃদয়ের গুপ্ততম কক্ষে এঁকে কষ্টকে কষ্ট মনে করি না—দুঃখকে উপেক্ষা করি? বল—বল বিম্বিসার—কে—সে?

বিম্বিসার—সে কি জীবনের এক মুহুর্তের তরেও ভুলেছি—অম্বা?

অম্বা—(চীৎকার করিয়া) তুমি ভুলেছ—তাই আজ বিস্ময় বিস্ফারিত নেত্রে জিজ্ঞাসা কর্চ্ছ—"তোমার সতীত্ব! সে কি!" তাই আজ আমার ধ্রুবতারার মত একনিষ্ঠ প্রেম নিয়েও আমি অসতী, আর—সুন্দরকের সেই কুলবধূ মনে মনে তোমাকে আত্মসমর্পণ করেও সতীত্বের ডঙ্কা বাজাতে স্বর্গ লাভ কর্ত্তে গেছে—!

বিম্বিসার—সে আমার নিকট আত্মসমর্পণ করেনি—তার পিতার নিকট করেনি—করেছে তার নিষ্ঠুর স্বামীর নিকট। অবলীলাক্রমে সে তার জন্মদাতা পিতাকে ফেলে তার স্বামীর সঙ্গে চলে গেল—তার শাণিত ছুরিকা বুকে পেতে নিতে—

অম্বা—তার পিতা! তার পিতা এসে পড়েছেন?—কোথায় তিনি?

বিম্বিসার—এইখানে—

অম্বা—এইখানে?

বিম্বিসার—এই কক্ষে—

অম্বা—এই কক্ষে?—বিম্বিসার, তুমি কি জ্ঞান হারিয়েছ?

বিম্বিসার—জ্ঞান আমি হারাইনি—হারিয়েছ তুমি।—হারিয়েছে সেই মা—যে তার নিজের গর্ভের সন্তানকেও চিনতে পারে না।

অম্বা—বিম্বিসার—তার অর্থ?

বিম্বিসার—প্রথমে তার পিতাও চিনতে পারেনি। আজ এই কক্ষে জ্যোৎস্নালোকে প্রথমে সে যখন তাকে দেখেছিল তখন তার মনে হয়েছিল—সেই মেয়ের মা-ই বুঝি চতুর্দ্দশ বর্ষের পূর্ব্বকার মূর্তি নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে—আর পিতা তার প্রকৃতিগত কাম-দৃষ্টিতে ভ্রান্ত হয়ে তাকেই আলিঙ্গন কর্ত্তে ছুটে গিয়েছিল—ওঃ তার পর—

অম্বা—সে কি! তার পর?

বিম্বিসার—তার পর, কিছুক্ষণ পরে তার মা এই কক্ষে এলে নির্ব্বাক বিস্ময়ে আমি মুখ ফিরাতেই কক্ষগাত্রে ঐ প্রতিমূর্তি দেখতে পেলুম (প্রতিমূর্তি নির্দ্দেশ করিলেন)

অম্বা—প্রতিমূর্তি!

[প্রতিমূর্তির সম্মুখে আসিয়া]

এ কি! এ যে সুচিত্র!—হাঁ, তাইত ঐতো তাঁর সেই ক্ষমাময়—বৈরাগ্যময় চক্ষু—(চীৎকার করিয়া) বিম্বিসার—বিম্বিসার—পদ্মা তবে আমারই মেয়ে? আমি

তবে নিজের গর্ভের সন্তানকে হত্যা করেছি! তুমি কি করেছ? তুমি কি করলে? এ কথা তুমি পূর্ব্বে আমায় বল্‌লে না কেন?

[মাথায় হাত দিয়া বসিয়া পড়িলেন]

বিম্বিসার—তার মুখের উপর আমি তাকে জারজ বলে পরিচিত কর্ত্তে পারি না অম্বা—!

অম্বা—(হঠাৎ উঠিয়া) ছিন্ন শির! ছিন্ন শির!—কোথায় তার ছিন্ন শির?

বিম্বিসার—তার স্বামী তোমাকে খুসী করবার জন্য নিজ হাতে তা তোমার চরণে ডালি দিতে নিয়ে আস্‌ছে।

অম্বা—পালাই—পালাই—না—কোথায় সুন্দরক...কোথায় সে?

[উদ্ভ্রান্তভাবে প্রস্থানোদ্যম]

[সুচিত্রের প্রবেশ]

[সুচিত্রকে দেখিয়াই অম্বা থমকিয়া দাঁড়াইলেন এবং স্থির দৃষ্টিতে তাঁহার দিকে তাকাইয়া রহিলেন]

সুচিত্র—(অম্বাকে) আপনিই কি আর্য্যা অম্বা?

অম্বা—(প্রশ্ন শুনিয়াই দুই হাতে মুখ ঢাকিলেন)

বিম্বিসার—আপনার অনুমান সত্য!

সুচিত্র—(অম্বার প্রতি) বেণুবনে বসে আমার কন্যার ধাত্রীর হাতে তার লেখা একখানা চিঠি পেয়ে আমি এখানে এসেছি। তাতে সে আমাকে জানিয়েছে যে তার স্বামী আপনাকে গৃহস্বামিনী করে তাকে গৃহনির্ব্বাসিতা করেছে। কোথায় সে? সে যে আমার বড় স্নেহের—বড় কষ্টের ধন। দয়া করে বলুন কোথায় সে—

অম্বা—(দুই হাতে মুখ ঢাকিয়াই) বিম্বিসার—বিম্বিসার—কোথায় সে?

সুচিত্র—(বিম্বিসারের নাম শুনিয়াই চমকিয়া উঠিলেন—পরে রাজাকে চিনিতে পারিয়া) মহারাজ—! আপনি! এখানে!

বিম্বিসার—আর আমি মহারাজ নই।—ভিক্ষু শ্রেষ্ঠ!—আজ রাজ্য নয়—আজ আমি শুধু শান্তি চাই—শান্তি চাই—যে শান্তি আপনার ঐ ক্ষমা-সুন্দর চক্ষে ভাস্‌ছে—ঐ শান্তির এক কণা আমি ভিক্ষা চাই। পাবো? ভিক্ষুবর;—বলুন পাবো?—জ্বলে গেল—জ্বলে গেল দেহ মন জ্বলে গেল—

[রাজপথ দিয়া সশিষ্য বুদ্ধদেব বেণুবনে গমন করিতেছিলেন। শিষ্যগণের জয়ধ্বনি ঠিক এই সময়ে শোনা গেল—। সহস্র কণ্ঠে ধ্বনিত হইল—'বুদ্ধং শরণং গচ্ছামি']

সুচিত্র—(সেই ধ্বনিতে যোগ দিলেন) 'বুদ্ধং শরণং গচ্ছামি'!

বিম্বিসার—(সঙ্গে সঙ্গে বলিয়া উঠিলেন) 'বুদ্ধং শরণং গচ্ছামি।'

সুচিত্র—(রাজাকে জয়ধ্বনিতে যোগদান করিতে দেখিয়া—চমকিত হইয়া তাঁহার পানে তাকাইয়া বাহিরের জয়ধ্বনির সঙ্গে সঙ্গে) 'ধর্ম্মং শরণং গচ্ছামি।'

বিম্বিসার—ধর্ম্মং শরণং গচ্ছামি।

সুচিত্র—সংঘং শরণং গচ্ছামি!

বিম্বিসার—সংঘং শরণং গচ্ছামি।

সুচিত্র—(বিম্বিসারকে) বুঝেছি—তবে আপনারও ডাক এসেছে। তবে চলুন রাজা—ভগবান সশিষ্যে বেণুবনে চলেছেন—সেখানে গিয়ে একসঙ্গে প্রসাদ গ্রহণ করি—!

বিম্বিসার—চলুন—শীঘ্র চলুন—

সুচিত্র—(অম্বার প্রতি) পদ্মা কোথায়—বলুন, শীঘ্র বলুন—আমার যে আর দাঁড়াবার সময় নেই!

অম্বা—(ঊর্দ্ধে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিলেন—তাঁহার দুই চক্ষু হইতে অশ্রু-ধারা বহিতে ছিল)

সুচিত্র—ওকি আর্য্যে?

বিম্বিসার—ভিক্ষুবর সংক্ষেপে শুনে রাখুন—সে স্বর্গে—।

সুচিত্র—(স্তম্ভিত হইয়া পরে প্রশান্ত ভাবে)—যাক্ আজ তবে মুক্তি। প্রথম যখন ভগবানের চরণতলে আশ্রয় নিলুম—কিছুদিন পরে ভগবান বল্লেন—'সংসারে তোমার প্রয়োজন হয়েছে—গৃহে যাও।' দুই বৎসর পরে গৃহে যেয়ে দেখি আমার স্ত্রী একটি কন্যা সন্তান প্রসব করে আমার গৃহ প্রত্যাগমনের অব্যবহিত পূর্ব্বে গৃহত্যাগ করে নিরুদ্দেশ হয়েছেন। সেই মাতৃহারা শিশুকে ভগবানের দান মনে করে, ফেলতে পারলুম না—কি কষ্টেই না তাকে আমার লালন পালন কর্ত্তে হল—তার পর সে বিবাহ যোগ্যা হলে তাকে তারই মনোনীত স্বামীর হাতে সমর্পণ করে প্রব্রজ্যা গ্রহণ করলুম—কিন্তু মায়ামুক্ত হতে পারিনি। আজ আমার জীবনের সেই একমাত্র স্নেহ বন্ধন খসে গেল!...

[সকলেই নিস্তব্ধ রহিলেন—পরে সুচিত্র সেই নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করিয়া কহিলেন]

চলুন মহারাজ—

[ধীর পাদ বিক্ষেপে উভয়ে যাইতেছিলেন এমন সময় পশ্চাৎ হইতে অম্বা বিম্বিসারকে আবেগ পূর্ণ কণ্ঠে ডাকিলেন।]

অম্বা—বিম্বিসার, দাঁড়াও।

[বিম্বিসার এবং সঙ্গে সঙ্গে সুচিত্র ফিরিয়া দাঁড়াইলেন।]

(বিম্বিসারের প্রতি) তুমি আমার আদেশ পালন কর্ব্বে বলেছিলে—সেই আদেশ আমি এখন কর্ব্ব।

বিম্বিসার—এখন! এখন যে তুমি আদেশ কর্ব্বে শুনে ভয়ে আমার সর্ব্বাঙ্গ শিউরে উঠ্ছে অম্বা—

অম্বা—তোমার প্রতিশ্রুতি রক্ষা কর—

বিম্বিসার—হুঁ। বেশ...কি আদেশ?

অম্বা—এই রাজদণ্ড গ্রহণ করে আমায় মুক্তি দাও—

বিম্বিসার—(নতজানু হইয়া) অম্বা—ক্ষমা কর—ক্ষমা কর অম্বা—

অম্বা—(অবিচলিত হৃদয়ে দৃঢ়স্বরে)—নাও, আমার আদেশ, নাও—

বিম্বিসার—(উঠিয়া) কিন্তু—

অম্বা—আর কিন্তু নেই।—নাও—আমার আদেশ পালন কর—

বিম্বিসার—(রাজদণ্ড গ্রহণ করিয়া) তবু—

অম্বা—বৃথা অনুনয়। নৃপতি বিম্বিসার—তুমি তোমার সম্পূর্ণ জ্ঞাতসারে আমাকে দিয়ে আমার কন্যাকে হত্যা করিয়েছ—এ তারি প্রতিশোধে—(পৈশাচিক হাস্য) হাঃ হাঃ হাঃ (পরে হঠাৎ শান্ত হইয়া) চলুন ভিক্ষুবর—

সুচিত্র—কোথায়?

অম্বা—যেখানে আপনি চলেছেন।

সুচিত্র—আমি বেণুবনে যাচ্ছি।

অম্বা—আমি বেণুবনে যাব।

সুচিত্র—বেণুবনে?

অম্বা—হাঁ, বেণুবনে।

সুচিত্র—কেন যাচ্ছেন জিজ্ঞাসা করতে পারি কি?

অম্বা—রাজা বিম্বিসার যাচ্ছিলেন কেন?

সুচিত্র—বোধ হয় তাঁর আহ্বান এসেছিল—

অম্বা—আমারও আহ্বান এসেছে। শুধু একজনের আহ্বান নয়—দুজনের। আমার ভুল ভেঙ্গে দেওয়ার জন্য স্বর্গ হতে ডাকছে পদ্মা—আর স্বর্গ কি নরক জানি না—সেখান হতে মায়াবিনীর স্বরে ডাকছে সুরূপা। কোথায় যাব ঠিক করতেই বেণুবনে চলেছি।

সুচিত্র—একি!—তবে তুমিই সেই...এতক্ষণে বুঝলুম। হুঁ—এমন পরীক্ষায় আর কখনো পড়িনি। (কি ভাবিলেন—পরে অবিচলিত চিত্তে)—বেশ, এসো।

বিম্বিসার—শুনুন ভিক্ষুবর—আজ আমার নবজীবনের সুত্রপাত। তাকে পুণ্য-পূত কর্ত্তে চাই—ভগবান তথাগতের মঙ্গলাশীষে। আমি তাঁকে এখানে নিমন্ত্রণ করছি—

সুচিত্র—বেশ—আমি তাঁর নিকট যেয়ে এ নিমন্ত্রণ জ্ঞাপন কর্ছি—তিনি বোধ হয় সশিষ্যে এই গৃহের সম্মুখেই এসে পড়েছেন। তবে আমি আসি—

অম্বা—(বিম্বিসারের প্রতি) আমিও আসি রাজা।

[উভয়ের প্রস্থান]

[বিম্বিসার তাঁহাদিগের দিকে তাকাইয়া রহিলেন; পরে তাঁহারা দৃষ্টির বহির্ভূত হইলে তাঁহাদিগকে দেখা যায় কি না দেখিবার জন্য বাতায়ন পার্শ্বে আসিয়া দাঁড়াইলেন]

[অলিন্দ সংলগ্ন দ্বার পথে সুন্দরকের প্রবেশ]

সুন্দরক—রাজা—অম্বা কই?

বিম্বিসার—(চমকিয়া উঠিয়া)—কে—সুন্দরক? পদ্মা...(মুখ ঘুরাইয়া) না, যাও, তুমি আমায় মুখ দেখিয়ো না—যাও—দূর হও—

সুন্দরক—(কিংকর্ত্তব্য বিমূঢ় হইয়া) হাঁ, যাব, কিন্তু একটু প্রয়োজন আছে। একবার অম্বার সঙ্গে দেখা করে তবে যাব।

বিম্বিসার—(তাঁহার দিকে কি না তাকাইয়া) আমার সম্মুখে তার ছিন্ন শির বের কোরোনা—সাবধান—যাও সেই রাক্ষসীর চরণে ডালি দিয়ে এস—

সুন্দরক—রাজা—রাজা—আমি সেই রাক্ষসীর চরণে ছিন্ন শির ডালি দেব বলেই এসেছি।—তবে সে ছিন্ন শির পদ্মার নয়—আমার।

বিম্বিসার—সে কি!

সুন্দরক—রাজা—যে প্রাণে তার বুকে ছুরি বসিয়ে দিতুম—সে প্রাণকে সে-ই একদিন মৃত্যুর দুয়ার হতে ফিরিয়ে এনেছিল—তার-ই দেওয়া প্রাণে তাকে আঘাত করবার কতটুকু শক্তি থাকে রাজা? আমি তাকে হত্যা করিনি। রাজ-আজ্ঞা অমান্য করে তাকে আমি মুক্তি দিয়েছি—। মুক্তি দিয়ে ফিরে এসেছি। রাজ-আজ্ঞা অমান্যের জন্য—শাস্তি স্বরূপ এই লম্পট হতভাগ্যের ছিন্নমুণ্ড তাঁর চরণে ডালি দিতে—।

বিম্বিসার—বটে, বটে, সুন্দরক (ছুটিয়া সুন্দরকের হাত ধরিয়া) সে বেঁচে আছে? তবে সে বেঁচে আছে?

সুন্দরক—শুধু বেঁচে নেই—জীবনে রসে ভরপুর হয়ে আছে। ঐ বুদ্ধ দেবের শিষ্য দলের আগে আগে সে তার দিব্য দীপ্তিতে পথ আলোকিত করে চলেছে—

বিম্বিসার—সুন্দরক! আমায় ক্ষমা কর তুমি—তুমি জানো না সে আমার কে?

সুন্দরক—কে?

বিম্বিসার—সে আমার—সে আমার কন্যা!

[বাহিরের দ্বার পথে পদ্মার প্রবেশ]

পদ্মা—(বিম্বিসারের নিকট ছুটিয়া যাইয়া) শুন্‌তে পেলুম এখানে বাবা এসেছিলেন—তিনি কোথায় রাজা?

বিম্বিসার—তিমি এইমাত্র তোমার মাকে সঙ্গে নিয়ে ভগবান বুদ্ধদেবকে এখানে নিমন্ত্রণ করে আনতে গিয়াছেন—

পদ্মা—মা! আমার মা!

বিম্বিসার—হাঁ, তোমার মা—

পদ্মা—যে আমার পিতাকে বঞ্চনা করেছিল—সেই মা?

বিম্বিসার—তবু তোমায় গর্ভে ধরেছিল—পদ্মা!

পদ্মা—কৃতার্থ করেছিল!—

বিম্বিসার—জননী অশ্রদ্ধার পাত্রী নয় মা!

পদ্মা—গর্ভে ধারণ করাতেই নারী সন্তানের পূজ্যা হয় না রাজা! অসহায় সন্তানকে লালন পালন করাতেই মা সন্তানের দেবতা—যে তা না করে—সে মা নয়—রাক্ষসী। কোথায় সে?

[সোল্লাসে অম্বার প্রবেশ]

অম্বা—(ছুটিয়া বিম্বিসারের সম্মুখে যাইয়া) শোন রাজা—ভগবান আমার নিমন্ত্রণ গ্রহণ করেছেন—কি অর্ঘ্য দেব জান?—

সুন্দরক—(পদ্মাকে জনান্তিকে) পদ্ম—পালাও—পালাও।

পদ্মা—কেন পালাব স্বামী?

অম্বা—(ঐ কথা শুনিয়াই চমকিয়া উঠিয়া তাকাইয়া দেখেন—পদ্মা)—পদ্মা—তুই? (ছুটিয়া যাইয়া তাঁহাকে জড়াইয়া ধরিলেন) এ কি স্বপ্ন না সত্য? সুন্দরক! তবে তুমি একে হত্যা করনি?

সুন্দরক—(অন্য দিকে মুখ ফিরাইয়া) না—বিনিময়ে নিজের শির দিতে এসেছি—

অম্বা—আমার কান্না পাচ্ছে—আমার কান্না পাচ্ছে! সুন্দরক—যদি একে হত্যা করতে—তবে তোমাকে কি কর্ত্তুম জান? (উত্তর না পাইয়া কটি হইতে শাণিত ছুরিকা বাহির করিয়া—রোষ কষায়িত নয়নে)—তা হলে তোমায় আমি স্বহস্তে হত্যা কর্ত্তুম। (আবেগে) আনন্দে আমার কান্না পাচ্ছে! আয় মা—আমার বুকে আয়। (এই বলিয়া পদ্মাকে জড়াইয়া ধরিলেন)

পদ্মা—(তাঁহার আলিঙ্গন হইতে মুক্ত হইতে চেষ্টা করিতে করিতে)—ছাড়ো—আমায় ছেড়ে দাও তুমি—

অম্বা—(হঠাৎ তাঁহাকে ছাড়িয়া দিয়া মিনতিপূর্ণ স্বরে) আমায় ক্ষমা কর্ মা—আজ ভাগ্যদোষে আমি অম্বা—কিন্তু (পদ্মার কানে কানে কি কহিলেন)

পদ্মা—বটে! তুমিই সেই রাক্ষসী? স্বীকার না হয় করলাম তুমি আমাকে গর্ভে ধরেছিলে—কিন্তু তোমার লালসার ক্ষুধা পরিতৃপ্ত কর্ত্তে যেয়ে, আমায় গর্ভে ধরেছিলে ব'লেই মায়ের গৌরব লাভ কর্ত্তে তোমার কি অধিকার আছে? মায়ের কাজ তুমি কি করেছ? তুমি আবার মা! (অম্বা এক পাশে যাইয়া মুখ নত করিয়া রহিলেন)

[সুচিত্রের প্রবেশ]

সুচিত্র—(পদ্মার প্রতি) মা—ভগবানের নিকট শুনলুম তুই প্রব্রজ্যা গ্রহণ করতে গিয়েছিলি—আমি জানতাম তুই আমাকে মায়া মুক্ত করে জন্মের মত চলে গেছিস্!

পদ্মা—বাবা—বাবা—(ছুটিয়া তাঁহার বুকে পড়িয়া—অম্বাকে দেখাইয়া) দেখছ? দেখছ? ঐ রাক্ষসীকে দেখছ?—চল এখান থেকে পালাই।

সুচিত্র—রাক্ষসী নয় মা—তোর জননী...স্বর্গাদপি গরিয়সী জননী! পদ্মা, এই তোর মা!

পদ্মা—(সুচিত্রের প্রতি) বাবা—ও মা নয়—ও রাক্ষসী—

সুচিত্র—যখন ওকে আমি ক্ষমা কর্ত্তে পেরেছি, তখন তুই কেন পারবি না মা?—সুরূপা এই নাও...তোমার মেয়ে নাও।

[পদ্মাকে অম্বার হাতে সঁপিয়া দিলেন]

অম্বা—(আনত মুখেই ক্ষণকাল স্তব্ধ থাকিয়া পরে মুখ তুলিয়া) আমায় তুমি স্পর্শ কোরো না—মা!—আমি অন্য জগতের—(মুখ নামাইলেন)

[দ্বারে করাঘাত হইল]

সুচিত্র—(শশব্যস্ত) ভগবান—ভগবান! (বিম্বিসার ত্বরিৎপদে যাইয়া—দ্বারোদ্‌ঘাটন করিলেন। শান্ত—সৌম্য প্রসন্ন-নয়ন পূর্ণ-দর্শন মতিমান বুদ্ধদেব দৃষ্টিগোচর হইলেন। কি এক স্বর্গীয় আভায় কক্ষ দীপ্তোজ্জ্বল হইল।)

[অম্বা ব্যতীত সকলে আবৃত্তি করিলেন]

"বুদ্ধং শরণং গচ্ছামি"
"ধর্ম্মং শরণং গচ্ছামি"
"সংঘং শরণং গচ্ছামি"

[আবৃত্তি অন্তে তাঁহারা প্রণত হইলেন। ভগবান তাঁহার কর-কমল সম্মুখে প্রসারিত করিয়া প্রসন্ন-হাস্যে সকলকে আশীর্ব্বাদ করিলেন।]

[একমাত্র অম্বা বিদ্রোহিনীর মত একধারে উন্নত গ্রীবায় দাঁড়াইয়া রহিলেন]

বিম্বিসার—আজ আমি ধন্য। আজ আমার গৃহ ভগবানের পদরজ স্পর্শে সার্থক হল—

অম্বা—(ধীরে, অথচ সুস্পষ্ট স্বরে—বিম্বিসারের প্রতি বক্রদৃষ্টিতে তাকাইয়া) গৃহ আমার—তোমার নয় রাজা।

বিম্বিসার—(স্তম্ভিত হইয়া, পরে) বেশ!—ভগবান্! আগামী প্রভাতে আমার রাজপ্রাসাদে সশিষ্য আপনার নিমন্ত্রণ...

অম্বা—(প্রশান্ত গম্ভীর স্বরে) ভগবান সপ্তাহকাল এ গৃহে অবস্থান করবেন—আমাকে কথা দিয়েছেন।—

বিম্বিসার—(নিষ্ফল রোষে)—এক পতিতার কুটির—

অম্বা—এ আর পতিতার কুটির নয়—এ এখন পতিত-পাবনের আশ্রম। আমার যথাসর্ব্বস্ব আমি সঙ্ঘে দান করেছি—এ এখন সঙ্ঘের সম্পত্তি—

সুচিত্র—(অম্বাকে) আর তুমি?

অম্বা—আমি—আমি—আমার ধ্রুবতারার পানে চেয়ে থাকব।

বুদ্ধদেব—(দুই হাত তুলিয়া আশীর্ব্বাদ করিলেন) স্বস্তি—স্বস্তি—স্বস্তি—

[সমবেত গীত]

শ্রীঘন মুনীন্দ্র জয় সুগত জয় হে।
প্রচার প্রেম যার কোটী বিশ্বময় হে ॥
বুদ্ধং শরণং গচ্ছামি !
ভিক্ষু জন শ্রমণগণ শরণ পাপহারী।
সংঘ রাজ সিদ্ধবাক্ ধর্ম্ম প্রেমচারী ॥
মোক্ষ বিধায় পূত পাদপদ্মদ্বয় হে।
ধর্ম্মং শরণং গচ্ছামি ॥
উদান গান তৃপ্ত প্রাণ, সত্য ধ্যানধারী।
মহান নির্ব্বাণ দান দুঃখ ত্রাণ কারী ॥
বুদ্ধ অমিতাভ হর ক্রুদ্ধ মার ভয় হে।
সংঘং শরণং গচ্ছামি।

যবনিকা

□

দেবী

তুলসী লাহিড়ী

(১৮৯৭-১৯৫৯)

চরিত্র

নিতাইবাবু
মিঃ ভোস
গোবর্দ্ধন
শুখনি

[স্থান—সোনাবাঁক ডাকবাংলোর বারান্দা। কাল—সন্ধ্যা। ঐ বাংলোতে রাত্রি বাসের জন্য উঠেছেন খুদিয়া কয়লাখাদের ম্যানেজার নিতাই বাবু। বারান্দায় আরাম কেদারায় গা এলিয়ে দিয়ে সিগারেট টানতে টানতে বিশ্রাম করছেন এবং বন্দুকটি নাড়াচাড়া করছেন।]

নিতাই—চৌকীদার!

[নেপথ্য থেকে উত্তর এল 'যাচ্ছি সাহেব']

অন্ধকার হয়ে এল যে। আলো নিয়ে এস।

[এক হাতে লণ্ঠন অপর হাতে একটা টাঙ্গি নিয়ে প্রবেশ করল ডাকবাংলোর চৌকীদার গোবর্ধন। চেহারা শক্ত পোক্ত, রং মিশকালো। লণ্ঠনটি বারান্দায় রেখে ঘরের দিকে এগোতেই নিতাই বাবু বললেন।]

কি হে কোথায় যাচ্ছ?

গোবরা—আঁইগা কামরার বাতিটো জ্বাইলে দিব!

নিতাই—তাও ভাল। টাঙ্গি হাতে করে যে রকম রোয়াব করে চলেছ।

গোবরা—(লজ্জিত ভাবে) আঁইগা! দেবী আইসেছেন—চাইর দিনে তিন জনকে লিয়েছেন। কাইল্ সইন্ধার সময় হাঁই সাঁওতাল ঘরের একটো ছেইলাকে টাইনে লিছিলেন। তা উয়ারা সোর গোল কইরে ভালা টাঙ্গি কাঁড় লিয়ে বিরাইল। যখ্মী ছেইলাটো নিয়ে আজ হাজারীবাগ গেঁইছে উয়ারা।

নিতাই—দেবীটি কে?

গোবরা—বাঘ বটে। বাঘিন্।

নিতাই—ও! তাই দেবী বলছ। তা বাঘিন্ জানলে কি করে?

গোবরা—আঁইগা ডাক শুইনে বুইঝ্তে পারি যে। যে ডাক ডাইক্ছে এখন দ্যাব্তা দু'চাইর দিনে আইস্বেক্।

নিতাই—তা ত হল। এখন আমাদের দেবতাটি যে এসে পৌঁছালেন না, তার কি হবে।

গোবরা—কে দ্যাব্তা বটে?

নিতাই—আরে তোমাদের ছোট পুলিশ সাহেব? সন্ধ্যার আগেই 'পৌঁছে যাবেন কথা ছিল।

গোবরা—কোনও কাজে ফাঁইসেছেন বটে।

নিতাই—তাতো ফাঁইসেছেন—এখন খাওয়া দাওয়ার কি হবে? তিনি খাবার আনবেন কথা ছিল।

গোবরা—হুজুর বইল্লেন খাবেন নাই!

নিতাই—তা ত বলেছিলাম। কিন্তু এখন কিছু খেতে ত হবে? মুরগী টুরগী কিছু যোগাড় কর।

গোবরা—দিনে বইল্লে সব হইত আঁইগা। রাইত্ হয়ে গেল যে!

নিতাই—লণ্ঠনটি নিয়ে টাঙ্গি কাঁধে করে বীর পদভরে চলে যাও।

গোবরা—টিলা হইতে লাইম্‌তে হবেক যে, শাল বনের ভিতর দিয়ে।

নিতাই—এমন ভীমের মত চেহারা আর তুমি এমন ভীতু হে!

গোবরা—জোওয়ান কি হবেক হুজুর। দ্যাব্‌তার সাথে পাইর্‌বার যোটি নাই যে—কুথা হইতে আইসে এক ঝাপটে পাটাশে দিবে।

নিতাই—তা সারা রাত কি না খেয়ে থাকব?

গোবরা—আগে বইল্লেন নাই হুজুর। দেখি ঘরে মুড়ীটুড়ী কিছু যদি থাকে।

নিতাই—মুড়ী! Nonsense। ও সব চলবে না। যাও fowl-curry-র বন্দোবস্ত কর। না কর ত তোমার নামে report করব।

গোবরা—করুন গা কেনে। জান থাইক্‌লে বহুৎ চাকরী পাওয়া যাবেক্।

[নিতাইবাবু রেগে তার দিকে কট্‌মটিয়ে চেয়ে রইলেন। গোবরা সেটা লক্ষ্য করে দেখে বলল]

গোবরা—হুজুর! অনেক কয়টো প্যাট্ চালাইতে হয় যে। আপন জান বাঁইচ্‌লে—

নিতাই—(রাগত ভাবে) যা যাঃ। কৈফিয়ৎ দিতে হবে না!

গোবরা—আঁইগা—ছেইলা পুইলা বহু বিটি লিয়ে এগারটি।

নিতাই—একটাও ত দেখলাম না।

গোবরা—বিটি ছেইলা লিয়ে কি এখানে থাকা যায়। সব ঘরে রঁইয়েছে।

নিতাই—বিটি ছেইলা নিয়ে থাকা যায় না কেন?

গোবরা—কত রকমের সাহেব লোক সব আসা যাওয়া কইচ্ছেন। মদ টদ খাইছেন, কত রকম হুকুম কইচ্ছেন।

নিতাই—যা যাঃ।

গোবরা—মদে বেহুঁস হইয়ে কত কাণ্ড করেন কি বইল্‌ব। ঐ তারা কইচ্ছে—সাহেব আইলেন বুঝি। (দূরে চেয়ে দেখল)

নিতাই—সে গাড়ীতে আসবে।

গোবরা—ঐ ত টর্চ বাতি মাইর্‌ছে। হাঁই দেখেন আঁইগা।

[নিতাই উঠে দাঁড়াল এবং বাহিরের দিকে দেখতে লাগল]

নিতাই—কি কাণ্ড মি: ভোস্! আমি চারটে থেকে wait কচ্ছি।

[খাকী-পরা বন্দুক হাতে মি: ভোস—সঙ্গে শুখনী নামে একটি বাউরী মেয়ে। তার মাথায় হোলড্‌অল, হাতে একটি টিফিন কেরিয়ার।]

ভোস—গাড়ী বিগড়েছে। বহু চেষ্টা করা গেল। শেষ পর্যন্ত driver-কে রেখে চলে

এলাম। যা শুখনী—ওগুলো ঘরে নিয়ে রাখ।

নিতাই—টিফিন কেরিয়ারে—আছে ত কিছু?

ভোস—Snacks আছে কিছু। তুমি খাবারের order দাও নি?

নিতাই—এখানে দেবীর আবির্ভাব হ'য়েছে। তোমার জন্য পথ চেয়ে ছিলুম তাই order দেওয়া হয় নি। এখন নাকি দেবীর দাপটে কিছু করা সম্ভব নয়।

ভোস—ঐ শুখনিও তাই বলছিল। লোক জোটানো গেল না—নইলে গাড়ী এইখানেই ঠেলে আনতাম।

নিতাই—যা আছে খেয়ে ত নিই। পেট না ভরে, তখন চৌকীদার গোবর্ধনের ঘরের মুড়ির stock capture করা যাবে।

ভোস—এই চৌকীদার—টিফিন কেরিয়ার থেকে বের করে সব লাগাও একটা tea-poy-এর উপর। আমি হাত মুখ ধুয়ে নিই। চলো শুখনী—ওটা ঘরে রেখে দাও। আরে আলোই জ্বালেনি যে।

গোবরা—এই দিছি হুজুর।

[বেগে ঘরের ভিতর গেল। মিঃ ভোস ও শুখনি তার পর গেল। ঘরে আলো জ্বলল। শুখনি ফিরে এল, তারপর এল tea-poy-নিয়ে গোবর্ধন]

নিতাই—এই মাঝান—

শুখনি—(বাধা দিয়ে হাসি মুখে বলল) আমি বাউরী বটে। সাঁওতাল নই।

নিতাই—(সুগঠিত তনুশ্রী লক্ষ্য ক'রে) গড়ন পেটন দেখে আমি সাঁওতাল ভেবেছিলাম।

[গোবর্ধন কাজ করতে করতে চোখ বেঁকিয়ে চাইলো। শুখনি নারী-সুলভ সঙ্কোচের সঙ্গে গায়ের কাপড় টেনে হাসি মুখে বলল]

শুখনি—ই বাবা! সাঁওতাল কি এমন বাংলা বইল্‌তে পারে? উয়ারা বইল্‌তে গেলে বইল্‌বে—(সাঁওতাল অনুকরণ করে) মার্‌ তুদের মত আমরা বাংলা বইল্‌তে নারি গো।

[জাত্যাভিমানের সূক্ষ্ম ক্রিয়া কত বিচিত্র ভাবে মানুষের মনের উপর প্রভাব করে তা দেখে নিতাই বাবু হেসে বললেন]

নিতাই—তাতো হ'ল, এঘন ঘরে যাবে কি করে?

শুখনি—কেনে? রাস্তা দিয়ে চইলে যাব। বেশী দূর লয় ত।

নিতাই—দেবী এসেছে যে—ভয় করবে না।

শুখনি—আসুক—ত! অত ড্‌র কইল্লে চলে গরীবের।

নিতাই—শুনছ গোবর্ধন?

গোবরা—আঁইগা।

নিতাই—সন্ধ্যা হতে না হতে তুমি ত টাঙ্গি নিয়ে ঘুরছ। আর এ বলছে অত ড্‌র কইল্লে চলে।

গোবরা—উ বিটি-ছেইলাটো—ডান্ বটে।

শুখনি—(রেগে গিয়ে) হঁ হঁ! রিষের জ্বালায় বইল্ছে সাহেব।

গোবরা—(রুখে দাঁড়াল) তবে বইল্ব সব কথা?

শুখনি—বলগা ত। কত জনে কত বইল্ছে। কথা বইল্তে সবাই পারে—খাইতে দিতে নারে।

গোবরা—কি বইল্ব হুজুর। ই বিটি ছেইলাটোর স্বভাব ভাল লয়।

শুখনি—হঁ রে।

গোবরা—সাঙ্গা বইস্লি না কেনে? মরদ ত মইরেছে দুই বছর।

শুখনি—ছোট ছেইলা দুটো—বুঢ়ীটা কি খাবেক—কে খাওয়াবেক্? সবাই অমনি নিতে খুইজ্ছে। যে দিন হঁইয়েছে, চাইরটা প্যাটের খোরাকী চালাইতে মুরাদ নাই কারও।

গোবরা—(প্রায় পরাস্ত হ'য়ে) তুই ত সব জানিস্।

শুখনি—হঁ রে জানি—সব জানি—বলে

যৌবন বড় দায়
এ চায় ও চায় না পাইলে হায়—
অমনি জ্বইলে যায় ॥

গোবরা—(ধমক দিয়ে) দেখুন হুজর কেমন বেহায়া বটে। খবরদার ডাক-বাংলায় আইলে ভাল হবেক্ নাই বইলে দিচ্ছি!

শুখনি—আমাকে সাহেব ডাইকে আইনেছে তবে আইসেছি—

[মিঃ ভোস ভিতর থেকে এলেন]

ভোস—গরম গরম গলার আওয়াজ পাচ্ছি।

গোবরা ও শুখনি—(একসঙ্গে) দেখুন সাহেব—এই নষ্টা বিটি-ছেইলাটা—আপনি মাল নিয়ে আইসতে বইল্লেন তাথেই আইলাম।

ভোস—আঃ চুপ্।

শুখনি—কি বইল্ছেন বিচার কইরে বইলে দেন।

ভোস—আরে এই সাহেব খাদের ম্যানেজার—ওঁকে বল্।

নিতাই—এই সাহেব পুলিশের কত্তা—ওঁকেই বল্।

শুখনি ও গোবরা—আইজ্ঞা আমাকে বইল্ছে—বেহায়া নষ্ট বিটি-ছেইলা—সাহেবের সামনে আইজ্ঞা—এমন কইচ্ছে।

ভোস—আচ্ছা—এখন থাম, ওসব বিচার পরে করা যাবে। এখন নাও এই টর্চটি নিয়ে ওকে বাড়ী পৌঁছে দিয়ে এস।

গোবরা—আমি পরব নাই হুজুর!

শুখনি—আমি একাই যাব সাহেব। কিছু হইলে আমাকে ঠেইলে দিয়ে উ ত আগে পালাবেক্।

নিতাই—তাইত! আচ্ছা একটু দাঁড়াও। আমরা কিছু খেয়ে নিই। তারপর বন্দুক নিয়ে আমরাই পৌঁছে দেব।

শুখনি—দেব দেবী কেউ আমাকে লিব্বেক নাই হুজুর! আমাকে নিলে চাইর্টা অবল অবলাকে কে খাওয়াবেক্! (বিনীত ভাবে) সায়েব আমাকে কিছু দিবেন আঁইগা।

ভোস—চৌকীদার চার আনা পয়সা দিয়ে দাও ত ওকে!

শুখনি—চার আনা আমি লিব নাই।

ভোস—বটে কত চাই?

শুখনি—দুটো টাকা হইলে হইতো।

নিতাই—দুটাকা!

ভোস—ঐ মোট তার মজুরী দুটাকা!

শুখনি—আমি ত আরও কাজ দিব বইলছি। দুটো টাকা হইলে—

ভোস—যা যা, এখন ভাগ্, খেতে দে আমাদের। অন্য সময় আসিস্।

শুখনি—অন্য সময়?

ভোস—হাঁ হাঁ, অন্য সময়। চৌকীদার টর্চটা জ্বেলে দেখাও, ও যাক্।

শুখনি—অন্য সময় আইসব তো?

গোবরা—দেখুন হুজুর কেমন ট্যাটা বিটি-ছেইলা। (শুখনি হাসিমুখে গোবর্ধনকে মুখ ভেঙ্গিয়ে বলল)

শুখনি—যাছি বেহাই। আবার অন্য সময় আইস্ব। হুকুম দিয়া দিলেন হুজুর আইস্তে—

[হেসে চলে গেল। নেপথ্য থেকে গান শোনা গেল—

'বেহাই আমার কাল কুহুলী
ও বেহাইকে ঘইসে মেইজে কই র্ব গলার মাদুলী
বেহাই আমার কাল কুহুলী।'

গানের স্বর ক্রমে দূরে গেল। সাহেবরা খেতে খেতে হাসিমুখে শুনল!]

নিতাই—মেয়েটার নাম কি চৌকীদার?

গোবরা—শুখনি।

ভোস—সুখ ত ওদের চারদিকে।

গোবরা—আঁইগা সে সুখ লয়। শুকুর বারে হঁইয়েছে তাই শুখনী, মঙ্গলবার হইলে মুংলী, বুধবারে বুধনী এইসব।

নিতাই—কিন্তু কিরকম বেপরওয়া চলে গেল অন্ধকারে শালবনের ভিতর দিয়ে।

গোবরা—আঁইগা। চাঁদ উঠল যে—একটুক্ মুখ আঁধারী রাইত। আর শুখনি বড় কঠিন বিটি-ছেইলা বটে।

ভোস—কঠিন?

গোবরা—হঁ হুজুর কঠিন। উদিন্‌কে কাবলী আগা সাহেবকে তাইড়েছিল।

নিতাই—কাবুলীরা কি ওদেরও ধার দেয়?

গোবরা—না আঁইগা, মাল-কাটা, খাদে-খাটা, ব্যাপারী-হাট-কয়া ইয়াদের দেয়। তবে শুখনি দেইখ্‌তে ভাল, তাথেই দিয়েছিল।

[নিতাই বাবু ও মিঃ ভোস খেতে খেতে দৃষ্টি বিনিময় করলেন।]

তারপর যে তাড়া কইল্ল শুখনি। হঁ কঠিন বিটি-ছেইলা বটে। মুড়ী আইন্‌তে হবেক্ হুজুর?

নিতাই—না। আজ রাতটা এতেই চালিয়ে নেব। কাল তোমার রান্নার কেরামতি দ্যাখা যাবে। কি বল?

ভোস—কাল কি করতে থাকব? সকালে উঠে গাড়ীটায় হাত লাগিয়ে ঠিক করে নেব।

নিতাই—দেবী দেখে যাবে না?

ভোস—দেবী!

নিতাই—যিনি আবির্ভাব হয়ে রোজ একজন করে নিচ্ছেন। আজ রাতে যদি kill হয় তবে কাল একটা chance না নিয়েই যাবে?

ভোস—তুমিও যেমন! এদের কথা বিশ্বাস কর?

গোবরা—আইজ রাইতে—ডাক শুইনে লিবেন হুজুর। রোজদিন আমরা শুনছি। ঐ শুনুন কেনে দূরে ফেউ ডাইক্‌ছে।

[কান পেতে শুনে]

নিতাই—সত্যিই ত?

ভোস—ওসব false ফেউ। বারমাস ওরকম শোনা যায়।

গোবরা—আজ কাকেও লিবেন। কাল সাঁওতালদের ছেইলাটা মুখ হইতে ছুইটে গেল। আজ কি ভোগ না লিবেন?

ভোস—গরু ছাগল মারে নি?

গোবরা—নামা কুলীতে ৫/৬ দিন আগে ধইরে ছিল। সবাই হুঁসিয়ার হইল। দিন থাইক্‌তে সব ঘরে তুইল্‌ছে। খালি মানুষ তিনজন লিয়েছেন। খাইতে পারেন নাই। তাতে পাইছেন আর মাইর্‌ছেন।

নিতাই—খেলেন না কেন?

গোবরা—সোর গোল হইছে—সব মানুষ হাতিয়ার নিয়ে আউগাইছে যে—

ভোস—তবে আজ রাতেও দেখা পাওয়া যেতে পারে।

গোবরা—দেখার কথা বইল্‌তে পাইর্‌ব নাই। তবে ডাক শুইন্‌তে পারেন আঁইগা।

নিতাই—ব্যস আমরা শব্দভেদী বাণ চালিয়ে দেব। নাও এখন এসব তুলে রাখ। কাল খুব সকালে চা চাই।

[গোবরা tea-poy ও খাবার বাসন সরাতে সরাতে]

গোবরা—আমি হুজুর ভোর হইতে চা দিয়ে দিব।

[ঘরের ভিতরে ঐ সব নিয়ে গেল]

নিতাই—দেবীদর্শন হতে পারে, কি বল?

ভোস—বন্দুক দুটো বুলেট পুরে ready করে রাখি।

[উঠে ঘরে গেল। গোবরা বাহিরে এল।]

গোবরা—তা হইলে ছুটির হুকুম দিয়ে দেন হুজুর। আমি গোসল ঘরের খিল দিয়ে দিয়েছি। ঘরে যাঁইয়ে বসেন আঁইগা!

নিতাই—কেন? দেবী এসে টেনে নেবেন?

গোবরা—ঠাট্টা লয় কো। সব পারেন উয়ারা।

[ভোস দুটি বুলেট্ ও বন্দুক নিয়ে বাহিরে এল]

নিতাই—ঐ ত দেবী-পূজার উপচার এসে গেল। তুমি যাও।

ভোস—খাবার জল রাখা আছে ত?

গোবরা—ঠিক আছে হুজুর। রাইতে ঘর হইতে বাইরে বিরাইবেন না। আর বাতিটো জ্বালা রইতে দিবেন? আর ঘরে যাঁইয়ে বইস্‌লে হইত হুজুর।

ভোস—(বন্দুকে গুলি পুরিয়া) তুমি গিয়ে নিশ্চিন্ত হয়ে শুয়ে পড়। আমরা দেবীদর্শনের আশায় রইলাম!

[ভক্তিভরে হাত জোড় করে প্রণাম করে গোবর্ধন চলে গেল।]

নিতাই—অতিভক্তি।

ভোস—ডাকবাংলোর চৌকীদার অনেক রকম যজমান যজায়।

নিতাই—তাই পরিবার নিয়ে থাকে না। তা এমন নির্জন জায়গা চারদিকে—জন্তু-জানোয়ার আর জংলী মানুষ। পরিবেশের প্রভাবে অনেক মানুষের আদিম মনটা জেগে ওঠে।

ভোস—তোমারও জাগছে নাকি?

নিতাই—জেগেছে তোমার। তাই ওই ছুঁড়ীকে জুটিয়ে এনেছ।

ভোস—ওর contour লক্ষ্য করে দেখেছ? ঘষে মেজে সাধনা করে সাজান সহুরে রূপ বড্ড একঘেয়ে হয়েছে—

নিতাই—(বিদ্রূপের ভঙ্গীতে হেসে)

নিত্য পোলাও কোর্মা আহার
বল ভাল লাগে কাহার
প্রত্যহ উর্বশী দেখে
তাতেও মন আর টলে না।

ভোস—(হেসে) যা বলেছ। এখন চল ঘরে গিয়ে শুয়ে পড়া যাক।

নিতাই—চমৎকার জ্যোৎস্না উঠছে। বস না একটু। দেবীদর্শন যদি হয়।

ভোস—পাগল। আজ রাতে যদি কোনও kill হয় তখন কাল চেষ্টা করা যাবে।

নিতাই—ঐ শাল গাছগুলোর তলায় তলায় আলো ছায়ার খেলাটা দেখতে বেশ ভাল লাগছে।

ভোস—তোমার আদিম মন জাগছে নিতাই, লক্ষণ ভাল নয়।

নিতাই—আর একটু বস না।

ভোস—Long journey—car নিয়ে হাঙ্গামা—রাত জাগা আজ সম্ভব নয়। কাল দেখা যাবে চল।

[ওঁরা উঠে ঘরে গিয়ে দরজা বন্ধ করে দিলেন। মাঝে মাঝে দূরে ফেউ ডাকে—কুকুরের কান্না—আর একঘেয়ে ঝিঁঝির ডাক ঐ নির্জন পরিবেশের নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করতে লাগল। একটু পরে শুখনি এসে চৌকীদারের ঘরের দিকে বেশ করে চেয়ে দেখে বারান্দায় উঠল। তারপর পা টিপে টিপে দরজার কাছে গিয়ে খড়খড়ির উপর আঙ্গুল দিয়ে অল্প অল্প শব্দ করতে লাগল। ভিতরে সাড়া পেয়ে সে সরে এসে দেয়াল ঘেঁসে দাঁড়াল। ভিতরে খুট খাট শব্দ ও ফিস ফিস করে কথা শুনে তার মুখ হাসিতে ভরে গেল। পাশের জানালার খড়খড়ি ফাঁক হতেই সেদিকে চেয়ে দেখে হাসিমুখে দেহ থেকে কাপড়ের আঁচল সরিয়ে নিয়ে আঁচলটা জানালার দিকে ছুঁড়ে দিয়েই টেনে নিল। দুম করে বন্দুকের গুলি হল। শুখনি খিলখিল করে হেসে উঠে ঈষৎ উচ্চ কণ্ঠে বলল]

শুখনি—আইস্‌তে বইলে—অখুন গুলী কইচ্ছ সাহেব।

[দরজা খুলে ওঁরা বন্দুক হাতে বেরিয়ে এলেন। শুখনিকে দেখে রাগত ভাবে ভোস বললেন]

ভোস—হারামজাদী! তুই পাগল না খ্যাপা!

শুখনি—(হেসে) ক্ষেপী বটে।

নিতাই—Kick her out. গুলি লাগলে কি কাণ্ড হত বল ত!

ভোস—এত রাতে কি করতে এয়েছিস্‌?

শুখনি—(বিব্রত ভাবে) আইস্‌তে বইল্লেন আপনি।

ভোস—কি! আমি আসতে বলেছি?

শুখনি—বইল্লেন অন্য সময় আসিস্‌।

[গোবর্ধন লণ্ঠন নিয়ে টাঙ্গি হাতে এল]

গোবরা—কি হঁইয়েছে হুজুর। গুলীর আওয়াজ কেনে?

নিতাই—এই rascal মেয়েমানুষটা—এসে বারান্দায় ঘোরাঘুরি করছে। শব্দ পেয়ে—আমরা বাঘ মনে করে—

গোবরা—বড়া নষ্ট বিটি-ছেইলা। গুলী খাইত ত ঠিক হইত।

শুখনি—হঁ রে!

গোবরা—কেনে আইয়েছিস্ তুই?

শুখনি—আইস্‌তে বইলেছে তাথে আইসেছি।

গোবরা—(ভ্যাংচাইয়া) আইস্‌তে বইলেছে!

শুখনি—টাকা দিবে বইলেছে।

গোবরা—টাকা লিতে—বিহানে আইলে কি হইত?

শুখনি—বিহানে আইস্‌তে বলে নাই। অইন্য সময় আইস্‌তে বইলেছে।

নিতাই—কি dangerous মেয়ে দ্যাখ।

ভোস—সত্যি dangerous. তোর ভয় ডর্ কিচ্ছু নেই।

গোবরা—উ রাইত চরা ডাইনী বটে।

ভোস—যাক—ভুল আমার হয়েছে। সকালে টাকা নিতে এলে অমনি মালপত্তর গুলো—ওকে দিয়েই গাড়ীতে নিয়ে যাবো ভেবে—

নিতাই—বিদেয় কর। বিদেয় কর।

[ভোস ঘরের ভিতর গেলেন]

সাধে কি বলে ছোট জাত। লজ্জা-সরম, মান-অপমান কিচ্ছু বোধ নেই।

শুখনি—আমার মত হইতেন ত আপনাদেরও উ সব থাইক্‌ত নাই।

নিতাই—কি!

শুখনি—বাবু। একা বিটি-ছেইলা চাইরটা প্যাট-খোরাকী চালাইতে হয়।

নিতাই—খেটে খেতে পারিস না?

শুখনি—খাদে কামিনের কাজ করি ত।

নিতাই—তবে?

শুখনি—৭৷৷০ টাকা হপ্তা।

নিতাই—সস্তায় চাল ডাল ত পাস্।

শুখনি—খালি চাল ডাল হইলে হবে? আনাজ পাতি নুন তেল কাপড় চোপড়? ছেইলা গুলার পিরান নাই। বুঢ়ী হপ্তায় আট আনার বিড়ি খায়। বাবু রোজ একটা ম্যাচবাতি গেল এক টাকা। ই বার পোষ পরবে একদিন পিঠা দিতে পারি নাই ছেইলাদের। উয়ারা কুথা পাবেক্। মা বটি ত, আমাকেই দিতে হবেক্।

[ভোস এলেন—হাতে মানি ব্যাগ—একটা আধ্‌লী বের করে দিয়ে বললেন]

ভোস—এই নে আট আনা নিয়ে যা।

শুখনি—সাহেব—দুটা টাকা দ্যান।

নিতাই—এদের পেট কেউ ভরাতে পারবে না। একটা মোট এনে দুটাকা—চাইতে লজ্জা করে না তোর?

শুখনি—তাথে ত রাইতে আইলম্।

নিতাই—রাইতে আইলম্! দিওনা আর এক পয়সাও। নিতে হয় নে, না হয় চলে যা।

শুখনি—আমি বুঢ়ীকে বইলে আইসেছি কাল ভাগা কিনব।

ভোস—কি কিনবি?

গোবরা—আঁইগা পাঁঠার ভাগা।

নিতাই—দ্যাখ কি লালচ। এদের সবার ঐ রকম! লোভের শেষ নেই।

শুখনি—বাবু মানাইতে নারি যে। বুঢ়ী বলে আমাকে ভাল মন্দ খাইতে দিতে হবেক্। আমি বলি কুথা পাব মা। উ তখন বলে 'যখন ছুট ছিলি তখন পিঠা দে—গুড় দে—মাছ দে বইলে যে কান্দতিস্ তখন আমি কুথা পাব তা ভাইবেছিস্? এখন তুই কুথা পাবি আমি কেনে ভাইব্ব বল্?' একে বুঢ়ী অবুঝ তার উপর দুইটা অবুঝ ছেইলা। আমি কি কইর্ব।

গোবরা—তা ধার করগা কেনে। ভাল মানুষ পাইয়ে সাহেবের কাছে জুলুম কইরে দুটাকা লিবি?

শুখনি—ধার কইরে ত মইরেছি হুজুর! সুদ দিছি দুই টাকা মাসে।

ভোস—এই নে এক টাকা নিয়ে যা।

শুখনি—হুজুর আপনি কত টাকা কামাইছেন। এক টাকায় কি হবেক্ আপনার! একটা দিন ত ছেইলাগুলাকে খুসী হইয়ে হাইস্তে দেখি। একটা দিন ত বুঢ়ীর গাইল্ শুনা বন্ধ থাকুক্। কি বইল্ব সাহেব! ছেইলাগুলাকে কে বাঁচাবেক্—বুঢ়ীটা জীবন ভর খাইটেছে, আইজ না খাইয়ে মইর্বেক তাথেই। তা না হইলে বিবাগী হইয়ে ঘর ছাইড়ে চইলে যাইতাম।

[গলার স্বর গাঢ় হয়ে এল]

ভোস—আচ্ছা এই নে দুটো টাকা। (টাকা দিলেন) গোবর্ধন চল ত লণ্ঠন নিয়ে—ওকে শালবনটা পার করে দিয়ে আসি।

শুখনি—(হাসি মুখে) লণ্ঠন কি হবে হুজুর! ভগবান চাঁদের আলো দিয়েছেন। সে সকলকে সব সমান দেন—ছুট বড় তার কাছে নাই। যাচ্ছি—আমার হাতে ইটো আছে। (ছুরী দেখিয়ে দিল)

[শুখনি চলে গেল]

ভোস—কি নিতাই। একেবারে গুম হয়ে গেলে যে।

নিতাই—ভোগা দিয়ে দুটাকা নিল তাই দেখলাম। ওরা মিছে কথা বলার ওস্তাদ। কুলীদের কাঁদুনী হরদম শুনছি ত।

গোবরা—তা আমি যাছি হুজুর।

ভোস—আচ্ছা যাও। (গোবর্ধন চলে গেল।) নিতাই, পুলিসের চাকরী এত দিন করে এইটুকু বেশ ভাল করে বুঝেছি, যে সুরুচি-সুনীতি-আদর্শবাদ সব কিছু নির্ভর করে

আর্থিক সচ্ছলতার উপর। Born criminal খুব কম—economic pressure-এ লড়তে লড়তে হয়রান হয়ে শেষে অমানুষ হয়!

[দূরে আর্তনাদ ও গর্জন শুনে ওঁরা চমকে উঠলেন।]

কি হ'ল?

নিতাই—মেয়েটাকে বাঘে ধরল নাকি।

ভোস—চলত—চলত—

[ভোস এগোলেন বন্দুক নিয়ে]

নিতাই—গোবর্ধন—গোবর্ধন আলো নিয়ে এস ত!

[নিতাইবাবুও বন্দুক নিয়ে চলে গেলেন। আলো নিয়ে টাঙ্গি হাতে গোবর্ধন এল। শব্দ সেও শুনেছে। তাই বুঝতে পেরেছে যে শুখনি দেবীর হাতে পড়েছে। উত্তেজনার মাথায় বারান্দা থেকে নেমে তারপর সে আবার পিছিয়ে এল ও আলোটি রেখে টাঙ্গিটা বাগিয়ে ধরে উবু হয়ে বারান্দায় বসে অপেক্ষা করতে লাগল। দূরে দুম্ দুম্ করে দুবার বন্দুকের শব্দ হল। গোবর্ধন তড়াক্ করে উঠে খানিকটা এগিয়ে গিয়ে ফিরে এল। ওঁরা উচ্চৈস্বরে ডাকতে লাগলেন'চৌকীদার—চৌকীদার'। অগত্যা টাঙ্গি বাগিয়ে ধরে বাঁহাতে লণ্ঠনটি নিয়ে গোবর্ধন এগিয়ে গেল। নিতাইবাবু ও ভোস ধরাধরি ক'রে রক্তাক্ত শুখনিকে নিয়ে এলেন। ওকে মাটিতে শুইয়ে দেওয়া হল।]

ভোস—ঘরে নিয়ে গেলেই হত।

নিতাই—Senseless হয়ে গেছে। Open air-ই ভাল।

ভোস—এইখানেই first aid যে টুকু সম্ভব দেওয়া যাক্।

নিতাই—কি করা যাবে। গাড়ী ত অচল!

ভোস—আছে কিছু সঙ্গে?

নিতাই—Iodine থাকতে পারে। দেখি—এঃ জামা কাপড় সব গেছে রক্তে নষ্ট হয়ে—

[নিতাইবাবু ভিতরে গেলেন]

ভোস—(অস্থির হয়ে দুবার ঘুরে একটু এগিয়ে গিয়ে ডাকলেন) গোবর্ধন। গোবর্ধন!

[নেপথ্য থেকে 'আইলম হুজুর' বলে সে ছুটতে ছুটতে এল।]

ভোস—কি কচ্ছিলে ওখানে?

গোবরা—আঁইগা—বাঘটো মইরেছে তাই তার কটা মোছ লিয়ে আইলাম। বড় ওষুধ হয়।

ভোস—এই তোমার মোছ নেবার সময় হল! মেয়েটা মরে—

গোবরা—অনেক লোক আইসে গেল। উয়ারা সব মোছ ছিঁড়ে লিবে?

ভোস—ধেৎ তেরি মোছের কিছু বলেছি! ডাক্তার আছে কাছাকাছি?

গোবরা—উ সেই গোবিন্দপুর।

ভোস—যাও ডেকে নিয়ে এস গিয়ে।

গোবরা—এত রাইতে আইসবেন্ কেনে?

ভোস—আরে দেবী ত তোমাদের মরেছে—এখন আর ভয় কি?

গোবরা—আরও ত থাইক্‌তে পারে।

ভোস—যা যাঃ! তা বলে মেয়েটা বিনা চিকিৎসায় মরবে?

গোবরা—মইর্‌বেক নাই আঁইগা। উয়াকে ঝাপট্ মারার আগে উ দেবীকে মাইরে দিয়েছে। সহজ বিটি-ছেইলা লয় উ।

[নিতাইবাবু শিশি ও কাপড় হাতে বাইরে এলেন]

ভোস—আমরা মরার উপর গুলী করেছি। শুখনির ছুরীর ঘায়েই শেষ হয়েছে, নইলে অমন করে পড়ে থাকে!

নিতাই—তা হবে। কিন্তু টিংচার আয়োডিন অতি সামান্য আছে যে।

ভোস—তুমি থাক। আমি চৌকীদারকে নিয়ে গিয়ে ডাক্তার আনি। চল চৌকীদার।

[নিতাই শুখনির কাছে গেলেন]

নিতাই—বোধ হয় জল খেতে চাইছে। একটু খাবার জল নিয়ে এস ত চৌকীদার।

[গোবর্ধন ঘরে গেল। নিতাইবাবু উঠে এসে ভোসকে বললে]

নিতাই—ডাক্তার আসুক বোস, গরম জল নেই—তার উপর এই সব ন্যাকড়া। হিতে বিপরীত হতে পারে।

ভোস—কতটা যখম?

নিতাই—সর্ব অঙ্গ ক্ষতবিক্ষত। কোনটা কতখানি সে ত wash না করে বলা মুস্কিল।

[গোবর্ধন জল নিয়ে শুখনিকে খাওয়াতে গেল]

গোবরা—কি বইল্‌ছে হুজুর।

[ওঁরা এগিয়ে গেলেন। অস্ফুট স্বরে শুখনি কি বল্ল। তার বাঁহাত থেকে টাকা দুটো মাটিতে পড়ল। গোবরা মুখের কাছে কান নিয়ে শুনে বলল]

হুজুর—বইল্‌ছে ভাগা কিনার কথা। (আবার শুনে বলল) ছেইলাগুলাক্ ডাইক্‌ছে। বুঢ়ীকে ডাইক্‌ছে।

[হঠাৎ দেহ মুচড়ে উঠে শুখনি নিশ্চল হয়ে গেল।]

গোবরা—(সচকিত ভাবে) হুজুর। (উঠে দাঁড়াল)

[ভোস নিচু হয়ে নাকের কাছে হাত ধরে বুকে হাত দিয়ে গম্ভীর মুখে উঠে দাঁড়ালেন। নিতাই বাবু জিজ্ঞাসা করলেন—'কি ব্যাপার?']

ভোস—শুখনির ছুটি হল। Life's fitful fevers—finished.

[নিতাইবাবু shocked হয়ে—ইস্! বলে বসে পড়লেন]

ভোস—দেবীদর্শন হতে পারে বলছিলে না। নিতাই দেবীদর্শন হল। অতীতের ঋণের বোঝা মেনে নিয়ে ভবিষ্যতের মানুষকে বাঁচানর দায়িত্ব নিয়ে—to the last struggle করে—glorious exit.

[চৌকীদারের লণ্ঠনটা তুলে নিয়ে একবার শুখনির মুখ ভাল করে দেখতে এগিয়ে গিয়ে ভোস হাত থেকে খসে পড়া টাকা দুটো দেখতে পেয়ে চেঁচিয়ে উঠলেন।]

নিতাই—নিতাই—দ্যাখ দ্যাখ রক্তমাখা টাকা দুটো ওই পড়ে আছে। নিতাই মার যাত্রার কৌটায় ঐ রকম সিঁদুরমাখা টাকা দেখেছি ভাই। মা কত শ্রদ্ধা ভক্তি নিয়ে নিজের মাথায় ঠেকাতেন, আমাদের মাথায় ঠেকাতেন, আমাদের মাথায় ছোঁয়াতেন। এস আমরা ঐ টাকা দুটো মাথায় ছোঁয়াই।

[ভোস টাকা তুলে নিয়ে মাথায় ছোঁয়ালেন। নিতাই এগিয়ে আসতে তাঁর মাথায় ছোঁয়ালেন]

নিতাই—(গাঢ়স্বরে বলে উঠলেন) সত্যই দেবীদর্শন হল আমাদের—দেবীদর্শন হল।

□

বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়

(১৮৯৮-১৯৭১)

চরিত্র

ব্রাহ্মণ
গোবিন্দ
হরি
ভামিনী

[অজয়ের তীরে একখানি গ্রামে একটি আখড়া। আম-জাম-কাঁঠালের গাছ। গাছগুলির বয়স দশ-বারো বৎসরের বেশি নয়। গুটি-চারেক নারকেল গাছ। তাল নারকেল গরুতে মুখ না দিলে, পরিচর্যা ভালো হ'লে বারো বছরেই ফল দেয়! গাছে নারকেল এখনও ফলে নি। তবে ফলবে শীঘ্র তাতে ভুল নেই। গাছগুলি সতেজ পুষ্টিতে বেড়ে উঠেছে।

আখড়াটির বয়সও বারো বছর। ঘর-দোরগুলি বারো বছরে খুব পুরানো নয়। তার উপর বারান্দায় কিছুদিন আগে টিন পড়েছে। বাঁধানো হয়েছে। তাতে নতুন বলে মনে হয়। অঙ্গনটি ঝকঝক তকতক করছে। তাতে পরিচ্ছন্ন নিকানো। ছোট একটি ধানের মরাই। ওদিকে একটি গোশালা সামনে একটি ছোট পরিপাটি ঘর। ঘরখানি পূজা-মন্দির।

আখড়ার মালিক কুৎসিতদর্শন গোবিন্দ দাসের বয়স পঞ্চাশ। সবল স্বাস্থ্যবান মানুষ, রূঢ় গঠন। আধপাকা লম্বা চুল, কপালে তিলক, নাকে রসকলি, মাথার লম্বা চুলগুলি রাখালচূড়া ক'রে ব্রহ্মতালুতে ঝুঁটি ক'রে বাঁধা, গোবিন্দ দাস দুপুরবেলা দাওয়ায় বসে শনের দড়ি পাকাচ্ছিল আর আপন মনেই গুনগুনিয়ে গান করছিল]

মধুর মধুর বংশী বাজে কদমতলে কোথায় ললিতে—
কোন মহাজনে পারে বলিতে?
(আমি) পথের মাঝে পথ হারালাম ব্রজে চলিতে,
কোন মহাজনে পারে বলিতে!
ও পোড়া মন, হায় পোড়া মন!
ভুল করিনি চোখ তুলিনি পথের ধুলা থেকে;
রাই যে আমার রাঙা পায়ে ছাপ গিয়েছে এঁকে—
মনের ভুলে গলিপথে ঢুকলি রে তুই বেঁকে!
পোড়া মন পথ হারালি পা বাড়ালি (চন্দ্রাবলীর) কুঞ্জ গলিতে।

[প্রবেশ করলে একজন ব্রাহ্মণ]

ব্রাহ্মণ—কি গো বাবাজী, আজ ঘরে ব'সে?

গোবিন্দ—(হেসে বললে) ঘর কৈনু বাহির—বাহির কৈনু ঘর, বাদ আজ থেকে বাবা।

ব্রাহ্মণ—কি রকম! হঠাৎ—এমন মতি ফিরল?

গোবিন্দ—নাঃ, আর ভিক্ষেয় বেরুব না। এইবার ঠিক করেছি, ঘরেই সাধনভজন করব। মন্দিরে মহাপ্রভু নিত্যানন্দ প্রতিষ্ঠা করব, ওই নিয়েই থাকব।

ব্রাহ্মণ—বটে বটে! আজ শুনলাম, কৃষ্ণদাস বাবাজীর আখড়ার দখল নিচ্ছে। আদালতের লোক এসেছে। তোমার তরফে কে গিয়েছে?

গোবিন্দ—আমার তরফে গিয়েছেন হরি ঘোষ।

ব্রাহ্মণ—হরি ঘোষ! হাঁ, সে জাঁদরেল লোক বটে, তা—। তা আখড়া সম্পত্তি-বিগ্রহ সব নিলেম হয়ে গিয়েছে?

গোবিন্দ—হাঁ। সব। কৃষ্ণদাসের বাপ আখড়া করে বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করেছিল। দেবোত্তর কিছু করেনি। কৃষ্ণদাস পাঁচ শো টাকা ধার নিয়েছিল, সব বন্ধক দিয়ে। মহাজন গাঙ্গুলী ভেবেছিলেন, বিগ্রহ বন্ধক রাখলে টাকাটা যে ক'রে হোক পাবেন। তা কৃষ্ণদাস বাবুগিরি ক'রেই গেল। বৈষ্ণবের আচারও মানে না, বাপ বিগ্রহ ক'রে গিয়েছে। আছে ওই পর্যন্ত। সম্পত্তি মাত্র পাঁচ বিঘে ডাঙা জমি। তাতে কুলোবে কেন? গোকুলে গোবিন্দের মত সুদে আসলে হাজার টাকা হ'ল যখন, তখন নালিশ করতে হ'ল; করলে। কিস্তিবন্দি হ'ল। সে কিস্তি খেলাপ যখন হ'ল, তখন আমি খবর পেয়ে গিয়ে পুরো টাকা দিয়ে ডিগ্রি কিনে জারি করলাম। এইবার দখল।

[ব্রাহ্মণ কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেললে]

গোবিন্দ—দুঃখ হ'ল নাকি ঠাকুরের?

ব্রাহ্মণ—দুঃখ? না। দুঃখ কিসের বল?

গোবিন্দ—সে তুমিই বলতে পার। আমি কি ক'রে বলব, বল?

ব্রাহ্মণ—তোমার আখড়াটি বেশ, অজয়ের একেবারে ওপরে। লোকে বলে, অজয়ের জলের ছলছলানির মধ্যে জয়দেব প্রভুর পদ শোনা যায়।

গোবিন্দ—ও মহতের কথা মহতে বোঝে। মেঘের কথা ময়ূরে বোঝে, কদমতলায় বাজে বাঁশী—সবার মাঝে রাই উদাসী। বলে লোকে শুনি! যার কান আছে সে শুনতে পায়।

ব্রাহ্মণ—তুমি! তুমি নিশ্চয় শুনতে পাও।

গোবিন্দ—হরিবোল, হরিবোল; ঠাকুর, কালাতে বাদ্যি শুনতে পায় একমাত্র ঢাকের, কানাতে ফুল দেখে সর্ষের, খোঁড়াতে নাচ দেখে ঢেঁকির। আমি বাবা কানা খোঁড়া কালার দলে। অজয়ের জলে আমি গ্রীষ্মকালে শুনি—কুল কুল, কুল কুল। আর বর্ষায় শুনি, কুল ভাঙ্, কুল ভাঙ্! জোড় হাত ক'রে অজয়কে বলি—আমার ঘর বাদে বাবা, আমার ঘর বাদে। (একটু হেসে) আমাকে তোষামদ ক'রে ফল হবে না ঠাকুর। আমি জানি তুমি কৃষ্ণদাস বাবাজীর চর। তুমি ওর সঙ্গে গাঁজা খেতে, এক সঙ্গে যাত্রার দলে অ্যাকটো ক'রে বেড়াতে। আমি জানি।

ব্রাহ্মণ—কঞ্জুষ বোরেগী কোথাকার, আমি রে?

গোবিন্দ—কঞ্জুষ বললে রাগ করব না। বোরেগী? হ্যাঁ, তাও আমি বটেই, কিন্তু তুমি বামুন—কেষ্ট বোষ্টমের চর। ওর মাথা তুমিই খেয়েছ।

ব্রাহ্মণ—খবরদার বলছি, মুখ সামলে কথা বলবে। তোমার দফা আমি নিকেশ ক'রে দোব।

গোবিন্দ—তা দেবে। তবে আমি তার আগে হিসেব না ক'রে ছাড়ব না। শোন ঠাকুর, (খপ করে হাত চেপে ধরল) এই নদীর ধারে আখড়াতে আমি বারো বছর কাটিয়ে আসছি। বোষ্টম হ'লেও গান গেয়ে ভিক্ষের সময় ছাড়া হরিনামের সময় হয় না আমার, একা কোদাল চালিয়ে জমি করেছি, এই ঘর করেছি। আমার চালের বাতায় ওই দেখ হেঁসো আছে। বল তো ঠাকুর, তোমাকে কে পাঠিয়েছে? কোনকালে হাঁটো না, তুমি যাত্রার দলের রাণীমা সেজে বেড়াও, হঠাৎ আজ সংক্রান্তি পুরুষের মত এখানে কেন বল। নইলে হাতখানি ছাড়ব না।

ব্রাহ্মণ—ছেড়ে দাও। ছেড়ে দাও বলছি।

গোবিন্দ—না। বল আগে।

ব্রাহ্মণ—এইবার আমি চেঁচাব।

গোবিন্দ—তবু ছাড়ব না। শোন ঠাকুর, মাথার আমার গোলমাল আছে। আমি পাগল হয়েছিলাম এক সময়। আমার ঘর ছিল, ঘর আলো করা স্ত্রী ছিল ভগবানে মতি ছিল। হঠাৎ পাগল হয়ে গেলাম। কাঁদতাম। শুধু কাঁদতাম। চার বছর কেঁদে বেড়িয়েছি পথে পথে। তার পরে ভাল হলাম। এখানে এসে আখড়া বাঁধলাম। শোন, আমার সেই মাথার গোলমাল এখনও মধ্যে মধ্যে ওঠে, এখানকার লোক জানে, আমি রাত্রে পাগলের মত ঘুরি উঠোনে, তুমিও জান। আমার সেই রোগ তুমি উঠিয়ো না। ঠাকু-র!

[ব্রাহ্মণ ভয় পেলে এবার। গোবিন্দের চোখ দুটো লাল হয়ে উঠেছে। তার দেহ যেন ফুলছে। শরীর তার সত্যই যেন পাথরের]

ব্রাহ্মণ—আমি বলছি। আমি বলছি।

গোবিন্দ—বল।

ব্রাহ্মণ—পাঠিয়েছে আমাকে কৃষ্ণদাসের স্ত্রী।

গোবিন্দ—কৃষ্ণদাসের স্ত্রী? কৃষ্ণদাস জানে না?

ব্রাহ্মণ—তার জানা আর না-জানা? জান তো, সে এখন একটা ছোট জাতের মেয়ে নিয়েই উন্মত্ত। আহ্লাদী তার নাম।

গোবিন্দ—জানি। আহ্লাদীকে জানি না? রাত্রির অন্ধকারে সে সর্বনাশী মোহিনী? তাকে জানি না? কৃষ্ণদাসের সঙ্গে তার প্রেমও জানি।

ব্রাহ্মণ—সেই। তার বাড়িতেই এক রকম থাকে সে, খায় শোয়-সব সেইখানে। আজকাল আবার গুলি খেতে শিখেছে!

গোবিন্দ—বলহরি, বলহরি! তারপর? কি বলেছে কৃষ্ণদাসের বোষ্টুমী? কৃষ্ণদাসের বোষ্টুমীর তো এককালে রূপসী বলে খ্যাতি ছিল গো! এখনও তো তার রূপ আছে, বয়সও তো বেশি নয়। তিরিশ। আমি একদিন গান গাইতে গিয়েছিলাম ও-আখড়ায়, বেশ রূপসী, তাতেও কেষ্টদাসের এই মতি?

ব্রাহ্মণ—তবু তার এই মতি। কি বলব বল বাবাজী! আমিও পাপের ভাগী। এককালে তখন আমাদের প্রথম যৌবন। কেষ্টদাসের বাপের কিছু পয়সা ছিল, কেষ্ট সেই পয়সায় নতুন ফুর্তি করতে লেগেছে। যাত্রার দলে ঢুকেছিল। জয়দেবের মেলায় গেলাম; সেখানে দেখা এক বামুনের মেয়ের সঙ্গে। নতুন বউ। রূপ যেন ফেটে পড়ছে। গোবিন্দ মন্দির থেকে বেরিয়ে এল, মনে হ'ল সাক্ষাৎ রাধা। কেষ্টদাসেরও তখন নতুন বয়স, তারও রূপ তখন লোকে দাঁড়িয়ে দেখে, যাত্রার দলে সে সাজত অভিমন্যু। অভিমন্যু বধ হ'ত, লোকে ঝরঝর করে কাঁদত তার ওই রূপের জন্যে!

গোবিন্দ—তারপর?

ব্রাহ্মণ—পরের দিন অজয়ের ঘাটে দেখা। মেয়েটি অবাক হ'য়ে চেয়ে রইল কেষ্টদাসের দিকে।

ব্রাহ্মণ—তারপর আর কি? মেয়েটি গিয়েছিল বাপের বাড়ির মেয়েদের সঙ্গে। স্বামী সঙ্গে ছিল না। পর পর তিন দিন কেষ্টর সঙ্গে দেখা হ'ল মেলায়। তিন দিনের দিন কাউকে কোনও কথা না ব'লে কেষ্ট হ'ল উধাও। মেয়েটিকেও আর দেখলাম না। দলে গণ্ডগোল শুনলাম। কেউ বললে কিছু। কেউ বললে না কিছু আমি সব বুঝলাম। বাড়ি ফিরলাম, দেখলাম, কেষ্ট তাকে বউ সাজিয়ে বাড়ি এনে তুলেছে।

গোবিন্দ—তারপর?

ব্রাহ্মণ—তারপর আর কি বল?

গোবিন্দ—কি বলেছে কেষ্টদাসের বউ, তাই বল?

ব্রাহ্মণ—বলেছে, জোড়হাত করে বলেছে, জমি নাও, থালা-বাসন আর নাই কিছু, তবে যা আছে তাই নাও, শুধু ঘরটুকু আর ওই বিগ্রহ ঠাকুর, এই দুটি ছেড়ে দাও।

গোবিন্দ—বটে!

ব্রাহ্মণ—বলেছে—বামুন ঠাকুরপো, তুমি ব'লো, ঘর নিলে আমি দাঁড়াব কোথায়? আর ঠাকুর নিলে আমি কি নিয়ে থাকব।

গোবিন্দ—হুঁ। মেয়েটি রসিকা বটে! বামুনের ঘরে জন্ম, বৈষ্ণবের প্রেমে দীক্ষা, রসিকা হওয়ারই তো কথা। কিন্তু কি জান ঠাকুর, টাকার কারবারে রস নেই, ও হ'ল শুকনো কারবার। আমি গাঙ্গুলী মহাজনকে খরচা সমেত বারো শো টাকা গুনে দিয়েছি। আর এই টাকা বারো বছর ভিক্ষে ক'রে একটি একটি পয়সা ক'রে জমিয়েছি।

ব্রাহ্মণ—সে তা বলেছে।

গোবিন্দ—বলেছে! কৃষ্ণদাসের বোষ্টুমী তো শুধু রসিকাই নয়, সন্ধানীও বটে। অনেক সন্ধানী। কি বলেছে শুনি?

ব্রাহ্মণ—বলেছে, সবই জানে সে। জেনে শুনেই বলেছে, ভিক্ষে চাইছে। দিলে

তোমার ধর্ম হবে। প্রভুর রাজ্যে এখানে দয়া করলে সেখানে পায়, এখানে যা পেলে না সেখানে তা পাবে।

গোবিন্দ—ভাল, আমার উত্তর শোন। আমি বোষ্টম হলেও সুদী কারবারী। ভক্তিপথের মহাজনি আমার নয়, দেনা-পাওনার মহাজনি আমার; আমার হ'ল ডান হাতে নাও, বাঁ হাতে দাও। ফেল কড়ি মাখ তেল; বুঝেছ ঠাকুর! আমি যে দিন এখানে সেই দিন থেকে ওই ঠাকুর আখড়া আর সম্পত্তির উপর লোভ। ঠাকুর আমাকে স্বপ্নে বলেছিলেন, আমার বড় কষ্ট; এদের হাতে সেবায় আমার কষ্ট হয়, তুই আমাকে নিয়ে যা। পরদিন এইখানে বাঁধলাম আখড়া। তারপর রোদ বৃষ্টি শীত গ্রীষ্ম বর্ষা মানি নি, প্রতিদিন গান গেয়ে ভিক্ষে ক'রে টাকা জমিয়েছি। চাল বেচে পয়সা, পয়সা গেঁথে রেজকি, রেজকি গেঁথে টাকা। লোককে সুদে টাকা ধার দিয়েছি; একটা পয়সা কাউকে ছাড়ি নি। সে কেবল ওই জন্যে। জমি কিনেছি, বৈষ্ণব হয়ে ধনে পুতেছি, চাষ খেটেছি। আমি ছাড়তে পারব না।

ব্রাহ্মণ—আচ্ছা তাই বলব আমি। (চলে যেতে যেতে ফিরল) ভামিনীকে আমি বলেছিলাম—ভাজবউ, আমাকে পাঠিয়ো না, আমাকে পাঠিয়ো না, সে চণ্ডাল, পিশাচ।

গোবিন্দ—হাঁ তা বলতে পার। মনের রাগ ব'লে ক'য়ে ঝেড়ে ফেললেই ভাল। বল, আরও দশটা কথা তুমি বল। চণ্ডাল-পিশাচ-দানব, চশমখোর, আর কি বলবে? দেখ, যাত্রার দলে রাণী সাজতে, অনেক কথা তুমি জান। বর্বর-টর্বর যা মুখে আসে বল।

[ঠিক এই সময়েই হরি ঘোষ এবং আরও জনকয়েক লোক এসে উপস্থিত হল]

গোবিন্দ—এই যে ঘোষ মশায়! আসুন কাজ সুশেষ হয়েছে?

হরি—হ্যাঁ, তা হয়েছে। তবে—

গোবিন্দ—'তবে' ব'লে হ্যা'ক রাখছেন যে গো!

হরি—অন্য কিছু নয়, মেয়েটিকে—মানে, কৃষ্ণদাসের পরিবারকে বার ক'রে দিলাম এই অপরাহ্ন বেলায়। একটু কেমন লাগল দাসজী, ঘরে কুলুপ দিয়ে লাঠিয়াল জিম্বা ক'রে রেখে এসেছি। ব'লে এসেছি, যদি দাসের মত হয় তবে রাত্রিটার মত একখানা ঘর খুলে দিবি।

গোবিন্দ—আজ্ঞে না। দখলে খুত হবে। ওতে আমি নেই। ও আমি অনেক জানি। এই নিন আপনার টাকা। ট্যাঁকে নিয়ে ব'সে আছি আমি।

হরি—টাকা নিচ্ছি। কিন্তু তা হ'লে তাই ব'লে দোব যে, হবে না।

গোবিন্দ—আজ্ঞে হ্যাঁ। অপরাহ্ন কাল, সামনে রাত্রি, মেয়েটি সুন্দরী সত্য সবই ঘোষ মশায়। কিন্তু আমার টাকা আরও সত্যি। নিন এই আপনার পঞ্চাশ টাকা। আর এই পেনাম। জয়-জয়কার হোক আপনার। দরিদ্র বোষ্টমকে যে সাহায্য করলেন, চিরকাল স্মরণ থাকবে আমার।

ব্রাহ্মণ—আবার বলছি তুই চণ্ডাল-তুই চণ্ডাল-তুই চণ্ডাল!

[সে দ্রুত পদে বের হয়ে গেল। প্রায় পাগলের মত]

হরি—ও! ও সেই কেষ্টদাসের সঙ্গীটা বুঝি? কি নাম যেন?

গোবিন্দ—নটবর ড্যান্সিং মাষ্টার গো। বেজায় দরদ! একেবারে গলায় গলায়! (হা হা ক'রে হেসে উঠল।)

হরি—(সবিস্ময়ে বললে) তোমার হ'ল কি দাস?

গোবিন্দ—কেন বলুন তো?

হরি—এমন ক'রে হাসছ?

গোবিন্দ—(একটু লজ্জিত হ'ল, বললে) ওই একটা হাসি আমার আছে। বুঝছেন না? জানেন তো সবই। একবার পাগল হয়েছিলাম তো! তার ওই ছিটটুকু আছে।

হরি—মাথায় একটু-আধটু ঠাণ্ডা তেল-টেল মেখো। ভাল নয় এমন হাসি। বুঝলে!

[গোবিন্দ আবার হা—হা—ক'রে হেসে উঠল।]

হরি—আচ্ছা আমি চললাম দাস। তুমি হাস। বুঝেছ। চাবি রইল এই। সেখানে লাঠিয়াল আছে। ইচ্ছে হ'লে তুমি যেতে পার। না—ইচ্ছে হয় কাল সকালে গিয়ে যা হয় ব্যবস্থা ক'রো। আয়রে সব আয়।

[গোবিন্দ তখনও হাসছিল; সে হাসতেই লাগল; বাকি সকলে চ'লে গেল বাড়ি থেকে। গোবিন্দ অকস্মাৎ হাসি থামিয়ে, স্তব্ধ হয়ে ব'সে রইল অজয়ের দিকে তাকিয়ে। অজয়ের ক্ষীণ স্রোতে তখন সন্ধ্যার লাল আলো ঝিকমিক করছে। ব'সে থাকতে থাকতে সে গান ধরলে—]

সাধের কলস গলায় বেঁধে, ডুব দিয়ে আর উঠব না;
যমুনায় কদমতলায় ডুব দিয়ে আর উঠব না।
মন আগুনের জ্বালায় পুড়ে খাক্ হয়ে আর ছুটব না।
নিধুবনে, মধুবনে, তমালতলায় ছুটব না।
ও সাধের কলস গলায় বেঁধে—ডুব দিয়ে আর উঠব না—

[হঠাৎ আঙ্গিনায় নারিকেল গাছের আড়াল থেকে কেউ যেন ব'লে উঠল, 'হরি বলে, আমাকে ভিক্ষে দাও গোঁসাই।'—গান থামিয়ে স্তব্ধ হয়ে গেল গোবিন্দ দাস।]

গোবিন্দ—কে?

নেপথ্যে—ভিক্ষে চাইতে এসেছি।

গোবিন্দ—কি? (গোবিন্দ যেন এখনও ঠিক ধারণা করতে পারলে না)

নেপথ্যে—কলসী—একটা কলসী!

গোবিন্দ—(এবার সপ্রতিভ হয়ে উঠল) কেষ্টদাসের বোষ্টমী?

[নারকেল গাছের আড়াল থেকে ২৯/৩০ বছরের একটি সুশ্রী তরুণী আধ-ঘোমটা টেনে সামনে এসে দাঁড়াল। সন্ধ্যার অন্ধকারে স্পষ্ট দেখা গেল না—তবু বোঝা গেল]

গোবিন্দ—(আবার বললে) কৃষ্ণ-ভা-মিনী! গরবিণী!

ভামিনী—না। আমি সতী।

গোবিন্দ—সতী? বল কি? সতী?

ভামিনী—হ্যাঁ, কলঙ্কিনী সতী। তুমি কুসুমপুরের গাইয়ে কালো গোস্বামী, তোমার স্ত্রী কলঙ্কিনী সতী।

গোবিন্দ—না না। তুমি কৃষ্ণদাসের ভামিনী, বড় ভাল নাম নিয়েছ। একেবারে প্রেমে ডগমগ? ত্রিলোক সংসারে সবচেয়ে সৌভাগ্যবতী সুখী। কিন্তু কি ভিক্ষে চাইতে এসেছ বললে? কলসী? না?

ভামিনী—হ্যাঁ, কলসী।

গোবিন্দ—আমার গান শুনেছ বুঝি? 'যমুনায় ডুব দিয়ে আর উঠব না!'

ভামিনী—শুনেছি। শুনেই চাইলাম। নইলে—

গোবিন্দ—নইলে, কি চাইতে? বল তো শুনি? কি চাইতে এসেছিলে? দাঁড়াও, দাঁড়াও।

ভামিনী—আমি তোমার কাছে—

গোবিন্দ—দাঁড়াও, দাঁড়াও। সবুর কর। আগে—

ভামিনী—কি?

গোবিন্দ—সন্ধে হয়ে গিয়েছে কখন। আলো জ্বালা হয়নি। মনের ভুল দেখ দেখি!

ভামিনী—কি দরকার? 'চন্দ্রাবলীর কুঞ্জবনে নীল মানিকের আলো জ্বলে;
রাধার কুঞ্জ আঁধার সেথা রাধা ভাসে নয়ন জলে।'

—এ তো তোমারই গান। সেদিন এখানে এসে আমার সন্ধান পেয়ে আমাদের আখড়ায় গিয়েছিলে, সেদিন এই গানটাই শুনিয়ে এসেছিলে। রাধার কান্না দেখে কি করবে? আলো থাক।

গোবিন্দ—তুমি কি আমাকে সেই দিনই দেখে চিনেছিলে? গোফ, দাড়ি চুল—

ভামিনী—তবু চিনেছিলাম। তোমার কপালের ওই দাগ দেখে চিনেছিলাম।

গোবিন্দ—হ্যাঁ। ফুলশয্যার রাত্রে—

ভামিনী—হ্যাঁ। আমি ধরা দিতে চাই নি, তুমি জোর ক'রে টেনেছিলে, আমি হাত ছুঁড়েছিলাম, আমার হাতের বালায় তোমার কপালে, ডান ভুরুর উপরে লম্বা হয়ে কেটে গিয়েছিল।

গোবিন্দ—আমি কালো, কুৎসিত, আমার বয়েস বেশি ব'লে তুমি কেঁদেছিলে, তুমি রূপসী—

ভামিনী—হ্যাঁ, আমি রূপসী ছিলাম। রূপ আমার ছিল। আজও আছে। তুমি কুৎসিত কালো, তোমার নাকের ডগায় ওই আঁচিল। সেদিন চোদ্দ বছরের রূপসী মেয়ে সতী তোমাকে দেখে কেঁদেছিল; তোমাকে তার পছন্দ হয়নি। সেদিন ওই তোমার কপালের দাগ দেখেই তো শুধু চিনি নি, ওই আঁচিলটা দেখেও চিনেছিলাম।

গোবিন্দ—ওঃ, সাক্ষাৎ সতী! ষোল বছরেও আমার মূর্তি তোমার হৃদয় পটে এতটুকু মলিন হয়নি!

ভামিনী—ছেলেবেলায় পট দেখিয়ে গান করতে আসত পটুয়ারা; তারা যমদূতের ছবি দেখাত, নরকের ছবি দেখাত, তাও হৃদয় পটে তেমনি আঁকা আছে গোঁসাই।

গোবিন্দ—দাঁড়াও, দাঁড়াও। আলোটা জ্বালি, কথায় কথায় ভুলেই যাচ্ছি।

ভামিনী—আলো থাক গোঁসাই, আলো থাক।

গোবিন্দ—লজ্জা! (হা হা ক'রে হেসে উঠল) সূর্য-চন্দ্র আকাশে আছে চিরকাল। যে দিন তোমার আমার বিয়ে হয়েছিল, সে দিন তাদের সাক্ষী মেনেছিলাম। তারা আজও আছে। এখানে অন্য কেউ তোমার পরিচয় না জানুক, তারা তো জানে। তাদের সামনে মুখ দেখাতে লজ্জা হয় না তোমার?

ভামিনী—না। লজ্জা আমার নাই। ঘৃণা লজ্জা ভয়, তিন থাকতে নয়। গোঁসাই, যাত্রার আসরে অভিমন্যুকে দেখে মনে হ'ল আমি জন্ম-জন্মান্তরের উত্তরা। পরদিন দেখা হ'ল ঘাটে; কুল ভাবলাম না, জাত ভাবলাম না, ঝাঁপ দিলাম। লজ্জা ঘেন্না সব ভাসিয়ে দিলাম অজয়ের জলে। অজয়ের ঘাটে কোনদিন আমি চান করি না। ভয়ে করি না গোঁসাই। যদি আবার সেগুলো অজয় ফিরে দেয়। লজ্জা আমার নাই।

গোবিন্দ—তবে?

ভামিনী—তোমারও লজ্জা নাই, কিন্তু মনে তোমার ঘা আছে, সেই ঘায়ে আবার ঘা খাবে। বুকের ভেতরটা তোমার রক্তারক্তি হয়ে যাবে। আমি এখন আরও রূপসী হয়েছি গোঁসাই। সে দেখলে—

গোবিন্দ—দেখেছি। দেখেছি।

ভামিনী—সেও বারো বছর আগে। বারো বছরে রূপ আমার আরও বেড়েছে। বয়স আমার যত বাড়ছে গোঁসাই, রূপ আমার তত ফুটছে, আমাকে দেখে যদি আয়নাতে তোমার চোখ পড়ে গোঁসাই, তবে তুমি আবার পাগল হয়ে যাবে।

গোবিন্দ—তাই যাব। তবু তোমাকে দেখব।

ভামিনী—ভাল। জ্বাল তবে আলো।

গোবিন্দ—(হাত ধরলে ভামিনীর) ঘরে এস।

ভামিনী—ঘরে? কিন্তু আর তো আমি তোমার ঘরণী নই।

[গোবিন্দ কথার উত্তর দিল না, জোর ক'রেই যেন টানলে।]

ভামিনী—জোর ক'রে নিয়ে যাবে ঘরে? চল। কিন্তু মানুষ পাখী নয় গোঁসাই, খাঁচায় পাখী পুষলে, পাখী শেখানো বুলি ব'লে শিষ দেয়। মানুষ দেয় না। মানুষকে বাঁধাও যায় না।

[কথা বলতে বলতেই সে গোবিন্দ দাসের সঙ্গে ঘরের মধ্যে গেল ও একটি আলো জ্বেলে আনল।]

গোবিন্দ—তা জানি। তোমাকে আমি হাজার টাকা পণ দিয়ে কিনে বিয়ে করেছিলাম। এক দুই তিন ক'রে গুণে—

[বলতে বলতে সে আলোটা তুলে ধরলে। এবং আলোর ছটা ভামিনীর মুখের উপর পড়তেই সে স্তব্ধ হয়ে গেল। চোখ দুটি বিস্ফারিত হয়ে উঠল। এমন রূপ শ্রী এই ভ্রষ্টা দুঃখিনী মেয়েটির। স্তব্ধ হয়ে সে দেখতে লাগল।]

ভামিনী—কি গোঁসাই কি হল?

গোবিন্দ—(চোখ তার ঝকমক ক'রে উঠল) আমাদের কুল ছিল না; কন্যাপণ দিতে হ'ত। (সে আলোটা নামালে।)

ভামিনী—হ্যাঁ হ্যাঁ। এক দুই তিন চার পাঁচ ক'রে বিয়ের আসরে তুমি আমার বাবাকে এক হাজার টাকা পণ দিয়েছিলে; সে আমার মনে আছে; বিয়ের সময় আমার বয়স ছিল চোদ্দ বছর; শিশু ছিলাম না, মনে আছে সে কথা।

গোবিন্দ—(দরজার কাছে দরজা বন্ধ ক'রে দাঁড়িয়ে বললে) সেই এক হাজার টাকার আজ শোধ নেব।

[ভামিনীর ঠোঁটে বিচিত্র হাস্যরেখা ফুটে উঠল। সে উত্তর দিলে না।]

গোবিন্দ—বাল্যাবধি আমি কুৎসিত—মনে মনে তার দুঃখ, কৃষ্ণবিহীন বৃন্দাবনের অন্ধকারের দুঃখের মত গভীর ছিল আমার। দরিদ্র শুক্রবিক্রেতা ব্রাহ্মণ-ঘরের সন্তান, বিয়ের সঙ্কল্প আমার ছিল না। এক সান্ত্বনা ছিল—সম্পদ ছিল—কণ্ঠস্বর, গুণী ওস্তাদ গলা শুনে ছেলে বয়সেই আমাকে টেনেছিলেন, গান শিখিয়েছিলেন, তিনি বলেছিলেন—বাবা, ব্রহ্মচর্য যদি রাখতে পার তবে ভগবান মিলবে। বয়স হ'ল, নাম হ'ল, খ্যাতি হ'ল, পয়সার মুখ দেখলাম। বিয়ে করি নি, মেয়েদের মুখের দিকে চাইনি। পঁচিশ বছর, তিরিশ বছর, তেত্রিশ বছর কাটল, চৌত্রিশ বছর বয়সে তোমাকে দেখলাম। শিবরাত্রিতে বক্রেশ্বর মহাদেবকে গান শোনাতে গিয়েছিলাম। রাত্রে দেখলাম, চুল এলো করে লালপেড়ে শাড়ি পরণে, কপালে সিঁদুরের টিপ, কুমারী মেয়ে, গলায় আঁচল দিয়ে, শিবের সামনে হাঁটু গেড়ে ব'সে পূজো করছে। মনে হ'ল, সাক্ষাৎ গৌরী উমা। পরদিন আবার দেখলাম দিনের আলোতে। আমি গুরুর উপদেশ ভুললাম, ভগবান পাওয়ার সঙ্কল্পে জলাঞ্জলি দিলাম। তোমাকে পাবার জন্যে পাগল হলাম। তোমার বাবার কাছে লোক পাঠালাম। পাঁচশো, সাতশো, আটশো হাজার—। একদিন যা বললে তোমার বাবা, পরের দিন বললে, না, ওতে হবে না আরও চাই। তাই—তাই দোব। হাজার টাকা—তাই দিতে চাইলাম। শুদু তাই নয়, আমার পুরানো ভাঙ্গা ঘর, নতুন ক'রে সাজালাম। টিন দিলাম, মেঝে বাঁধলাম, দেওয়ালে কলি দিলাম, উঠানে তোমার পায়ে ধুলো-কাদা লাগবে ব'লে উঠান বাঁধালাম। তারপর তোমাকে বিয়ে ক'রে ঘরে আনলাম।

ভামিনী—গোঁসাই, এক কথা বিশবার শুনতে ভাল লাগেনা। ওসব আমি জানি,

তাছাড়া একথা আজ নিয়ে তোমার তিনবার বলা হ'ল; ফুলশয্যার রাত্রে—তুমি কুৎসিৎ, তুমি কালো, তোমার নাকে আঁচিল ব'লে আমি কেঁদেছিলাম। আমার রূপ দেখে তুমি ভগবান ভুলেছিলে; তোমার দেহে রূপ ছিল না ব'লে আমি যদি কেঁদে ভগবানকে ডেকে থাকি, ব'লে থাকি—আমার কপালে তুমি এই লিখেছিলে, তবে সেটা কি আমার খুব অপরাধ হয়েছিল?

গোবিন্দ—না, তোমার অপরাধ হয়নি; অপরাধ হয়েছিল আমার।

ভামিনী—হয়েছিল। হাজার বার। হয়নি? লোকে বলত, আমি রাজরাণী হব, রাজপুত্র এসে আমাকে বিয়ে ক'রে নিয়ে যাবে। তার বদলে তুমি এলে। অপরাধ হয়নি?

গোবিন্দ—নিশ্চয়। কিন্তু তোমার বাবা টাকা নিয়ে—

ভামিনী—টাকা! টাকা! টাকা! বাবা টাকা নিয়েছিল, বাবার মুখে কালি লেপে দিয়ে চ'লে এসেছি। গোঁসাই, ফুলশয্যার রাত্রে কেঁদেছিলাম; কিন্তু পরে হয়তো বুঝতাম, অদৃষ্টের হাতে নিজেকে সঁপে দিতাম, তোমার এমন গান—ওই গান শুনেও তোমাকে ভালবাসতে পারতাম। কিন্তু তুমি আমাকে বলেছিলে এই কথা, যে কথাটা আজ নিয়ে তিনবার বলা হল। বলেছিলে, হাজার টাকা দিয়ে আমাকে কিনেছ তুমি। আমার দাম হাজার টাকা গোঁসাই? আমি হাজার টাকায় বিক্রী হই?

গোবিন্দ—ভুল হয়েছিল। তোমার দাম একটা কানাকড়ি।

ভামিনী—না। রূপ। যা দেখে তুমি ভগবানকে কানাকড়ির মত ফেলে দিয়েছ, যার জন্যে চার বছর পাগল হয়ে ঘুরেছ, যার সন্ধান পেয়ে ব্রাহ্মণের ছেলে, জাত দিয়ে বোষ্টম হয়ে আখড়া বেঁধে একটি একটি ক'রে পয়সা জমিয়ে—কেষ্টদাসের আখড়া কিনেছ, বিগ্রহ কিনেছ, সেই রূপ। আমার দাম নাই। টাকায় হয় না। তাই ওই রূপের পায়ে আমার রূপ বিলিয়ে দিয়েছি! আমি পেয়েছি, তুমি পাওনি। পেলে না!

গোবিন্দ—বলছ কি? পেলাম না? না? (উচ্চহাসি হেসে উঠল)

ভামিনী—হাসছ গোঁসাই? হাস। হাসি তোমার মিথ্যে।

গোবিন্দ—মিথ্যে? (হাসি তার থেমে গেল) না, মিথ্যে নয়। এবার পেয়েছি। আজ পাব।

ভামিনী—ভাল কি দেবে আমাকে?

গোবিন্দ—কি দেব? এত দিয়েছি—

ভামিনী—কি দিয়েছ? বল?

গোবিন্দ—আবার তুমিই সেই টাকার কথা তুলছ। আমি টাকা ছাড়া কিছু বুঝি না। আমি দিয়েছি টাকা, এক হাজার টাকা—

ভামিনী—সে দিয়েছ আমার বাবাকে। বারোশো চোদ্দশো টাকা খরচ করেছ বিগ্রহ আখড়া উপলক্ষে, সে আমি জানি, লক্ষ্য আমি। কিন্তু সে টাকাও পেয়েছে কৃষ্ণদাস বৈষ্ণব। আমি কি পেয়েছি? কি দেবে আমাকে বল?

গোবিন্দ—সব—সব। আমার যা আছে সব!

ভামিনী—না। ও চাইতে আমি আসিনি। আমি যা চাইব তা দেবে বল?

গোবিন্দ—বল কি নেবে?

ভামিনী—চাইতে এসেছিলাম বিগ্রহ। এসে আখড়ার পিছন দিক দিয়ে আখড়ায় ঢুকছি, শুনলাম তুমি গাইছ 'সাধের কলস গলায় বেঁধে যমুনায় ডুব দিয়ে আর উঠব না।' শুনে তোমাকে এসে চেয়েছি কলসী। দুটোর যা হয় দিয়ো। বিগ্রহ যদি পাই তবে তোমার সঙ্গে বাসর সেরে তাঁর পায়ে বিলিয়ে দেব নিজেকে। নাহ'লে ওই কলসীটা নিয়ে নামব গিয়ে অজয়ের দহে।

গোবিন্দ—শোন সতী। আমি তোমার জন্য তপস্যা করেছি।

[ভামিনী খিল খিল ক'রে হেসে উঠল]

গোবিন্দ—হেসো না সতী, হেসো না। শোন।

ভামিনী—ভাল, আর হাসব না, বল।

গোবিন্দ—আজ আমিও বৈষ্ণব, তুমিও বৈষ্ণব, গৃহস্থ নই, আখড়াধারী। আমাদের প্রথা যখন আছে, তখন তুমি ফিরে এস। কৃষ্ণদাসকে ছেড়ে আমার ঘরে এস। এঘর—এ আয়োজন সব তোমার জন্যে। সতী!

ভামিনী—না।

গোবিন্দ—সতী!

ভামিনী—না—না! তাছাড়া আমি আমি আর সতী নই, আমি ভামিনী—কৃষ্ণভামিনী।

গোবিন্দ—তবে তুমি বিগ্রহ পাবে না ভামিনী। কলসীই তোমাকে নিতে হবে।

ভামিনী—তাই দিয়ো। তা হ'লে বাসর পাত। আলো... (আলোটার শিখা এতক্ষণ বিশেষ উজ্জ্বল ছিল না, এবার উজ্জ্বল ক'রে দিল।)

ভামিনী—(গায়ে একখানা চাদর জড়ানো ছিল। চাদরখানি খুলে ফেলল সে। গোবিন্দের মুখের দিকে চেয়ে হাসলে।) শপথ ভাঙতে পাবে না। কলসী আমাকে দিতে হবে।

[গোবিন্দ ভামিনীর মুখের দিকেই তাকিয়ে ছিল। এতক্ষণ অনুজ্জ্বল আলোর মধ্যে উত্তেজনাবশে মুখের দিকে তাকিয়েই কথা বলছে। এবার উজ্জ্বল আলোয় তার দিকে তাকিয়ে আপাদমস্তক দেখে চমকে উঠল। চাপা গলায় ব'লে উঠল, ভামিনী!]

ভামিনী—কি? কি হ'ল?

গোবিন্দ—তুমি মা হবে? তোমার কোলে—

ভামিনী—হ্যাঁ, আমার কোলে চাঁদ আসবে।

গোবিন্দ—ভাগ্যবান কৃষ্ণদাস। এতকাল পরে পথের ভিক্ষুক হয়ে—

ভামিনী—না—না—না। সে দুর্ভাগা তুমি। কালো গোঁসাই তুমি।

গোবিন্দ—ভামিনী! বাহবা!

ভামিনী—বাহবা নয় গোঁসাই, বাহবা নয়। সাক্ষী আছে আহ্লাদী।

গোবিন্দ—(চমকে) আহ্লাদী?

ভামিনী—হ্যাঁ। গোঁসাই, আমি তোমাকে দুঃখ দিয়েছি। কিন্তু ঠকাইনি। বিয়ের প্রথম দিন থেকে তোমাকে আমি বলেছিলাম, তোমাকে ভালবাসতে পারব না। তুমি ঠকিয়েছ নিজে নিজেকে। গোঁসাই টাকা দিয়ে আমাকে কিনেছ ভেবে তুমি নিজেকে নিজে ঠকিয়েছিলে। গোঁসাই, তারপর এখানে এসে জাত দিয়ে টাকা জমিয়ে ভেবেছিলে, আমার তপস্যা করছ। অন্তত তাই তুমি বললে, সত্যি হ'লে নিজেকে নিজে ঠকিয়েছ। তুমি আক্রোশ মেটাবার জন্য তপস্যা করেছিলে। আমাকে পথে দাঁড় করিয়ে সুখ পাবে। সম্ভব হ'লে এইভাবে আমাকে ধুলোয় ফেলে লাথি মেরে সুখ পাবে। গোঁসাই, তুমি আহ্লাদীর নেশায় পড়েছিলে মনে পড়ছে? বেশি দিন আগে তো নয়, এই মাস সাতেক আগে। বল। লজ্জা তোমার নাই। আর আমার কাছেই বা লজ্জা কি তোমার!

গোবিন্দ—হ্যাঁ। কেনই বা লজ্জা করব? হ্যাঁ, আহ্লাদীকে আমার ভাল লেগেছিল। আমি তাকে—

ভামিনী—তুমি তাকে বলেছিলে, প্রতি বাসরে দশ টাকা ক'রে দেবে।

গোবিন্দ—বলেছিলাম।

ভামিনী—কিন্তু আহ্লাদী যে আহ্লাদী, সেও তোমার এই কুৎসিৎ রূপ দেখে বলেছিল—না।

গোবিন্দ—মিছে কথা। টাকায় সব হয়। সে এসেছিল পাঁচ রাত্রি।

ভামিনী—হ্যাঁ, পাঁচ রাত্রি। আহ্লাদীর শয্যার অন্ধকার ঘরে আলো না জ্বালার কড়ারে তুমি প্রবেশাধিকার পেয়েছিলে। আহ্লাদী তোমাকে বলেছিল, আলো জ্বালালে তোমার মুখ আমার চোখে পড়বে, আমি ঘেন্নায় ম'রে যাব। বল তুমি এই শর্ত হয়েছিল কি না?

গোবিন্দ—হ্যাঁ, হয়েছিল।

ভামিনী—আহ্লাদী আমাকে একদিন বললে, কৃষ্ণদাসের তখন কঠিন অসুখ, আহ্লাদী তাকে দেখতে আসত। সেও তার রূপে মজেছিল। বললে, ওই নরকের প্রেতের মতন চেহারা, ওর কথা শোন দেখি দিদি? সে এই বলে। মরণ আমার! জলে ডুবে মরব আমি, তবু না। এইদিন এলে ওকে ঝেঁটিয়ে বিদেয় করব। তখন আমার ঘরে কঠিন অবস্থা। মানুষটা হাঁপানিতে যায় যায়। ওদিকে বিগ্রহের সেবা হয়না। কৃষ্ণদাস আমাকে বললে, তুই যা। ওকে যদি হাতে করতে পারিস, সব রক্ষে হবে। কৃষ্ণদাসের অরুচি নাই, ঘেন্না নাই, সে সব পারে। আমার উপর তার নেশাও ছুটেছে। নেশা তার আহ্লাদীর ওপর। রাজী প্রথমটা হতে পারিনি। একদিন বিগ্রহের সেবা হ'ল খুদ রান্না ক'রে। প্রসাদ ক'টি কৃষ্ণদাস খেলে, আমি উপোস করে রইলাম। সন্ধ্যাবেলা বিগ্রহের পায়ে মাথা কুটে কাঁদলাম। তারপর মন বাঁধলাম। আহ্লাদীকে বললাম, লোকটাকে তুই 'হ্যাঁ' বল্। তোর বদলে ঘরে থাকব

আমি। তোর তো নামের ভয় নাই! দেখ তা হ'লে লোকটা বাঁচে। আমিই শর্ত বলে দিলাম। তুমি রাজী হ'লে। আহ্লাদী রইল কেষ্টদাসের শিয়রে, আমি ব'সে রইলাম আহ্লাদীর ঘরে, তারই শয্যায়। তুমি এলে। আংটিটা চিনতে পার? কার বন্ধকী আংটি তুমি দিয়েছিলে সোহাগ ক'রে? এই দেখ। (ভামিনী হাত বাড়িয়ে ধরলে)

গোবিন্দ—(সভয়ে পেছিয়ে গেল) স—তী!

ভামিনী—হ্যাঁ, আমি সতী। তোমাকে পরিত্যাগ করেছিলাম; কিন্তু তবু তোমার পাপের ফল আমার গর্ভে। এর পর হয় ওই বিগ্রহ নয় কলসী ছাড়া আমার আশ্রয় আর কি বলতে পার? তবে বিশ্বাস কর, ওই বিগ্রহকে স্মরণ ক'রেই প্রতি রাত্রির অভিসারে যাত্রা করেছি। প্রণাম করে গিয়েছি। কৃষ্ণদাসের সন্তান ষোল বৎসর হয়নি। এ আমার পঞ্চতপার ফল, এ তোমার সন্তান। প্রভুর দান।

গোবিন্দ—আমাকে তুমি মার্জনা কর সতী, আমাকে তুমি মার্জনা কর।

ভামিনী—মার্জনা! (হাসলে) আমার কাছে নয়। যার কাছে অপরাধ তার কাছে চাও। কিন্তু আমি আর পারছি না গোঁসাই। আমি আর পারছি না।

[সে হঠাৎ ঝড়ে ভাঙ্গা গাছের মত ঘরের শয্যার উপরই ভেঙ্গে পড়ল। তারপর ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগল। গোবিন্দ তার মাথার কাছে বসল। মাথায় হাত বুলিয়ে দিতে লাগল।]

গোবিন্দ—তুমি আজ সারা দিন কিছু খাওনি, না? (ভামিনী উত্তর দিল না)

গোবিন্দ—খাওয়া হবে কি ক'রে? আজ আহারের পূর্বেই আমার লোকেরা গিয়ে ঘর দখল করেছে। কিছু খাও সতী।

ভামিনী—(মাথা নাড়লে) না—না।

গোবিন্দ—না, আমার হাতে তোমাকে খেতে হবে না। একদিন উপবাসে মানুষ মরে না। তুমি শান্ত হও, সুস্থ হও।

[গোবিন্দ মাথায় হাত বুলোতে লাগল, ভামিনী শান্ত নিথর হয়ে এল।]

গোবিন্দ—সতী! সতী! (উত্তর না পেয়ে আবার ডাকল) সতী! (মাথা ধরে নাড়া দিল) সতী। একি। তবে কি মূর্ছিত হয়ে পড়ল!

[একবার মাথায় হাত দিল, উঠে গিয়ে জলের ঘটি নিয়ে মাথায় জল দিতে যেয়ে থমকে দাঁড়াল—কি ভাবতে ভাবতে জলো হাত মাথায় দিলো। আরো অন্যমনস্ক হয়ে পড়ল—চোখ মুখে অদ্ভুত ভাবান্তর।

ভালই হল। (অদ্ভুত হাসি দিয়ে গুন্ গুন্ করে গান ধরলে—)

(হঠাৎ) গোলকধাঁধার বাইরে এলাম এলাম কোন পারে
এ-পার ওপার নাই পারাপার গভীর অন্ধকারে
ও বৃন্দে সখী, বলে দে দিশে

কৃষ্ণ আমার কালী হ'ল (আমি) পূজিব কিসে?
চন্দন সিন্দুর হ'ল শ্মশান বাসর ধারে এলাম কোন পারে!

[গান থামলেও সুর থামল না, সতীর কাছে আরও একবার এগিয়ে গেল, নীচু হয়ে নিঃশ্বাস পরীক্ষা করল আবার গানের শেষ পংক্তি আরম্ভ করলে এবং ধীরে ধীরে বেরিয়ে গেল। ধীর ধীরে সকাল হয়ে এল। পাখীর ডাকে চকিত হয়ে জেগে উঠল ভামিনী। চাদরখানা গায়ে টেনে নিলে।]

ভামিনী—গোঁসাই! গোঁসাই! গোঁসাই! আমি চললাম গোঁসাই।

[ভামিনী বেরিয়ে যেতে গিয়ে থমকে দাঁড়াল। কোলাহল করতে করতে একটি জনতা এগিয়ে এল। সামনেই হরিচরণ ঘোষ। ভামিনী পাশ কাটিয়ে দাঁড়াল।]

হরি—দাঁড়াও। গোবিন্দ দাসের খবর শুনেছ?

ভামিনী—(বিস্মিত ও আতঙ্কিত ভাবে) কেন গোঁসাই তো ঘরেই।

হরি—না, ঘরে সে নেই।

ভামিনী—ঘরে নেই! গোঁসাই—গোঁসাই! (আর্তস্বরে ডাকতে ডাকতে ঘরে গিয়ে আবার ফিরে এল। হতবিহ্বল হ'য়ে পড়ল যেন) না—গোঁসাই ঘরে নেই।

হরি—ঘরে আর সে কোন দিনই ফিরবে না, ভামিনী। গোবিন্দ দাস তোমাকেই এই সব দিয়ে গিয়েছে। বিগ্রহের সেবায়েত করে দিয়েছে। তোমার পর তোমার ছেলে হবে সেবায়েত। পাগল, কাল তখন অনেক রাত্রি। আমাকে ডেকে তুলে এই সব ব্যবস্থা ক'রে—

ভামিনী—(রাঙা হয়ে উঠল) কিন্তু কোথায় গেল সে? সে কই? গিয়েছে বলছেন, কোথায় গেল?

হরি—আমাকে বললে, বৃন্দাবন যাবে। বললে, এ ভোলে আর নয় ঘোষ মশায়, ভোল পাল্টে ফিরব। তারপর সকালে দেখি, কলঙ্কিনীর দেহে তার দেহটা ভাসছে। ওই নিয়ে আসছে।

ভামিনী—গোঁ-সা-ই—(একটা অস্ফুট আর্তনাদ বেরিয়ে এল)।

□

শিক কাবাব

বনফুল

(১৮৯৯-১৯৭৯)

চরিত্র

করিম
শিবু
ভুট্টা
পান্নালাল
জমিদার
জীবনধন

[প্রকাণ্ড একটি হল-ঘর। ছাদ পাকা নয়, খাপরার চাল। একটি বড় বরগা ঘরের এক প্রান্ত হইতে আর এক প্রান্ত পর্যন্ত চলিয়া গিয়াছে দেখা যাইতেছে। পর্দা টাঙাইয়া হলটিকে দুই ভাগে ভাগ করা হইয়াছে। পর্দা একটি নয় দুইটি—পাশাপাশি টাঙানো আছে। পর্দার ওপারে কি আছে তাহা দেখা যাইতেছে না বটে, কিন্তু উভয় পর্দার সন্ধিস্থল ফাঁক করিয়া দিলে স্পষ্ট দেখা যাইবে। ঘরের দুই দিকে দুইটি দরজা আছে। ঘরের মাঝামাঝি একটি গোল টেবিল এবং দেয়াল ঘেঁসিয়া ছোট লম্বা গোছের আর একটি টেবিল রহিয়াছে। গোল টেবিলের চারি ধারে কয়েকখানি দামী চেয়ার আছে। সুদৃশ্য ডোম-সমন্বিত একটি ইলেক্‌ট্রিক বাতি জ্বলিতেছে। একটি প্লেট হাতে করিয়া করিম খানসামা প্রবেশ করিল। করিম খানসামার নুর আছে; পরিধানে চেক-চেক লুঙ্গি, ফতুয়া এবং মলিন ফেজ। প্লেটটি ছোট লম্বা টেবিলে রাখিয়া করিম উৎসুক নয়নে দ্বারের দিকে চাহিয়া রহিল। ক্ষণকাল পরে ডাক দিল]

করিম—কই রে শিবু, শিকগুলো নিয়ে আয়।

শিবু—(নেপথ্য হইতে) যাই।

করিম—(এদিক ওদিক চাহিয়া) সব ঘরগুলোর খাপরা নাবিয়েছে দেখছি। ঘরের মাঝামাঝি আবার পর্দা টাঙিয়েছে কেন! শিবু, ওরে শিবু।

শিবু—(নেপথ্য হইতে) যাই—যাই।

[শিবু প্রবেশ করিল। ঝানু চেহারা। তাহার কাঁধে ঝাড়ন, পরনে ফতুয়া এবং হাতে গোটা দুই লোহার শিক। শিবু আসিয়াই চোখ বড় বড় করিয়া ঠোঁটে আঙুল দিল।]

শিবু—আরে, চুপ চুপ করিম মিয়া, অত চেঁচায় না।

করিম—কেন?

শিবু—(পর্দা দেখাইয়া, চুপি চুপি) আরে, দেখছ না?

করিম—দেখছি তো, পর্দা টাঙালে যে হঠাৎ?

শিবু—(চুপি চুপি) ওপারে মেয়েমানুষ আছে।

করিম—(সবিস্ময়ে ও নিম্ন কণ্ঠে) তাই নাকি?

শিবু—তা না হ'লে শুধু শুধু পর্দা টাঙাব কেন?

[উভয়ে কিছুক্ষণ চুপ করিয়া রহিল]

করিম—কর্তা তা হ'লে আর একটি উড়িয়ে এনেছেন?

[শিবু সম্মতিসূচক ঘাড় নাড়িল]

শিবু—তাই না শিক-কাবাব করবার জন্যে তোমার ডাক পড়েছে। তোমার হাতের শিক-কাবাব নইলে কর্তার ফুর্তিই জমে না যে।

[করিম দন্ত বিকসিত করিয়া হাসিল]

করিম—দাও তা হ'লে শিকগুলো, মাংসটা গেঁথে ফেলি চটপট।

[শিবু শিক দিল, করিম মাংস গাঁথিতে লাগিল]

শিবু—এখানে টেবিলটা ময়লা করবে কেন, চল না, রান্নাঘরে ব'সে গাঁথবে।

করিম—রান্নাঘরে যা ধোঁয়া করেছ তুমি!

শিবু—কয়লায় আগুন দিয়েছি যে, যাই একটু হাওয়া করি গিয়ে, মদও আনা হয়নি এখনও। তুমি মাংসটা গেঁথে নিয়ে চটপট এস।

[গমনোদ্যত]

করিম—আরে আরে, শোন না—(বাম চক্ষু কুঞ্চিত করিয়া) চিড়িয়া ফাঁসল কি ক'রে?

শিবু—বাবুর ওই যে একটি নতুন মোসাহেব জুটেছে আজকাল—

করিম—কে, পান্নালালবাবু?

শিবু—হ্যাঁ। উনিই উড়িয়ে এনেছেন আজ সন্ধ্যেবেলা।

করিম—(সাগ্রহে) কোথা থেকে?

শিবু—আমাকে জিজ্ঞেস ক'র না, আমি কিছু জানি-টানি না।

করিম—তুমি বাবা পুরনো ঘুঘু, তুমি জান না!

[শিবু মুচকি হাসিল]

শিবু—মাইরি বলছি, কালীর কসম। আমি চাকর মনিষ্যি...সাতেও থাকি না, পাঁচেও থাকি না।

করিম—তবু—

শিবু—যেটুকু জানি, সেটুকু হচ্ছে এই—সকালে বৈঠকখানা ঝাড়পোঁছ করি, এমন সময় এক টেলিগেরাপ এল। জীবনধনবাবু তখন সেখানে ব'সে। টেলিগেরাপ প'ড়ে বাবু আমাকে বললেন, ওরে. পালকির বেয়ারাগুলিকে ব'লে দে, সন্ধ্যের সময় যেন তারা পালকি নিয়ে ইষ্টিশানে থাকে, জেনানি সোয়ারি আসবে। আর তুই বাগানবাড়িটা পরিষ্কার ক'রে রাখিস।

[শিবু একবার পর্দার প্রতি চকিত দৃষ্টিপাত করিয়া নিম্নকণ্ঠে পুনরায় সুরু করিল]

আমি বললাম বাগানবাড়িতে তো জেনানি রাখবার মত ঘর নেই, মাঝের হল-ঘরটি ছাড়া সব ঘরের খাপরা নাবানো হয়েছে। বাবু ধমকে উঠলেন, বললেন, ওই হল-ঘরেই ফরাসের চাদর টাঙিয়ে একটা পর্দার ব্যবস্থা ক'রে রাখ।

[পুনরায় পর্দার প্রতি চকিত দৃষ্টিপাত করিল]

করিম—(মাংস গাঁথিতে গাঁথিতে) তারপর?

শিবু—তারপর আর কি, সন্ধ্যের সময় পালকি এসে ওই পেছনের দরজাটায় লাগল, পান্নালালবাবু এসে কি একটু ফুসফুস গুজগুজ করলেন, চিড়িয়া এসে খাঁচায় ঢুকল। আমি ঝি-মাগীকে দিয়ে এক বালতি জল, একটা ঘটি আর কিছু জলখাবার

পাঠিয়ে দিলাম। (হাত উল্টাইয়া) কত্তার ইচ্ছেয় কম্ম। যেমন যেমন বলেছিলেন, তেমনই তেমনই করেছি; তোমাকেও খবর দিতে বলেছিলেন, তুমিও এসে গেছ; যাই এবার, দেখি আঁচটার কতদূর!

[গমনোদ্যত]

করিম—আরে, দাঁড়াও দাঁড়াও, আসল খবরটাই তো বললে না।

শিবু—(সবিস্ময়ে) আবার কি! যা জানি, তা তো বললাম।

করিম—(ভুরু নাচাইয়া) মানে, চিড়িয়াটি কি রকম? বুলবুল, না ছাতারে?

শিবু—(মাথা নাড়িয়া) জানি না ভাই।

করিম—(অবিশ্বাসভরে) আরে যাও যাও।

শিবু—সত্যি বলছি, কালীর কসম। তবে পর্দার ব্যাপার দেখে মনে হচ্ছে, বাগ্দী ক্যাওড়া নয়, ভদ্রলোকের মেয়ে।

করিম—(লুব্ধ আগ্রহে) বল কি?

শিবু—তাই তো মনে হয়! [ভুট্টা নামক বালক-ভৃত্য প্রবেশ করিল]

ভুট্টা—এই পেঁপে-বাটাটা মাংসে পড়ে নি।

করিম—সেকি, কোথায় ছিল ওটা এতক্ষণ?

ভুট্টা—রান্নাঘরের কোণের দিকটায় ছিল।

করিম—একটা শিক তো গাঁথা হয়ে গেছে। আচ্ছা দে, বাকি মাংসটায় মিশিয়ে দিই।

[মিশাইয়া দিল]

শিবু—তুই উনুনটায় হাওয়া কর গিয়ে, আমি যাচ্ছি।

[ভুট্টা চলিয়া গেল]

করিম—বাগ্দীই হোক, ক্যাওড়াই হোক, আর ভদ্দরলোকই হোক, শেষ পর্যন্ত তো আমাদের ভোগেই লাগবে।

[হঠাৎ ক্যাঁক ক্যাঁক করিয়া হাসিয়া উঠিল]

শিবু—(নিম্ন কণ্ঠে) আরে, চুপ চুপ, শুনতে পাবে যে, পাশেই রয়েছে।

[পর্দার ওপাশে চেয়ার সরানোর শব্দ পাওয়া গেল। উভয়েই সেদিকে সচকিত দৃষ্টি-নিক্ষেপ করিল। কিছুক্ষণ চুপচাপ]

করিম—নিস্তারিণীটাকে আজকাল দেখলে কিন্তু কষ্ট হয়। দেখেছ এদানীং তাকে তুমি?

শিবু—দেখেছি।

করিম—গায়ে চাকা চাকা কি বেরিয়েছে বল দিকি?

শিবু—(নির্বিকারভাবে) কি আবার, কুট।

করিম—ক্যাওড়ার মেয়ে হ'লে কি হয়, রূপ ছিল বটে এককালে! প্রথম বাবুর কাছে যখন এল—ওরে ব্বাস রে—চোখ-ঝলসান রূপ!

শিবু—হ'লে কি হয়, শেষ পর্যন্ত যে ওরা গিয়ে ব্যবসা খোলে! ব্যবসা যাঁহাতক খুলেছে কি মরেছে!

করিম—কি করবে বল, বাবু তো আর চিরকাল পোষে না। পেট চালাতে হবে বেচারীদের।

শিবু—(দরজার পানে চাহিয়া) ওই কত্তা এসে পড়লেন, এখনও মদ আনা হয়নি। চল চল, যেটুকু বাকি আছে রান্নাঘরে ব'সেই গেঁথো।

[উভয়ে চলিয়া গেল। যাইবার পূর্বে শিবু ঝাড়ন দিয়া টেবিলটা ঝাড়িয়া দিল। কথা কহিতে কহিতে জমিদার এবং মোসাহেব পান্নালাল আসিয়া প্রবেশ করিলেন। পান্নালাল একটু রোগা-গোছের, ছিমছাম, চোখে চশমা, গোঁফদাড়ি কামানো। জমিদারটি খুব মোটা বর্তুলাকার ব্যক্তি। তিন থাক চিবুকের উপর কটা রঙের ফ্রেঞ্চকাট দাড়ি। মাথায় সামনের দিকটায় টাক।]

জমিদার—ওসব কবিত্ব-টবিত্ব রাখ তুমি, মনে ঘাঁটা প'ড়ে গেছে বাবা। আগে ইতিহাসটা শুনি।

পান্নালাল—ইতিহাস তো বললাম সংক্ষেপে।

জমিদার—সংক্ষেপে টংখেপে চলবে না, বিশদভাবে শুনতে চাই। ইতিহাসটি পুরোপুরি না শুনে আমি ছুঁচ্ছি না ওসব। সেবারে মনে নেই, এক পুলিস-কেসেই ফেঁসে গেলাম বাবা, হাজারখানেক টাকা লম্বা হয়ে গেল ঘুষঘাষ দিতেই। এস, বসা যাক ভাল ক'রে সব গুছিয়ে বল দিকি শুনি। হ্যাংলার মত হামলে পড়বার বয়স গেছে— হঁ হঁ হঁ হঁ (হাসিলেন)।

পান্নালাল—বেশ শুনুন তা হ'লে।

[চেয়ার টানিয়া দুজনে উপবেশন করিলেন]

জমিদার—দাঁড়াও, সিগার বার করি।

[পকেট হইতে সিগার-কেস বাহির করিলেন]

দেশলাই কোথা গেল?

[এ পকেট ও পকেট খুঁজিতে লাগিলেন]

ঠিক ফেলে এসেছি, এমন ভুলো মন হয়েছে আজকাল! ওরে শিবে!

[পান্নালাল পকেট হইতে দিয়াশলাই বাহির করিলেন]

পান্নালাল—এই যে আমার কাছে আছে।

জমিদার—দাও। এইবার আনুপূর্বিক সব কাহিনীটি বল দিকি বাবা, ভদ্দরলোকের মেয়ে তোমার খপ্পরে পড়ল কি ক'রে?

পান্নালাল—ওই যে বললাম, শেয়ালদা স্টেশনে পুলিসের হাতে ধরা প'ড়ে কাঁদছিল। আত্মহত্যা করতে যাচ্ছিল আর কি।

জমিদার—আত্মহত্যা করতে যাচ্ছিল? তুমি জানলে কি ক'রে?

পান্নালাল—পুলিসের কাছে শুনলাম, রেল-লাইনে মাথা দিয়েছিল।

জমিদার—তারপর?

পান্নালাল—তারপর আমি পুলিসকে কিছু দিয়ে-টিয়ে উদ্ধার করলাম। একটা হোটেলে নিয়ে গিয়ে খাওয়ালাম বোঝালাম—

জমিদার—(সকৌতুকে) কি বোঝালে?

পান্নালাল—বোঝালাম যে, এত অল্প বয়সে মরবার দরকার কি! চল, আমি তোমাকে একটি চাকরি জুটিয়ে দিচ্ছি আমার এক জমিদার বন্ধুর বাড়িতে।

জমিদার—আরে এটা তো শেষের ঘটনা। গোড়া থেকে সব বল না, শুনি। শেয়ালদা স্টেশনেই এল বা কি ক'রে, তার আগেই বা কোথা ছিল? দাঁড়াও, এটা আগে ধরিয়ে নিই, তুমিও নাও একটা।

[জমিদারবাবু সিগার ধরাইতে লাগিলেন। দেখা গেল Alcoholic tremor আছে, হাত কাঁপে। পান্নালালও একটি সিগার লইয়া ধরাইলেন]

পান্নালাল—(ধোঁয়া ছাড়িয়া) সেই মামুলি কাহিনী আর কি।

জমিদার—কি?

পান্নালাল—মেয়ের বয়স হ'ল, কিন্তু পাত্র জুটল না, বাপ মা বিয়ের জন্যে ছটফট ক'রে বেড়াতে লাগল—

[জমিদারবাবুর সিগারটা ঠিকমত ধরিতেছিল না। তিনি তাহা ধরাইবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন।]

জমিদার—কি বললে, ছটফট ক'রে বেড়াতে লাগল, আই সি, তারপর?

পান্নালাল—তারপর যা হয়। কেউ চাইলে টাকা, কেউ চাইলে রূপ, কেউ চাইলে গান, কেউ চাইলে বাজনা, কেউ চাইলে নাচ, কেউ চাইলে লেখাপড়া, কেউ চাইলে সব—

[জমিদারের সিগার ঠিক ধরে নাই, নিবিয়া গেল। তিনি কম্পমান হস্তে পুনরায় তাহা ধরাইতে ধরাইতে গল্পে মনোযোগ দিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন।]

অর্থাৎ বরপক্ষের চাহিদা সবই প্লাসের কোঠায় আর মেয়েপক্ষের দিকে সবই মাইনাস। সুতরাং বিয়ে হ'ল না, বয়স বাড়তে লাগল।

জমিদার—(এক মুখ ধোঁয়া ছাড়িয়া) এইবার ধরেছে। কি বললে, বয়স বাড়তে লাগল, আই সি। (সহসা) মেয়েটি দেখতে কেমন?

পান্নালাল—এস না, দেখবে?

জমিদার—না, এখন থাক। এই অপেক্ষা ক'রে থাকার মধ্যেই একটা থ্রিল আছে হে, দেখলেই তো সব ফুরিয়ে গেল—হঁ হঁ হঁ হঁ। যাক, ইতিহাসটা আগে শুনি নিই। ভাল কথা, ওকে ওখানে বসতে-টসতে দিয়েছ তো ভাল ক'রে?

[পর্দার দিকে চাহিলেন]

পান্নালাল—একটা চেয়ার দিয়েছি।

জমিদার—বেশ, এইবার বল শুনি। তারপর কি হ'ল?

পান্নালাল—তারপর একটু রোমান্টিক ব্যাপার ঘটল।

জমিদার—কি রকম?

পান্নালাল—স্বাভাবিক নিয়মে মেয়েটি একটি প্রতিবেশী যুবকের প্রেমে পড়ল।

জমিদার—(হাসিলেন) হঁ হঁ হঁ হঁ হঁ হঁ।

পান্নালাল—তারপরই কিন্তু হ'ল মুস্কিল, মনে মিলল, কিন্তু জাতে মিলল না।

[জমিদারবাবু এ কথায় অত্যন্ত পুলকিত হইয়া উঠিলেন। হাস্যবেগ দমন করিবার চেষ্টা করিয়া কৃতকার্য হইতে পারিলেন না—এঃ হে হে হে হে হে করিয়া উচ্চকণ্ঠে ফাটিয়া পড়িলেন। শিবু এক বোতল হুইস্কি ও কয়েকটি গ্লাস লম্বা টেবিলটিতে রাখিয়া গেল।]

জমিদার—(সিগারের ছাই ঝাড়িয়া) বেড়ে বলেছ কথাটা হে, মনে মিলল, কিন্তু জাতে মিলল না, অ্যাঁ! তারপর?

পান্নালাল—উধাও হ'ল একদিন দুজনে।

জমিদার—উধাও হ'ল! বল কি?

পান্নালাল—হ্যাঁ।

[জমিদারবাবু বার্তাটি উপভোগ করিলেন এবং মৃদু হাসিয়া বলিলেন]

জমিদার—ঠেকল গিয়ে কোথায়?

পান্নালাল—কাশীতে।

জমিদার—পুণ্য বারাণসী তীর্থে! (সহসা চক্ষু দুইটি বড় করিয়া) খান জায়গায় গিয়ে পড়ল বল।

পান্নালাল—(মুচকি হাসিয়া) সে কথা আর বলতে! খান খান হয়েও গেল।

জমিদার—কি রকম! এ যে রীতিমত উপন্যাস ক'রে তুললে তুমি বাবা! থাম থাম, এটা আবার নিবে গেল, ধরিয়ে নিই, আর গলাটাও একটু ভিজিয়ে নেওয়া যাক, কি বল অ্যাঁ? ওরে শিবু!

[কম্পমান হস্তে সিগার ধরাইতে লাগিলেন। কয়েক বোতল সোডা লইয়া হন্তদন্তভাবে শিবু প্রবেশ করিল।]

তুই সোডা আনতে গেছলি বুঝি? ব্যাটা আগে থাকতে কিছু এনে রাখবে না। বোতলটা খোল।

শিবু—খোলাই আছে হুজুর।

[শিবু হুইস্কির বোতল এবং তিনটি গ্লাস আনিয়া গোল টেবিলটাতে রাখিল। জমিদারবাবু দুইটি গ্লাসে মদ ঢালিলেন। শিবু সোডা খুলিল]

জমিদার—(তৃতীয় গ্লাসটি দেখাইয়া) এটা আবার কার জন্যে?

শিবু—জীবনধনবাবুর আসবার কথা ছিল।

জমিদার—হ্যাঁ হ্যাঁ, ঠিক তো, সে এখনও এল না কেন? নে, ঢাল।

[শিবু সোডা ঢালিয়া দিয়া চলিয়া গেল। দুইজনে দুইটি গ্লাস তুলিয়া লইয়া 'সিপ' করিতে লাগিলেন।]

এইবার বল শুনি। খান খান হয়ে গেল কি রকম?

পান্নালাল—মানে কাশীর পাণ্ডার হাতে পড়ল আর কি। পাণ্ডাগুলো তো গুণ্ডারই নামান্তর।

জমিদার—আর সেই ছোকরা?

পান্নালাল—ছোকরা আর কি করবে, তার না ছিল ট্যাঁকের জোর, না ছিল গায়ের জোর।

জমিদার—প্রেমের জোর তো ছিল। কাশী পর্যন্ত টেনে তো নিয়ে গেছল বাবা—হুঁ হুঁ হুঁ হুঁ হুঁ হুঁ—তারপর?

পান্নালাল—মেয়েটি পাণ্ডাদেরই আশ্রয়ে রইল দিনকতক।

জমিদার—আশ্রয়ে—অ্যাঁ!

[মুচকি হাসিলেন। চর্বিস্ফীত গাল দুইটি আরও স্ফীত হইয়া উঠিল]

পান্নালাল—দিন দশেক ছিল সেখানে। তারপর অসহ্য হওয়াতে পালাল একদিন।

জমিদার—পালাল! এবার কার সঙ্গে?

পান্নালাল—এবার একা, রাত্রে চুপি চুপি দরজা খুলে—

[জমিদার পুনরায় সিগার ধরাইতেছিলেন]

জমিদার—মেয়েটির তা হ'লে খুব ইয়ে আছে বল। (সহসা) আচ্ছা, এত সব খবর তুমি পেলে কি করে?

পান্নালাল—মেয়েটি সব বলেছে আমাকে।

জমিদার—মেয়েটির বাপ-মা কোন খোঁজ করে নি?

পান্নালাল—করেছিল কি না, মেয়েটি জানে না।

জমিদার—মেয়েটিও বাপ-মাকে কিছু জানায় নি?

পান্নালাল—জানাবে কি ক'রে? নিরক্ষর পাড়াগেঁয়ে মেয়ে, নিঃসম্বল। তা ছাড়া অত বড় কলঙ্কের পর—

জমিদার—যাক্, তারপর?

পান্নালাল—পালিয়ে যাবার পর সন্তোষবাবু ব'লে এক ভদ্রলোকের সঙ্গে আলাপ হ'ল।

জমিদার—ছোক্‌রা, না বুড়ো?

পান্নালাল—বুড়ো।

জমিদার—বুড়ো! তারপর?

পান্নালাল—বুড়ো আশ্রয় দিলে।

জমিদার—আশ্রয় দিলে মানে? খোলসা ক'রে বল না বাবা!

পান্নালাল—মানে চাকরাণী হিসেবে বাহাল করলে।

জমিদার—(সহাস্যে) পাটরাণী না ক'রে চাকরাণী করবার মানে? ধার্মিক ব্যক্তি, না মেয়েটা কুৎসিৎ?

পান্নালাল—ধার্মিক ব্যক্তি। কিন্তু—

[হাসিলেন]

জমিদার—আবার 'কিন্তু' কেন বাবা? মুখোসের তলা থেকে লেলিহান জি-উ-হ্বা দেখা গেল নাকি, অ্যাঁ?

পান্নালাল—না, ধার্মিক কিছু করবার ফুরসতই পেলেন না। তাঁর এক গোঁফ-ছাঁটা ভাগ্নে ছিল, সেই ব্যাটাই খেলতে লাগল।

জমিদার—গোঁফ-ছাঁটা? দেখেছ নাকি তাকে?

পান্নালাল—ফোটো দেখেছি। ওর কাছে তার একখানা ফোটো আছে।

জমিদার—ওরে ব্বাবা! ফোটো পর্যন্ত রয়েছে—ভাগ্নের সঙ্গে ব্যাপার তা হ'লে বেশ ঘনীভূত হয়েছে বল।

পান্নালাল—খুব। বিয়ে করবে আশ্বাস দিয়ে ছোকরা ওকে নিয়ে কলকাতায় ভেগেছিল।

জমিদার—(চক্ষু বিস্ফারিত করিয়া) বটে! তারপর? (সহসা) ওরে শিবু!

[পর্দার ওপারে খট করিয়া একটা শব্দ হইল। শিবু আসিয়া প্রবেশ করিল]

শিবু—কি বলছেন হুজুর?

জমিদার—শিক-কাবাবের কতদূর?

শিবু—আজ্ঞে দেখি।

[চলিয়া গেল]

জমিদার—জীবনধনের এখনও পর্যন্ত কোন পাত্তা নেই, কেন বুঝতে পারছি না! মেয়েমানুষের গন্ধ পেয়েছে, তার এতক্ষণ আসা উচিত ছিল।

পান্নালাল—জীবনধন জানে নাকি?

জমিদার—জানে বৈকি। তোমার টেলিগ্রাম যখন এল, তখন তো সে আমার কাছে বসে। ঝানু লোক—মালটাল টানতে গেছে বোধ হয়। আসবে ঠিক। সে থাকলে আরও জমত। তারপর কি হ'ল?

[পান্নালাল শূন্য গ্লাসটি নামাইয়া রাখিয়া দিলেন]

পান্নালাল—ভাগ্নে তো ভাগলেন কলকাতায়। সঙ্গে সঙ্গে মামাও ছুটলেন তার পিছু পিছু।

জমিদার—সেই ধার্মিক মামা?

পান্নালাল—হ্যাঁ।

জমিদার—তাঁর ছোটবার হেতুটা?

পান্নালাল—ধার্মিক ব'লেই। তিনি ছুটলেন ভাগ্নেকে ফিরিয়ে আনতে, পাছে সে বিয়ে ক'রে ফেলে।

জমিদার—আই সি। [শূন্য গ্লাসটি রাখিয়া দিলেন]

ভাগ্নে ফিরে এল?

পান্নালাল—নিশ্চয়। অনুতপ্ত চিত্তে অশ্রু বিসর্জন করতে করতে।

জমিদার—(হাসিলেন) হঁ হঁ হঁ হঁ হঁ হঁ তারপর?

পান্নালাল—মেয়েটি রইল কলকাতায়।

জমিদার—কার কাছে?

পান্নালাল—সন্তোষবাবু তাকে এক অবলা-আশ্রমে ভর্তি করে দিয়ে এলেন।

[শিবু আসিয়া প্রবেশ করিল]

শিবু—শিক-কাবাবের এখনও একটু দেরি আছে বাবু, এখনও ঠিক নরম হয়নি।

জমিদার—(ধমকাইয়া) নরম আবার কোন জন্মে হবে? মদ ফুরিয়ে গেলে ও গুষ্টির পিণ্ডি নিয়ে কি করব আমি? সেবারেও ঠিক এই কাণ্ড হ'ল।

[গ্লাসে খানিকটা মদ ঢালিলেন]

নে, সোডা দে। তুমি আর একটু নেবে নাকি পান্নালাল?

পান্নালাল—না থাক, পরে নোব।

[শিবু সোডা ঢালিয়া দিয়া চলিয়া গেল]

জমিদার—(বেশ বড় এক চুমুক পান করিয়া) হ্যাঁ, তারপর? অবলা-আশ্রমে ভর্তি করে দিলে, তারপর?

[পান্নালাল সিগার ধরাইলেন]

পান্নালাল—তারপর আর কি, তপ্ত কটাহ থেকে অগ্নিকুণ্ডে। সেখানে এক ব্যাটা রাঘব-বোয়াল ম্যানেজার ছিল—

[জমিদার মদ 'সিপ' করিতেছিলেন, এ কথা শুনিয়া আনন্দে 'বিষম' খাইলেন]

জমিদার—হে হে হে হে হে—রাঘব-বোয়াল—অ্যাঁ—বেড়ে উপমাটা দিয়েছ তো হে—না চিবিয়েই গেলে, অ্যাঁ?

[পান্নালাল উপমা-প্রয়োগের কৃতিত্বটা স্মিত মুখে উপভোগ করিতে লাগিলেন]

ম্যানেজার রসিক ব্যক্তি বল। চিবিয়ে সব জিনিস যে গলাধঃকরণ করা যায় না, সেটা জানে, অ্যাঁ?

[টলিতে টলিতে অসম্বৃত-বেশবাস মুক্তকচ্ছ জীবনধন প্রবেশ করিলেন। বগলে বোতল, কণ্ঠে গান।]

জীবনধন—(সুরে) গয়লা দিদিলো, তোর ময়লা বড় প্রাণ—

জমিদার—এস, এস, জীবনধন, এস, তোমাকেই খুঁজছিলাম এতক্ষণ। ভয় হচ্ছিল কোথাও আটকেই গেলে বুঝি।

জীবনধন—(জড়িত কণ্ঠে) যৌবন জলতরঙ্গ রোধিবে কে—

জমিদার—ব'স ব'স।

[জীবনধন চতুর্দিকে দৃষ্টিনিক্ষেপ করিয়া জড়িত কণ্ঠে বলিলেন]

জীবনধন—সাড়া পেয়েই কোথায় সরালে বাবা পানু ?

[পান্নালাল মুচকি হাসিলেন]

জমিদার—আরে, ব'স না আগে।

[জীবনধন ধপাস করিয়া একটা চেয়ারে বসিয়া পড়িলেন]

জীবনধন—হুকুম তো তামিল করলাম ইন্দ্রদেব, এইবার অপ্সরাটিকে আসতে বলুন।

জমিদার—হচ্ছে হচ্ছে, সব হচ্ছে। ততক্ষণ এক আধ পেগ চালাও না।

জীবনধন—তথাস্তু।

জমিদার—শিবু তোমার জন্য আলাদা গেলাস রেখে গেছে। এই নাও।

[তৃতীয় গ্লাসে মদ ঢালিলেন]

সোডা চাই ?

জীবনধন—না। স্বয়ং সুজলাং ধান্যেশ্বরী উদরে বিরাজ করছেন—জলের অভাব নেই। নির্জলাই দিন।

[নির্জলাই পান করিয়া মুখবিকৃত করিলেন]

জমিদার—হ্যাঁ, অবলা-আশ্রমে কি হ'ল তারপর। রাঘব-বোয়াল করলে কি ?

পান্নালাল—রাঘব-বোয়াল আকারে ইঙ্গিতে বুঝিয়ে দিল, আমাকে যদি না গিলতে দাও, পাঞ্জাবীর কাছে বিক্রি ক'রে দোব।

জমিদার—(সবিস্ময়ে) পাঞ্জাবীর কাছে ?

জীবনধন—(জড়িত কণ্ঠে বিড় বিড় করিয়া বলিল) পাঞ্জাবীরা গুড ট্যাক্সি-ড্রাইভার—বেপরোয়া হাঁকায় বাবা।

[জমিদার মুচকি হাসিলেন]

জমিদার—পাঞ্জাবী মানে ?

পান্নালাল—অবলা-আশ্রমগুলো থেকে পাঞ্জাবীরা মেয়ে কিনে নিয়ে যায় যে, বিয়ে করবে ব'লে। বেশ দাম দিয়ে কেনে, এক হাজার দেড় হাজার পর্যন্ত দাম দেয়।

জমিদার—তাই নাকি ? জানতাম না তো এ কথা। তুমি জানতে জীবনধন ?

জীবনধন—(হাতজোড় করিয়া) যদি অভয় দেন, একটি কথা নিবেদন করি।

জমিদার—কি ?

জীবনধন—অত্যন্ত বাজে বিষয় নিয়ে আলোচনা হচ্ছে হুজুর। পাঞ্জাবী প্রসঙ্গে আলোচনা চলবে জানলে কোন্ শালা—

জমিদার—আহা, আর এক পেগ চড়াও না, ততক্ষণ আমরা গল্পটা শেষ করি।

[জীবনধনকে আরও খানিকটা নির্জলা হুইস্কি ঢালিয়া দিলেন]

আর কতটা বাকি পান্নালাল?

পান্নালাল—আর বেশী নেই।

জীবনধন—(সানুনয়ে) তাড়াতাড়ি শেষ কর পানু, লক্ষ্মী ধন আমার।

[করিম শিক-কাবাব লইয়া প্রবেশ করিল]

করিম—একটা শিক নিয়ে এলুম, হুজুররা একটু চেখে দেখুন তো। ওরে শিবু, প্লেট নিয়ে আয় তিনখানা।

[শিবু তিনখানি প্লেট দিয়া চলিয়া গেল, করিম তিনটি প্লেটে শিক-কাবাব ভাগ করিয়া দিল]

জীবনধন—(এক কামড় দিয়া) উঃ, বড় গরম যে! উঃ উঃ, এ যে নেশা ছুটিয়ে দিলে বাবা—উঃ।

পান্নালাল—(সামান্য ভাঙ্গিয়া লইয়া চিবাইতে চিবাইতে) এখনও একটু কসর আছে হে।

[জমিদার বাম হাত দিয়া খানিকটা তুলিয়া ডান হাত দিয়া টানিয়া দেখিলেন]

জমিদার—হ্যাঁ, বেশ কসর আছে এখনও। নিয়ে যা, আরও খানিকটা হবে।

[পান্নালাল ও জমিদার প্লেট ঠেলিয়া দিলেন। জীবনধন কিন্তু প্লেট ছাড়িলেন না]

জীবনধন—আমার এই বেশ লাগছে বাবা, বেড়ে ঝাল ঝাল হয়েছে। করিমের মসলার হাতটি একেবারে নিখুঁত।

[চক্ষু বুজিয়া চিবাইতে লাগিলেন। করিম দুইটি প্লেট লইয়া চলিয়া গেল]

জমিদার—(পান্নালালকে) তারপর?

পান্নালাল—গতিক খারাপ দেখে মেয়েটি একদিন অবলা-আশ্রমের পাঁচিল ডিঙিয়ে পালাল।

জমিদার—আবার পালাল? এতো খুব তুখোড় মেয়ে দেখছি হে! পাঁচিল ডিঙিয়ে, অ্যাঁ!

পান্নালাল—পাঁচিল ডিঙিয়ে।

জীবনধন—(সানুনয়ে) সংক্ষেপ কর বাপ পানু।

জমিদার—তারপর?

পান্নালাল—তারপর কলকাতার জনসমুদ্রে ঘোলটান খেতে খেতে শেয়ালদা স্টেশনে গিয়ে হাজির এবং সেখানে—

জমিদার—এবং সেখানে চারিচক্ষের মিলন, আর অমনই আমাকে টেলিগ্রাম—এহ্ এহ্ এহ্ এহ্! বুদ্ধিকে তোমার বলিহারি।

[পান্নালাল স্মিত মুখে সিগার ধরাইতে লাগিলেন]

পান্নালাল—ইতিহাস তো শুনলে, এইবার একটু আলাপ-পরিচয় হোক।

জমিদার—আলাপ-পরিচয় করতে পারি, কিন্তু আর কিছু নয়। আজই সরিয়ে ফেল ওকে। (সহসা) তুমি আমাকে কি ঠাউরেছ বল দিকি?

[পান্নালাল একটু অপ্রতিভ হইয়া পড়িলেন]

পান্নালাল—তুমি একদিন বলেছিলে কিনা যে, যদি ভাল জিনিষ কখনও চোখে পড়ে—

জমিদার—এর নাম ভাল জিনিষ! সাত ঘাটের জল খাওয়া রাবিশ দাগী মাল। ছি ছি ছি ছি!

জীবনধন—আরে বাবা, বারই কর না, দেখি জিনিসটা।

[পর্দার ওপার হইতে চেয়ার সরানোর একটা শব্দ হইল। পর্দাটা একটু নড়িয়া উঠিল]

জমিদার—(চর্বিস্ফীত হাসি হাসিয়া) অধীর আগ্রহে ছটফট করছে ব'লে মনে হচ্ছে যেন!

[সহসা জীবনধনের পানে চাহিলেন]

আরে, ছি ছি জীবনধন, তুমি করছ কি, কাঁচা মাংসগুলো চিবুচ্ছ? রক্ত বেরুচ্ছে যে ঠোঁটের দুপাশ দিয়ে।

জীবনধন—বড় মিঠে লাগছে কিন্তু।

[আর একটা শিক লইয়া করিম পুনরায় প্রবেশ করিল]

করিম—আগেকার শিকটায় পেঁপে দেওয়া হয়নি; এই শিকটা দেখুন তো হুজুর। শিবু, প্লেট আন।

[শিবু প্লেট দিয়া চলিয়া গেল। করিম প্লেটে কাবাব পরিবেশন করিতে লাগিল। জমিদারবাবু তিনটি গ্লাসে আবার খানিকটা করিয়া মদ ঢালিয়া লইলেন]

জমিদার—ওরে শিবু!

শিবু—(নেপথ্য হইতে) আজ্ঞে যাই।

জমিদার—সোডা ভাঙ।

[সোডা ভাঙ্গিয়া জমিদারবাবুর হাতে দিল, তিনি নিজের গ্লাসে ও পান্নালালবাবুর গ্লাসে পরিমাণমত সোডা ঢালিয়া লইলেন]

পান্নালাল—(শিক-কাবাব খাইয়া) এইবার ঠিক হয়েছে।

জমিদার—(একটু চাখিয়া) হুঁ।

জীবনধন—(বেশ খানিকটা মুখে পুরিয়া, নিমীলিত চক্ষে) দীর্ঘজীবী হও বাপ করিম, তুমি ছদ্মবেশী অন্নপূর্ণা বাপ।

[করিম ও শিবু চলিয়া গেল। তিনজনে জমাইয়া শিক-কাবাব সহযোগে মদ্যপান করিতে লাগিলেন]

পান্নালাল—এইবার ডাকব?

জীবনধন—ডাক না বাপ। (সুর করিয়া) সময় বহিয়া যায় নদীর স্রোতের প্রায়—

জমিদার—ডাকতে পার, তবে আমি ওসবের মধ্যে নেই। ওসব দশ-হাত-ঘোরা জিনিস টাচ করি না আমি।

পান্নালাল—(হাসিয়া) আলাপ ক'রে দেখতে ক্ষতি কি?

জীবনধন—কিস্‌সু ক্ষতি নেই।

পান্নালাল—ডাকি তা হ'লে?

জমিদার—ডাক।

পান্নালাল—সৌদামিনী! [পর্দার ওপার হইতে কোনও উত্তর আসিল না]

সৌদামিনী! [কোন উত্তর নাই]

ঘুমিয়ে পড়ল নাকি!

[পান্নালাল উঠিয়া গেলেন ও পর্দা ফাঁক করিয়া চীৎকার করিয়া উঠিলেন]

একি!

জমিদার—কি?

[তিনিও উঠিয়া গেলেন ও অন্য পর্দাটা ফাঁক করিয়া ধরিলেন। দেখা গেল শূন্যে শেমিজ-পরা একটি নারীদেহ বরগা হইতে ঝুলিতেছে। পরণের শাড়ি খুলিয়া সৌদামিনী গলায় দড়ি দিয়াছে। জীবনধনও উঠিয়া দাঁড়াইয়া ছিলেন। রক্তাক্ত মুখে ভীত বিস্মিত নেত্রে খানিকক্ষণ চাহিয়া থাকিয়া বলিয়া উঠিলেন]

জীবনধন—গলায় দড়ি দিয়েছে—অ্যাঁ, সেকি!

□

নতুন তারা

অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত

(১৯০৩-১৯৭৬)

চরিত্র

জয়ন্ত

নির্মল

প্রতিমা

সুধা

[দোতলায় জয়ন্তের শুইবার ঘর। দক্ষিণের দেয়াল ঘেঁসিয়া পিতলের একটা মজবুত খাট—তাহার উপর তকতকে বিছানা সদ্য পাতা হইয়াছে—পাশাপাশি শুইবার মতো স্থান ও বালিশ। খাটের সঙ্গে-ই দুইটি জানালা খোলা আছে—একটু বারান্দা এবং সামনেই পার্ক। বেশ প্রশস্ত ঘর—পূবে ও পশ্চিমে আরো দুইটি করিয়া জানালা—সবগুলিই খোলা। উত্তর দিকে নিচে নামিবার সিঁড়ি। উত্তর-পূব কোণে একটা কাচের আলমারি—বইয়ে ঠাসা; উত্তর-পশ্চিম কোণ হইতে একটু সরিয়া ভিতরের দিকে একটা ড্রেসিং-টেবিল এবং তাহারই সন্নিকটে একটি আলনা। টেবিল প্রসাধন-সামগ্রীতে ও আলনা কাপড়-ট্রাউজার্সে বোঝাই।

দক্ষিণের দেয়ালে একটা ক্লক—উত্তরের দরজা দিয়া ঘরে ঢুকিলেই নজরে পড়ে। ঘড়িতে চারটা প্রায় বাজে।

ছোট একটি লিখিবার টেবিল, দুইটি বেতের মোড়া ও একটি ইজিচেয়ারও আছে এদিকে-ওদিকে ছড়ানো।

যবনিকা উঠা-মাত্রই দেখা গেল প্রতিমা ড্রেসিং-টেবিলের সামনে দাঁড়াইয়া—দুই হাতে দুইটা কাঁচের গ্লাস লইয়া মিছরির পানা নাড়িতেছে—আয়নায় তাহার মুখের ছায়া। দীর্ঘাঙ্গী মেয়ে, বয়স ছাব্বিশ পার হইয়াছে—সীমন্তে সিন্দুর না থকিলে আরো একটু কম বলিয়া মনে হইতে পারিত। পরনে আটপৌরে একখানি ফর্সা শাড়ি—কলাপাতার মতো সবুজ পাড়, গায়ে লংক্লথের সাধাসিধে ব্লাউজ, হাতায় বাহুর উপরে রঙিন সুতার কাজ করা। চুলগুলি ঘোমটার অন্তরাল হইতে কাঁধ বাহিয়া বুকে-পিঠে বিপর্যস্ত হইয়া আছে—খাটো চুল।

একটা কাঁচের গ্লাসে মিছরির জল রাখিয়া একটা বই দিয়া ঢাকিয়া প্রতিমা আয়নার দিকে পিছন করিয়া দাঁড়াইল। এবার মুখ দেখা গিয়াছে, প্রতিমার গায়ের রঙ কালো—মিঠে-মিঠে কালো; মুখখানি লাবণ্যে মাখিয়া আছে। মুখের চেহারা একটু রোগা বলিয়া চক্ষু দুইটিকে বড়ো মনে হয়।

পিঠের উপর ঘোমটাটা ফেলিয়া দিয়া প্রতিমা চুলগুলিকে খোঁপা করিয়া বাঁধিয়া রাখিবার জন্য হাত তুলিয়াছে, এমন সময় সিঁড়িতে জুতার শব্দ শোনা গেল। প্রতিমা একটু সচকিত হইয়া ঘড়ির দিকে তাকাইল। জুতার শব্দ অত্যন্ত লঘু, মন্থর। তবু জুতার শব্দকে পরিচিত ভাবিয়াই প্রতিমা আর পিছন ফিরিল না। সামনের পার্কে একটা ফিরিওয়ালা কতকগুলি ছেলেকে কাঠি-বরফ বিক্রি করিতেছে—তাহাই দেখিতেছে।

পিছনে অর্থাৎ উত্তরের দরজা দিয়া একটি ভদ্রলোক ঘরে ঢুকিল—নাম নির্মল বন্দ্যোপাধ্যায় —বয়স বত্রিশ। বেশভূষা পরিচ্ছন্ন হইলেও দামী নয়—নেহাৎই সাধারণ। চোখে-মুখে সপ্রতিভ ভাব, চাপা ঠোঁট দেখিলে ভদ্রলোকটিকে একটু কঠোর-প্রকৃতি বলিয়া মনে হয়। চুল উসকো-খুসকো, চেহারায় কি-রকম একটা রুক্ষতা আছে। ঘরে ঢুকিয়া পা টিপিয়া-টিপিয়া ধীরে-ধীরে প্রতিমার নিকটবর্তী হইতে লাগিল। প্রতিমার চোখ প্রায় টিপিয়া ধরে, এমনি সময় প্রতিমা পিছন ফিরিয়া নির্মলকে সহসা দেখিয়া ভীষণ চমকাইয়া উঠিয়া দুই হাত দূরে ছিটকাইয়া গেল। প্রতিমা রীতিমতো ভয় পাইয়া গেছে।]

নির্মল—(অর্ধ-প্রসারিত দুই হাত তৎক্ষণাৎ গুটাইয়া নিয়া তাড়াতাড়ি জোড় করিয়া কপালে ঠেকাইয়া) এই যে প্রতিমা, নমস্কার। বেশ ভালো আছো?

প্রতিমা—(খাটের একটি ধার ধরিয়া—ভীত স্বরে) তুমি—আপনি কোত্থেকে এলেন?

নির্মল—(অল্প একটু হাসিয়া) আপাতত মঙ্গলগ্রহ থেকে। চিনতে পাচ্ছ না?

প্রতিমা—কিন্তু একদম সোজা ওপরে চলে আসবার কী মানে?

নির্মল—মানে একটুও কঠিন নয়, একটু ভেবে দেখলে তুমিই বার করতে পারবে। আচ্ছা, নিচে বৈঠকখানায় এসে কার্ড পাঠালে তুমি নেমে গিয়ে দেখা করতে?

প্রতিমা—তা পরে বিবেচনা করা যেত। কিন্তু না বলে-কয়ে কোনো ভদ্রলোকের বাড়ির অন্তঃপুরে ঢুকে পড়া ভদ্রতা নয়।

নির্মল—একটু অভদ্র না হয় হলামই। এতে অত দুঃখিত হবার কী আছে? নিচের ঘরও ঘর, এ-ও ঘর; নিচের ঘরেও লোক ছিল না, বেশ, এ ঘরেও লোক আসতে দিও না। হ্যাঁ, নিশ্চয়, তোমাদের বিছানাতে আমি বসছি না। (একটা বেতের মোড়ায় বসিল)

প্রতিমা—আপনার যদি তাঁর সঙ্গে কোনো দরকার থাকে, তবে নিচে গিয়ে অপেক্ষা করুন। তিনি কোর্ট থেকে এক্ষুণি এসে পড়বেন। (ঘড়ির দিকে চাহিল)

নির্মল—জয়ন্তবাবুর ফী কত?

প্রতিমা—জানি না।

নির্মল—তুমি একটু সুপারিশ করলে আমার একটা মোকদ্দমা উনি বিনা ফীতে করে দিতে পারেন। যদিও জানি শেষ পর্যন্ত আমারই হার হবে। তবুও দেখা যাক। তোমার তাঁকে একটু বলবে?

প্রতিমা—কিসের মোকদ্দমা?

নির্মল—এমনি মানুষের আইন-কানুন যে, তা নিয়ে মোকদ্দমাই চলে না। আজ যদি আমি তোমাকে নিয়ে এই পার্কের পার থেকে ম্যাডাগাসকারের দিকে পাড়ি দিই, আমাকে জেল যেতে হবে; আর জয়ন্তবাবু যে তোমাকে আমার চোখের সামনে দিয়ে দিব্যি তাঁর নিউ-মডেল ফিয়াট গাড়িতে করে পালিয়ে নিয়ে গেলেন, তার জন্যে আদালতে একটা দরখাস্ত পর্যন্ত করা যাবে না। পেনাল কোডে এর জন্যে কোনো সেকশনই নেই। থাকা উচিত, কি বলো প্রতিমা? তোমরা যখন পুরুষের দয়ায় এম.এল.সি. হতে পারবে তখন এ-বিষয়ে পেনাল কোডকে সংশোধন করবার জন্যে বক্তৃতা দিয়ো।

প্রতিমা—(বিরক্ত হইয়া) আপনার যে এত দূর অধঃপতন ঘটেছে তা আমি কোনো দিন ভাবিনি। ভদ্র মহিলাকে কী করে সম্বোধন করতে হয় তা পর্যন্ত আপনি জানেন না—

নির্মল—তোমার যে এতটা পদোন্নতি হবে তা কিন্তু আমি আগেই জানতাম, মিসেস সেন। তবে কি জানো, তোমাকে সাত বছর—সাত বছর আট মাস (আঙুলের কড় গুনিয়া একটু হিসাব করিয়া) প্রতিমা বলে ডেকেছি, নামটা যেন জিভে মেখে আছে। তুমিও তো আমাকে দেখে স্বতঃ-উচ্ছ্বসিত হয়ে প্রথমে 'তুমি' বলে ডেকেছিলে—পরে জিভকে অবিশ্যি শাসন করলে। অভ্যাস প্রতিমা, অভ্যাস।

প্রতিমা—আপনি ককখনো ভদ্রলোক নন।

নির্মল—বোধ হয় মিথ্যা বলনি।

প্রতিমা—কোনো ভদ্রলোক এমনি করে অপরিচিত ভদ্রলোকের বাড়ি ঢুকে পড়ে না। সে হয় চোর, নয় মাতাল।

নির্মল—কথাটা সত্য হত যদি তুমি আমার পরিচিতা না হতে। কত দিনের পরিচয়, মনে করতে পারো? খদ্দর বেচে জেলে গেলাম যে বছর, উনিশ শো কুড়ি সন—এটা সাতাশ! আমাকে তুমি চোর বলো আর মাতালই বলো, সত্যি কথা বলতে কি, তুমি জানো, আমি চোরও নই মাতালও নই।

প্রতিমা—কেন এসেছেন তাহলে?

নির্মল—এমনি!

প্রতিমা—তাই ঘরে ঢুকে আমাকে ছুঁতে হাত বাড়িয়েছিলেন—

নির্মল—তোমাকে নয়, তোমার চোখ দুটি ছোঁব ভেবেছিলাম—আর একটি বার। তোমাকে অমনি করে উদাসীন হয়ে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে ভারি লোভ হয়েছিলো—খুব অন্যায় হয়েছে?

প্রতিমা—(জোরের সঙ্গে) নিশ্চয়। আপনি কতদূর নষ্ট হয়েছেন যে সে সম্বন্ধে আপনার জ্ঞান পর্যন্ত নেই। (কাকুতি করিয়া) আমার স্বামী এক্ষুনি এসে পড়বেন, দয়া করে এখান থেকে চলে যান।

নির্মল—(একটু হাসিয়া) আমার অধঃপতন যে কতদূর হয়েছে তা তুমি জানো না। বেশ তো তোমার স্বামী আসুন। শুনেছি তিনি নাকি খুব অতিথিপরায়ণ।

প্রতিমা—না, না, তা হবে না। আপনি যান।

নির্মল—ওপরে চলে আসবার সময় তো কারুর অনুমতি নেবার দরকার বোধ করিনি—একটু না-হয় থেকেই গেলাম। গ্লাশে ও খাবার জল? খাব? (প্রতিমার অনুমতির প্রতীক্ষা না করিয়াই মিছরির পানা এক চুমুকে নিঃশেষ করিয়া ফেলিল। মুখ মুছিতে-মুছিতে) তুমি যে আমার চেয়ে তোমার স্বামীকে বেশি ভয় করো। তিনি তো চোরও নন, মাতালও নন।

প্রতিমা—আমি আপনার সঙ্গে বাজে কথা কয়ে সময় কাটাতে চাই না—আমার ঢের কাজ আছে। সামনেই দরজা—আপনি বেরিয়ে গেলে খুশি হব।

নির্মল—তোমার সুখের জন্য একদিন জীবন দিতে পারতাম, আজ সামান্য ক'টা সিঁড়ি

ভাঙতে পারছি না বলে ক্ষমা কোরো। হাত বাড়িয়ে পাখা খুলে দাও না, শুধু শুধু এত ঘামছ কেন? জয়ন্তবাবু আসুন, তাঁর কাছে আমার একটা নালিশ আছে।

প্রতিমা—(ভয় পাইয়া) কী?

নির্মল—তিনি এলেই বলা যাবে।

প্রতিমা—না, বলুন।

নির্মল—তিনিই তার বিচার করবেন।

প্রতিমা—না, আপনাকে বলতেই হবে। আমার বিরুদ্ধে কিছু?

নির্মল—নইলে কি আমার বিরুদ্ধে?

প্রতিমা—(একটু উত্তেজিত) না, বলুন আপনি। আপনি আমার ঢের অনিষ্ট করেছেন, আমি আপনার কাছ থেকে আর অপমান সইবো না।

নির্মল—অনিষ্ট! অপমান! বলো কি?

প্রতিমা—আপনি জানেন না, আমার কি সর্বনাশ আপনি করেছেন!

নির্মল—সত্যিই জানি না।

প্রতিমা—আপনার পায়ে পড়ি, যদি আপনার মনুষ্যত্ব বলে কোনো জিনিস থাকে তবে এখান থেকে চলে যান।

নির্মল—মনুষ্যত্ব বলে কোনো পদার্থের আমি অধিকারী কি না জানি না, তবে গায়ে যে আমার ধুলো লেগে নেই তা বলতে পারি।

প্রতিমা—আপনার সর্বাঙ্গে ধুলো, আপনি যে কত মলিন তা-ও আপনি জানেন না।

নির্মল—জানলে আসতাম না—এই বলতে চাও?

প্রতিমা—কিছুই বলতে চাই না। খালি বলছি বেরিয়ে যান আমার বাড়ি থেকে—আমার স্বামীর বাড়ি থেকে।

নির্মল—কথাটা সংশোধন করে ভালোই করেছো।

প্রতিমা—(চঞ্চল হইয়া) গেলেন না আপনি?

নির্মল—তুমি আমাকে ভয় দেখাচ্ছো? যদি-ও তুমি আগের চেয়ে আয়তনে একটু মোটা হয়েছো, বুদ্ধিও তোমার তদনুরূপ মোটা হয়েছে। জানো তো, আমি স্বদেশী যুগের ডাকাত,—যে-বাড়িতে ডাকাতি করতে যেতাম সে-বাড়ির মেয়েদের দিয়ে নারকোল কুরিয়ে মুড়ির মোয়া খেতে-খেতে ডাকাতি করতাম। আমার ভয় বলে কিছু নেই।

প্রতিমা—(ঘৃণার সহিত) লজ্জা বলেও কিছু নেই।

নির্মল—নেই। যে যত বেশি উজ্জ্বল, সে তত বেশি নির্লজ্জ। যেমন ধরো, সূর্য।

[কিছুকালের জন্য বিশ্রী নিস্তব্ধতা—একটা গুমোট ভাব। প্রতিমা জানালা দিয়া মুখ বাড়াইয়া রাস্তাটা দেখিয়া নিয়া আবার আসিয়া দাঁড়াইল।]

নির্মল—তোমার স্বামীর তো শুনেছি খুব ভালো প্র্যাকটিস। বাড়ি ফিরতে সাড়ে

পাঁচটা হবে। ট্র্যামে আসেন? ও, না তোমাদের একখানা ফোর্ড আছে। সে-ফিয়াট-টা বেচে দিলে কেন?

প্রতিমা—(ফের ঘড়ির দিকে চাহিয়া) আপনি আর কতক্ষণ বসবেন?

নির্মল—বাকি জীবনটা নিশ্চয়ই নয়। বেশ নির্জন ঘর, রোদ পড়ে আসছে—আস্তে-আস্তে আকাশ ঠাণ্ডা হয়ে উঠবে। খানিকক্ষণ বসে যেতে ইচ্ছে করছে।

প্রতিমা—বেশ, আপনি বসুন। আমার অনেক কাজ আছে, আমি-ই চললাম।

নির্মল—কি কাজ?

প্রতিমা—ওঁর জন্য এখনো জলখাবার তৈরি করা হয়নি।

নির্মল—বেশ তো, চলো না, আমিও যাচ্ছি তোমার সঙ্গে রান্নাঘরে। দুজনে মিলে রাঁধিগে। একদিন এমনি সময়—তারো কিছু আগে হয়তো—তোমাদের ঝামাপুকুর লেনের বাড়ির রান্নাঘরে বসে আমরা দুজনে স্টোভ জ্বালিয়ে মোহনভোগ তৈরি করছিলাম। সে-ও এমনি ফাল্গুনের শেষাশেষি। তোমার তারিখ মনে আছে?

প্রতিমা—আমি তো আর সি.আই.ডি. পক্ষের সাক্ষী নই যে সব তারিখ-টারিখ মুখস্ত থাকবে।

নির্মল—অর্থাৎ, তোমার স্মরণশক্তি তীক্ষ্ণ নয়। নয় বলেই আমাকে যে 'তুমি' বলে ডাকা উচিত তাও ভুলে গেছ। আমার স্মৃতিশক্তি কিন্তু বেশ টনটনে আছে। তারিখটা হচ্ছে চৌঠা মার্চ, উনিশ শো পঁচিশ। মোহনভোগ করে একটা বাটিতে খাচ্ছিলাম আর পরস্পরকে খাইয়ে দিচ্ছিলাম। তুমি লজ্জায় হাঁ-ই করছিলে না। শেষে একবার তোমার গালে-মুখে খানিকটা মোহনভোগ মেখে দিয়েছিলাম, মনে আছে? তুমি জিভ বাড়িয়ে চেটে-চেটে খেয়েছিলে—

প্রতিমা—(ঠোঁটের প্রান্তে ক্ষীণ হাসিটি লুকাইবার চেষ্টা করিয়া) থাকুন আপনার স্মৃতিশক্তি নিয়ে। আমি চললাম নিচে। (চলিয়া যাইবার জন্য উত্তরের দরজার দিকে একটু অগ্রসর হইল)

নির্মল—তোমাকে এত সামনে দিয়ে যেতে দেখে যে তোমার আঁচল চেপে ধরে বাধা দেবো সে অধিকারও আজ আমার নেই, ইচ্ছাও নেই। বেশ, (মোড়া হইতে উঠিয়া) আমি-ই যাচ্ছি। (সরাসরি ভাবে) কিন্তু যাবার আগে একটা কথা আমাকে জেনে যেতে হবে।

প্রতিমা—(থামিয়া, বিরক্তির সহিত) কী?

নির্মল—তোমার আমি কী অনিষ্ট করেছি—জেনে যেতে চাই।

প্রতিমা—(উত্তেজিত হইয়া) কী অনিষ্ট করেছেন! আপনি আমার নামে সব জায়গায় দুর্নাম রটিয়ে বেড়াচ্ছেন।

নির্মল—(ভুরু কুঁচকাইয়া) দুর্নাম!

প্রতিমা—হ্যাঁ। আপনি সব জায়গায় বলে বেড়াচ্ছেন যে আপনি আমাকে ভালোবাসেন।

নির্মল—(ড্রেসিং টেবিলে হেলান দিয়া দাঁড়াইয়া) ভালোবাসতাম, বলো। সে একটা দুর্নাম হল? আমি যদি শুনি কেউ আমাকে ভালোবাসত বলে কাব্যরচনা করছে বা কলেজ স্কোয়ারে বক্তৃতা দিচ্ছে, আমি তাহলে দুমুঠো ভরে আকাশ এনে দিতাম।

প্রতিমা—কিন্তু এ-কথা প্রচার করে বেড়ানোর দরকার কি? তার মানে, কোনোদিন আমাকে আপনি ভালোবাসতেন না।

নির্মল—তুমিও তো তোমার স্বামী ও তাঁর আত্মীয়স্বজনকে বলে বেড়াচ্ছো যে আমাকে তুমি কোনো দিন ভালোবাসোনি। তার মানে কি এই যে তুমি আমাকে এই সাত বছর ধরে গভীর ভালোবেসে এসেছো?

প্রতিমা—এই ভাবে বলে বেড়ানোতে লাভ?

নির্মল—ক্ষতি?

প্রতিমা—ক্ষতি প্রচণ্ড। সে আপনি বুঝবেন না।

নির্মল—সম্পূর্ণ হয়তো বুঝবো না, কিছু-কিছু বুঝি। কিন্তু লাভও যে কত প্রচণ্ড তা তুমি একেবারেই বুঝবে না।

প্রতিমা—দরকার নেই বুঝে।

নির্মল—কিন্তু আমার বোঝানোতে অনেক লাভ আছে। একটা উপমা দেবার লোভ ছাড়তে পারলাম না। খানিক আগে সূর্যের কথা বলছিলাম, সেই সূর্য। তার আলোকে প্রকাশিত, উন্মুক্ত করে দেবার জন্যেই সূর্যের সার্থকতা। কোথায় অনাবৃষ্টি হল তা দেখবার তার সময় নেই।

প্রতিমা—কিন্তু সূর্য তো অস্ত গেছে। এখন তো অন্ধকার।

নির্মল—হ্যাঁ, জানি এখন অন্ধকার। রাত্রি। কিন্তু রাতেও যে পৃথিবীর আরেক পিঠে সূর্য থাকে, সে-কথা অস্বীকার করা চলে কী করে?

প্রতিমা—খুব চলে, সে-রাত্রির যদি অবসান না থাকে।

নির্মল—উপমাটা সার্থক হয়েছে! তুমি রাত্রি—অনবিচ্ছিন্ন নিবিড় রাত্রি। আমি সূর্য—চির জাগ্রত, প্রখর, প্রচুর। তোমার অন্ধকার দূর করতে আমার অভ্যুদয় হয়েছে। (সোজা হইয়া দাঁড়াইয়া) চিনতে পারবে, প্রতিমা?

প্রতিমা—অসম্ভব।

নির্মল—কি অসম্ভব? বলো, চুপ করে রইলে কেন?

প্রতিমা—আপনার সঙ্গে আমার আর কোনো সম্পর্ক রাখা চলে না।

নির্মল—আমাকে ফের তা'লে বসতে হল। (মোড়ার উপর বসিয়া) তোমার সঙ্গে রীতিমতো তর্ক করতে হবে। কেন চলে না শুনি?

প্রতিমা—আপনি আমার সমস্ত বিশ্বাস হারিয়েছেন, মিথ্যা কথা প্রচার করে আমার স্বামীকে আমার প্রতি সন্দিগ্ধ করে তুলেছেন।

নির্মল—তাই তোমার স্বামী এসে পড়ে আমাকে তোমার সঙ্গে দেখে ফেলেন বলেই

বুঝি এত ঘাবড়াচ্ছিলে! কিন্তু কী মিথ্যা কথা আমি প্রচার করেছি বললে?

প্রতিমা—আমি আপনাকে নাকি বিয়ে করবো বলেই এত দিন ভালোবেসেছি—আমি বিশ্বাসঘাতক।

নির্মল—বেশ তো, না-হয় বিয়ে করবে না বলেই ভালোবেসেছিলে। তাতে কী হয়েছে! দোষটা কোনখানে?

প্রতিমা—যা-নয় তাই বলে-বলে আমাকে লোকের কাছে কলঙ্কিনী করে তুলেছেন।

নির্মল—ভুল। গৌরবময় করে তুলেছি। মিথ্যা যদিও তোমার কিছু থাকে তা তোমার মুকুটমণি হয়েছে। শুনছি, তুমিও লোকের কাছে বলে বেড়াচ্ছো?

প্রতিমা—কী? বা-রে—কবে? কার কাছে?

নির্মল—বলে বেড়াচ্ছো যে, তুমি এত দিন আমাকে প্রেমের প্রশ্রয় দিচ্ছিলে কেননা আমি তোমার কাছে এত দিন কাকার মতো ছিলাম, না, মামার মতো।

প্রতিমা—সত্য কথাই তো বলেছি।

নির্মল—সত্য কথা বলোনি। তোমার জন্য আমার দুঃখ হয়। তুমি আমাকে যত চিঠি লিখেছিলে, ফের আরেকবার পড়ে দেখবে?

প্রতিমা—সে-চিঠিগুলো ছিড়ে ফেলেন নি?

নির্মল—না।

প্রতিমা—(প্রায় কান্নার সুরে) কেন ছিঁড়ে ফেলেন নি! সব্বাইকে দেখাচ্ছেন?

নির্মল—সব্বাইকে নয়। ধরো আজ যদি আমাদের এক সঙ্গে দেখে জয়ন্তবাবু কিছু একটা সন্দেহ করে মোকদ্দমা করেন, তবে সে-চিঠিগুলি আমাকে আদালতে দাখিল করতে হবে।

প্রতিমা—আজকের দিনের কথা ভেবেই সেগুলি জমা করে রেখেছেন নাকি? আমার স্বামীকে অত ছোটলোক ভাববেন না। আপনার মতো পরনিন্দাই তাঁর পেশা নয়।

নির্মল—তুমি দান্তের নাম শুনেছো? বিয়াট্রিস? দান্তে ন বছর বয়সে বিয়াট্রিসকে ভালোবেসেছিলো। সে ভালোবাসার কথা সে গোপন করতে পারেনি।

প্রতিমা—কিন্তু আপনি ভুলে যাচ্ছেন সত্যিকারের বিয়াট্রিসরা আঠারো বছর বয়সেই মরে।

নির্মল—তুমিও যদি আঠারো বছরেই মরতে, তোমার যখন বিয়ে হয়নি—তা'লে আমিও হয়তো দান্তের মতো মহাকবি হতাম, তবে জানো কি, আমি মিথ্যাচারীকে সহজে ক্ষমা করবার মতো দুর্বল হ'তে শিখিনি।

প্রতিমা—তাই অভদ্র হয়ে পৌরুষ দেখাচ্ছেন! এখন আপনি যান—আমার কী সর্বনাশ করেছেন তা তো জানলেন।

নির্মল—তোমার স্বামী তোমাকে সন্দেহ করেন,—আর?

প্রতিমা—করতেন।

নির্মল—কি করে সে-সন্দেহ দূর করলে?

প্রতিমা—সত্য কথা বলে।

নির্মল—তবে আমাকে সত্য কথা বলতে দেবে না কেন? আসুন তোমার স্বামী। তাঁকে আমার সত্য স্পষ্ট করে জানিয়ে দেবো। ভয় পাবে না তো?

প্রতিমা—কিসের ভয়? বলবো, আপনি আমার বন্ধু ছিলেন।

নির্মল—(উল্লাসে) বন্ধু! ছিলাম কেন, আছি, আজো আছি। দেখ্‌লে তো—কত সহজ সমাধান। তোমার সঙ্গে আমার সম্পর্ক নেই বলছিলে না? আছে। বন্ধু আমরা। বোস আমার পাশে—এই মোড়াটায়।

প্রতিমা—আপনি বসুন, আমি কাজ সেরে আসি।

নির্মল—এবার সত্যিই তোমার আঁচল চেপে ধরে বাধা দেবার সাহস হচ্ছে। তোমার কোনো ভয় নেই, তোমার সে-চিঠিগুলি ছিঁড়ে ফেলেছি বৈ কি! পকেটে করে নিয়ে আসিনি।

প্রতিমা—কিই বা ছিল তাতে?

নির্মল—মনে নেই, তবে তোমাকে ভয় পাইয়ে দেবার মতো জিনিস ছিল হয়তো। বেশ, আমরা বন্ধু। সম্পর্কটাকে অনেক সহজ করে আনা গেছে। কিন্তু, এক দিন তুমি আমাকে সত্যিই ভালোবেসেছিলে—সেই উনিশ শো ছাব্বিশের মে মাস—দারুণ বৃষ্টি হচ্ছিলো, আমি আর তুমি নৌকোতে করে নারায়ণগঞ্জ যাচ্ছিলাম—সেদিনের কথা তুমি তোমার স্বামীকে বলো নি কেন? তেমন আরেকটা দিন কি তোমার জীবনে আসবে? ডুববো ঠিক—সেই ভেবে দুজনে হাতে হাত জড়িয়ে বাইরে এসে ঝড় দেখছিলাম, তুমি আমাকে কানে-কানে বলেছিলে : আমাকে অনাস্বাদিত মৃত্যুর মতো সুমধুর একটি চুম্বন দাও। এমন মজা প্রতিমা, তোমার ঠোঁট এসে আমার ঠোঁটে ডুবলো, কিন্তু নৌকো ডুবলো না।

প্রতিমা—সে-সব কথা কেউ বিশ্বাস করবে না।

নির্মল—কথাটাকে বন্ধুর মতো করে বলো : সে সব এখন স্বপ্নের মতো মনে হচ্ছে। তোমার সে বিলেত পালিয়ে যাওয়ার আইডিয়ার কথা মনে আছে?

প্রতিমা—একটু-একটু। শেষকালে ব্যাপারটা কেমন বেরিয়ে পড়লো।

নির্মল—তোমার বোকামির জন্যে।

প্রতিমা—আমার বোকামি কিসে?

নির্মল—তুমি কেন বোকার মতো পাসপোর্টটা পড়ার টেবিলের ওপর ফেলে রেখেছিলে?

প্রতিমা—(অন্তরঙ্গতার সহিত) সত্যি, যদি ধরা না পড়তাম।

নির্মল—তা'লে য়্যাদ্দিনে আমরা ভেনিসে এসে নীড় বেঁধেছি! তা'লে, তুমি আমাকে এমনি করে তাড়িয়ে দিতে পারতে না।

প্রতিমা—(অল্প একটুখানি আগাইয়া আসিয়া) সে-সব দিনগুলি আমার সহজে ঘুম

আসতো না—জেগে-জেগে নীল ফেনিল বিশাল সমুদ্রের স্বপ্ন দেখতাম। সত্যিকারের সমুদ্র যা নয় তার চেয়েও বড়ো করে সে-সমুদ্রের ছবি আঁকতাম। সে-সমুদ্রের চেয়েও আমার হৃদয়কে বড়ো মনে হত। তুমি গেলে না কেন?

নির্মল—একা-একা আর যেতে ইচ্ছে করলো না। (হঠাৎ) তুমি যাবে? চলো, বেরিয়ে পড়ি। অনেক দূরে, যেখানে আমাদের অতীতকালকে ফেলে এসেছি।

প্রতিমা—পেছনে আর চলা যায় না। আমরা ভুলতে পারি বলেই বাড়তে পারি।

নির্মল—হারাতে পারি মানেই ঐশ্বর্যশালী ছিলাম।

প্রতিমা—কিন্তু সে-হারাবার কথাকে খবরের কাগজে বিজ্ঞাপন দিয়ে বেড়ানোর দীনতা আমাকে লজ্জা দেয়।

নির্মল—আমাকে দেয় তৃপ্তি। যে-তুমি সবার কাছে এত সাধারণ, এত অপ্রয়োজনীয়, সেই তোমাকে হারিয়ে যদি আমি ঐশ্বর্যময় হয়ে উঠি, তা'লে তোমার মূল্য তুমিই ঠিক করো।

প্রতিমা—তুমি আই.সি.এস. দিয়েছিলে?

নির্মল—দিয়েছিলাম, ফেল করেছি।

প্রতিমা—কেন ফেল করলে?

নির্মল—তুমি কেন আমাকে বিয়ে করলে না?

প্রতিমা—(হাসিয়া) তাহলে পাশ করতে পারতে?

নির্মল—(হাসিয়া) হয়তো পারতাম না। কিন্তু পাশ করলে তোমাকে বিয়ে করতে পাবো জানলে নিশ্চয়ই পাশ করতাম।

প্রতিমা—বিয়ে করতে পেলে না বলে এখন কী করছো?

নির্মল—চাকরি।

প্রতিমা—কোথায়?

নির্মল—কাশীতে—

প্রতিমা—কতো মাইনে পাও?

নির্মল—জিগগেস না করলেই পারতে। পঁয়ষট্টি টাকা। আশা করি, এর পর বিয়ে করেছি কি না জিগগেস করবে না।

প্রতিমা—গেল-পুজোয় কাশীতে গিয়েছিলাম বেড়াতে। ব্রিজের ওপর থেকে গঙ্গার ঘাটগুলিকে কী চমৎকার দেখায় বলো তো। তোমার সঙ্গে দেখা হয়ে গেলে ভারি চমৎকার হত।

নির্মল—চিনতে পারতে?

প্রতিমা—না, তা কি আর পারতাম? (অন্য মোড়াটায় বসিয়া) নতুন যে জায়গায়ই গেছি, ভেবেছি দূর থেকে তোমার সঙ্গে দেখা হয়ে যাবে।

নির্মল—দূর থেকে!

প্রতিমা—কাছে এলেই ভয় করবে, তুমি যে ডাকাত!

নির্মল—তোমার মতো নয়। দেখা হলে কী হত?

প্রতিমা—একটুখানি মনখারাপ হত। মাঝে-মাঝে মনখারাপ হলে বেশ ভালো লাগে!

নির্মল—কাশীতে তুমি একলা গেছলে? মানে—

প্রতিমা—হ্যাঁ, একলাই গিয়েছিলাম। কাশীতে তুমি যদি কাছে আসতে তাহলে ভয় পেতাম না। নৌকো করে গঙ্গায় বেড়াতে যেতাম।

নির্মল—কিন্তু ঝড় উঠতো না।

প্রতিমা—না-ই বা উঠতো! এমন ঠাণ্ডা নদী তুমি দেখেছ—এমন মিষ্টি জল! (হাঁটুর উপর দুই কনুইয়ের ভর রাখিয়া একটু নিচু হইয়া) আমি জলে পা ডুবিয়ে বসে তোমার সঙ্গে গল্প করতাম। নদীর জলে পা ডুবিয়ে বসে থাকতে খুব ভালো লাগে, না?

নির্মল—আমার ঝড় ভালো লাগে।

প্রতিমা—আচ্ছা, নারায়ণগঞ্জের সেই ঝড়ে যদি আমাদের নৌকো ডুবে যেত?

নির্মল—ডুবে যেত।

প্রতিমা—মরে যেতাম তো নিশ্চয়ই। আচ্ছা, মরলে কী হয়?

নির্মল—তুমি-ই বলো।

প্রতিমা—ধরো, দুজনে একটা নক্ষত্রলোকে বেড়াতে যেতাম। মঙ্গলগ্রহে নয়—এমন একটা তারা যা পৃথিবী থেকে দেখা যায় না।

নির্মল—সেখানে গিয়ে দুজনে আবার স্টোভ জ্বালিয়ে মোহনভোগ রাঁধতাম।

প্রতিমা—সেখানে হয়তো খিদে পেত না। পৃথিবীর সব নিয়মই সেখানে খাটবে এমন কি কথা আছে?

নির্মল—আমরা যাচ্ছি তো পৃথিবী থেকে।

প্রতিমা—গেলামই বা। সেখানে যে আমরা নতুন পৃথিবী সৃষ্টি করবো! তোমার মা কেমন আছেন?

নির্মল—গেল-বছর পুজোর সময় মরা গেছেন।

প্রতিমা—(আহত হইয়া) মারা গেছেন? তাঁর অসুখের কথা আমাকে জানাও নি যে!

নির্মল—জানালে কী হত?

প্রতিমা—তাঁকে আরেকবার দেখতাম, সেবা করতাম। আমার কথা তাঁর মনে ছিল?

নির্মল—(সহসা, প্রতিমাকে ধীরে একটু স্পর্শ করিয়া) চোখ বোজ!

প্রতিমা—কেন?

নিনর্মল—একবার দুজনে চোখ বুজে ফের চোখ মেললেই হয়তো দেখতে পাব এই ঘরটা সেই নতুন তারা হয়ে গেছে।

প্রতিমা—আচ্ছা, উনি যদি এখন এসে পড়েন?

নির্মল—তখন আবার এই তারা তোমার স্বামীর শোবার ঘর হয়ে যাবে।

প্রতিমা—কি বলবো তাঁকে?

নির্মল—ভালোবাসার সময় দুজনই যথেষ্ট, কিন্তু বিয়ের পর পরিচয়টা আড়াল করবার জন্যে আরেকজনের দরকার আছে। বলবে, ইনি আমার সেই বন্ধু!

প্রতিমা—তাঁর সঙ্গে কিন্তু ডাকাতের মতো ব্যবহার কোরো না। মক্কেলদের মতো বেশ সমীহ করে কথা কোয়ো। আমার জন্যে অন্তত।

নির্মল—তিনি ভদ্রলোক হলেই বাঁচি।

প্রতিমা—তুমি তো এখন চলে গেলেও পারো।

নির্মল—বা, তোমার স্বামীর সঙ্গে দেখা করে যাবো না?

প্রতিমা—বৈঠকখানাতে গিয়ে ততক্ষণ বোস না, আমি চা পাঠিয়ে দিচ্ছি।

নির্মল—(কঠোর হইয়া) চা আমি খাই না।

প্রতিমা—তোমার চেহারা খুব কাহিল হয়ে গেছে। বিয়ে করলেই তো পারো।

নির্মল—বিয়ে করলেই চেহারা ভালো হয় না কি?

প্রতিমা—আচ্ছা, তখন যে বড়ো শাসিয়েছিলে, কী নালিশ করতে তাঁর কাছে?

নির্মল—বলতাম, প্রতিমা ভারি দুষ্টু হয়েছে।

প্রতিমা—সত্যিই, তোমার বিয়ে করা উচিত। ভুলে যাবার পক্ষে বিয়ে-করার মতো টনিক আর নেই।

নির্মল—নিজেকে দেখে জেনেরালাইজ কোরো না।

প্রতিমা—না, আমিই তো একমাত্র সে-নিয়মের ব্যতিক্রম। তোমাকে আজো ভুলিনি।

নির্মল—গোড়াতেই তো তার চমৎকার পরিচয় দিয়েছ।

প্রতিমা—সত্যিই, আজো আমি সেই নতুন তারার স্বপ্ন দেখি—তারাটা শাদা বরফে ঢাকা, গাছ নেই, পাথর নেই, বাতাস নেই। নিরেট নীরব তারা।

নির্মল—(প্রতিমার একখানি হাত ধরিয়া) যাবে সেখানে? (এমন সময় সিঁড়িতে চটিজুতার শব্দ স্পষ্টতর হইতে লাগিল)

প্রতিমা—(নির্মলের হাত ছাড়িয়া উঠিয়া পড়িয়া) উনি আসছেন—কি হবে?

নির্মল—(তেমনি বসিয়া থাকিয়া) আসতে দাও। কী আবার হবে?

[প্রতিমা দরজার সামনে আসিয়া দাঁড়াইল। জুতার শব্দ ঘরের খুব কাছে আসিতেই নির্মল চট করিয়া উঠিয়া পড়িয়া বইয়ের আলমারির পিছনে গিয়া লুকাইল। ক্ষণকালের জন্য পিছন ফিরিয়া এই ব্যাপারটা দেখিয়া নিমেষে প্রতিমার মুখ নিদারুণ ভয়ে পাংশু হইয়া গেল।

জয়ন্তর প্রবেশ। বয়স বত্রিশ হইবে, মাথার সামনে অল্প একটু টাক—গোঁফ আছে। সাটিনের ট্রাউজার্স, তার উপর আলপাকার চাপকান, গলায় কোণমোড়া কলার—কড়া করিয়া ইস্ত্রি-করা। নিচে 'শু' ছাড়িয়া মোজা-শুদ্ধই চটিজুতা পরিয়া আসিয়াছে।

জয়ন্ত—(পকেট হইতে একটা পোস্টকার্ড বাহির করিয়া) মহা মুস্কিলে পড়া গেছে। সুধার চিঠি এসেছে দেখ।

প্রতিমা—কার? সুধা-ঠাকুরঝির?

জয়ন্ত—হ্যাঁ। ঠিকানা ভুল লিখেছে, তাই ঠিক সময় পৌঁছয়নি। কোর্টে বিকেলবেলা পেলাম।

প্রতিমা—(উদ্বিগ্ন স্বরে) কী লিখেছে?

জয়ন্ত—(চিঠিটা টেবিলের উপর রাখিয়া চাপকানের বোতাম খুলিতে খুলিতে) আজ সকালবেলা ঢাকা-মেইলে কলকাতা পৌঁছেছে নাকি। স্টেশনে থাকতে লিখেছিলো। দেখ তো কী কাণ্ড—চিঠির ঠিকানা লিখতে ভুল, পাঁচটা পোস্টাপিস ঘুরে হাতে এলো।

প্রতিমা—কার সঙ্গে আসছে লেখেনি?

জয়ন্ত—(চিঠিটা তুলিয়া নিয়া) এই যে আমরা রওনা হব। বোধ হয় স্বামীর সঙ্গে আসছে।

প্রতিমা—তা হলে আর ভাবনা কি?

জয়ন্ত—ওর স্বামীর হয়তো কলকাতায় তেমন আত্মীয়স্বজন নেই, তাই আমাদের এখানেই উঠতে চেয়েছিলো। খুব অন্যায় হয়ে গেল কিন্তু।

প্রতিমা—তাতে তোমার হাত কি! চিঠি ঠিক সময় না পেলে কী করতে পারো?

জয়ন্ত—তবু জানো তো ওর বাবা—আমার ছোট মামাবাবু আমাকে মানুষ করেছেন। ছোট মামাবাবু এলাহাবাদে ব্যাঙ্কে চাকরি করতেন—সেখেনেই 'ল' পড়া ও পাশ করা। সেই ছোট মামাবাবু হঠাৎ একদিন সন্ন্যাস হয়ে মারা গেলেন। রাত দশটায় খেয়ে-দেয়ে শুয়েছেন, একটুও টুঁ-টাঁ না করে ধীরে ধীরে নেমে গেলেন। সুধা আমাদের কত আদরের বোন—কত দিন দেখিনি।

প্রতিমা—বিয়ের সময় তো যেতে পারনি।

জয়ন্ত—(চাপকানটা খুলিয়া ফেলিয়া—নিচে টুইলের শার্ট) কী করেই বা যাব? দরিয়াপুরের মোকদ্দমাটা পেলাম—দিনে বত্রিশ টাকা ফী। আমার মতো নতুন উকিলের পক্ষে একটি দিনও কামাই করা চলতো না।

প্রতিমা—তারপর তো একদিনও আদরের বোনটির তত্ত্ব-তালাস করোনি।

জয়ন্ত—সে সব তো তোমার দেখবার কথা। সে সব বিষয়ে কি তোমার হুঁস আছে? দুখানা বাজে নভেল পড়তে পেলেই খুসি! এখন বলো তো আমি ওদের কোথায় খুঁজি!

প্রতিমা—ওরা নিজেরাই খুঁজে আসবেখন।

জয়ন্ত—(কলারের বোতাম খুলিতে খুলিতে) ঠিকানাই জানে না—কত হয়তো ঘুরতে হবে।

প্রতিমা—ওর স্বামী নিশ্চয়ই আর গণ্ডমূর্খ নয়—এমন একটা বিখ্যাত উকিলের বাসা চিনতে পারবে না। 'হরিশ চ্যাটার্জি'তে গেলেই 'হরিশ মুখার্জী'র পাত্তা মিলবে।

জয়ন্ত—কিম্বা ওর স্বামী গোঁয়ারগোবিন্দও হতে পারে। হয়তো স্টেশনে আমাকে না দেখে রাগ করে কোনো হোটেলে গিয়ে উঠেছে।

প্রতিমা—সুধা-ঠাকুরঝির বিয়েটা কিন্তু খুব তাড়াতাড়ি হয়ে গেল। নিজেই স্বয়ম্বরা হয়েছিলো বুঝি।

জয়ন্ত—শুনতে পাই তো। স্বামী নাকি বাউণ্ডুলে।

প্রতিমা—প্রেম অন্ধ।

জয়ন্ত—চোখের জল ফেলে-ফেলে বুঝি?

প্রতিমা—না, অসহ্য দীপ্তিতে। (থামিয়া) তুমি জামা-কাপড় ছেড়ে নিয়ে এসো, খাবার এখনও তৈরি হয়নি।

জয়ন্ত—(হঠাৎ রাগ করিয়া) কেন তৈরি হয়নি? কী করছিলে এতক্ষণ? একি, মিছরির সরবৎও করনি।

প্রতিমা—একটা বই পড়ছিলাম—

জয়ন্ত—তার জন্যে তুমি আমার খাবার তৈরি করে রাখবে না! আমার কী ভীষণ খিদে পেয়েছে, জানো? দশ হাত কাপড় পরতে জানলেও কাছা দিতে তো আর শেখনি। জানো পা ছড়িয়ে বসে গিলতে! মাথার ঘাম তো আর পায়ে ফেলতে হয় না।

প্রতিমা—অমন চেঁচিয়ো না, দুমিনিটে হয়ে যাবে।

জয়ন্ত—দুমিনিটের খাবার আমি খাই না।

প্রতিমা—বেশ, দুঘণ্টাই না হয় লাগাবো।

জয়ন্ত—আমার এমন খিদে পেয়েছে যে তোমার ঠাট্টা ভালো লাগছে না। তুমি কেন আমার কাজে এত গাফিলি করো? কবিতা লিখছিলে বুঝি?

প্রতিমা—কবিতা লিখতে বসলে তোমার এই গোঁফ জোড়া মনে করে আমার এত হাসি পায়—লেখা আর হয় না। তুমি বোস, আমি নিয়ে আসছি।

[চলিয়া যাইতে পা বাড়াইল। সহসা আলমারির পিছন হইতে নির্মলের আবির্ভাব।]

নির্মল—যেয়ো না, প্রতিমা। (জয়ন্ত বিস্ময়-বিস্ফারিত নেত্রে তাকাইয়া রহিল। প্রতিমার ভয় ও অস্থিরতা) সত্য কথা বলতে ভয় পাচ্ছিলে কেন? ঠিকই তো, কবিতা রচনা করছিলে।

জয়ন্ত—(কঠোর স্বরে প্রতিমার প্রতি) কে এ?

নির্মল—বলো না, আমার বন্ধু, যে-বন্ধু প্রেমের নগ্নতার একটি অন্তরাল রচনা করে—আমার নতুন তারার বন্ধু।

জয়ন্ত—(আরও কঠিন স্বরে) লুকিয়ে এ-সব কী কাণ্ড হচ্ছিলো?

নির্মল—আমাকে মাপ করো প্রতিমা, বেশিক্ষণ লুকিয়ে থাকা গেল না, আলমারির পেছনে ডজন-খানেক আরশুলা জামার ভেতরে ঢুকে ভারি ব্যতিব্যস্ত করে

তুলেছিলো। (জয়ন্তের প্রতি) চায়নায় আরশুলা চালান দিতে পারেন। সে-ব্যবসায় লাভ হতে পারে।

জয়ন্ত—(নির্মলের প্রতি) কে আপনি? কেন এখানে এসেছেন?

নির্মল—ঠিক জেরার মতো হচ্ছে না, জয়ন্তবাবু। এক 'হ্যাঁ' কিম্বা 'না' বলে পার পাওয়া যাবে না।

জয়ন্ত—(প্রতিমার প্রতি) উত্তর দাও, কে এ?

প্রতিমা—আমার ছেলেবেলাকার বন্ধু—বহু দিন পরে হঠাৎ এসে পড়েছিলেন। দুজনে বসে গল্প করছিলাম, তুমি ঘরে আসতে না আসতেই হঠাৎ উনি আলমারির পেছনে গিয়ে লুকোলেন।

জয়ন্ত—কেন লুকোলেন?

নির্মল—শুনেছিলাম আপনি নাকি ভীষণ পালোয়ান। তাই ভয় পেয়ে লুকিয়েছিলাম। রাইট অফ প্রাইভেট ডিফেন্স্।

জয়ন্ত—তাই এতক্ষণ আমার খাবার তৈরি হয়নি?

নির্মল—আমাকে মাপ করবেন জয়ন্তবাবু, এত তেষ্টা পেয়েছিলো যে আপনার মিছরির সরবৎটুকুও খেয়ে ফেলেছি।

জয়ন্ত—(প্রতিমার প্রতি) এই নষ্টামি কতদিন থেকে চলছে?

প্রতিমা—(প্রায় কাঁদিয়া ফেলিয়া) আমার কি দোষ! যদি একজন অভদ্রের মতো ভদ্রলোকের বাড়ির ভিতর ঢুকে পড়ে আমি তাকে ঠেকাই কি করে?

নির্মল—তা ছাড়া আমি স্বদেশী যুগে ডাকাতি করতাম।

প্রতিমা—আমার সঙ্গে ছেলেবেলায় আলাপ ছিল। একেবারে তাড়িয়েও দিতে পারি না—তাড়িয়ে দিলেও শুনতো না—লোকটা এমন পিশাচ।

নির্মল—'ছেলেবেলা' ডিফাইন করো।

জয়ন্ত—(নির্মলকে ধমক দিয়া) চুপ করো।

প্রতিমা—(আগের কথার পারম্পর্য রাখিয়া) তোমাকে দেখে যে আলমারির পেছনে গিয়ে লুকোবে—আর মুহূর্তে সমস্ত ব্যাপারটা যে বিসদৃশ ও বিশ্রী করে দেবে তা আমি স্বপ্নেও ভাবিনি।

জয়ন্ত—আমি ঘরে ঢোকা মাত্রই আলমারির পেছনে যে লোক আছে তা বলোনি কেন?

নির্মল—তার জন্যে আপনার স্ত্রীর কিছুমাত্র দোষ নেই,—দোষ আরশুলার। উনি ভেবেছিলেন যে আপনি হাতমুখ ধুতে নিচে নেমে গেলেই আমি তিরোধান করবো। কিন্তু অভদ্র আরশুলাগুলোর জন্যে সব জানাজানি হয়ে গেল।

জয়ন্ত—(প্রতিমার প্রতি) তবে যে বলছিলে পড়ছিলে?

নির্মল—স্বামীর কাছে অমন দুচারটে মিথ্যে কথা স্ত্রীরা বলেই থাকেন।

জয়ন্ত—আমার সঙ্গে কত দিন ধরে এই মিথ্যা ব্যবহার করছ?

নির্মল—বন্ধুর অসাক্ষাতে স্ত্রীকে বকবেন।

জয়ন্ত—উত্তর দাও।

প্রতিমা—তোমার সঙ্গে আমি কোনো মিথ্যা ব্যবহার করিনি। আমাকে অসহায় পেয়ে ঐ লোকটা আমাকে অপমানিত করছে। আমি তোমারই কাছে বিচার প্রার্থনা করছি।

জয়ন্ত—(নির্মলের প্রতি) আপনি ভদ্রলোক?

নির্মল—হ্যাঁ, এবার আমাকে বকুন। স্ত্রীকে বকে কোনো পৌরুষ নেই। ভদ্রলোক? যদি বলি, ভদ্রলোক, আপনি বিশ্বাস করবেন?

জয়ন্ত—ককখনো না। ভদ্রলোকের বাড়ির ভিতরে ঢুকে এমন ইতরামো কদিন থেকে করছেন?

নির্মল—আজ।

জয়ন্ত—জানেন আপনাকে আমি পুলিশ দিতে পারি?

প্রতিমা—তাই দাও—এই পাষণ্ডের জেল খাটাই উচিত। পশু!

নির্মল— পুলিশে দিতে পারেন, তবে আপনি বিচক্ষণ উকিল বলে দেবেন না।

জয়ন্ত—বিচক্ষণ উকিল! তুমি কী ভাবছ? চাকরবাকর ডাকিয়ে তোমাকে ছাতু করে দিতে পারি, জানো?

নির্মল—তা-ও জানি, কিন্তু তা-ও আপনি করবেন না।

জয়ন্ত—তা-আমি করবো না! (প্রতিমার প্রতি) ডাকো তো রঘুয়াকে—

প্রতিমা—রঘুয়া! রঘুয়া!

নির্মল—(মোড়ার উপর বসিয়া জামার ধুলা ঝাড়িতে ঝাড়িতে) আগে আপনার রঘুয়াকে দেখি, পরে পালাবো কিনা বিবেচনা করা যাবে।

জয়ন্ত—বসলে যে! (মোড়াতে লাথি মারিয়া) আমার বাড়ি থেকে বেরিয়ে যাও।

নির্মল—রঘুয়া আসুক।

জয়ন্ত—না, রঘুয়া আসবে না।

নির্মল—তবুও আমাকে একটু বসতে হবে। (প্রতিমার প্রতি) তুমি যাও না নিচে, খাবার তৈরি করোগে, আমার জন্যেও কোরো—আমারো কম খিদে পায়নি! সুইচটা টেনে দাও, বেশ অন্ধকার হয়ে এসেছে। এখুনি তারা ফুটবে! নিচে যদি রঘুয়াকে পাও, পাঠিয়ে দিয়ো।

জয়ন্ত—ছোটলোক কোথাকার, যাবে কি না বলো!

নির্মল—বললাম তো, আমাকে এখানে একটু বসে থাকতে হবে। একজনের প্রতীক্ষা করছি!

জয়ন্ত—কার?

নির্মল—(একটু হাসিয়া) রঘুয়ার। রঘুয়াকে ডেকে আনো না!

জয়ন্ত—রঘুয়াকে কেন?

নির্মল—আমার মাথা ফাটাতে নয়। ওকে এক টুকরো কাগজে একটা ঠিকানা লিখে পাঠালে বাড়ি চিনে যেতে পারবে?

প্রতিমা—আপনি ডাকাতি করতে এসেছেন নাকি? চিঠি পাঠিয়ে বন্ধুদের ডেকে আনতে চান? (স্বামীর প্রতি) তুমি লালবাজারে এক্ষুনি ফোন করে দাও।

নির্মল—(প্রতিমার কথার সুর অনুকরণ করে) দাও ফোন করে। তোমার লালবাজারই আসুন আর শ্যামবাজারই আসুন, আমি উঠছিনে। আগুনে জাহাজ পুড়ে গেলেও আমি ক্যাসাবিয়ানকার মতো ঠায় বসে থাকবো। প্রতীক্ষা কাকে বলে, শিখে রাখো প্রতিমা।

জয়ন্ত—(আগাইয়া আসিয়া) আপনার নাম?

নির্মল—নাম বললেও চিনতে পারবেন না। আইন নামক প্রেয়সীটি শুনেছি অত্যন্ত হিংসাপরায়ণা—ভক্তকে আর কোথাও দৃষ্টিপাত করতে দেয় না। আমার নাম তোমার মনে আছে, প্রতিমা?

জয়ন্ত—আমার স্ত্রীকে নাম ধরে সম্বোধন করছেন যে?

প্রতিমা—আস্পর্ধা!

নির্মল—প্রতিমা নামটি শুনতে আপনার ভালো লাগে না? আপনি তো আশা করি ব্রাহ্ম নন। আমারই মতো প্রতিমা-পুজো করেন।

জয়ন্ত—তোমার মতলব কি, স্পষ্ট করে বলো।

প্রতিমা—আমাকে অপমানিত করতে, তোমার কাছে আমাকে কলুষিত করে দেখাতে।

জয়ন্ত—বলো, কেন এসেছ?

নির্মল—সে-ই বুঝে বিহিত করবেন? আমার মতলব একেবারেই ঘোরালো নয়—মিণ্ট থেকে বেরিয়ে আসা নতুন টাকার মতোই ঝকঝকে। কেন এসেছি? কারণটা তুমিই সত্যি করে বলো না, মিসেস সেন।

প্রতিমা—আপনি একটা ঘৃণ্য কীটের চেয়েও অধম—তাই তার স্বামীর সামনে নারীকে অপমান করতে আপনার কুণ্ঠা আসে না। ভাবছেন এমনি ছল করে খুব বাহাদুরি হচ্ছে! (স্বামীর প্রতি) তুমি একে গলাধাক্কা দিয়ে বার করে দাও। যা হবার তা হবে।

নির্মল—চটলে তোমাকে আর আগের মতো সুন্দর দেখায় না।

জয়ন্ত—বলবে না?

নির্মল—চটবেন না, বলছি। আলোটা জ্বালুন।

[জয়ন্ত সুইচ টিপিয়া আলোটা জ্বালাইয়া দিল]

নির্মল—কেন এসেছি? প্রতিমার সঙ্গে আলাপ করতে—কত দিন ওর সঙ্গে দেখা হয়নি।

জয়ন্ত—(কি একটা আবিষ্কার করিয়া) ও! আপনি এঁকে বুঝি ভালোবাসতেন?

নির্মল—ঠিক মনে নেই। তবে যাঁকে ভালোবাসতাম তিনি ইনি নন।

জয়ন্ত—(বিরক্ত হইয়া) তবে কিনি?

নির্মল—(হাসিয়া) মনে নেই।

প্রতিমা—আলাপ তো শেষ হয়েছে, এখন আপনি যান।

নির্মল—যাচ্ছি; আর একটু। (যেন আপন মনে) বড্ড দেরি করছে। (সহসা) আপনি ল অফ আইডেন্টিটিতে বিশ্বাস করেন? তাতে বলে : সক্রেটিস সব সময়েই সক্রেটিস : এক তার অর্থ। আমি বিশ্বাস করি না। আজকের প্রতিমা আর সাত বছর আগের প্রতিমা সমান নয়।

প্রতিমা—নিশ্চয়ই নয়।

জয়ন্ত—আলমারির পাশে লুকিয়ে ছিলেন কেন?

প্রতিমা—চোরের মতো?

নির্মল—হ্যাঁ, বীরের মতো নয় বটে। লুকিয়েছিলাম কেন ঠিক ব্যাখ্যা করতে পারবো না। কেন জানি মাথায় এলো।

প্রতিমা—এই মাথা চাকার তলায় পিষে ফেলা উচিত।

নির্মল—তার জন্যে তোমার মাথা-ব্যথা না করলেও চলবে। মোট কথা—

জয়ন্ত—(দৃঢ়স্বরে) মোট কথা?

নির্মল—মতলব ছিল প্রতিমাকে ভয় পাইয়ে দেব।

জয়ন্ত—প্রতিমার প্রতি এই করুণা!

নির্মল—করুণা নয়, নির্দয়তা তা আমি বুঝি। তার কারণ ছিল।

জয়ন্ত—কি কারণ?

নির্মল—যে-আমাকে ও দীর্ঘ সাত বছর ধরে ভালোবেসে এসেছে তাকে আপনার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিতে ওর ভয় কেন? কেন ওর মুখ অপরাধীর মুখের মতো চুন হয়ে এসেছিলো?

প্রতিমা—ভয়? তোমাকে ভয়?

নির্মল—আমাকে নয়, তোমার স্বামীকে।

প্রতিমা—কেন আমার স্বামীকে ভয় করবো?

নির্মল—হ্যাঁ, কেন ভয় করবে? একদিন যাকে ভালো লেগেছিলো তাকে চিরকালই ভালোবাসতে হবে এর যেমন মানে নেই, তেমনি একদিন যে ভালো লেগেছিলো তা স্বীকার করতে লজ্জিত হবারো কোনো মানে নেই।

প্রতিমা—তোমাকে আমি কোনোদিন ভালোবাসিনি।

নির্মল—(পকেট হাতড়াইয়া) একটা চিঠি বোধহয় সঙ্গে আছে। দেখি।

প্রতিমা—(ব্যাকুল কণ্ঠে স্বামীর প্রতি) তুমি ওর কথা একটিও বিশ্বাস কোরো না। ও

জালিয়াত, ডাকাত—একবার জেল খেটেছিলো ছমাস; ও সব করতে পারে।

নির্মল—(পকেট খুঁজিয়া) না, নেই। ব্যস্ত হয়ো না।

প্রতিমা—(স্বস্তির নিশ্বাস ফেলিয়া) যা হয়নি, তা কখনো থাকে?

নির্মল—যা থাকে না, তা কখনো হয়?

জয়ন্ত—কি বলতে চান আপনি?

নির্মল—হ্যাঁ, যা বলতে চাই। বলতে চাই যে অতীত কালে আমি ওর—

জয়ন্ত—(বাধা দিয়া) অতীত মৃত।

নির্মল—মৃত বলেই তো বেশি সুন্দর, বিস্মৃত বলেই তো তা বেশি রমণীয়। নয়?

প্রতিমা—যার প্রাণ নেই তার সৌন্দর্য কোথায়?

নির্মল—সৌন্দর্য না থাক, সৌরভ আছে। যে বন্ধু ছেড়ে যায় তার বন্ধুতারই দাম বেশি।

জয়ন্ত—(মীমাংসা করিবার উদ্দেশ্যে) থাক তার দাম। আপনি এখন দয়া করে এ-স্থান ত্যাগ করুন। আমার মাথা ঘুরছে, কোর্ট থেকে ভারি শ্রান্ত হয়ে এসেছি, এখনো মুখ-হাত ধুইনি। কিছু খেতে হবে।

নির্মল—(প্রতিমার দিকে চাহিয়া) এ-যুগের পতিভক্তির নমুনা দেখুন। তুমি যাও না নিচে, স্বামীর জন্য জলখাবার তৈরি করো গে।

জয়ন্ত—আপনি যান।

নির্মল—বেশ তো, আপনি জামা কাপড় ছাড়ুন, মুখ হাত ধোন। প্রতিমা যাচ্ছে খাবার করতে। যদি হয়, আমাকে এক পেয়ালা চা দিও।

জয়ন্ত—(বিরক্ত হইয়া) আমরা চা খাই না।

নির্মল—তবে আরেক গ্লাশ মিছরির সরবৎ দাও।

প্রতিমা—ঘরে মিছরি নেই।

জয়ন্ত—আপনি যদি এখন না যান, তবে সত্যিই আমি পুলিশ-স্টেশনে ফোন করবো।

নির্মল—(যেন আপন মনে) সত্যিই, এত দেরি করছে কেন? (জয়ন্তের প্রতি) রঘুয়াকে একটু ডেকে দিন না; এই গলির মোড়ের হলদে বাড়িতে একটা চিঠি দিয়ে আসবে।

প্রতিমা—আপনার চোখ নেই, না পা নেই, যে আপনি সেই হলদে বাড়িতে যেতে পাচ্ছেন না?

নির্মল—সময় নেই।

[সিঁড়িতে জুতার শব্দ করিতে করিতে ছুটিয়া সুধার প্রবেশ। সুধা—বয়েস সতেরো আঠারো হইবে—পাতলা ছিপছিপে—ঝর্ণার মতো চঞ্চল। পরনে খুব ফিকে বেগুনী রঙের একখানা বেনারসী শাড়ি, বর্ষাকালে সূর্য উঠিবার আগে মেঘলা আকাশের মতো সর্বাঙ্গ হইতে আনন্দ বিচ্ছুরিত হইতেছে।]

সুধা—(দুয়ারে প্রতিমাকে প্রথম দেখিয়া) এই যে বৌদি! চিনতে পারছো?

জয়ন্ত—আরে, তুই। একা নাকি? কখন এলি?

সুধা—সকালে এসেছি, স্টেশনে ছিলে না কেন?

জয়ন্ত—কি ভুল ঠিকানা লিখেছিস! কোথায় উঠেছিস?

সুধা—(হাসিয়া) তারো ঠিকানা জানি না। (প্রতিমার প্রতি) চিনতে পাচ্ছো না?

প্রতিমা—পাচ্ছি না আবার! আমার বিয়ের সময় দেখেছিলাম—

সুধা—আমার বিয়ের সময় তো তোমাকে দেখলাম না।

নির্মল—গন্ধর্ব-বিয়েতে নোটিশ দেবার প্রথা নেই।

জয়ন্ত—এখন কোত্থেকে আসছিস?

প্রতিমা—সঙ্গে বডি-গার্ড আসেনি? লজ্জায় নিচে দাঁড়িয়ে আছে বুঝি? (জয়ন্তের প্রতি) যাও, অভ্যর্থনা করে ওপরে নিয়ে এসো গে।

নির্মল—উপরে তা'লে অনেক লোক হয়ে যাবে!

জয়ন্ত—সুধাকে এ-ঘর থেকে নিয়ে যাও।

সুধা—দাঁড়াও, তোমাকে প্রণাম করি। (বলিয়া নিচু হইয়া আগে প্রতিমাকে ও পরে জয়ন্তকে প্রণাম করিল। নির্মলের কাছে আসিয়া) তুমিও পা দুটো বাড়িয়ে দেবে নাকি? (সুধা ফের নিচু হইতেই জয়ন্ত তাহার হাত খপ করিয়া ধরিয়া ফেলিল।)

জয়ন্ত—(তাড়াতাড়ি) ও আমাদের কেউ নয়। ওকে প্রণাম করতে হবে না। (প্রতিমার প্রতি) ওকে ঐ ঘরে নিয়ে যাও না!

[প্রতিমা সুধাকে স্থানান্তরিত করিবার জন্য আকর্ষণ করিল]

সুধা—(ভ্যাবাচ্যাকা খাইয়া) কেন, এই ঘরেই তো সবাই বেশ আছি। (প্রতিমার প্রতি) তোমাদের এই গলির মোড়ে হলদে বাড়িটাতে মালতী থাকে—আমার এলাহাবাদের সই। এগোতে দেখি নিচের ঘরের রোয়াকে বসে মালতী মেমদের বাক্সওয়ালার কাছ থেকে মেয়ের জন্য ফ্রক কিনছে। ওকে এমন জায়গায় দেখতে পাবো স্বপ্নেও ভাবিনি। অভাবনীয়রূপে ওকে দেখতে পেয়ে কী চমৎকার যে লাগলো।

নির্মল—এতদিন পরে প্রতিমাকে দেখে আমার যেমন লেগেছিল!

জয়ন্ত—আঃ, ওকে যাও না নিয়ে।

প্রতিমা—যেতে না চাইলে আমি কী করবো।

জয়ন্ত—সুধা! পাশের ঘরে যা তো।

সুধা—যাচ্ছি। মালতী কি আমাকে সহজে ছাড়ে? দুহাত ভরে যেন আকাশ পেয়েছে।

নির্মল—এই উপমাটা আমার।

সুধা—নইলে, ভবানীপুর এসেছি তো কতক্ষণ হল। বললাম, দাদার বাড়ি বেড়াতে এসেছি। ও বললে, যাবিখন রাত্রে। খানিক থেকে যা। খাইয়ে দাইয়ে তবে ছাড়লে। কত গল্প যে করলাম! তাইতেই দেরি হয়ে গেল।

প্রতিমা—এলে কার সঙ্গে?

নির্মল—মেয়েরা আজকাল ভোট পেয়েছে, নাচতে শিখেছে, গলির মোড়টুকু থেকে পায়ে হেঁটে দাদার বাড়ি আসতে পারে না?

জয়ন্ত—(নির্মলকে ধমক দিয়া) চুপ করো।

সুধা—তোমাদের দেখে আমার কী যে ভালো লাগছে, বৌদি। আমি কয়েকদিন থেকে যাবো এখানে।

নির্মল—রিটার্ন-টিকিটের মেয়াদ কত দিন?

জয়ন্ত—সে-খবরে তোমার কি বাপু?

নির্মল—তোমাদের বাড়িতে রেডিয়ো আছে, প্রতিমা?

জয়ন্ত—(কর্কশ স্বরে) ফের কথা কয়?

নির্মল—রেডিয়ো থাকলে এই চ্যাটর্‌বক্‌স্‌ মেয়েটিকে ঘণ্টা তিনেকের জন্য চুপ করিয়ে রাখতে পারবেন। যা বকে—

সুধা—বকবো না, একশো বার বকবো।

জয়ন্ত—এর সঙ্গে কথা কয় না, সুধা। পাশের ঘরে যা, আমি জামা-কাপড় ছেড়ে যাচ্ছি।

প্রতিমা—এসো।

সুধা—যাচ্ছি। তোমাদের বাড়ি খুঁজে নিতে আমাদের অযথা কি বেগ পেতে হলো। এমন লোকের সঙ্গে এসেছি রাস্তা বের করতেই এক ঘণ্টা। রোদ্দুরে আমার কম হয়রানিটা হয়েছে! তারপর মালতীর সঙ্গে দেখা—এমন আশ্চর্য দেখা খুব কম ঘটে। মালতী চমৎকার মেয়ে। তোমার সঙ্গে আলাপ করিয়ে দেব। চলো না, ওকে নেমন্তন্ন করে আসি।

নির্মল—তাই যাও।

জয়ন্ত—না। তুমি হুকুম দেবার কে হে?

নির্মল—বলছিলেন না ওকে ঘর ছেড়ে চলে যেতে!

সুধা—এক্ষুনি যাচ্ছি না।

নির্মল—যেয়ো না।

প্রতিমা—(সুধাকে) লোকটা ভারি বাচাল।

সুধা—অত্যন্ত।

জয়ন্ত—কার সঙ্গে এলি ঢাকা থেকে? একা?

নির্মল—পাগল!

সুধা—কার সঙ্গে আবার! (নির্মলকে আঙুল দিয়া দেখাইয়া) ঐ যে বসে আছে—

জয়ন্ত—ঐ বাঁদরটার সঙ্গে?

নির্মল—দেখলে সুধা, তোমার এবার রীতিমতো অপমান বোধ করা উচিত। স্বামীর সামনে নারীকে অপমান করতে এদের কুণ্ঠা আসে না।

সুধা—তুমি এতক্ষণ তোমার নিজের পরিচয় দাওনি?

নির্মল—দিয়েছি—একেবারে হুবহু। আমি চোর, মাতাল, জালিয়াৎ, ছোটলোক—হ্যাঁ, প্রেমিক—তোমার ফিরিস্তিটা বলে-বলে যাও, প্রতিমা! খালি অতীতকালের সম্বন্ধটা বলা হয় নি। তা-ও আর উহ্য রইলো না।

সুধা—অতীতকালের সম্বন্ধ মানে?

নির্মল—বন্য পূর্বপুরুষদের কালটা তো অতীত কাল-ই।

প্রতিমা—(চমকিত) তুমি বিয়ে করেছ?

জয়ন্ত—সুধাকে!

নির্মল—খবরটা শুনে বিস্মিত না ব্যথিত বোধ করছ, প্রতিমা!

প্রতিমা—(কথার সুর স্বাভাবিক করিবার চেষ্টা করিয়া) এতে আমার দুঃখ কিসের?

নির্মল—বা, তোমার প্রেমের স্মৃতির প্রতি অপমান! এতে তোমার বেশি অপমানিত মনে করা উচিত। সুধার দিকে তাকাচ্ছ কি? সুধা সব জানে। সুধাকে আমি সব বলেছি। বলবার মধ্যে সত্য ছিল বলে সাহস ছিল।

সুধা—(ঠোঁট উলটাইয়া) এ আমি কিছুই বুঝছি না।

নির্মল—(দাঁড়াইয়া) এ-ও বলেছি, যে-প্রেম আমি ফেলে এসেছি সেই প্রেম আমার বিস্তীর্ণ আকাশ হয়ে থাক, বেদনায় নীল, ভাবে গম্ভীর। সুধার সঙ্গে আমার পথের প্রেম, পৃথিবীর প্রেম!

সুধা—আমি অত-শত কবিত্ব বুঝি না। কি হলো তোমার?

নির্মল—(জয়ন্তের প্রতি) সুধাকে পাশের ঘরে গিয়ে নিরাপদ হতে বলছিলেন না? চলো সুধা, এ-বাড়ির আর পাশের ঘরে নয়, এ বাড়ির বাইরে—রাস্তায়।

জয়ন্ত—(আগাইয়া আসিয়া নির্মলের কাঁধে হাত রাখিয়া আদরের সুরে) তাই। তুমি সুধার স্বামী বলেই তো ঠাকুরজামাই হয়ে আলমারির পেছনে লুকিয়ে ঠাট্টা করছিলে! এ-রকম ঠাট্টা চলে। তোমাকে বাঁদর বলেছি বলে রাগ করো না, নির্মল! (হাসিয়া) কপি থেকেই ত কবি।

নির্মল—আর, উল্লুক থেকেই তো উকিল।

জয়ন্ত—যা পোশাক—কথাটা নেহাৎ মিথ্যে নয়।

নির্মল—(সুধাকে) চলে এসো। (ঘড়ির দিকে চাহিয়া) সময় নেই আর।

সুধা—বা, এখুনি যাবো কি।

নির্মল—যাবে না তো, সতী সাজবে নাকি?

সুধা—সতী সাজবো মানে?

নির্মল—বিয়ের পর সব মেয়েই একেকটি তৈলপক্ক সতী সাজে, তার কথা বলছি না। সতী মানে দক্ষকন্যা।

সুধা—সে এখানে কি?

নির্মল—বলা যায় না, হয়ে যেতে পারো চট্ করে। মেয়েদের কি, যখন যেমন সুবিধে, একটা কিছু হয়ে পড়লেই হলো।

জয়ন্ত—কেন আর রাগ করছো, নির্মল?

নির্মল—রাগ আমি করবো কেন? রাগ করবে সুধা। জ্বলে পুড়ে ভস্ম হয়ে যাবে। স্বামীর নিন্দা স্বামীর অপমান সে সহ্য করবে না।

□

জবানবন্দী

বিজন ভট্টাচার্য

(১৯১৭-১৯৭৮)

চরিত্র

পরান মণ্ডল	বৃদ্ধ চাষী
বেন্দা	জ্যেষ্ঠ পুত্র
পদা	কনিষ্ঠ পুত্র
রাইচরণ	প্রতিবেশী
রমজান	প্রতিবেশী
বেন্দার মা	
বেন্দার বৌ	
হাসি	রাইচরণের স্ত্রী
মাণিক	বেন্দার পুত্র
	ভদ্রলোকদ্বয়, এ-আর পি কর্মচারীরা
	ইত্যাদি

প্রথম দৃশ্য

[অজ পাড়া গাঁ। নিথর হয়ে আছে সব কিছু। প্রত্যুষের অস্পষ্ট আলোয় চালা ঘরখানা দেখা যাচ্ছে আবছা আবছা। বাঁশের খুঁটি লাগানো চালাঘরখানার বারান্দার ওপর জন দুয়েক লোক গায়ে কাপড় জড়িয়ে তিন মাথা এক করে বসে বসে ঝিমুচ্ছে। আর একজন বুড়ো মত লোক বসে বিড়ি টানছে। বিড়ি টানছে আর কাশছে। দুজন স্ত্রীলোক নোংরা কাপড়ে আপাদমস্তক ঢেকে শুয়ে পড়ে আছে মড়ার মত। একটা বাচ্চা ছেলে ওদের একজনের কোল ঘেঁসে শুয়ে আছে।

একটা মোরগ ডেকে উঠলো। বুড়োটা একটু কাশলো। বহুদূরে একটা কুকুর ডাকছে শোনা যাচ্ছে। থেকে থেকে অস্পষ্ট একটা আজানের সুর দূরাগত বাঁশীর সুরের মতই শুনতে পাওয়া যাচ্ছে। বুড়োটা আবার কেশে উঠলো। একটা কাক কোথাও কোন্ ডালপালার মধ্যে ডানা ঝাপটে ডেকে উঠলো!

নেপথ্যে চলতে থাকবে একটা আবহ করুণ বিলাপ। অনেকটা মড়া কান্নারই মত। আর আলোটা অভিনয় এগিয়ে যাবার সঙ্গে সঙ্গে ক্রমশ সুস্পষ্ট হয়ে উঠবে। প্রথমটা থাকবে আবছা আবছা]

বৃদ্ধ পরান—(খুব কাশছে খক্ খক্ করে। হঠাৎ কাশতে কাশতেই বলে উঠলো) বাপুরে, কাসতি কাসতি ধড়েথে প্রাণডা য্যানো একেবারে বেরিয়ে যেতি চায়। (দীর্ঘশ্বাস) হা-া-াঃ। (একটু থেমে) হায় পরমেশ্বর!

[যে দুটো লোক ঝিমুচ্ছিলো এতক্ষণ ব'সে, তাদের একজন মাথাটা তুলে বুড়ো পরানের দিকে তাকালো]

বেন্দা—থাকো থাকো মাঝখান্থে ঐ নামডা উচ্চারণ ক'রে খামখা হামলে ওঠ কেন বলদিনি, হুঁঃ!

[দু হাঁটুর ভেতরে বেন্দা মাথাটা গুঁজে বসে।]

পদা—(দু হাঁটুর মাঝখান থেকে মাথাটা তুলে বেন্দার দিকে মুখ ক'রে) তো কি করবে? সম্বল আর থাকলো কি!

বেন্দা—(ক্ষোভের সুরে) তাই ঠেকলো এসে এখন ঐ নামে, কি বলিস...ছেঃ! ধুয়ে ধুয়ে জল খা, বুঝলি; ঐ নাম ধুয়ে ধুয়ে জল খা। পেট ভরবেনে। যত সব!

[মাথাটা গুঁজে বসে দু হাঁটুর মধ্যে]

পদা—তো তোমারই আপিত্যডা কিসির এত! বুড়ে মানুষ, নেছেই না হয় দু বার ভগবানের নাম। তো হয়েছে কি?

বেন্দা—ও—ো—োঃ, কানে যে একেবারে মধু ঢেলে দেছে দেখতি পাই। পেটে

বলে এদিকি চড়া পড়ে গেল না-খাতি না-খাতি, তার আবার! বোটকারা আর এখন ভাল লাগে না শুনতি, বুঝলি পদা!

বৃদ্ধ পরান—তো এর মধ্যি তুই বোটকারাডা দেখলি কমনে? ভগবানের নাম নিলি কি বোটকারা করা হয়? ভুত কমনেকার!

বেন্দা—(ক্ষোভের সুরে) না, তুমি আর ও নাম নিতি পারবা না মুখি, এই বলে দেলাম। (সখেদে) ঐ নাম সে দিন জ্যাঠাও করিছিল। মাথার কাছে বসেছিলাম আমি। আমি জানি সব। হায় পরমেশ্বর, হায় ভগবান বলে কত চোখির জল ফ্যাল্‌লে জ্যাঠা। কিছুতেই কিছু হ'লো না। শেষ কালে ঐ নামডাই যানো শক্ত এট্টা ইঁটির ড্যালার মত দেবে বসলো জ্যাঠার গলার মধ্যি। দম পর্যন্ত নিতি পাল্লে না জ্যাঠা! মরে গেল। তা তুমিও আর নিও না ও নাম মুখি। কেন যানো ভয় করে আমার। (আবেগে কণ্ঠরোধ হয়ে আসে বেন্দার) মনে হয় তুমিও মরে যাবা জ্যাঠার মত। বাঁচবা না তুমি।

[বৃদ্ধ পরান মণ্ডল উদ্বিগ্ন হয়ে ওঠে। শুয়ে প'ড়ে ঘুমুচ্ছিল যারা তারা সবাই সচকিত হয়ে উঠে ব'সে এ ওর দিকে বিস্মিতের ভঙ্গীতে তাকায়। বেন্দার মা ত্রস্তে গিয়ে বেন্দার গায়ে হাত বুলিয়ে দেয়।]

বেন্দার মা—(সস্নেহে) কি হয়েছে রে বেন্দা? কি হয়েছে? ওরম্ কত্তিছিস্ কেন বাপ্? ওরম্ কত্তিছিস কেন? কথা ক।

বেন্দা—(সামলে নিয়ে) না কিছু হয় নি। তুমি যাও।

[হাত দিয়ে বৃদ্ধার হাত সরিয়ে দেয়।]

বেন্দার মা—(উৎকণ্ঠিত ভাবে) কি হয়েছে রে পদা?

পদা—হবে আবার কি!

বেন্দা—(বিরক্তিভরে) বল্লাম বলি হয় নি কিছু। তা না আবার—কি হয়েছে রে পদা! পদা কি বলবে?

[ঘুমন্ত ছেলেটি উঠে বসে ঘ্যান ঘ্যান করে কাঁদতে শুরু করে দিল।]

বৃদ্ধ পরান—(বেন্দার মাকে) ন্যাও, আর ঘাঁটিও না মিছে, হ্যাঁ! তার চেয়ে ঐ দ্যাখো ওডা আবার কাঁদতি আরম্ভ করলো ক্যানো। (বিরক্তিভরে রোরুদ্যমান ছেলেটিকে লক্ষ্য করে) এই, চুপ কর্। সাত সকালে উঠে বসে অমনি প্যান প্যান আরম্ভ করলে। চুপ করে থাক। (একটু পরে আনমনে বসে থাকতে থাকতে) হায় পরমে—শ্ব—র—।

[শেষ অক্ষর দুটো আস্তে উচ্চারণ করে পরান বেন্দার দিকে একটু অপ্রস্তুত ভাবে তাকায়। পদা, বেন্দা ও পরানের দিকে লক্ষ্য করে। সকলেই চুপচাপ। শুধু ছেলেটার কান্না শোনা যায়।]

বেন্দার মা—(সস্নেহে) মানিক আমার, সোনা আমার, কাঁদে না। এস, কোলে এসো।

(ছেলেটা এগিয়ে আসে। বেন্দার মা দু' হাত বাড়িয়ে ছেলেটাকে বুকে জড়িয়ে ধরে।) ষাট, বাছা আমার একেবারে কাঁটাসারা হয়ে গেছে গো! কিছু নেই শরীলি।

পদা—(অভিযোগের সুরে) থাকবে কনথে? মানুষির বাচ্চা তো। সময় মতো না পায় দুটো খাতি, না পায় এট্টা কিছু। এ তো আর জন্তু-জানোয়ারের বাচ্চা না। সইতি পারে কখনও এত ধকল ঐ অটটুক'খানি ছেলে? রোজ তিন বেলা ক'রে ব'লে জ্বর আসতেছে কাঁপিয়ে কাঁপিয়ে! শরীলির আর দোষ কি। বেঁচে যে আছে এখনও এই ঢের।

বৃদ্ধ পরান—এ্যাঁ—া—াঃ।

বেন্দা—(ঘুমন্ত স্ত্রীকে লক্ষ্য করে বৃদ্ধা মাকে) আরে ওডা এখনও প'ড়ে প'ড়ে ঘুমুচ্ছে কেন বলদিনি মা! দ্যাও, তুলে দ্যাও, তুলে দ্যাও। যত সব।

বৃদ্ধ পরান—(বাধা দিয়ে) না থাক, ঘুমুচ্ছে ঘুমুতি দ্যাও। ডেকো না। ও যতক্ষণ ঘুমোনো যায় ততক্ষণই ভাল। জেগে আর কি ক'ত্তেছে। এই ঘুমডা আছে ব'লে তাই এখনও—

বেন্দা—কিন্তু মাঝে মাঝে যে আবার ভেঙ্গে যায়। মুস্কিলির কথাডাই তো হলো সেই।

বৃদ্ধ পরান—(একটু চুপ করে থাকে) এত ভোরে কাঁদতেছে কেডারে কুক্ ছেড়ে। পদা শুনতি পাচ্ছিস নে?

পদা—শুনতিছি তো।

বৃদ্ধ পরান—কেডা ও। বেন্দা জানিস?

বেন্দার মা—পচা পুকুরির ও ধারেথে আসতেছে না কান্নাডা? তা হলি...।

পদা—(মুখের কথা কেড়ে নিয়ে) আরে ঐ তো গ্যাঁদার মা।

বৃদ্ধ পরান—গ্যাঁদার মা! গ্যাঁদা তো গলায় দড়ি দেছে আজ হপ্তাখানেক হ'লো। এখনও ভুলতে পারে নি গ্যাঁদার মা গ্যাঁদারে?

বেন্দার মা—ওমা, তুমি য্যানো ক্যামন ধারা কথা কও গো। ছেলের শোক, মা কখনও ভুলতি পারে?

বৃদ্ধ পরান—তা ভুলতি এখন হবে। নইলি হিসেবে কুলিয়ে উঠতি পারবে না। সকলের জন্যিই তো আবার কাঁদতি হবে কিছুডা ক'রে! গ্যাঁদা কড়া ছেলেমেয়ে রেখে গেছে রে পদা?

পদা—তা ফুটিকুটিরিনে পাঁচ-ছড়া হবে 'খন।

বৃদ্ধ পরান—ও সব মরবে। এট্টাও বাঁচবে না।

বেন্দার মা—(সভয়ে) ওমা!

বৃদ্ধ পরান—(চোখ বড় বড় ক'রে) আঁৎকে উঠিস নে বেন্দার মা, আঁৎকে উঠিস নে। যা কোন দিন দেখিস নি তাই এবার দু চোখ চেয়ে দেখতি হবে। আঁৎকে উঠিস নে।

[একটু চুপচাপ। শুধু রুগ্ন ছেলেটার একটা ক্ষীণ কান্নার শব্দ শোনা যায়। আলোটা স্পষ্ট হয়ে উঠেছে ইতিমধ্যে। অপরিচ্ছন্ন পরিবেশের মাঝখানে দেখা যায় একটা উৎসন্নে যাওয়া সংসারের ধ্বংসাবশেষ। ভাঙ্গা ঘর, ভাঙ্গা মন, কালো কালো চেহারার রুক্ষ মুখগুলোর ওপর দারিদ্র্যের ছাপ সুস্পষ্ট।]

পদা—তা এতখানি পথ যাতি হবে, রওনা দিলি হ'তো সকাল সকাল। এর পর আবার উঠে পড়বেখন রোদ্দুর। সারাডা পথ মরতি হব্যান্ তেতে পুড়ে। শহর কি আর এখেনে না? আর তারপর গে পৌঁছুতি পৌঁছুতিই তো বাবুরা আর খিচুড়ি ভোগ দেবেনেন্ না। তদ্বির করে গোছগাছ করে নিতি হব্যানে সকলে মিলে।

বেন্দা—গোছগাছ কি বলতিছিস! সময় মত না গে পৌঁছুলি কিন্তু খাতি পাবা না, হ্যাঁ। সব বাঁধা টায়েনের ব্যাপার।

পদা—না সে এক জায়গার টায়েন ফুরোলিউ আর এক জায়গার টায়েন হাতে পাওয়া যাবেখন। (সপ্রতিভ ভাবে) না খেয়ে থাকতি হবে না তোমার সেখানে।

বেন্দা—না তা হলিউ সে অনেক ঝামেলা। কুচো কাচা নে ছোট রে আবার সেই আর এক দিক পানে। রাস্তায় গাড়ী ঘোড়া মিলিটরী নরী, কোন্‌ডা কখন কোথে চাপা পড়ে তার ঠিক নেই। দেখে আলাম গে সেদিন, আর আমি জানি নে!

পদা—বাচ্চা-কাচ্চাদের জন্যি আবার শোনলাম নাকি দুধ বাল্লি—এ সবেরও ব্যবস্থা করেছে।

বেন্দার মা—ক'দিন আগে থাকতি রওনা দিলিউ পারতাম। মানিক আমার খেয়ে বাঁচতো।

পদা—(উৎফুল্লভাবে) ও মানিকির তোমার শরীল ভালো হয়ে যাবে, দেখো শরীল ভালো হয়ে যাবে।

বেন্দা—(বিজ্ঞের সুরে) ভুল করিছি পেরথমে না গে। এখন লোক এসে পড়েছে বিস্তর। পুকুর পুকুর খিচুড়ি দেও কূল পাচ্ছে না বাবুরো। তা একজন ভণ্টিয়ার বাবুর সঙ্গে আমি কথা কয়ে এইছি এ বিষয়ে। শহরে গে উঠে তানিরই একবার খুঁজে বার করতি হবে সব্বার আগে।

বৃদ্ধ পরান—(বেন্দার মাকে) তো ন্যাও, জিনিস পত্তর সব তা হলি গুছিয়ে ফ্যালো এই বেলা।

বেন্দা—হ্যাঁ, এইবার রওনা দিতি হয় আর কি! পদা! তুই এট্টু এগিয়ে গে রাইচরনদারে এট্টা হাঁক দে দিনি। বল, যে দেরী হচ্ছে, এইবার সব রওনা দিতি হয়। আর রমজানও যাবে বলিছিল একসঙ্গে, হয় তো আসতি বল তারেও ঝটপট। নে উঠে পড়। (ঘুমন্ত স্ত্রীকে লক্ষ্য করে বৃদ্ধা মাকে) আর মা, তুমি তুলে দ্যাও দিনি ওরে। বাপুরে ঘুম, তুলে দ্যাও। জিনিসপত্তর সব ঐ বস্তার ভেতর পুরে ফেলে তৈরী হয়ে নিক ঝটপট, মানিক, নেমে বোস তুই মার কোল ছেড়ে। মা, তুমি ওঠ। দেখে শুনে সব গোছগাছ করে ন্যাও।

পদা—(বসে বসেই হাঁক দেয়) ও রাইচরণ দা-া-াঃ।

বেন্দা—(রাগতঃভাবে) তা সে ওখানে বসে চেঁচাচ্ছিস কেন? এট্টু ফাঁকে গে হাঁক দে। শুনতি আবার পাওয়া চাই তো কানে?

[পদা বাইরে যায়]

পদা—(নেপথ্যে) রাইচরণদাগো—

সাড়া আসে—যাই গো—

পদা—তাড়াতাড়ি—ই-ইঃ।

[পদার পুনঃপ্রবেশ]

পদা—ন্যাও আসতেছে ওরা।

বেন্দা—রমজানরে ডেকেছিস? ডাকিস নি! আচ্ছা তো থাক তুই, আমি গে ডেকে নে আসি। তুই তারে এদিকি গুছিয়ে ফ্যাল সব হাতে সঙ্গে। নে তা হলি আর বসিস নি চেপে; দেখে শুনে ঠিকঠাক করে নে।

[বেন্দার প্রস্থান]

[ইতিমধ্যে বেন্দার মা, বেন্দার বৌ ও পদা চালা ঘরখানার ভেতর থেকে সংসারের টুকিটাকি যাবতীয় জিনিসপত্র বারান্দায় এনে জমা করে। বেন্দার মা প্রয়োজনীয় জিনিসগুলোকে বস্তার ভেতর পুরে নেয়। দু'একখানা ছেঁড়া মাদুর, খানকয়েক সানকি, কয়েকটা মেটে পাত্র, একখানা কাটারী, ছেঁড়া কাঁথা, দু'একটা তেলচিটে খড়ের বালিশ, দু'খানা কাস্তে—এই নিয়ে দুটো বস্তা বাঁধা হয়। বুড়ো পরান সব কিছু নিরীক্ষণ করে, আর কাশে। কাশে আর মাঝে মাঝে দু একটা মন্তব্য করে, সেটা নেওয়া হয়েছে ওটা নেওয়া হয়েছে। মানিকের কান্নার বিরাম নেই, বসে বসে ঘ্যান ঘ্যান করছে।]

বৃদ্ধ পরান—হুঁকোডা নেছ!

[পরিবারসহ রাইচরণের প্রবেশ। সঙ্গে একটা বছর চারেকের শীর্ণ মেয়ে। সঙ্গে একটা বস্তা—রাইচরণের স্ত্রী হাসির কাঁকালে। রাইচরণ খালি গায়ে গামছা কাঁধে মেয়ের হাত ধরে এসে ঢুকলো। পেছনে হাসি।]

বৃদ্ধ পরান—এই যে রাইচরণ এয়েছো? তো বোসো। বেন্দা আবার রমজানরে ডাকতি গেল এই মাত্তর। তা গোছগাছ করে নেছ তো সব?

রাইচরণ—সব আর কি!

বৃদ্ধ পরাণ—ঐ যা নেবা আর কি সঙ্গে।

রাইচরণ—হ্যাঁ, তা নিইছি।

[বেন্দার প্রবেশ]

বেন্দা—এই যে এসে পড়েছো রাইচরণদা। তো ভালই হলো! রমজানরা এগিয়ে গে রয়েছে রাস্তায়। এখন আমরা রওনা দিতি পাল্লিই হয়। তা এদিককার গোছগাছ তো সব হয়ে গেছে দেখতি পাই! তবে আর দেরী কি? রওনা দেওয়া যাক।

[নেপথ্যে রমজানের হাঁক শোনা যায়। বেন্দা চেঁচিয়ে উত্তর দেয়, যাই গো—ো-োঃ। বেন্দার স্ত্রী ও পদা দুজনে দুটো বস্তা নেয়। বেন্দার মা নেয় মানিককে। আর পেছনে পরিবার সহ এগিয়ে যায় রাইচরণ। সব শেষে বেন্দা বুড়ো পরানকে আগলে নিয়ে শহরের উদ্দেশ্যে যাত্রা করে। ফেলে যাওয়া গেরস্থালীর দিকে পরান ফিরে ফিরে চায় আর ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদে।]

বৃদ্ধ পরান—(হাউমাউ করে কেঁদে) আমার সুখির সংসার! হায় পরমেশ্বর!

বেন্দা—ফের আবার ঐ নাম নেয় মুখি।

দ্বিতীয় দৃশ্য

[শহরের একটা বড় রাস্তার ধারে একটা পার্কের রেলিং ঘেঁসে আস্তানা গেড়েছে বেন্দারা। রেলিং-এর ওপর দিয়ে সুকৌশলে একটা ছেঁড়া মাদুর আর চট ফেলে একটা ঘর মত বানিয়ে নিয়েছে ওরা; দেখতে অনেকটা ছেলেপেলেদের খেলাঘরেরই মত। দুটো মেটে কালো হাঁড়ি, খানকয়েক সানকি, আর সব টুকিটাকি জিনিস-পত্তর রেলিং-এর সিমেণ্ট করা ভিতের ধার ঘেঁসে সাজিয়ে রাখা হয়েছে। রেলিং-এর ওপর একখানা ছেঁড়া চট আর দু'এক টুকরো নোংরা কাপড় ঝুলছে। একটা ছোট মেটে হাঁড়ি রেলিং-এর ওপর উপুড় করা রয়েছে দেখা যাচ্ছে। দেখলে মনে হয় যেন একটা পাগলের ছন্নছাড়া সংসার।

বেন্দারা বেরিয়ে পড়েছে সবাই আহার্যের সন্ধানে। শুধু বুড়ো পরান তিন মাথা এক করে বসে সংসার আগলাচ্ছে। হাঁটু দুটো পরানের ঠক্‌ঠক্ করে কাঁপছে। মনে হয় জেগেই আছে পরান। মাঝে মাঝে সুবেশ কুবেশ—হরেক রকমের বেশভূষায় সজ্জিত ত্রস্তগতি পথচারীদের দিকে পরান উদ্ভ্রান্তের মত চেয়ে চেয়ে দেখে, আবার গুঁজে দেয় তার মাথাটা দু'হাঁটুর মধ্যে। হাঁটু দুটো পরানের আবার ঠক্‌ঠক্ করে কাঁপতে থাকে। পেশাদার ভিক্ষুক নয় পরান। হাত পেতে ভিক্ষে চাইতে তার কি রকম বাধ-বাধ ঠেকে।]

বৃদ্ধ পরান—(জনৈক পথিক ভদ্রলোকের প্রতি) বলি মহাশয়ের এট্টু শোনা হবে এদিকি?

ভদ্রলোক—(বিরক্তিভরে) কি?

বৃদ্ধ পরান—বুলতিছি, বলি অনুগ্‌গেরো করে মশায়ের এট্টু কৃপাদিষ্টি করা হবে অধমের ওপর!

ভদ্রলোক—অধমের ওপর, কৃপাদৃষ্টি! তুমি তো বেশ ভাল বাংলা ব্যবহার কর হে। বাড়ী কোথায় তোমার?

বৃদ্ধ পরান—সে কথা বলতি গেলি মশায় সে অনেক বিত্তান্ত। আমরা বাবু মাঠের চাষী। নাঙ্গল চষে খাওয়া অভ্যেস, বুঝতি পেরেছেন। চোদ্দ পুরুষির মধ্যি আমাদের কেউ কক্ষণও ভিক্ষে করে নি, উঁ। তা এবার ক্ষেত খামার যা ছিল সব পয়মাল হয়ে গেছে বানের জলে। তারপর মাগ্ ছেলেপুলে নে একেবারে না খেতি পেয়ে মরার অবস্থা আর কি। তাই চলে আলাম শহরে। ভাবলাম, বলি বাবুরো থাকতি আর না খাতি পেয়ে মরবো না সেখেনে, দুটো ভাতের ব্যবস্থা এক রকম করে হয়েই যাবে। এই তাপর...

ভদ্রলোক—তা হলে সব বুঝে শুনেই এয়েছো।

বৃদ্ধ পরান—এঁজ্ঞে?

ভদ্রলোক—না বলছি বলি তা হলে সব খবর নিয়েই এয়েছো শহরে।

বৃদ্ধ পরান—এঁজ্ঞে তা আছেন আপনারা দয়াবান এখানে সব, খিচুড়ি খয়রাত কত্তেছেন দুঃস্থজনে,—এই সংবাদ জেনে শুনেই তো আমাদের এখানে আসা।

ভদ্রলোক—(ঝিমিয়ে) হুঁ; তা দেশ কোথায় তা তো কিছু বললে না।

বৃদ্ধ পরান—দেশ, এজ্ঞে বাড়ী আমাদের মাথালে। (হাত তুলে) ঐ যে মণিবিষ্ণুপুরির রায় বাবুরো আছেন, নাম কল্লিই চেন্‌বেনেন্ বোধ করি, এই আপনার গে নেপেন্দরনারায়ণ, মহেন্দরনারায়ণ, তেনারাই হচ্ছেন আমাদের মনিব—জমিদার। তা বুড়ো কত্তার আমলে...

ভদ্রলোক—(হাত তুলে) থাক থাক, আর বলতে হবে না।

বৃদ্ধ পরান—(উৎফুল্ল হয়ে) চিনতি পাল্লেন?

ভদ্রলোক—বিলক্ষণ—বিলক্ষণ, না চিনে উপায় আছে। তা এখানে এসেছো তোমরা সব কদ্দিন?

বৃদ্ধ পরান—তা হপ্তাখানেকের ওপর হ'লো।

ভদ্রলোক—তা হ'লে সব এসেছো, তাই বলো।

বৃদ্ধ পরান—এঁজ্ঞে তা বাবু মশায়ের থাকা হয় কমনে?

ভদ্রলোক—বাবু মশায় এই এখানেই থাকেন।... (ঝিমিয়ে) হুঁ।...তা তোমাদের আর সব কোথায়? (গমনোদ্যত)

বৃদ্ধ পরান—এই দুটো ভাতের সন্ধামে বেরিয়েছে।...তা হ'লো নি বাবু দয়া অধমের ওপর!

ভদ্রলোক—(ঘুরে দাঁড়িয়ে) দয়া বা কি করবেন বাবু অধমের ওপর। (পকেটে হাত দিয়ে) টিকিট আছে একখানা, নেবে?

বৃদ্ধ পরান—টিকুটি?

ভদ্রলোক—হ্যাঁ, হ্যাঁ, টিকিট। নাও তো বল।

বৃদ্ধ পরান—(হতাশার সুরে) টিকুটি দে কি করবো বাবু?

ভদ্রলোক—আহা দোকানে দিলেই চলে যাবে। কি আবার করবে! আজকাল তো টিকিটেরই রাজত্বি, পয়সা কি আর বাজারে আছে? নাও ধর।

[টিকিট দিয়ে ভদ্রলোকের প্রস্থান। পরান উলটে পালটে টিকিটটা দেখে ট্যাঁকে গুঁজে রাখে। তারপর আবার মাথা গুঁজে বসে দু' হাঁটুর ভেতর। হাঁটু দুটো ঠকঠক করে নড়তে থাকে। বেন্দার মা প্রভৃতির প্রবেশ।]

বেন্দার মা—(হাঁড়িটা মাটিতে সন্তর্পণে নামিয়ে রেখে) খুব শিক্ষে হচ্ছে শহরে এসে। বাব্বা, পায়ের নড়া দুটো আর নেই। ছিঁড়ে পড়তেছে।

[বেন্দার স্ত্রী রুগ্ন মানিক্‌কে কোল থেকে নামিয়ে খিচুড়ির হাঁড়িটা আলগোছে মাটিতে নামিয়ে রেখে জিরোতে বসে। শ্বশুর পরানের ক'রে বেন্দার বউ-এর এখন আর সে রকম সরম নেই। বেন্দার মা চকিতে বুড়ো পরান আর বেন্দার বউ-এর দিকে এক নজর তাকিয়ে ঘুরে বসে খিচুড়ির হাঁড়ি সমুখে ক'রে তারপরে গোগ্রাসে খিচুড়ির হাঁড়িটা নিঃশেষ ক'রে ফেলতে থাকে। পেছন থেকে মানিক এসে ঘ্যানঘ্যান করে একটু খিচুড়ির জন্যে; বেন্দার মা ফিরেও তাকায় না। অন্য দিকে ঘুরে ব'সে গোগ্রাসে গিলতে থাকে খিচুড়ি। কি রকম যেন পশুর মত স্বার্থপর হয়ে উঠেছে বেন্দার মা দিনকে দিন।]

বেন্দার মা—(হাত চাটতে চাটতে) কিই বা খালাম, জিবিউ নাগলো না; মানিকির মা দিবি নাকি এট্টু খিচুড়ি তোর হাঁড়ির থেকে?

বেন্দার স্ত্রী—কেন, সঙ্গে করে যে হাঁড়ি নে এলে তার থেকে খাও না নিয়ে। এ হাঁড়ির থেকে দিলি পরে আবার পদা এসে চেঁচামিচি করবেনে? পদার ভাগও তো দেছে কিনা এই একই হাঁড়িতি।

বেন্দার মা—আমার হাঁড়িতি আর কট্টুক খিচুড়ি দিছলো লো। যা খালাম তা মুখিউ নাগলো না।

বেন্দার স্ত্রী—(রেগে) ও মা! তোমার পেটে কি রাক্ষস এয়েছে, না? ঐ এক হাঁড়ি খিচুড়ি তুমি একলা ফুরিয়ে ফেল্লে! তারপর ও এসেই বা খাবে কি? বাবারেও তো দিলি পাত্তে এট্টু।

বৃদ্ধ পরান—(বেন্দার মায়ের প্রতি) বড্ড খিদে পেয়েছে রে বেন্দার মা। কি এনিছিস দে দিনি দুটোখানি। আর তো বাঁচিনে খিদের জ্বালায়।

বেন্দার মা—(গালে হাত দিয়ে অবাক হয়ে) ওমা, এই না খাইয়ে রেখে বেরিইছি; আবার এর মধ্যিই পেটে আগুন জ্বলে উঠেছে! না আর পারব না তোমারে নিয়ে।

বেন্দার স্ত্রী—(রাগের সুরে) কি, বুড়ো মানুষ, সেই কোন সকালে দেছ তো এট্টু ফ্যান। দুটো খেতি চেয়ে সেই কল্লে অপরাধ; আর নিজি যে একবার পেট পুরে খেয়ে এসে আবার এক হাঁড়ি খিচুড়ি গোগ্রাসে গিল্‌লে, সেডা কোন দোষের হলো না। বাবা, বাবা! বাপের কালে এমন খাওয়া দেখিনি।

বেন্দার মা—(সরোষে) তুই চুপ কর আবাগীর বিটি। আমার হাঁড়ির থেকে আমি খেইছি, তোর কি র‍্যা? আবার গলা কত্তেছে!

বেন্দার স্ত্রী—(রাগতঃভাবে) না, করবে না গলা! এমনি তো দেখি এত আহ্লাদ, এত ষাট-সোনা, মানিকির হাতে পর্যন্ত কি দিতি পাল্লে না তুমি এট্টুখানি, যে ধর খা। তা ও সব হলো মুখমিষ্টি। না দ্যাখালিই হয় অমন সোহাগ!

বেন্দার মা—মুখ সামলে কথা বলিস মানিকির মা। তোর মুখির শাস্তি কিন্তু আমি, তোর, আগে আসুক আজ বেন্দা।

বেন্দার স্ত্রী—ও-হো—হোঃ, বেন্দা এসে তো আমার সব করবে।

বেন্দার মা—তা এখন আর বেন্দার ভয় করবি ক্যানো। কত বেন্দা জুটেছে তোর শহর বাজারে?

বৃদ্ধ পরান—(ধমকের সুরে) চুপ কর ব'লতিছি বেন্দার মা। হারামজাদী নচ্ছার মাগী কোথাকার। ফের যদি চেঁচাবি তো এই কাটারির এক ঘায়ে দেব'খন খতম ক'রে তোরে ইহ জনমের মত। চুপ কর।

বেন্দার মা—তো দ্যাও না, মিটে যাক সব জ্বালা যন্তন্না।

বৃদ্ধ পরান—(কাটারি আস্ফালন করে) ফের আবার!

[ঝগড়াটা আপাততঃ বন্ধ হয়। একটু পরেই বেন্দা, পদা, রমজান, রাইচরণ, মেয়ে-কোলে হাসির প্রবেশ। সকলের হাতেই একটা করে মাটির হাঁড়ি বা টিনের কৌটো। খিচুড়ি কেউ পেয়েছে, কেউ পায় নি। সকলেই পথশ্রমে ক্লান্ত। এসেই ক্লান্ত দেহ এলিয়ে দিল সব মাটিতে। কেউ হাঁড়িটা মাথায় দিয়ে শুয়ে পড়ল। কেউ বা বসে রইল চুপ করে।]

বেন্দা—(ক্রন্দনরত পুত্রকে লক্ষ্য করে সস্নেহে) মানিক, কাঁদতিছিস কেন র‍্যা, আয় আমার কাছে আয়।...খিচুড়ি খেয়েছিস?

[মানিকের কান্না আরো বেড়ে যায়]

বেন্দার স্ত্রী—কি যে হয়েছে ওর! দিনরাত ঘ্যানর ঘ্যানর। খেয়েও জ্বালা, না খেয়েও জ্বালা।

বেন্দা—আর শরীলিই ও যুত পায় না মোট্রে, তার কি করবে।

পদা—ওর হয়েছে তোমার চোখির খিদে, বুঝলে, চোখির খিদে।

বেন্দা—এট্র খিচুড়ি খাবি রে মানিক?

বেন্দার স্ত্রী—ন্যাও, তুমি আর নোবানি দিও না ওরে; এমনিই বলে তাই ঠেকাতি পারিনে।

পদা—বারণ কত্তেছে দেখতেছো ওর মা, তবু আবার তুমি খেতি বলতেছো ওরে। এই আদর দে দেই ছেলেডারে তোমরা খাবা।

বেন্দার মা—বোঝ বেলা কথা। খেতি না দে না দে ছেলেডারে বলে একেবারে শেষ ক'রে ফ্যাল্লে।

বেন্দা—(স্ত্রীকে) তুমি দ্যাও দিনি ওরে এট্র খিচুড়ি। কাঁদিসনে রে তুই মানিক দাঁড়া।

পদা—শুধু খিচুড়ি না দে ফ্যানে খিচুড়ি করে দ্যাও, পুষ্টায়ী হব্যান।

[বেন্দার স্ত্রী সরোষে এগিয়ে গিয়ে ফ্যান আর খিচুড়ির হাঁড়ি মামিকের সামনে ধরে দেয়।]

বেন্দার স্ত্রী—ধর খা। খেয়ে খেয়ে মর। আমারও হাড় জুড়োক।

বেন্দা—(সস্নেহে) ব'সে ব'সে খাও মানিক, খাও।

[মানিক খেতে বসে]

পদা—(রাইচরণের প্রতি) মেয়েডারে এট্র কিছু খেতি দ্যাও রাইচরণদাদা। কাঙ্গালপানা মুখ করে দাঁড়িয়ে আছে।

হাসি—(একটু ক্ষীণ হেসে) শহরে দুধ দেয়, বাল্লি দেয়—কত কথাই না বলিছিলে। কই এত জাগা ঘোরলাম, সন্ধান তো পালাম না কিছুরই।

রাইচরণ—তা ঐ রকম বেলতাউড়ি ছুটে বেড়ালি কখনও জোগাড় করতি পারা যায় ঐ সব জিনিস। সারাডা দিন যতি ঐ এক তল্লাসে ঘুরতি পারি তো দেখি একবার কেমন না পাওয়া যায় দুধ। তা সময় কোথায়? এই তাই এট্টু খিচুড়ি জোগাড় করতিই বলে এসোগে, তার আবার দুধ বাল্লি। (হতাশার সুরে) যাগগে, মরুক গে যাক।

হাসি—তা হবেও তাই। ঐ অট্টুকখানি কচি মেয়ে, আধসেদ্ধ ভেঁটে চালির খিচুড়ি কখনও বরদাস্ত করতি পারে? আমি কি করবো। মেয়েমানুষ তার ওপর আন্‌কে জায়গা। বারবার পথ হারিয়ে ফেলি। বেটাছেলে হলিও বা দ্যাখতাম একবার।

রাইচরণ—ও—হো—হোঃ, বেটাছেলে হ'য়ে দ্যাখো না কত কত্তিছি, হুঁঃ।

হাসি—হলিই তো হলো না বেটাছেলে, আবার ফিকির ফন্দী করতি হয়। এট্টু ঘুরে এসেই তুমি একেবারে মরা বেলের মত চিতিয়ে পড়বা তার হবে কন্‌থে।

বেন্দা—হয়েছে রে খাওয়া মানিক। (স্ত্রীকে) নাও, ওর হাতখানা এট্টু জলদে ধুয়ে দাও দিনি। এইবার এট্টু শুয়ে থাক।

[আকণ্ঠ খেয়ে উঠে দাঁড়ায় মানিক। পেটটা ফুলে উঠেছে মরা গরুর পেটের মত। তখনও কাঁদছে।]

ঐ তোর বড় এক দোষ হ'য়েছে মানিক। খেয়েও যা, না খেয়েও তাই। দিনরাত কান্না আর কান্না। এইবার তো ভরেছে পেট, চুবোঃ!

[পেটে হাত দিয়ে ব্যথায় মুচড়ে ওঠে মানিক থেকে থেকে। বেন্দার বউ আড়চোখে ছেলের দিকে তাকায় আর রেলিং-এর ওপরকার একখানা ভিজে নোংরা কাপড় উল্টে পাল্টে দেয়।]

পদা—এট্টু শুইয়ে দাও ওরে যুতমত ক'রে, ঘুমোক। ঘুমুলিই সেরে যাবেনে পেটের ব্যথা।

[হঠাৎ মানিক অসহ্য একটা যাতনায় মাটির ওপর আছড়ে প'ড়ে চেঁচাতে থাকে। বেন্দা ছুটে যায় মানিকের কাছে।]

বেন্দা—ওরম কত্তিছিস কেন রে মানিক, কি হয়েছে?

[ছুটে যায় বেন্দার স্ত্রী, উঠে আসে পদা, বেন্দার মাও এগিয়ে আসে]

বেন্দার স্ত্রী—(সভয়ে) ওমা, ছেলে য্যানো আমার কেমন করে গো! ও মানিক, মানিক আমার!

[আর্তকণ্ঠ ফেটে পড়ে বেন্দার স্ত্রীর]

বেন্দা—জল, জল। পদা! রমজান!

[পদা জল আনতে ছুটে যায়।]

মা—(স্ত্রীকে) কাঁদিস কেন বউ। এট্টু ধৈর্য্য ধর।

[পদা জল নিয়ে ঢোকে। বেন্দা ঝাপটা মারতে আরম্ভ করে মানিকের চোখে মুখে। মানিকের শরীরে কোন উত্তেজনা নেই। বেন্দার বউ কেঁদে ফেটে পড়ে—'ও আমার মানিক রে।' আর বেন্দা জলের হাঁড়িটা হাতে ক'রে খানিকক্ষণ চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকে গতায়ু মানিকের দিকে চেয়ে। তারপর হাতের হাঁড়িটা সশব্দে রাস্তার ওপর আছড়ে ফেলে।]

বৃদ্ধ পরান—(নিরীক্ষণ করছিলো এতক্ষণ সব কিছু চুপ করে) হয়ে গেছে। যাক।

[বৃদ্ধ পরান আবার গুঁজে বসে মাথাটা। হাঁটুটা ঘনঘন নাড়তে থাকে। বেন্দা চোখে হাত চাপা দেয়। একটু পরে দু'জন সৎকার সমিতির লোক এসে মানিককে স্ট্রেচারে করে তুলে নিয়ে যায়। ফুঁপিয়ে কাদে বেন্দার স্ত্রী। পদা বসে থাকে চুপ করে। সকলেরই যেন কেমন একটা আচ্ছন্ন ভাব। কেউ কোন কথা কয় না। জনৈক এ.আর.পি. যুবকের প্রবেশ।]

এ.আর.পি.—ওর নামটা কি?...আরে ওর নামটা কি?

বেন্দা—(ক্লান্ত স্বরে) য়্যাঁ!

এ.আর.পি.—আরে ঐ যে ইয়েটা, ওর নামটা কি?

বেন্দা—আমার ছেলে বাবু।

এ.আর.পি.—ছেলে ফেলে নয়, ছেলে ফেলে নয়, নামটা কি?

[বেন্দা নির্বাক বিস্ময়ে এ, আর, পি-র দিকে তাকিয়ে রইল]

তৃতীয় দৃশ্য

[বিকেল বেলা। ঐ একই পরিবেশ। বেন্দার বউ নতুন একখানা কাপড় পরে এলোচুলে বসে আছে। আর হাসি বেন্দার বউ-এর মাথার উকুন বেছে দিচ্ছে। বৃদ্ধ পরান আরও খানিকটা কাহিল হয়ে পড়েছে। ঘন ঘন কাশছে আর গয়ের ফেলছে। বেন্দার বউ আর হাসি যেন কি সব কথা বলাবলি করছে নিজের মধ্যে; শুনতে পাওয়া যাচ্ছে না। আর সবাই বেরিয়েছে।

পদা ও বেন্দার মায়ের প্রবেশ। পদা যেন কি একটা কামড়ে কামড়ে খাচ্ছে। বেন্দার মায়ের এ বেলা আর কিছুই জোটে নি। পরিশ্রান্ত বেন্দার মা ঢুকেই বেন্দার স্ত্রীর দিকে কটাক্ষ করে নিজের আস্তানা নেয়। বৃদ্ধা বেন্দার মায়েরও স্বাস্থ্য ভেঙ্গে পড়েছে একেবারেই। পরনে জীর্ণ একখানা মলিন বসন, চক্ষু কোটরাগত। দেখতে যেন একটা জীবন্ত প্রেতিনী।]

পদা—(বেন্দার স্ত্রীর কাপড় লক্ষ্য করে) আমি ভাবলাম বলি কেডা না কেডা। তা পেলে কন্‌থে? নতুন কাপড়?

বেন্দার স্ত্রী—পাবো আবার কন্‌থে। চেয়ে চিন্তে নিয়ে আলাম।

পদা—মানষি তো বেশ দ্যায় দেখতি পাই তোমাদের চাইলি পরে। আর আমরা যদি মুখ ফুটে কিছু চাই তো কি বলে শোনবা?—বলে যে, যা গতোরে খেটে খেগে যা, হুঁঃ। এখন দেখি মেয়েমানুষ হয়ে জন্ম নিলিউ পারতাম।

হাসি—মেয়েমানুষ হলিই হয় না, আবার কপাল করে আসতি হয়। এই তো সারাডা দুকুর ঘুরে আলাম কত মুল্লুক, এট্টু ছাই-ই দিক মানষি হাতে ক'রে, নাঃ।

বেন্দার স্ত্রী—নে, তুই আর আমার কপালের জোর দেখিস নি হাসি, হ্যাঁ। শত্তুরিউ য্যানো এমন কপাল করে না আসে।

বৃদ্ধ পরান—(অস্থির হয়ে) এট্টু জল দে তো পদা আমারে। গলা শুকিয়ে একেবারে কাঠ হয়ে উঠতেছে নিয়ত।

[পরান হাঁ করে দাঁত দেখিয়ে, ওঃ আঃ শব্দ করে শারীরিক অস্বস্তির আক্ষেপ জানায় আর হাতখানা বার বার বুলিয়ে নেয় চকিতে চোখ মুখের ওপর দিয়ে।]

বেন্দার মা—(বসে বসে ভাবছিল এতক্ষণ) কি, জল খেতি চাচ্ছো নাকি? দেবো?

বৃদ্ধ পরান—(সঙ্গে সঙ্গে বাধা দিয়ে ক্ষোভের সুরে) না না তোরে আর কষ্ট করতি হবে না বেন্দার মা, তুই যা, তুই যা। তোর মানুষ মনিষ্যত্ব একেবারে গেছে। তুই আর মানুষ নেই রে বেন্দার মা; তুই আর মানুষ নেই।...(হাউ মাউ করে কেঁদে) পঞ্চাশ বছর এক নাগাড়ি ঘর করিছি তোরে নে বেন্দার মা। সুখি দুঃখি এক দিনির জন্যিউ তোরে কাছ ছাড়া হ'তি দেই নি। (সামলে নিয়ে) তা সে সব কথা তুই আজ একেবারে ভুলে গিছিস, একেবারে ভুলে গিছিস। (একটু পরে আর্তকণ্ঠে) আমার ঘর, আমার জমি, আমার ছেলে, আমার হাল নাঙ্গল, আমার বলদ, আমার সোনার ধানের ক্ষেত, বেন্দার মা, বেন্দার মা!!

[বেন্দার মা, পদা, বেন্দার স্ত্রী, হাসি ছুটে যায় পরানের কাছে। বেন্দার মা বৃদ্ধ স্বামীর মুখের ওপর ঝুঁকে পড়ে।]

বেন্দার মা—কি হয়েছে। ওরম কত্তেছো ক্যানো, উঁ। জল খাবা, জল দেবো? (পদার প্রতি) জল দে দিনি পদা এট্টু।

পদা—(জল আনে) বাবা এই যে ধর জল খাও, জল এনিছি।...হুঁ, এই যে জল।

বৃদ্ধ পরান—(প্রকৃতিস্থ হয়ে মেটে পাত্র থেকে জল খায়। মাথাটা ঠক্‌ঠক্ কাঁপে পরানের।) যাও এইবার সব তোমরা যাও।

[আপাদমস্তক কাপড়ে ঢেকে আক্ষেপসূচক শব্দ করতে করতে কুণ্ডলী পাকিয়ে শুয়ে পড়ে পরান।]

বেন্দার মা—(পরানের কপালে হাত দিয়ে ভ্রূ ও ঠোঁট কুঁচকে) উঃ খুব জ্বর।

[বেন্দার প্রবেশ]

বেন্দা—কার জ্বর, বাপের?

বৃদ্ধ পরান—বেন্দা এইছিস? বেন্দা।

[সন্ধ্যা ঘোর হয়ে আসে। পরানের শিয়রে বেন্দা কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকে ঝিম ধরে। তারপর আস্তে আস্তে গিয়ে পরিশ্রান্ত দেহটি মাটিতে এলিয়ে দেয়। সকলেই শুয়ে পড়েছে

যে যার মত। শুধু বেন্দার মা বসে থাকে পরানের শিয়রে। কিছুক্ষণ পরে তাকেও শুয়ে পড়তে দেখা গেল। তরল অন্ধকারে কিছুই ভাল করে ঠাওর করা যায় না। শুধু দু'একজন ত্রস্ত পথিক-বাবুর সাদা জামা চোখের ওপর এক মুহূর্ত্ত আবছা ভেসে মিলিয়ে যায়। সব কিছু নিথর নিস্পন্দ। ঘুমুচ্ছে সব। এমন সময় দেখা গেল একটা লোক গুঁড়ি মেরে এগিয়ে যাচ্ছে ঐ ঘুমন্ত লোকগুলোর দিকে। লোকটা সরে যেতেই তাকে অনুসরণ করে উঠে গেল বেন্দার স্ত্রী। কিছুক্ষণ ওরা এক কোণে দাঁড়িয়ে কি সব ফিসফাস করে কথা বল্ল। তারপর দুজনে বেরিয়ে গেল একটু পরে।]

পদা—এ যে বিষ্টি এলো দেখি। (বৃষ্টি পড়ার শব্দ)

বেন্দা—(উঠে বসে) ছেঁড়া চটটা বাপের গা'র ওপর চাপিয়ে দিয়ে আয় তো পদা। একেতেই ভুগতেছে জ্বরে। না, আর বাঁচবে না দেখছি।

পদা—ছেড়ে গেল যেন মনে হচ্ছে।

বেন্দার মা—না, এখনও পড়তেছে টিপটিপ করে।

পদা—ধরে যাবে'খন।

বেন্দা—(উদ্বিগ্ন হয়ে) আচ্ছা মা!

বেন্দার মা—কি?

বেন্দা—মাণিকির মা আজ ফেরে নি?

বেন্দার মা—কি-ই-ই?

বেন্দা—বলি মাণিকির মারে তো দেখতিছিনে কোথাও!

পদা—সে আবার কিরম কথা। এই তো এখেনেই শুয়েছিল জানি।

বেন্দা—ছিলো তো গেল কমনে।...দেখ্‌দিনি এধারে সেধারে এট্ট পদা।

পদা—কই, না তো! কি জ্বালা!

বেন্দা—গেল কমনে বলদিনি এত রাতি।

বেন্দার মা—আজ কদিন থেকেই বুলতিছি বলি দ্যাখ, আমি কিন্তু ভাল নক্ষণ দেখতিছিনে বউ-এর। তা কেউ বিশ্বাসই যায় না। এইবার দেখলি তো নিজিদির চোখি।

পদা—হ্যাঁ, তোমার হয়েছে যত সব!

বেন্দা—আমি আজ ওর হাতে মাথা নেবো এই বলে দেলাম। এত বড় আস্পদ্দা মেয়েমান্‌ষির।

বেন্দার মা—তাই তো বুলি তাই, নতুন কাপড় আসে কন্‌থে। বোঝলাম সে এতক্ষণে।

বেন্দা—(রেগে) রও, আজ যদি আমি ওর...

পদা—আগে দেখই কমনে গেছে। তা না, আগে থাক্‌তিই চেঁচিয়ে মেচিয়ে একসা কত্তেছো।

বেন্দার মা—তো নে, এত রাতি আর খুঁজবি কনে? তার চাইতি ঘাপটি মেরে এখন পড়ে থাক, আলি পরে একেবারে হাতে নাতে ধরিসখন।

[কিছুক্ষণ আপন মনেই বক্‌বক্‌ ক'রে বেন্দা চুপ করে যায়। আবার সেই নীরবতা। একটু পরে। মানিকের মা ঢুকতেই বেন্দা লাফিয়ে গিয়ে তার চুলের মুঠি ধরে।]

বেন্দা—(চাপা গলায়) বল্‌ কোথায় গিছিলি সত্যি করে। নয় তো চোখ আমি তোর একেবারে উপড়ে ফ্যালবানে দেখিস'খন। হারামজাদী, বল শিগগিরি।

বেন্দার স্ত্রী—এমনি গিইলাম ঐ দিক পানে।

[স্ত্রীকে ধাক্কা মেরে ফেলে দিয়ে।]

বেন্দা—কোন্‌ দিক পানে?

বেন্দার স্ত্রী—ঐ দিক পানে।

বেন্দা—আয় দিনি পদা, ঝট করে।

[বেন্দা ও পদার দ্রুত প্রস্থান। নেপথ্যে হট্টগোল শোনা যায়। একটু পরেই দেখা যায় বেন্দা আর পদা এক ভদ্রলোককে টানতে টানতে নিয়ে এসেছে।]

জনৈক ভদ্রবেশী যুবক—এই কি হচ্ছে। যাঃ।

বেন্দা—দেখাচ্ছি তোমারে আমি কি হচ্ছে। এট্টু রও।

পদা—(সরোষে) এত রাতি তুমি এখেনে কেন এইছিলে সেই কথাডা কও।

[বেন্দার মা, রাইচরণ, হাসি সকলেই উঠে বসে গোলমাল শুনে। ওঠে না শুধু পরান।]

বেন্দার মা—(ঝুকে প'ড়ে) এই তো, এই নোকটারেই আমি সেদিন ঘুর-ঘুর করতি দেখিছি এখানে।

হাসি—দূর থেকে আদুলি দেখিইছিল সে দিন আমারে।

বেন্দা—শক্ত করে ধরিস পদা। (স্ত্রীকে উদ্দেশ্য করে) কই গেলি কমনে? এদিক আয় মাগী। দ্যাখ...এই নোক?

[বেন্দার স্ত্রী মাথা নেড়ে সম্মতি জানায়]

পদা—(ভদ্রলোককে) কি গো মশাই, অসভ্য জানোয়ারের মত রাতির ঝুলি বেরিয়েছো শিকের করতি। হেঁসোডা নে আয় তো দাদা, চুপিয়ে ফেলি।

বেন্দা—ধরিস তুই চেপে। আসতিছি আমি।

[গোলমাল শুনে দুজন এ, আর, পি যুবকের প্রবেশ। হাতে টর্চ]

১ম ব্যক্তি—(টর্চ ফেলতে ফেলতে) এই, গোলমাল কিসের এইখানে, কিসের গণ্ডগোল?

পদা—দেখুন বাবু, ভদ্দরনোকের কাণ্ড। অন্ধকারে গা ঢাকা দে এসে মেয়েমানষিরি ফুসলে নে যাচ্ছিলো।

২য় ব্যক্তি—কই দেখি। কোন লোকটা? উঁ।

[ভদ্রলোকের মুখে টর্চ ফেললো।]

তা এখানে কেন আসা হয়েছিল ভদ্রলোকের ছেলের?

বেন্দা—সে কথাই তো শুধোচ্চি। তা সে কথার কোন জবাব দেয় না। খালি

বুলতেছে বলি,—এই কি হচ্ছে, এই কি হচ্ছে। বেটা আমার নাট সায়েব রেঃ। মারে এক কাটারীর বাড়ি মুখি।

২য় ব্যক্তি—(বাধা দিয়ে) এই!

১ম ব্যক্তি—যাক, একে আমরা এখন থানায় নিয়ে যাচ্ছি। তোমাদের কাউকে কিছু করতে হবে না।

ভদ্রবেশী যুবক—(কাঁচুমাচু মুখে) থানায় নিয়ে যাবেন না স্যার। মাইরি বলছি, আমি কোন দোষ করিনি। বিশ্বাস করুন। আমি ভদ্দর লোকের ছেলে।

১ম ব্যক্তি—(টানতে টানতে) আচ্ছা, এখন তো চলো থানায়। তারপর ভদ্দরলোকের কি ছোটলোকের ছেলে টের পাইয়ে দেওয়া যাবে'খন। (ধাক্কা মেরে চেঁচিয়ে) চালাও জলদি।

পদা—খয়রাতি কত্তেছে যারা তারাও ভদ্দর-নোক, আর তুমিও ভদ্দরনোক। ভদ্দরনোক চেনাচ্ছে। ভদ্দরনোকের ভদ্দরনোক! (পিচ কেটে) থু, থু। ঘেন্না ধরিয়ে দিলে ঐ নামে।

বেন্দা—ঠিক বলিছিস পদা। ঐ সেই পরমেশ্বর আর এই এক ভদ্দরনোক, সর্বনাশ ক'রে ছাড়লে একেবারে আমাদের। সর্বনাশ ক'রে ছাড়লে। চুপ করে পড়ে থাক মাগী। চাষীর ঘরের কলঙ্ক।

পদা—(ক্ষোভের সুরে চেঁচিয়ে) দাদা!

চতুর্থ দৃশ্য

[সকাল বেলা। বৃদ্ধ পরানের অবস্থা খারাপ। আজ আর কেউ ভিক্ষেয় বেরোয়নি। কঙ্কালসার পরানের শরীরে কোন চাঞ্চল্য নেই। শুধু বড় বড় দুটি চোখ জেগে আছে দ্বীপের মত। বেন্দার মা পা ছড়িয়ে বসে আছে পরানের শিয়রে, আর বেন্দা গালে হাত দিয়ে স্থানু হয়ে ব'সে আছে পরানের পাশে। একটু দূরেই দাঁড়িয়ে আছে পদা, ঠোঁটে আঙ্গুল ঠেকিয়ে কি যেন ভাবছে। হাসি মেয়েটিকে কোলের উপর উপুড় ক'রে ফেলে উকুন বেছে দিচ্ছে মাথার, আর বেন্দার বউ-এর সঙ্গে কথা বলছে! আর এক পাশে রাইচরণ রমজানের সঙ্গে ব'সে কি সব কথা বলাবলি করছে। হাবভাবে চলনে বলনে সকলেরই কেমন যেন একটা গা ছাড়া হা-পিত্যেশ ভাব, যেন করবার আর কিছুই নেই।]

বেন্দা—(গালে হাত দিয়ে বসে নিঃশব্দে কাঁদে, হঠাৎ সখেদে হাত উল্টে) কোনই কূল পাচ্ছিনে। (ক্ষোভের সুরে চেঁচিয়ে) বাপ কি তা'হলি আমাদের মরে যাবে রে পদা?

[পদা কোন কথা কয় না। বেন্দার দিকে চেয়ে কাঠ হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে।]

রমজান—কাঁদিসনে বেন্দা। ও মোড়লের পেছনে পেছনে আমরাও যাব; দু'দিন আগে আর পরে।

বেন্দা—(একটু ঝিম ধরে থেকে) দুদিন আগে আর পরে।

পদা—(গম্ভীরভাবে) ষাট বছর ধরে বাপ আমার সোনা ফলিয়ে এয়েছে মাথালের মাটিতি। শহর-বাজারে আজ যে সব চালিডালির খয়রাতি হচ্ছে, ইরির মধ্যে পরান মণ্ডলেরও হয়তো কিছুডা দান আছে। কিন্তু কেউ আজ সে কথাডা স্বীকার কল্লে না। পরান মণ্ডল বরবাদ। না খেতি পেয়ে আজ তারে রাস্তায় পড়ে মরতি হচ্ছে।

বেন্দা—(গম্ভীর উদাত্ত কণ্ঠে) চারিদিকি এত সম্পদ, এত ধনদৌলত অথচ এই পিরথিমিতে পরান মণ্ডলের বেঁচে থাকবার কোন অধিকার সাব্যস্ত হলো না।

রাইচরণ—(হাত উল্টে) কত আশা করেই না এইছিলাম এই শহরে, হুঃ; দেশে পড়লো আকাল, ভাবলাম বলি যাই, কত লোকই তো গেছে শহরে; না খেতি পেয়ে আর মরবো না। তা যে এই অবস্থা হবে তা ভেবিছি কখনও।

[জনৈক এ.আর.পি. যুবকের প্রবেশ। পরিবেশ ও রোগী পরানের দিকে একবার দেখে নিয়ে পকেট থেকে নোটবুক বার করে কি যেন লিখে নিল। জনৈক পথচারীর প্রবেশ। কৌতূহলী দৃষ্টি দিয়ে পরানের মুখের দিকে তাকিয়ে রইল।]

পথচারী—(এ.আর.পি. যুবকের প্রতি) হাসপাতালে ট্রান্স্ফার করছেন না কেন?

এ, আর, পি যুবক—এম্বুলেন্স ডাকা হয়েছে।

পথচারী—(শ্লেষের ভঙ্গীতে) বাঁচবে তো?

[এ.আর.পি. যুবক উত্তরে একটু হাসলো। হঠাৎ মৃতকল্প পরান হেসে ওঠে অদ্ভুতভাবে।]

বেন্দার মা—(সভয়ে) হ্যাদে ও বেন্দা, দেখিদিন এরম কত্তেছে ক্যানো।

বেন্দা—(ত্রস্তে) কি রম!

[পদা ঘনিষ্ঠ হয়ে আসে। বেন্দা পরানের মুখের ওপর ঝুঁকে পড়ে।]

পদা—(উদ্বিগ্ন হয়ে) হাসতেছে মনে হচ্ছে য্যানো।

বেন্দার মা—হ্যাঁ তো ঐরম কত্তেছে খালি খালি।

বেন্দা—বাবা, বাপগো, শুনতি পাচ্ছো! বাবা! এই যে—

বেন্দার মা—(গায়ে হাত দিয়ে সন্ত্রস্তভাবে) নাঃ, এ যেন কেমন ধারা করে রে বেন্দা! (গায়ে ধাক্কা দিয়ে) এই যে, শুনতি পাচ্ছো, বেন্দা ডাকতেছে তোমারে, বেন্দা, হুঁঃ, পদা এয়েছে। এই যে, পদা।

পদা—(পরানের গালে হাত দিয়ে) বাবা, বাপগো!

বৃদ্ধ পরান—য়্যাঁঃ (ভ্রূ কুঁচকে কি যেন লক্ষ্য করে পরান মাথা তোলে। চোখে অবিশ্বাসের দৃষ্টি) কেডাঃ! কেডাঃ!

বেন্দা—আমি, আমি বেন্দা। বেন্দা।

বৃদ্ধ পরান—(জোরে) বেন্দা।

বেন্দা—এই যে, আমি বেন্দা। হাসতিছিলে কেন তুমি?

বৃদ্ধ পরান—(সশব্দে হেসে উঠে হাত তুলে) মাঠে, মাঠে কত কত ধান, কত ধান হয়েছে। কত—ধান হয়েছে।

পদা—স্বপন দেখতেছে, না?

বৃদ্ধ পরান—(জড়িয়ে যাচ্ছে পরানের কথা) আমি, তুই, পদা, সব কেটে কেটে তুলতিছি সেই ধান, সব কেটে কেটে তুলতিছি কত—কত—কত—

[বেন্দার মায়ের হাতখানা ধরে চুপ করে থাকে।]

বেন্দা—(পরানের গায়ে ঠেলা মেরে) বাবা, বাবা, বাপ গো!

পদা—থাক, এট্টু চুপ করে থাকতি দ্যাও দাদা। এট্টু চুপকরে থাকতি দ্যাও।

[হঠাৎ পরান চেঁচিয়ে ওঠে]

বৃদ্ধ পরান—(উঠে বসতে চেষ্টা করে) বেন্দার মা! বেন্দা! পদা কই! রাইচরণ, রমজান। (সকলেই কৌতূহলী হয়ে এগিয়ে যায় পরানের দিকে।) তোরা সব ঘরে ফিরে যা বেন্দা। ঘরে ফিরে যা। রমজান। (আঙ্গুল তুলে) তুই-ই তো রমজান?

[রমজান এগিয়ে যায়]

রমজান—কিছু বলবা মণ্ডল?

[পরান মাথা নাড়ে]

বৃদ্ধ পরান—(হাত দিয়ে ফিরে যাবার ইঙ্গিত করে) ঘরে ফিরে যা রমজান—তোরা সব ঘরে ফিরে যা। আমার—আমার সেই মরচে পড়া নাঙ্গল ক'খানা আবার শক্ত করে চেপে ধরগে মাটিতি। শক্ত করে চেপে ধরগে মাটিতি। খুব শক্ত করে চেপে ধরবি। সোনা, বেন্দা, সোনা ফলবে, সোনা ফলবে। ফিরে যা। ফিরে যা। (পাগলের মত) বেন্দা—বেন্দার মা—বেন্দা—বেন্দার মা—বেন্দার মা!

[বৃদ্ধ পরান মণ্ডল মারা যায়। চীৎকার করে ফেটে পড়ে বেন্দার মা গতায়ু পরানের পায়ের ওপর।]

রমজান—(খুব গম্ভীর ভাবে) চলে গেলে মণ্ডল!

[বেন্দা, পদা, বেন্দার বউ, রাইচরণ, রমজান, হাসি সব শক্ত কাঠ হয়ে দাঁড়িয়ে রইল! চোয়ালগুলো গালের দু'পাশে সব চেপে বসেছে তাদের—ঘরে ফিরে যাবে এই সংকল্প। পাথরের মূর্তির মত নিশ্চল হয়ে তারা যেন দূর গ্রাম দেশের দিকেই মুখ তুলে তাকিয়ে রইল।]

□

বিভাব

শম্ভু মিত্র

(১৯১৫-১৯৮৭)

চরিত্র

শম্ভু

অমর

বৌদি

সার্জেণ্ট

মেয়ে

যুবক

কোন এক ভদ্রোলোক পুরোনো সব নাট্যশাস্ত্র তল্লাস ক'রে আমাদের এই অভিনয়ের নাম দিয়েছেন "বিভাব নাটক"। সংস্কৃত হিসাবে তিনি ঠিক কি বেঠিক সে বিবেচনা করবেন সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিতেরা, কিন্তু নামের দিক থেকে আমাদের একটা সামান্য আপত্তি আছে। আমাদের মনে হয় এর নাম হওয়া উচিত "অভাব নাটক"। কারণ দুরন্ত অভাব থেকেই এর জন্ম। আমাদের একটা ভাল Stage নেই। সিন্‌সিনারী আলো ঝালর কিছুই আমাদের নিজেদের নেই। সঙ্গে থাকবার মধ্যে আছে কেবল নাটক করবার বোকামিটা। তাও যদি বা যোগাড়যন্তর ক'রে অভিনয় একটা ফাঁদি সঙ্গে সঙ্গে দেখি সরকারের পেয়াদা খাজনার খাতা খুলে ষ্টেজের দরজায় হাজির। তাঁরা পেশাদারের কাছে খাজনা নেন না। কিন্তু আমাদের কাছে নেন। কারণ, আমরা তো নাটক নিয়ে ব্যবসা করি না, তাই সরকার আমাদের গলা টিপে খাজনা আদায় ক'রে নেন। এবং সেই নেওয়াটা এমন বিচিত্র সাঁড়াশি ভঙ্গীতে যে আমরা সর্বস্ব দিয়ে থুয়ে আবার ব্যোমকালী বলে রাস্তায় বেরিয়ে পড়ি। তাই অনেক ভেবে চিন্তে আমরা একটা প্যাঁচ বের করেছি। যাতে Stage-এর দরকার হবে না—যে কোনও রকম একটা Platform হলেই চলবে, সিন্‌সিনারী দরজা জানালা টেবিল বেঞ্চি কিছুরই দরকার হবে না। আমরা অভিনয় করবই। আপনারা কেউ আমাদের ঠেকাতে পারবেন না। এমন কি বাংলা সরকারও না।

বুদ্ধিটা কী করে এলো তাই বলি। এক পুরোনো নাটকে দেখি লেখা আছে "রাজা রথারোহণম্ নটয়তি।" 'অর্থাৎ রাজা রথে আরোহণ করবার ভঙ্গী করলেন।' কিন্তু কী যে সেই ভঙ্গী তা আজ কেউ বলতে পারে না। নিশ্চয়ই এমন কোন একটা ভঙ্গী ছিল যা' করলে দর্শক ধরে নিত যে রাজা রথে চড়লেন। রথেরও দরকার হোতো না ঘোড়ারও দরকার হোতো না।—কিন্তু কী সেই ভঙ্গী যা আজকের দর্শক মেনে নেবে!

উড়ে দেশের যাত্রায় দেখেছি রাজা বললেন দূতকে—তমে ঘোড়া নেইকিরি চঞ্চল খবর নেই আসিবি।

দূত অমনি ছোট ছেলের মত দুই পায়ের ফাঁকে একটা লাঠি গলিয়ে ঘোড়ায় চড়ার মতো হেট্ হেট্ করতে করতে বেরিয়ে গেল এবং একটু পরে ঠিক সেই একই ভঙ্গিতে ফিরে এসে সংবাদ রিপোর্ট ক'রে দিল। দর্শক কিন্তু কেউ হাসলো না, সবাই অত্যন্ত গাম্ভীর্য্যের সঙ্গে মেনে নিলো যে দূত ঘোড়ায় চড়েই গেলো এলো।

আর একবার এক মারাঠী 'তামাশা'য় দেখেছিলাম, মঞ্চের এক পাশে দাঁড়িয়ে চাষী তার জমিদারের কাছে খাজনা মকুবের জন্য অনেক কাকুতি মিনতি করলো, শেষে ব্যর্থমনোরথ হয়ে চললো মন্দিরে, ভগবানের কাছে নালিশ জানাতে। চলল বটে, কিন্তু বেরিয়ে গেল না। তক্তার উপরে বারকয়েক গোল হয়ে ঘুরপাক খেলে, যেন গ্রামটা অতিক্রম ক'রে যাচ্ছে, তারপর অপর একপাশে গিয়ে কাল্পনিক মন্দিরের সামনে দাঁড়িয়ে ভগবানকে মনের দুঃখের কথা নিবেদন করতে থাকলো।

এদিকে যে অভিনেতা জমিদার সেজে এতোক্ষণ গর্জন করছিলো, সে দর্শকের সামনেই মুখে একটা দাড়ি গোঁফ এঁটে পুরুত সেজে অপর পাশে চাষীর সামনে গিয়ে আবার ধর্মীয় তর্জন সুরু ক'রে দিলো।

এবং মাঠ ভর্তি লোক নিঃশব্দে এসব মেনে নিয়ে দেখলে।

দেখে প্রথমে খুব উল্লাস হয়েছিল যে পেয়ে গেছি পন্থা, কিন্তু যতোই ভাবতে থাকলাম ততোই যেন আমরা কেমন চুপসে গেলাম।

মনে হোল, লোকে মানবে না। এ শহরে সব কতো ইংরিজি জানা লোক, তারা ফি হপ্তায় বিলিতি বায়স্কোপ দ্যাখে, আর পেণ্টুলুন পরে ইংরিজি বলে, তারা এ সব মানবে কেন? তবে হ্যাঁ, মানতে পারে, যদি সাহেবে মানে। যেমন রবিঠাকুরকে মেনেছিল।—

এমনি সময় হঠাৎ এক সাহেবের লেখা পড়লাম। রুশদেশীয় এক বিখ্যাত চিত্র পরিচালক—নাম আইসেনষ্টাইন।—একবার কাবুকী থিয়েটার বলে এক জাপানী থিয়েটার মস্কোতে গিয়েছিল—তাদের অভিনয় দেখে আইসেনষ্টাইন সাহেব অত্যন্ত উচ্ছ্বসিত হয়ে অনেক কথা লিখেছেন। তাঁর লেখা পড়ে জানতে পারলাম যে সে অভিনয়েও ভঙ্গীর বহুল ব্যবহার আছে। যেমন ধরুন, কোন এক 'নাইট' অত্যন্ত ক্ষুব্ধ হয়ে এক দুর্গ থেকে বেরিয়ে যাচ্ছেন—মনে করুন তিনি এই ষ্টেজের পিছন দিক থেকে গম্ভীর ভাবে এগোতে থাকলেন এবং তার ঠিক পেছনেই দুজন লোক একটা মস্ত দুর্গদ্বার হাতে করে দাঁড়িয়ে রইল। তারা শিফ্‌টার। Stage-এর ওপর তাদের উপস্থিতিতে কেউ কিছু মনে করেন না। নাইট ২/৩ পা এগোল আর সেই শিফ্‌টাররা বড় দরজাটা রেখে দিয়ে একটা অপেক্ষাকৃত ছোট দরজা ধরে দাঁড়ালো—এ রকম করে 'নাইট' যখন প্রায় ফুটলাইটের কাছে এসে পড়েছেন তখন দেখা যায় শিফ্‌টাররা এই এতটুকু দরজা ধরে দাঁড়িয়ে আছে। অর্থাৎ Perspective রচনা হ'ল আর কি। 'নাইট' কতদুর এসে পড়েছেন তাই বোঝান হলো। তারপর ধরুন, দুই জন লোকের লড়াইয়ের একটা দৃশ্য আছে—সে লড়াই সত্যিকার তলোয়ার দিয়ে ঝন্‌ঝন্ করে বাস্তব লড়াই নয়। কাল্পনিক খাপ থেকে কাল্পনিক তলোয়ার বের করে ভীষণ ভাবে কাল্পনিক যুদ্ধ করতে করতে একজন পেটে কাল্পনিক খোঁচা খেয়ে কাল্পনিকভাবে মরে গেলো। সে মরারও বাহার কতো! অর্থাৎ আলতা চিপে অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের বীভৎস খিঁচুনি দেখিয়ে বাস্তব মরা নয়, সে খুব আর্টিষ্টিক মরা, একবারে ইস্‌থেটিক মরা। ধরুন—একবার হয়তো হাতটা নড়ে উঠলো—তারপর একটা ঠ্যাং তির তির করে কাঁপলো—তারপর মুণ্ডুটা দুবার নড়লো, চোখটা দুবার ঘুরলো। ব্যাস—তারপর জিভ বের করে এন্তেকাল ফরমালো। এবং সেই সময় যখন তার সদ্য বিধবা স্ত্রী ছুটে এসে রৈ-রাই করে কাঁদছে তখন যদি সেই মৃত লোকটা উঠে পুট্‌পুট্ করে চলেই যায়—তো দর্শকরা কিছু মনে করে না। কারণ স্ত্রীর দুঃখটাই তো প্রধান সেখানে। স্বামীটা তো অবান্তর।

এই পড়ে বুকে ভরসা এলো—কারণ সাহেবে একে সার্টিফিকেট দিয়েছে। এবারে নিশ্চয়ই আমাদের দেশের ইংরেজি শিক্ষিত লোকেরা এর কদর বুঝবেন। আর তো কিছুই না খালি মেনে নেওয়া। ধরে নিন আপনারা যদি মনে করতেন যে এটা একটা গভীর বন এবং আমি একটা হনুমান, তাহলে আমি হাজার আপত্তি করলেও কি চলতো? সকলে মিলে আমার মুখ পুড়িয়ে প্রমাণ করে ছাড়তেন যে আমি তাই।—তা' হলে সেই মনে করাটাই আর একটু বেশী করে করুন না, সব ঝঞ্ঝাট মিটে যায়। যেমন মনে করুন, আমি কারোর বাড়ীর দরজায় গিয়ে কড়া নাড়ছি আর ডাকছি—

শম্ভু—অমর—অমর আছো নাকি?

[অমর ষ্টেজে আসে]

অমর—কে? (দোতলা থেকে নীচে তাকানোর ভঙ্গী করে সে তাকায়) আরে শম্ভুদা—কি ব্যাপার, নীচে দাঁড়িয়ে কেন? চলে আসুন।

শম্ভু—(ওপরের দিকে তাকিয়ে) কি করে যাবো? দরজা বন্ধ যে।

অমর—ঠেলুন—খুলে যাবে—সিঁড়ি দেখতে পাবেন—সোজা চলে আসুন।

শম্ভু—তাই নাকি (দরজা ঠেলার ভঙ্গী করেন—সামনে যেন সিঁড়ি দেখতে পান, সিঁড়িতে ওঠবার ভঙ্গী করতে করতে।) আমি তো বুঝতেই পারিনি।

অমর—কি করে বুঝবেন—এভাবে তো কোনোদিন আসেন নি। (ততক্ষণে শম্ভু মিত্র ওপরে উঠে এসেছেন।) তারপর কি ব্যাপার? হঠাৎ এই সময়ে—মানে এ রকম অসময়ে—

শম্ভু—এমনি এলাম—একেবারে এমনি নয়, বলতে পারো হাসাতে এলাম—বা হাসির খোরাক জোগাড় করতে এলাম। সম্পাদক বলেছে হাসির নাটক করতে হবে, তার নাকি দারুণ বক্স্ অফিস্।

অমর—হাসাতে এলেন—তা বেশ চলুন বসবার ঘরে গিয়ে বেশ জমিয়ে বসি। আমরা বাঙ্গালীরা শুনি কাঁদুনে জাত—

শম্ভু—হ্যাঁ বল্লভভাই বলে গেছেন—

অমর—সুতরাং হাসতে হলে বেশ কোমর বেঁধে বসতে হবে (কথা বলতে বলতেই তাঁরা একই জায়গায় দু'বার বৃত্তাকারে ঘুরে যেন অন্য ঘরে এলেন—এই ভঙ্গী করে অমর গাঙ্গুলী বললেন—) নিন বসুন এই চেয়ারটায়—আমি জানালাটা খুলে দি, যা গরম। (অমর গিয়ে পেছনে কল্পিত জানলা খোলেন। শম্ভু মিত্র অমর নির্দিষ্ট কল্পিত চেয়ারে বসার ভঙ্গী করে থাকেন।)

শম্ভু—বাঃ বেশ বাতাস আসছে তো।

অমর—হ্যাঁ দক্ষিণমুখী জানলা যে। কি, বেশ আরাম করে বসেছেন তো? (অমরও এসে শম্ভু মিত্রের পাশে বসেন)

শম্ভু—কি হে সিগারেট আছে নাকি?

অমর—হ্যাঁ নিশ্চয়ই—এখন আপনি যা চাইবেন তাই পাবেন আমার কাছে। (পকেট থেকে সিগারেটের প্যাকেট বার করার ভঙ্গী করেন। প্যাকেট থেকে যেন একটা বার করে শম্ভু মিত্রকে দেন, আর একটি নিজে মুখে নেন। অন্য পকেট থেকে দেশলাই বার করে দুজনার সিগারেট ধরান—এবং উভয়েই খুব আরাম করে সিগারেট খাওয়ার ভঙ্গী করেন।)

অমর—কি, চা খাবেন নাকি?

শম্ভু—হ্যাঁ খেতে পারি, যদি অসুবিধা না হয়।

অমর—আরে না। অসুবিধা আবার কি হবে। (বাঁ দিকের wings-এর কাছে গিয়ে) বৌদি, দু' কাপ চা—

শম্ভু—যদি অসুবিধা হয় তাহলে—

[নেপথ্যে থেকে বৌদি বলেন 'না না কোন অসুবিধা হবে না। আমি এক্ষুনি নিয়ে যাচ্ছি।'—অমর এসে আবার নিজের চেয়ারে বসার ভঙ্গী করেন। কিছুক্ষণের মধ্যেই বৌদি দু হাতে করে কল্পিত চায়ের কাপ নিয়ে আসেন। এঁরা দুজনে বৌদির হাত থেকে চায়ের কাপ নেন। শম্ভু মিত্র নিজের হাতের কল্পিত সিগারেটের দিকে চেয়ে বলেন—]

শম্ভু—এঃ এত বড় সিগারেটটা নষ্ট হবে।

অমর—ঠিক আছে ফেলে দিন না—আবার দেবো—

শম্ভু—ওঃ দাতাকর্ণ যে।

অমর—এই কিছুক্ষণের জন্য।

[শম্ভু মিত্র সিগারেট ফেলে দেন। পায়ের উপর পা তুলে আরাম করে বসে চা খেতে থাকেন। অমরকেও সেই রকমই আরাম পেতে দেখা যায়। বৌদি দুজনার দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকে বলেন]

বৌদি—তা' কি খবর?

শম্ভু—এই এলাম আর কি।

অমর—শুধু এলেন না—হাসাতে এলেন।

বৌদি—ওঃ—তা—কই—?

অমর——হ্যাঁ—কই হাসান!

শম্ভু—কেন, হাসি পাচ্ছে না?

অমর ও বৌদি—না।

শম্ভু—(কল্পিত চেয়ার থেকে টলতে টলতে দাঁড়িয়ে) সে কি এত কষ্ট করছি তবু হাসি পাচ্ছে না?

অমর—আরে এতে হবে না শম্ভুদা—এতে হবে না।

[অমরও দাঁড়িয়ে ওঠে]

বৌদি—হ্যাঁ, এতে হবে না।

অমর—এতে কোন গল্প নেই, কোন—যাকে বলে human interest, কোন popular appeal নেই—খামোকা হাসি পেলেই হোল?

শম্ভু—ওঃ human interest, popular appeal কিছুই নেই, না? তাহলে! তাহলে কি করা যায়?

বৌদি—তাহলে—

অমর—তাহলে— [সকলেই গালে হাত দিয়ে চিন্তার ভঙ্গী করেন]

বৌদি—আচ্ছা, আমি একটা কথা বলবো?

শম্ভু—হ্যাঁ, হ্যাঁ, নিশ্চয় নিশ্চয়—

অমর—বলুন না, বলুন।

বৌদি—আচ্ছা, পপুলার করতে হবে, এই তো? তা পৃথিবীতে সব চেয়ে popular সব চেয়ে interest-এর জিনিষ কি?

শম্ভু ও অমর—সব চেয়ে পপুলার?...লারে লাপ্পা—

বৌদি—না, না, তার চেয়েও পপুলার? প্রেম। পৃথিবীর সব চেয়ে popular জিনিষ হচ্ছে প্রেম।

শম্ভু—নিশ্চয়ই, দেখছো না birth rate কি high!

বৌদি—বেশ, তাহলে সব চেয়ে popular জিনিষ যদি প্রেম হয় তাহলে আমাদের কি করা উচিত?

শম্ভু—কি করা উচিত?

অমর—প্রেমে পড়া উচিত।

বৌদি—আহা, সে তো ব্যক্তিগত ব্যাপার? আমাদের—আমাদের একটা লভ্‌সীন্ করা উচিত।

শম্ভু—লভ্‌সীন্! লভ্‌সীনটা আবার কি?

বৌদি—আরে লভ্‌সীন্ বোঝে না—মানে প্রেমের অভিনয়—

অমর—হ্যাঁ, হ্যাঁ, বুঝতে পেরেছি, বুঝতে পেরেছি। লভ্‌সীন্—লভ্‌সীন্। বায়স্কোপে দেখেছি।

বৌদি—আচ্ছা, তাহলে একটা লভ্‌সীন্ করা যাক। কিন্তু তাহলে তো এই টেবিলগুলো সরাতে হবে।

শম্ভু ও অমর—হ্যাঁ, হ্যাঁ,—এক্ষুণি সরিয়ে দিচ্ছি।

[দুটো কল্পিত চেয়ার এবং একটা টেবিল ওরা দুজনে নিয়ে যেন রেখে আসে একদিকে—রেখে হাত ঝেড়ে বৌদির কাছে এসে দাঁড়ায়।]

বৌদি—আচ্ছা লভ্‌সীন্ করতে হলে প্রথমেই কী দরকার?

শম্ভু—কি? চাঁদ, আকাশ—

অমর—আর দক্ষিণের খোলা বাতাস—

বৌদি—আরে ওসব তো পরে—তারও আগে দরকার একজন নায়ক এবং নায়িকার।

শম্ভু—হ্যাঁ, সে তো বটেই—নইলে একা চাঁদ আর কি করবে?

অমর—হ্যাঁ, ড্যাব্ ড্যাব্ করে তাকিয়ে থাকা ছাড়া?

বৌদি—আচ্ছা তাহলে আমাদের দরকার একজন নায়ক এবং নায়িকা।

শম্ভু—নায়িকার দরকার (বলেই তাড়াতাড়ি দর্শকদের দিকে তাকিয়ে নায়িকা খোঁজার ভঙ্গী করেন।)

বৌদি—(অমরের কাছে গিয়ে) নায়িকা তো আমিই হতে পারি।

শম্ভু—তুমি! তুমি হবে!

অমর—হ্যাঁ, হ্যাঁ, শম্ভুদা, বৌদিই হোন না—অনেকদিন থেকে আমাদের দলে রয়েছেন।

শম্ভু—আচ্ছা, তাহলে তুমিই হও।

বৌদি—আচ্ছা নায়িকা তো তাহলে আমিই হলুম। এখন নায়ক?

[অমর নায়কের কথা শুনেই তাড়াতাড়ি একটু এগিয়ে পকেট থেকে রুমাল বার করে মুখ মুছে একদিকে কায়দা করে তাকিয়ে একটা পা নাড়তে থাকেন। বৌদি একবার শম্ভু মিত্রের দিকে—একবার অমর গাঙ্গুলীকে দেখেন]

বৌদি—(শম্ভু মিত্রকে) আচ্ছা, নায়ক তুমিই হও।

শম্ভু—আমি!

অমর—(বৌদির কথা শুনে সে অপ্রস্তুত ভাবটা কাটাবার জন্য হাসবার ভঙ্গি করে বলে) হ্যাঁ, হ্যাঁ, শম্ভুদা আপনিই হোন্। আপনিই হোন্।

শম্ভু—আমিই হবো!—আমাকে অবশ্য মানায় ভাল—চেহারাটা তো—

অমর—সে অবশ্য আমাকেই কি আর কম মানায়? তা যাক্‌গে—আপনিই হোন্।

বৌদি—এখন তা হলে তুমি নায়ক আর আমি নায়িকা। আর এই ঘরটা ধরো একটা রাস্তা।

শম্ভু—রাস্তা, মানে Public thoroughfare

অমর—ওরে বাবা, ঘরটা রাস্তা!

বৌদি—হ্যাঁ, ধরো এইটা একটি রাস্তা। এখান দিয়ে নায়িকা College থেকে ফিরছে—আর নায়ক আসছে। রাস্তায় তাদের দুজনার ধাক্কাধাক্কি হবে।

শম্ভু—রাস্তায় ধাক্কাধাক্কি হবে?

অমর—আর তাতেই হবে পরিচয়?

বৌদি—হ্যাঁ, হ্যাঁ, লভ্‌সীনে তাই হয়। নাও নাও—আমি যাচ্ছি তুমি এসো।

[দুজনেই একটু পেছিয়ে গিয়ে start নিতে যান, শম্ভু মিত্র হঠাৎ চেঁচিয়ে ওঠেন]

শম্ভু—দাঁড়াও, দাঁড়াও—আমি তো নায়ক—তা এ নায়ক কে? মানে সে কোত্থেকে আসছে? অফিস থেকে? কলেজ থেকে?—না, বলাও যায় না আজকাল, স্কুল থেকে?

বৌদি—নায়ক আসছে। এটাই হোলো বড় কথা। নায়ক—নায়ক।

শম্ভু—ও নায়ক—নায়ক। তার অফিস নেই, কলেজ নেই, কিছু নেই?

অমর—খালি সে ধাক্কা দিয়ে বেড়ায়?

শম্ভু—বাঃ বেশ তো। ঠিক আছে আমি যাচ্ছি। (দুহাত জোড় করে প্রণাম করে বলে) জয় নটনাথায়।

[চলতে সুরু করেন—ওদিক থেকে বৌদিও আসছিলেন—মাঝ পথে দুজনার ধাক্কা লাগে। বৌদি এক পা পেছিয়ে যান।]

বৌদি—ক্যা—আপ্ দেখতে নেহি—-চোখ খুলে চলতে জানেন না?—আপনি—আপনি—

[হঠাৎ শম্ভু মিত্রের গায়ে সজোরে এক চড় বসিয়ে দেন]

শম্ভু ও অমর—আরে আরে এ কি হচ্ছে? মারামারি কেন?

বৌদি—(গম্ভীর ভাবে) লভ্‌সীন লভ্‌সীন।

শম্ভু—ওঃ এ বড় জখমী লভ্‌সীন! তা আমি কি করবো?

বৌদি—আম্‌তা আম্‌তা করো—আম্‌তা আম্‌তা করো।

শম্ভু—ইয়ে, দেখিয়ে বাত এইসী হুয়ী—মানে ব্যাপারটা হোলো—মানে আপনাকে দেখে আমি—মানে—

[বৌদি চোখের কোণ দিয়ে সভঙ্গিমায় শম্ভু মিত্রের দিকে তাকিয়ে হঠাৎ বাঁদিকের উইংসের দিকে চলে গিয়ে নেপথ্যে তাকিয়ে বলেন—'প্লে ব্যাক্'। নেপথ্য থেকে বেজে উঠলো হারমোনিয়ম।—একটি মেয়ের কণ্ঠে শোনা যায় 'মালতী লতা দোলে' গানের লাইনটি। বৌদি গানের কথার সঙ্গে ঠোঁট মেলাতে থাকেন; এবং দুহাত দিয়ে ধরে থাকেন একটা কল্পিত গাছের ডাল। শম্ভু মিত্র এবং অমর গাঙ্গুলী অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকায় তাঁদের বোঝাবার জন্য বলেন, 'গাছের ডাল; গাছের ডাল'।—আবার গান আরম্ভ করেন। গানটা ফিল্মী কায়দায় গাওয়া হচ্ছিল। শম্ভু মিত্র বলে ওঠেন—]

শম্ভু—যাও যাও—এই কি রবীন্দ্রনাথের গান হচ্ছে নাকি? ওই 'দোলে'—'দোলে' করে?

[নেপথ্যে যিনি হারমোনিয়ম বাজাচ্ছিলেন তিনি বলেন, আরে সব সময়ে কি aesthetic দিক দেখলেই চলে? Box office বলেও তো একটা কথা আছে।]

শম্ভু—আর বংশদণ্ড বলেও একটা কথা আছে। সেটা যখন মাথায় পড়বে বুঝবে তখন। আরে এই কি রবীন্দ্রনাথের গান? বিশ্বভারতীই কি permission দেবে?

অমর—আর দিলেও সে অনেক টাকা। আর তাছাড়া ওসব বাদ দিয়েও—হাসি পাবে না এর থেকে।

শম্ভু—ঠিক্—এতে লোক হাসবে না—আমার তো হাসি পাচ্ছে না।

বৌদি—তাহলে?

শম্ভু—তাহলে—

অমর—তাহলে—

[সবাই আবার গভীর ভাবে ভাবতে সুরু করে। হঠাৎ বৌদি বলে ওঠেন—]

বৌদি—আচ্ছা আমি আর একটা চেষ্টা করবো?

শম্ভু—কী চেষ্টা?

অমর—হ্যাঁ, চেষ্টা শেষ পর্যন্ত করতে হবে।

বৌদি—ধরো, আমরা যদি আর একটা—আর একটা লভ্‌সীন করি?

শম্ভু—আরে এর মাথায় খালি লভ্‌সীন ঘোরে রে?

অমর—যুগটা কি দেখুন।

বৌদি—না না এটা আগের মত নয়—এটা অন্য রকমের লভ্‌সীন; প্রগ্রেসিভ লভ্‌সীন।

শম্ভু—প্রগ্রেসিভ লভ্‌সীন কি রকম? প্রগ্রেস করতে করতে লভ্?

অমর—না লভ্ করতে করতে প্রগ্রেস।

শম্ভু—বাব্‌বা, সমস্ত loveই তো দেখি বিয়ের দু'বছরের মধ্যে গন্‌ফট্।

বৌদি—আহা দেখোই না, তোমরা কিছু না দেখেই মন্তব্য করতে থাকো।

অমর—আচ্ছা ঠিক আছে, দেখেই মন্তব্য করবো, নিন আরম্ভ করুন।

শম্ভু—হ্যাঁ, আরম্ভ কর, দেখাই যাক্।

বৌদি—বেশ তাহলে আরম্ভ করছি। নায়ক আছে, নায়িকা তো আছেই। এখন একজন পুলিশ দরকার যে—

অমর—পুলিশ—এই দেখো ফ্যাসাদ—এখানে পুলিশ কোথায় পাবো!

বৌদি—কেন আপনিই হোন না, হ্যাঁ হ্যাঁ আপনিই হোন।

অমর—(ঘাবড়ে গিয়ে) আমি পুলিশ, মানে এই চেহারায়?

শম্ভু—হ্যাঁ হ্যাঁ, ৩২ ইঞ্চি বুক হলেই পুলিশ হওয়া যায়।

অমর—আমার ৩৩ ইঞ্চি।

শম্ভু—ওঃ তাহলে তো তুমি একেবারে সার্জেণ্ট হয়ে যাবে।

বৌদি—যাক্ তাহলে সব হয়ে গেল, এবারে আরম্ভ করা যাক। (পেছনের দিকে তাকিয়ে) আচ্ছা এখানে তো একটা জানলা আছে?

অমর—হ্যাঁ দক্ষিণমুখী।

বৌদি—আর তার নীচে দিয়েই তো একটা রাস্তা আছে?

অমর—হ্যাঁ মণি সমাদ্দার লেন।

বৌদি—আচ্ছা ঠিক আছে। (অমরকে) আপনি শুনুন—ও যখন দৌড়ে পালাবে—আপনি তখন গিয়ে ওকে ধরবেন।

শম্ভু—কে—অমর, আমাকে ধরবে?

অমর—কেন, পারবো না ভাবছেন? হ্যা কত লোককে ধরে ফেললাম।

শম্ভু—আচ্ছা দেখাই যাক্।

[অমর পেছনে গিয়ে খৈনী খাবার ভঙ্গী করে। বৌদি একবার ভেবে নিয়ে ছোট ছোট step-এ দৌড়ে কল্পিত জানলা দিয়ে নীচের দিকে তাকান—হঠাৎ কি যেন দেখে ভয় পেয়ে শম্ভু মিত্রর কাছে দৌড়ে এসে বলেন]

বৌদি—ওগো এক্ষুণি দেখলাম রাস্তার মোড়ে একজন পুলিশ দাঁড়িয়ে রয়েছে। নিশ্চয়ই তোমাকে ধরতে আসছে—তুমি পালাও—পায়ে পড়ি তুমি পালাও।

শম্ভু—(একটু হেসে হাত দুটো বুকের ওপর রেখে একটা পা নাচাতে নাচাতে বলেন—) কেন, আমাকে ধরবে কেন?

বৌদি—বাঃ তোমাকে ধরবে না? তুমি যে underground political leader—তোমাকে ধরবে না তো কাকে ধরবে?

শম্ভু—(হঠাৎ যেন ভয় পায়) এই এই আমি কেন political leader হতে যাবো? এ সব যা তা কথা বোলো না।

অমর—(পেছন থেকে দৌড়ে এসে) আরে এসব কি কথা। এখনই কে সত্যি বলে মনে করবে—শেষে হাসতে গিয়ে কাঁদতে হবে।

শম্ভু—হাঁ বহুরূপী তখন লাটে উঠবে। (দর্শকদের দিকে তাকিয়ে) না না মশায়—এসব সত্যি নয়, আপনারা বিশ্বাস করবেন না।

বৌদি—আরে মহা মুস্কিল হোলো তো—তুমি যদি Underground Political Leader না হও তাহলে গল্পে Political significance আসে কোত্থেকে? গল্পটা Progressive হবে,—না? তাহলে—তাহলে—

অমর—তাহলে হয়েই ফেলুন শম্ভুদা—

শম্ভু—দাঁড়াও, আমি চিন্তা করে দেখি—

বৌদি—না, না, আর চিন্তা নয় ওগো তুমি পালাও—চল ঐ সিঁড়ি দিয়ে—(দুজনে ছোট ছোট step-এ দৌড়ে প্রায় footlights-এর কাছে যান—হঠাৎ বৌদি থেমে) না না সিঁড়ি দিয়ে নয়—ওরা বোধ হয় সিঁড়ি দিয়ে উঠে আসছে—তুমি ঐ জানলা দিয়ে পালাও— (আবার সেই ভাবে দৌড়ে পেছনের নির্দিষ্ট জানলার কাছে গিয়ে থামেন) নাও তুমি এই জানলা দিয়ে লাফিয়ে পালাও।

শম্ভু—এই জানলা দিয়ে? (জানলা দিয়ে নীচের দিকে তাকিয়ে ভয় পান) এত উঁচু থেকে লাফাবো?

বৌদি—হ্যাঁ, হ্যাঁ, লাফাও—তুমি তো নায়ক—তুমি তো সহজে মরবে না—ওগো তুমি পালাও—তুমি বীর—তুমি পালাও।

শম্ভু—বীর হয়ে পালাবো—(এক হাত দিয়ে কল্পিত জানলার গরাদ ধরেন এবং একটা পা সেই জানলার উপর রাখেন—রেখে বলেন) আমারও তো এখন কিছু বলার দরকার—আমি কি বলবো?

বৌদি—বার্ণার্ড শ থেকে একটা ডায়ালগ বলো—

শম্ভু—বার্ণার্ড শ?—আচ্ছা—(জানলা থেকে হাত পা নামিয়ে একটু সাহেবী কায়দা করে বলেন) The night is calling me—me—me—আমার মনে পড়ছে না আমি বরং তুলসী লাহিড়ীর 'পথিক' নাটক থেকে বলি—'আমি তো চল্লাম—আবার দেখা হয় কিনা কে জানে'—

[বলে জানালার নীচে তাকিয়ে নীচে লাফিয়ে পড়ার ভঙ্গী করেন। এবং লাফিয়ে নীচে থেকে ওপরের দিকে তাকিয়ে থাকেন)

বৌদি—(জানালা ধরে নীচের দিকে তাকিয়ে) আমি তো এখানেই থাকবো—যদি মনে

হয়—সময় পাও—

[শম্ভু মিত্র নিচে থেকে হাত নাড়েন—বৌদি কান্নার ভঙ্গীতে—মুখে হাত দিয়ে জানলার কাছ থেকে দৌড়ে চলেন front stage-এ। অমর এতক্ষণ নীচে দাঁড়িয়ে খৈনী খাচ্ছিল হঠাৎ যেন সে দেখতে পেল বাড়ীর জানলা দিয়ে কে লাফিয়ে পড়লো। সেইদিকে তাকিয়ে বলে উঠলো—]

অমর—আরে খিড়কী সে কেঁও উতার আয়া। চোট্টা হোঙ্গে জরুর—আরে এ

শম্ভু—এই সেরেছে—এ আবার কি ফ্যাসাদ—

[শম্ভু মিত্র এবং অমর গাঙ্গুলী নিজেদের জায়গায় দাঁড়িয়েই খুব জোরে দৌড়ানোর ভঙ্গী করেন। সেইভাবে দৌড়াতে দৌড়াতেই অমর চীৎকার করতে থাকে—'পাকড়ো পাকড়ো।' কিছুক্ষণ পরে হঠাৎ দুজনা থেমে যায়—অমর মুখ মুছতে মুছতে সামনের দিকে চলে যায়—একটু গম্ভীর তার মুখ। শম্ভু মিত্র ও বৌদি উৎসুক দৃষ্টিতে তার পেছনে পেছনে যান।]

শম্ভু ও বৌদি—কি হোলো—কি হোলো? কেমন হোলো?

অমর—হোলো না—কিছুই হোলো না।

বৌদি—কিছুই হোলো না মানে—হাসি পেল না?

অমর—না—হাসি পেল না—

বৌদি—(শম্ভু মিত্রকে) কি তোমারও হাসি পেল না?

শম্ভু—হ্যাঁ, আমার মানে,—একটু একটু হাসি পাচ্ছিল—

অমর—নায়ক হয়ে বসে আছেন—হাসি তো পাবেই—

বৌদি—তাহলে আপনার হাসি পেল না—

অমর—না, এতে আমার হাসি পেল না—

বৌদি—(ক্রমশঃ রাগতে থাকেন) তাহলে আপনার হাসি পেল না—

অমর—(ক্রমশঃ দুর্বল হয়ে পড়ে) না—পেল না—

বৌদি—তাহলে আপনার হাসি জীবনে কোনদিন পাবে না—

[বৌদি রেগে Stage থেকে চলে যান]

শম্ভু—দিলে তো রাগিয়ে—

অমর—হ্যাঁ, সত্যি কথা বলার দোষ—

শম্ভু—কে বলেছে সত্যি কথা বলতে? সংস্কৃত পড়নি—'মা ব্রূয়াৎ সত্যম্ অপ্রিয়ম্'—

অমর—সংস্কৃতে তের পেয়েছিলাম বলে হেড পণ্ডিত ইস্কুলে আমাকে প্রমোশন দেননি।

শম্ভু—তাহলে?

অমর—তাহলে—

[শম্ভু মিত্র প্রথমে কোমরের পিছনে হাত রেখে এবং তাঁর পিছনে অমরও সেইভাবে একবার Stage-এর ডান দিকে একবার বাঁ দিকে ঘুরতে থাকেন—মুখে ভীষণ চিন্তা—হঠাৎ শম্ভু মিত্র অমরের পিঠে ধাক্কা দিয়ে বলেন—]

শম্ভু—হয়েছে—

অমর—কি হয়েছে?

শম্ভু—জীবন কোথায়?

অমর—(বুকে হাত দিয়ে) কোথায়?

শম্ভু—রাস্তায়, মাঠে, ঘাটে। এই চার দেয়ালের মধ্যে, এই ঘরের মধ্যে জীবনকে উপলব্ধি করা যাবে না—হাসিও পাবে না—সুতরাং চলো—বাইরে—হাসির খোরাক Popular জিনিষের খোরাক পাবে।

অমর—চলুন—যাওয়া যাক—

[দুজনে সেই জায়গাতে দুবার বৃত্তাকারে ঘুরে—সিঁড়ির কাছে—আসেন এবং কল্পিত সিঁড়ি দিয়ে নেমে নীচে আসেন। দরজা বন্ধ করে দিয়ে রাস্তা দিয়ে চলতে থাকেন চারদিক দেখতে দেখতে। একটু হেঁটে তারপর এক জায়গায় দাঁড়িয়ে থেকে হেঁটে যাওয়ার ভঙ্গী করেন]

শম্ভু—কই হে, কিছুই তো দেখা যাচ্ছে না।

অমর—হ্যাঁ, জীবনও শুকিয়ে যাচ্ছে—এ থেকে বোঝা যায়।

[হঠাৎ একপাশ থেকে একজন লোক একটা মটর আঁকা ছবি ধরে মুখে horn-এর আওয়াজ করতে করতে ওদের cross করে চলে যায়। আর একটা লোক Bus-এর ছবি নিয়ে অন্যদিক থেকে আসে। অমর যেন প্রায় Bus চাপা পড়েছিল, শম্ভু মিত্র টেনে নেন ও Bus Driver-কে বকে ওঠেন। Bus Driver নিজের ভাষায় চেঁচিয়ে ওঠে। হাতে রিক্সার ছবি নিয়ে মুখে 'টুং টুং' করতে করতে একটি লোক ঢোকে—চলে যায়। শেষে একটি লোক Tram-এর ছবি নিয়ে ঢোকে—মুখে ট্রাম চালানোর 'ঠ্যাং ঠ্যাং' আওয়াজ। সে সোজা রাস্তা ধরে—মঞ্চের এক দিকে থেকে অন্য দিকে যায়, শম্ভু মিত্র বলেন—]

শম্ভু—দেখেছ, ইংরেজ কোম্পানী কিনা—ঠিক লাইন ধরে চলেছে।

[ওরা তখনও হাঁটার ভঙ্গীতে পা নেড়ে চলেছেন]

শম্ভু—নাঃ কোথাও জীবনের খোরাক, হাসির খোরাক নেই।

[হঠাৎ পেছন থেকে শোভাযাত্রীদের ক্ষীণ আওয়াজ শোনা যায়। 'চাল চাই, কাপড় চাই, চাল চাই' ইত্যাদি। শম্ভু মিত্র সেইদিকে তাকিয়ে ঘুরে মিছিল দেখতে পেয়ে বলে ওঠেন—]

শম্ভু—এই দেখ আবার মিছিল আসছে। এই নিয়ে নাটক লেখো—দেখো, পুলিশেও ছাড়বে না, আর লোকেও দেখবে না।

[শোভাযাত্রীদের আওয়াজ শোনা যাচ্ছে আরও কাছে। শম্ভু মিত্র উল্টো দিকে তাকিয়ে বলে ওঠেন—]

শম্ভু—এই রে—ঐ Police আসছে। লাগল ঝঞ্ঝাট। পালাও।

অমর—এ্যাঁ বলেন কি?

[দুজনে দৌড়ে পালিয়ে যান]

[মিছিল ঢোকে—কয়েকজন মেয়ে এবং কয়েকজন ছেলে—সামনের কয়েকজন হাতটা উঁচু করে থাকে। যেন ফেস্টুন বা পতাকা কিছু ধরে আছে। খুব ছোট ছোট Step-এ এগোয়

তারা, আস্তে আস্তে মুখে বলতে থাকে—চাল চাই, কাপড় চাই ইত্যাদি। এরা কিছুটা ঢুকে গেলে অন্য দিক থেকে একজন সার্জেন্ট এবং দুজন পুলিশ ঢোকে। সার্জেন্ট বা পুলিশের পরিচ্ছদের মধ্যে কোন বিশেষত্ব নেই—কেবল সার্জেন্ট-এর একটি Crossbelt থাকে। পুলিশেরা হাতে বন্দুক ধরে থাকার ভঙ্গী করে। সার্জেন্ট মুখে বলতে বলতে আসেন left, right, left, right, প্রায় ওদের কাছে এগিয়ে বলে—]

সার্জেন্ট—হল্ট্।

[পুলিশেরা মার্চ বন্ধ করে—শোভাযাত্রীরা একই জায়গায়—দাঁড়িয়ে চলার ভঙ্গী করতে থাকে এবং ঐ একই কথা বলে যেতে থাকে]

সার্জেন্ট—তোমরা ফিরে যাও।

[কেউ উত্তর করে না—একই ভাবে slogan দিতে থাকে]

—তোমরা ফিরে যাবে কিনা?

[শোভাযাত্রীদের মধ্যে সামনের মেয়েটি বলে ওঠে]

মেয়ে—না।

সার্জেন্ট—তোমরা ফিরে না গেলে আমি গুলি করতে বাধ্য হবো।

[শোভাযাত্রীরা পরস্পরের দিকে তাকায়। উচ্চ গ্রামে আবার সুরু করে 'চাল চাই, কাপড় চাই।']

সার্জেন্ট—(প্রচণ্ড রেগে একবার পুলিশের দিকে—আর একবার মিছিলের দিকে তাকায়—পরে পুলিশদের বলে)—রেডি,—এম্—

[পুলিশরা বসে পড়ে—এবং কল্পিত বন্দুক তাগ করে ধরে—হঠাৎ মিছিলের সামনের ছেলেটি খুব তীব্র গলায় বলে ওঠে—]

যুবক—চাল চাই।

সার্জেন্ট—(আর বলতে না দিয়ে) Fire—

[বন্দুকের আওয়াজ হয়—একটি ছেলে ও মেয়ে চীৎকার করে পড়ে যায়। শোভাযাত্রীরা সকলে বসে পড়ে। তাদের মধ্যে একটা হাহাকার আর গোঙানি শোনা যায়। পুলিশেরা march করতে করতে চলে যায়—সারা Stage তখন লাল আলোয় ভরে গেছে—অমর দৌড়ে ঢুকলো—আহত মেয়েটির মাথায় হাত দিয়ে দেখতে থাকে। শম্ভু মিত্র ঢোকেন—অমরের পিঠে টোকা দিয়ে বলেন—]

শম্ভু—কি অমর—এবার হাসি পাচ্ছে? এবার নিশ্চয়ই লোকের খুব হাসি পাবে?

[আস্তে আস্তে মঞ্চে পর্দা নেমে আসে।]

[নিবেদন : এই নাটিকার কোনও লেখক নেই। একজনের সামান্য একটা আইডিয়া বিস্তার করে অভিনেতৃবর্গ নিজের নিজের কথা প্রায় নিজে নিজেই বানিয়েছেন। ফলে, প্রত্যেক অভিনয়ে কিছু কিছু অদল বদল হয়েই যায়। তাছাড়া, এটা মুখ্যত অভিনেতৃদের দ্বারা বানানো ব'লে এর কথার চেয়ে কথা বলার ভঙ্গীর মধ্যে হয়তো সামান্য একটু বৈশিষ্ট্য থাকে।

মিউজিক হলের স্কেচের ঠাট এর মধ্যে খানিকটা আছে।] □

শনিবার

বাদল সরকার

(১৯২৫)

চরিত্র

নবেন্দু
নবেন্দুর মা
নবেন্দুর বাবা
সুনন্দা
দিব্যেন্দু
পরিতোষ
বিশু
বাসু
সাগরিকা

[ঘরের প্রায় মধ্যস্থলে একটি লিখিবার টেবিল ও চেয়ার। একপাশে আর একটি চেয়ার। অন্যপাশে অল্প দূরে একটি ছোটো চৌকা টেবিল এবং একটি চেয়ার। কোনও টেবিলেই আচ্ছাদন নাই। পিছনে একটি ছোটো শেল্ফ্—তাহার নীচের তাকে জুতা এবং অন্যান্য তাকে হরেক রকম বস্তু। পিছনে একপাশ ঘেঁসিয়া একটি দরজা। তাহাতে পর্দা ঝুলিতেছে। আসবাব পুরাতন ও সাধারণ। সব মিলাইয়া একটি মধ্যবিত্ত পরিবারের বাহিরের ঘর, যাহা অন্দরের নানাবিধ কাজেও লাগাইতে হয়।

পর্দা সরিবার কয়েক সেকেণ্ড পরে খেলোয়াড়ের পোষাকে নবেন্দু ভিতরের দিক হইতে ছুটিয়া প্রবেশ করিল। ভিতর হইতে মায়ের ডাক আসিতে লাগিল।]

মা—(নেপথ্যে) নবু! ও নবু! চলে গেলি নাকি?

[নবেন্দু কর্ণপাত না করিয়া তাক হইতে একজোড়া খেলোয়াড়ি জুতা তুলিয়া লইল। মা প্রবেশ করিলেন এক গ্লাস দুধ হাতে। নবেন্দু ধাক্কা বাঁচাইয়া আবার ছুটিয়া ভিতরে গেল।]

মা—ও নবু!

[পিছন পিছন মা ভিতরে গেলেন। প্রায় সঙ্গে সঙ্গে নবেন্দু জুতা ও একটি হকি স্টিক হাতে প্রবেশ করিল। পিছনে স-গ্লাস মা।]

মা—নবু জ্বালাসনে বাবা। দুধটা খেয়ে যা। খালি পেটে এতো দৌড়ঝাঁপ চলে?

নবেন্দু—(জুতা পরিতে পরিতে) খালি পেট কোথায়? এই তো একপেট হালুয়া গেলালে?

মা—ও মা, সে কতোটুকু? দুধটা খেয়ে নে। দুধ না খেলে শরীর থাকে কখনো?

নবেন্দু—দুধ খাবো? ইণ্ডিয়া এবার অলিম্পিকে হেরে গেছে খবর রাখো?

মা—তা কে কোথায় হেরে গেলো, তা বলে তুই দুধ খাবি নে?

নবেন্দু—আরে হারলো তো ঐ দুধ খেয়ে! ভুঁড়ি নিয়ে কি হকি খেলা হয়?

[স্টিক লইয়া নবেন্দু বাহির হইয়া গেল। ভিতর হইতে বাবার প্রবেশ। পরিধানে বাহিরের পোষাক।]

মা—তুমি আবার এই অসময়ে চললে কোথায়?

বাবা—অসময় হবে কেন?

মা—অসময় নয়? বেলা দুটো অসময় নয়?

বাবা—আহা, শনিবার—

মা—শনিবার তো তোমার কি? দেড় বছর হোলো রিয়াটার করেছো, এখনো শনি রবি জ্ঞানটা টনটনে রেখেছো!

বাবা—গণেশ মিত্তির তো রিটায়ার করেনি এখনো? গণেশ বলেছিল শনিবার যেতে।

ওর মেয়ের এক সম্বন্ধ এসেছে, তার দুটো শলা পরামর্শ—

মা—সে জানি। জমির মামলা, মেয়ের বিয়ে—সব পরামর্শ তোমাদের হয় দাবার ছক পেতে। ফেরা হবে কখন?

বাবা—এই তো—ধরো ঘণ্টা খানেক—

মা—তোমার ঘণ্টাখানেক চিনি আমি। এই দুধটা খেয়ে নাও দেখি দয়া করে।

বাবা—সে কি? এই তো ভাত খেয়ে উঠলাম!

মা—ভাত খেয়েছো দু'ঘণ্টা আগে। কতো রাত্তির অবধি দাবার আড্ডা চলবে তার ঠিক আছে?

বাবা—আরে বলছি যতো দাবা নয়—

মা—আচ্ছা দাবা হোক না হোক আমি কিছু বলেছি? আমি শুধু বলছি দুধটুকু খেয়ে উদ্ধার করে দিয়ে তারপর যেখানে ইচ্ছে যাও।

[সুনন্দার বাহির হইতে প্রবেশ। বাবা নিরুপায় হইয়া দুধ লইতে হাত বাড়াইয়াছিলেন। সুযোগ পাইয়া হাত পিছাইয়া লইলেন।]

কি রে, তোর কলেজ এতক্ষণে শেষ হোলো?

সুনন্দা—(টেবিলে বই আছড়াইয়া) কলেজ হয়ে গেছে কখ—ন। সাগরিকা টেনে নিয়ে গেলো ওদের বাড়ী।

মা—যা কাপড় ছাড়। আমি গিয়ে খাবার দিচ্ছি।

সুনন্দা—খাবো না মা কিছু। সাগরিকাদের বাড়ী চা খেয়েছি। তাছাড়া এক্ষুনি আবার বেরুতে হবে।

[বাবা নিঃশব্দে হঠিতেছিলেন। এতোক্ষণে বাহির হইয়া গেলেন।]

মা—এই তো এলি; আবার এক্ষুনি কোথায় যাবি?

সুনন্দা—সিনেমায় যাবো মা। সাগরিকা গাড়ী নিয়ে আসবে আধ ঘণ্টার মধ্যে।

মা—এই তো গত শনিবার সিনেমা দেখলি। আবার এর মধ্যে?

সুনন্দা—কি করবো? ও আমাকে না জিজ্ঞেস করেই টিকিট কেটে রেখেছে। নইলে এটা দেখবার একটুও ইচ্ছে ছিল না আমার। বিশ্বজিৎটাকে দু চোক্ষে দেখতে পারি না আমি।

মা—বিশ্বজিৎ আবার কে? বললি যে সাগরিকার সঙ্গে যাবি?

সুনন্দা—(হাসিয়া) বিশ্বজিৎ ফিল্মস্টার মা। তার 'সঙ্গে' যাচ্ছি না, তাকে দেখতে যাচ্ছি।

[সুনন্দা ভিতরে গেল]

মা—কই তুমি—একি, চলে গেলো? দেখেছো!

[সুনন্দা বই লইতে ফিরিল]

এই, তোর তো ফিরতে অনেক রাত হবে।

সুনন্দা—বাঃ, অনেক রাত কোথায়? ছটার মধ্যে বাড়ী পৌঁছে যাবো।

মা—ছটা অবধি উপোষ করে থাকবি নাকি? খেয়ে যাবি।

সুনন্দা—বললাম না খেয়েছি? চা, কেক, সন্দেশ—

মা—আচ্ছা, তাহলে এই দুধটুকু খেয়ে নে শুধু।

সুনন্দা—দুধ!! আমি দুধ খাই কোনোদিন?

মা—এ—কটুখানি আছে। নবু খেলো না, তোর বাবা খেলো না, কি করবো এটা নিয়ে বল্?

সুনন্দা—বড়দা এলে দিও।

মা—সে আপিস থেকে কখন ছাড়া পায় তার ঠিক আছে?

সুনন্দা—তবে তুমি খেয়ে নাও।

[সুনন্দা ভিতরে চলিয়া গেল]

মা—শোনো মেয়ের কথা! আমি দুধ খাবো! ও সুনী! শোন্—লক্ষ্মী মেয়ে—

[মা ভিতরে গেলেন। অল্প পরে দিব্যেন্দু ও পরিতোষ বাহির হইতে প্রবেশ করিল। দিব্যেন্দুর হাতে পেটমোটা অফিস ব্যাগ। বয়স ত্রিশ ছাড়াইয়াছে কয়েক বছর আগে। অতি সাধারণ অফিস-চাকুরে চেহারা। মুখে সব সময়েই কিছুটা চিন্তাগ্রস্ত ভাব। পরিতোষ সমবয়সী।]

দিব্যেন্দু—বোসো, বোসো।

পরিতোষ—বসা সেফ্ নয় ভাই। দুটো বেজে গেছে।

দিব্যেন্দু—তাতে হয়েছে কি? শনিবার তো।

পরিতোষ—কি হয়েছে তুমি বুঝবে কোত্থেকে? দিন এলে বুঝবে!

দিব্যেন্দু—(হাসিয়া) আমার দিন আসবে না।

পরিতোষ—ও কথা আমিও বলতুম। বেশী দিন নয়—দু বছর আগেও বলেছি। (বসিয়া পড়িল) যাক গে, কি বলছিলে বলো।

দিব্যেন্দু—বলছি। একটু চা খাবে তো?

পরিতোষ—(শঙ্কিত হইয়া) চা মানে—মাসীমা তো? না ভাই, থাক। গতবার মাসীমার 'চা' খেয়ে রাত্তির অবধি ভালো করে খেতে পারি নি বাড়ীতে। তাই নিয়ে অনেক পারিবারিক হেনস্থা গেছে। তাছাড়া সময়ও নেই। তুমি বলো—বাসু সাহেব কি বললো।

দিব্যেন্দু—ওর যা চিরকেলে কায়দা। বললো—আপনার বাড়ীতে কাজ আছে—আই কোয়াইট্ এ্যাপ্রিসিয়েট্। কিন্তু এই টেণ্ডারটি সোমবার এগারোটার মধ্যে দাখিল না হলে বিশ লাখ টাকার কনট্র্যাক্ট মিস্ হ'য়ে যাবে। সেটা আপনার আমার দুজনেরই ইণ্টারেস্টকে হিট করবে।

পরিতোষ—অর্থাৎ সিধে ভাষায়—করবে তো করো, নয় তো রাস্তা দেখতে হবে।

দিব্যেন্দু—যা বলেছো।

পরিতোষ—তো এতো জরুরী টেণ্ডার লাস্ট মোমেণ্ট পর্যন্ত পড়ে থাকে কেন?

দিব্যেন্দু—অই! সে কথা শুনছে কে? এস্টিমেটিং সেকশনে তিন মাস পড়ে থাকবে, আর আমাদের বেলা—ফাইল নিয়ে বাড়ী যাও, রোববার অফিসে এসো—যতো সমস্ত! আর কাজ কি সোজা? দেখবে? (ব্যাগ খুলিয়া এক তাড়া কাগজ বাহির করিল) এই—এই—এই—এই—এই এতোগুলো কম্পুটেশন্ রাত জেগে চেক্ করো, ক'রে রোববার এগারোটার মধ্যে অফিসে ছোটো নাকে মুখে গুঁজে। আর বোনাসের বেলা, প্রমোশনের বেলা (ভ্যাংচাইয়া) ডায়রেক্টর্স্ আর সিরীয়াস্লী কনসিডারিং, বাট ইউ সী—ব্যস্ হ'য়ে গেলো!

পরিতোষ—তুমি বেশী কাজ করো ব'লেই তোমার ঘাড়ে চাপে বেশী।

[মায়ের প্রবেশ]

মা—ও মা, দিবু কখন এলি? কে, পরিতোষ? তা দিবুর আক্কেল কি? আপিস থেকে এলি, ডাকবি তো আমাকে?

দিব্যেন্দু—পরিতোষ বললো চা খাবে না।

মা—চা ছাড়া আর কিছু খাবার জিনিস কি নেই ভূভারতে? পরিতোষ, বোসো বাবা, আমি আসছি।

পরিতোষ—(শশব্যস্তে) না না, মাসীমা, আমাকে এক্ষুনি ছুটতে হবে।

মা—ও মা, সে কি?

পরিতোষ—হ্যাঁ মাসীমা, বাড়ীতে ভীষণ জরুরী কাজ। দিব্যেন্দু চলি ভাই। আসি মাসীমা।

[পরিতোষের প্রস্থান]

মা—আপিস থেকে এসে কিছু মুখে না দিয়ে চলে গেলো। তোর খাবার আনি?

দিব্যেন্দু—(জামা খুলিতে খুলিতে) কি খাবার?

মা—লুচি ভেজে দি গোটা কয়েক? আর—

দিব্যেন্দু—লুচি? না থাক! ক্ষিদে পায় নি। অফিসে খেয়েছি কিছু।

মা—তবে একটু দুধ খাবি বাবা?

দিব্যেন্দু—দুধ?

মা—সামান্য একটু। খা না?

দিব্যেন্দু—আচ্ছা নিয়ে এসো।

মা—(খুশী হইয়া) আমি গরম করে আনি, তুই হাত মুখ ধো।

[মায়ের প্রস্থান]

দিব্যেন্দু—হাত মুখ ধোয়া! (কাগজের তাড়া টেবিলে পাতিয়া বসিল) পড়ো নি তো বাসু সাহেবের পাল্লায়—মনের আনন্দে শুধু হাত মুখ ধুয়ে যাচ্ছো!

[দিব্যেন্দু কাজ আরম্ভ করিল। অল্পক্ষণ কোথা হইতে তবলার বাদ্য ভাসিয়া আসিল।

প্রথমে মৃদু স্বরে, ধীর লয়ে। পরে স্পষ্ট এবং ক্রমে দ্রুত হইয়া উঠিতে লাগিল। দিব্যেন্দু চেয়ারে এলাইয়া বসিল। ঘরের আলো কমিয়া আসিতেছে। পরিতোষ আসিয়া দিব্যেন্দুর টেবিলে পাশের চেয়ারটিতে বসিল। বিশু ছোট টেবিলটায় একটা টাইপরাইটার পাতিয়া বসিল। একটি উর্দিপরা বেয়ারা পিছনের দরজার পর্দা সরাইয়া দিয়া পাশে টুল পাতিয়া বসিয়া গেল। দেখা গেল পর্দার পিছনে স্প্রিঙের হাফ ডোর। প্রত্যেকের গতিবিধি যন্ত্রের মতো এবং নিঃশব্দে। সহসা তবলা থামিয়া গেল। ঘরে নীলাভ আলো। দিব্যেন্দু, পরিতোষ ও বিশু যেন প্রাণ পাইয়া কাজ সুরু করিল। তবলার বদলে টাইপরাইটারের দ্রুতধ্বনি চলিতে লাগিল। অল্পক্ষণ পরে বিশু টাইপ করা থামাইয়া একটি ইংরেজী পত্রিকা ও পেন্সিল লইয়া মাথা ঘামাইতে সুরু করিল।]

বিশু—পরিতোষদা।

পরিতোষ—উঁ?

বিশু—Dogs love to chase this animal—ক্যাট্ হবে না র‍্যাট্ হবে, বলতে পারো?

পরিতোষ—(ভাবিয়া) র‍্যাট বলেই তো মনে হচ্ছে। ক্যাট এক একটা এমন থাকে—ডগ্‌কেই তাড়া করে।

বিশু—র‍্যাট বলছো? (ভাবিয়া) র‍্যাটই হবে।

পরিতোষ—ওটা কোন্‌টা হে বিশু?

বিশু—উইক্‌লী সার্চলাইট। Twentyfive thousands must be won। ফার্স্ট প্রাইজ ষোলো হাজার। রানার্স-আপ ন' হাজার।

[ঘণ্টা বাজিল। বেয়ারা হাফ্ ডোর ঠেলিয়া ভিতরে গেল। বিশু পত্রিকা লুকাইয়া সবেগে টাইপ করিতে লাগিল। বেয়ারা আসিয়া পরিতোষকে ফাইল দিয়া যথাস্থানে বসিল।]

পরিতোষ—প্লীজ রিপ্লাই। দিস্ ইজ্ আর্জেণ্ট। আর পারা যায় না বাবা।

বিশু—আর্জেণ্ট মানে তো পরশু?

পরিতোষ—আর্জেণ্ট মানে এক সপ্তা। কতোবার শেখাবো তোমাকে? পরশু হোলো—রিপ্লাই ইমিজিয়েটলী।

বিশু—(অল্প পরে) আচ্ছা, a bad ড্যাশ্ can spoil your evening,—বুক হবে না কুক হবে?

পরিতোষ—বুক্ হবে। কুক্ রাখবার পয়সা আছে ক'জনের?

বিশু—উঁহু। এটায় গোলমাল আছে। দিব্যেন্দুদা কি বলো?

দিব্যেন্দু—উঁ?

বিশু—বুক্ না কুক্?

দিব্যেন্দু—কে কুক্?

বিশু—A bad ড্যাশ্ can spoil your evening,—বুক্ না কুক্?

দিব্যেন্দু—পরে বলবো ভাই, এই এস্টিমেটটা নইলে—(কাজে ডুবিয়া গেল)

বিশু—কি হবে অতো খেটে দিব্যেন্দুদা? কোম্পানী রাজা করে দেবে?

পরিতোষ—কেন জ্বালাচ্ছো ওকে বিশু? ও যদি কাজ করে আনন্দ পায়—তোমার কি বাপু?

[সহসা বাসু সাহেব প্রবেশ করিলেন। বেয়ারা লাফাইয়া উঠিল। বিশু ও পরিতোষ উর্দ্ধশ্বাসে কাজ করিতে লাগিল। দিব্যেন্দু পূর্ব্ববৎ।]

বাসু—(দিব্যেন্দুর কাছে আসিয়া) চৌধুরী।

দিব্যেন্দু—(কোন ব্যস্ততা না দেখাইয়া) ইয়েস্ স্যার?

বাসু—ইলেক্‌ট্রিসিটি বোর্ডের টেণ্ডারটা করছেন?

দিব্যেন্দু—না।

বাসু—সে কি! আপনাকে বললাম না—দ্যাট্‌স্ এক্সট্রিমলী আর্জেণ্ট?

দিব্যেন্দু—হ্যাঁ, বলেছিলেন।

বাসু—তবে? তবে করছেন না কেন?

দিব্যেন্দু—ওটা হয়ে গেছে ব'লে।

বাসু—হয়ে গেছে? আমি তো পাই নি?

দিব্যেন্দু—আপনার টেবিলেই আছে নিশ্চয়ই। ভালো করে খুঁজলে পাবেন।

বাসু—কাণ্ট্ বি! ইম্পসিব্‌ল্!

[প্রস্থান]

পরিতোষ—করছো কি হে?

দিব্যেন্দু—কি আবার করবো? যা জানতে চেয়েছে বলেছি।

বিশু—ভুল হয়ে থাকলে সায়েব যে কাঁচা চিবিয়ে খাবে!

দিব্যেন্দু—ভুল আমি করি না।

[বাসু ফাইল হাতে প্রবেশ করিলেন]

বাসু—ইয়েস। ইয়েস, হিয়ার ইট ইজ্। (বেয়ারাকে ধমকাইয়া) কোথায় কোন্ ফাইল রাখতে হয় এখনো শেখো নি?

বেয়ারা—সাব্, হামি তো—

বাসু—শাট্ আপ্! (দিব্যেন্দুকে) আপনি তাহলে এখন কোনটা করছেন?

দিব্যেন্দু—ইস্টার্ন রেলওয়েরটা।

বাসু—ওটা তো অনেক সময় আছে এখনো। আপনি বরং পাবলিক হেলথেরটা ধরুন আগে।

দিব্যেন্দু—সেটা করে দিয়েছি। এস্টিমেটিং সেকশন থেকে নিয়ে গেছে একবার—কি সব ওমিশন্ আছে দেখবে।

বাসু—(স্তম্ভিত) আই সী। রেলওয়েরটা কতোটা হয়েছে?

দিব্যেন্দু—কালকের মধ্যে হয়ে যাবে।

বাসু—কালকের মধ্যে? আর ইউ শিওর?

দিব্যেন্দু—হ্যাঁ স্যার।

বাসু—(মুহ্যমান) দ্যাট্‌স ফাইন। ফাইন। থ্যাঙ্ক ইউ।

[প্রস্থান]

পরিতোষ—এ করেছো কি হে দিব্যেন্দু?

[ঘণ্টা বাজিতে বেয়ারা ভিতরে গেল। পরবর্তী কথাবার্তার মধ্যে এক গ্লাস জল আনিয়া বাসু সাহেবের ঘরে দিয়া আবার যথাস্থানে আসিয়া বসিল।]

দিব্যেন্দু—কি করেছি?

পরিতোষ—কখন করলে এতো সব?

দিব্যেন্দু—নিয়ে বসলে কতোক্ষণ আর লাগে?

বিশু—কিন্তু করে লাভ কি দিব্যেন্দুদা? যতো খাটবে, ততো খাটাবে। পয়সার বেলা—এই! (একজোড়া বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ দেখাইল)

দিব্যেন্দু—ও সব জানি না। কাজ করে যাই—হবার হলে একদিন হবেই।

বিশু—হবে মরলে। তার চেয়ে ক্রস্‌ওয়ার্ড করো—একেবারে ষোলো হাজার।

পরিতোষ—ওটার লাস্ট ডেট কবে হে?

বিশু—এখনো সাতদিন আছে। করবে? এক টাকায় দুটো এণ্ট্রি। দু টাকায় পাঁচটা। দুজনে মিলে পাঁচটা পাঠিয়ে দিই, পেয়ে গেলে হাফ এ্যাণ্ড হাফ। কি বলো? পাঁচটা পাঠালে শিওর হিট। কুক, বুক—দুটোই দিয়ে দেবো।

পরিতোষ—দিব্যেন্দু, করবে না কি একটা?

দিব্যেন্দু—কি? ক্রসওয়ার্ড। নাঃ। আমার লাক ভালো না।

বিশু—লাকের কি আছে এতে? এ তো যুক্তির ব্যাপার। ভেবেচিন্তে যদি করো—ঠিক হতে বাধ্য!

দিব্যেন্দু—তোমার কবার ঠিক হয়েছে?

বিশু—দু' একটা বেটারা ইচ্ছে করে আনরিজনেবল্ আন্‌সার রাখে। তাও এবার ওদের কায়দাগুলো ধরে ফেলেছি। পাঁচটা এণ্ট্রিতে রানার্স আপটা লাগবেই। ন হাজার কম নয় দাদা! ল্যাম্‌ব্রেটা স্কুটার একটা কিনে সিধে চ'লে যাবো ধানবাদে দিদির বাড়ী। ঘর্ র্ র্! পিপ্!

[স্কুটার চালাইবার ভঙ্গি করিল। সহসা বাসু সাহেব প্রবেশ করায় আবার টাইপরাইটার চলিতে লাগিল।]

বাসু—চৌধুরী।

দিব্যেন্দু—ইয়েস্ স্যার?

বাসু—মিষ্টার টমলিন্‌সন্ ট্রাঙ্ক কল করছিলেন হেড অফিস থেকে। কানপুর ব্রাঞ্চের নায়ার বদলী হয়ে যাচ্ছে, অফিসিয়েট করতে এখানকার একজনকে চায়। আমি

আপনার নাম রেকমেণ্ড করে দিলাম। এখন ছমাস—পরে ফাইন্যাল সিলেক্সনের সময়—you stand a fair chance.

দিব্যেন্দু—থ্যাঙ্ক ইউ স্যার। এতোটা আমি আশা করতে পারি নি।

বাসু—প্লীজ ডোণ্ট্ মেনশন্। কাজ নিয়ে কথা, ওরা কাজের লোক চায়।

[বাসুর প্রস্থান। পরিতোষ ও বিশু দিব্যেন্দুকে ঘিরিয়া ফেলিল। বেয়ারাও।]

পরিতোষ—কন্‌গ্র্যাচুলেশন্‌স্ দিব্যেন্দু! একেবারে তিন ধাপ টপকে এ্যাসিস্ট্যাণ্ট ডায়রেক্টর?

বিশু—ছপ্পড় ফুঁড়কে একেই বলে দাদা। সন্দেশ দাদা, সন্দেশ চাই।

বেয়ারা—হাঁ বাবু, মিঠাই খিলাতে হোবে। বোলেন তো লিয়ে আসি লঞ্চ্ টাইমে।

দিব্যেন্দু—আরে সবুর—এ তো শুধু ছ্ মাস—

বিশু—কিসের ছমাস? ছপ্পড় একবার ফুঁড়েছে, এখন বারোমাস ঝন্ ঝন্ আওয়াজে কানে তালা ধরে যাবে। ক্রসওয়ার্ডটাও এই তালে লাগিয়ে দাও দিব্যেন্দুদা।

[ঘণ্টা বাজিল। বেয়ারা ছুটিল। বিশু আবার ক্রসওয়ার্ডে মন দিতে গিয়া কি ভাবিয়া পত্রিকাটি রাখিয়া দিল। তারপর একতাড়া চিঠি সাজাইয়া নিষ্ঠার সহিত টাইপ করিতে লাগিল। পরিতোষেরও কাজে অতিরিক্ত মনোযোগ দেখা গেল। তবলার বাজনা আবার ভাসিয়া আসিল। দিব্যেন্দু এলাইয়া বসিল। বিশু টাইপরাইটার লইয়া ছায়ার মতো সরিয়া গেল। পরিতোষও। বেয়ারা পর্দা ফেলিয়া চলিয়া গেল। তবলা থামিয়া আলো আবার স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরিল।

সুনন্দার প্রবেশ। সাজিয়াছে, কিন্তু এখনও প্রসাধন কিছু বাকি।]

সুনন্দা—বড়দা! (সাড়া নাই) ও বড়দা!

দিব্যেন্দু—(ধড়মড় করিয় উঠিয়া বসিয়া) অ্যাঁ? কে? কি?

সুনন্দা—আবার তুমি জেগে জেগে ঘুমোচ্ছো?

দিব্যেন্দু—ফাজলামি করিস না। ঘুমোবে! চাকরী তো করো না! (সুনন্দার সাজ লক্ষ্য করিয়া) যাওয়া হচ্ছে কোথায়?

সুনন্দা—সিনেমায়। তুমি এখন এঘরে থাকবে?

দিব্যেন্দু—কেন?

সুনন্দা—সাগরিকা এলে ডেকে দিও আমায়।

দিব্যেন্দু—কে সাগরিকা?

সুনন্দা—আহা, চেনো না যেন!

দিব্যেন্দু—ঐ যে চালিয়াৎ মেয়েটা মোটরে চড়ে ঘোরে?

সুনন্দা—চালিয়াৎ মোটেই নয়। বরং ঠিক উল্টো। অতো বড়োলোক, অতো সুন্দর দেখতে—তবু একফোঁটা অহঙ্কার নেই।

দিব্যেন্দু—কে সুন্দর দেখতে? সাগরিকা? চশমা নে।

সুনন্দা—আচ্ছা, আচ্ছা। তোমার বৌ ওর চেয়ে সুন্দর হয় কি না দেখবো।

দিব্যেন্দু—(রাগিয়া) বেশী ইয়ার্কি কোরো না, বুঝলে? মা আবদার দিয়ে দিয়ে তোমার মাথাটি খেয়েছে!

সুনন্দা—খেয়েছেই তো। বাকিটা খেয়েছো তুমি। এলেই ডেকে দিও, গল্প করতে বোসো না আবার।

[দিব্যেন্দু কিছু বলিবার পূর্বেই সুনন্দা চলিয়া গেল।]

দিব্যেন্দু—ফাজিল।

[দিব্যেন্দু কাজে মন দিল। তারপর সচকিত হইয়া একবার বাহিরের দিকে চাহিয়া ছাড়া জামাটা পরিয়া ফেলিল। অল্প ইতস্ততঃ করিয়া শেলফের উপর হইতে আয়না লইয়া মুখটাও দেখিল। সন্তোষজনক কিছু চোখে পড়িল না। চিরুনীর সাহায্যে খানিকটা মার্জিতভাব আনিবার চেষ্টায় ব্যাপৃত হইয়াছে—মা প্রবেশ করিলেন দুধের গ্লাস হাতে।]

মা—কি রে, আবার বেরোচ্ছিস না কি?

দিব্যেন্দু—(চমকাইয়া আয়না চিরুণী রাখিয়া) না না, কোথায় বেরুবো?

মা—তবে জামা পরলি যে?

দিব্যেন্দু—জামা? এই একটু ঠাণ্ডা বোধ হচ্ছিল, তাই প'রে ফেললাম।

মা—ঠাণ্ডা? জ্বরটর হয়নি তো? (কাছে আসিয়া কপালে হাত দিয়া দেখিলেন)

দিব্যেন্দু—(মাথা সরাইয়া) জ্বর কেন হ'তে যাবে? জ্বর হবার ফুরসৎ আছে?

মা—ও মা, জ্বর কি ফুরসৎ বুঝে আসে? গা তো ঠাণ্ডা। যাক্‌গে, দুধটা খেয়ে ফেল গরম গরম।

দিব্যেন্দু—কিসের দুধ?

মা—কিসের আবার। গরুর দুধ!

দিব্যেন্দু—তা আমাকে কেন?

মা—বললি যে খাবি?

দিব্যেন্দু—বলেছি না কি? আচ্ছা রাখো।

মা—(টেবিলে দুধ রাখিয়া) ফেলে রাখিস নি, ঠাণ্ডা হয়ে যাবে। লুচি ভেজে দেবো দুটো?

দিব্যেন্দু—না না, বললাম তো খাবো না।

মা—গরম গরম দুটো খেলে সর্দিটা টেনে যেতো।

দিব্যেন্দু—সর্দি হয়নি তো টানবে কি?

মা—হয় নি, হতে কতোক্ষণ? শীত করছে বলছিস।

দিব্যেন্দু—উঃ! (জামা খুলিতে প্রবৃত্ত হইল)

মা—না না, জামা খুলিস নি, জামা খুলিস নি! থাক তোর লুচি খেয়ে কাজ নেই। দুধটা খেয়ে নে।

[মায়ের প্রস্থান। দিব্যেন্দু জামাটা ঠিকভাবে পরিল। এদিক ওদিক চাহিয়া চুলটাও আঁচড়াইয়া ফেলিল। তারপর গুছাইয়া কাজ করিতে সুরু করিল। কিন্তু করিলে কি হইবে—সেই তবলা, সেই আলোর কারসাজি। সাগরিকা প্রবেশ করিল। পরিধানে স্বপ্নের সাজ, চলাফেরায় স্বপ্নের ছন্দ, কথায় স্বপ্নের সুর। এমন কি দিব্যেন্দুর কথাতেও।]

দিব্যেন্দু—কে?

সাগরিকা—আমি সাগরিকা। সুনন্দা কোথায়?

দিব্যেন্দু—সুনন্দা কাপড় পরছে। আপনাকে বসতে বলে গেছে। না কি ভিতরে গিয়ে বসবেন?

সাগরিকা—না, এখানেই ভালো। (বসিয়া) আপনার কাজের অসুবিধে করলাম না তো?

দিব্যেন্দু—কাজ? না না, কোনো কাজ নেই।

সাগরিকা—নেই? এই যে দেখলাম কি সব কাজ করছেন কাগজপত্র নিয়ে?

দিব্যেন্দু—দেখেছেন? তবে বলি—কাজটা এখন বন্ধ থাক। অসুবিধেটাই হোক।

সাগরিকা—(কলহাস্যে) কাজ বন্ধ থাকলে যে পেট ভরে না?

দিব্যেন্দু—মন তো ভরে।

সাগরিকা—আপনার মন বুঝি শুধু অসুবিধেতেই ভরে?

দিব্যেন্দু—না। আসলে আমার মন কাজেই ভরে। তবে কাজটা সেইরকম হওয়া চাই।

সাগরিকা—কি রকম কাজ?

দিব্যেন্দু—এই ধরুন, আপনার সঙ্গে কথা বলছি—এই রকম।

সাগরিকা—তাই না কি? আমি তো রোজই এসে আপনার সঙ্গে কথা বলতে পারি।

দিব্যেন্দু—পারেন,কিন্তু আসেন না।

সাগরিকা—আচ্ছা, এবার থেকে আসবো। কিন্তু একটা শর্তে।

দিব্যেন্দু—কি শর্ত?

সাগরিকা—আমাকে 'আপনি' বলতে পারবেন না। 'তুমি' বলতে হবে।

দিব্যেন্দু—'তুমি' বলতে ভয় করে।

সাগরিকা—কিসের ভয়?

দিব্যেন্দু—পুরীতে সমুদ্র দেখেছেন?

সাগরিকা—দেখেছি।

দিব্যেন্দু—আমার চোখ নিয়ে দেখেননি। দেখলে বুঝতেন—কেন তুমি বলতে ভয় করে।

সাগরিকা—আপনি কি দেখেছেন?

দিব্যেন্দু—নীল অবগুণ্ঠনে মুখ ঢেকে ছুটে আসে যে ঢেউ—তাতে অপরিচয়ের রহস্য।

সে 'আপনি'। তীরে এসে সাদা ফেনায় ভেঙ্গে প'ড়ে যে প্রকাশ—তাতে রহস্য নেই, কিন্তু দীপ্তি আছে, সান্নিধ্য আছে। সে 'তুমি'।

সাগরিকা—আপনি নিশ্চয়ই কবিতা লেখেন।

দিব্যেন্দু—কবিতা লিখি না, কবিতা ভাবি।

সাগরিকা—কি রকম?

দিব্যেন্দু—মনের মধ্যে কবিতা জমে ওঠে মেঘের মতো। যদি আঘাত পায়, ঘন বর্ষার ধারায় নেমে আসে।

সাগরিকা—কি রকম আঘাত?

দিব্যেন্দু—আপনাকে 'তুমি' বলতে পারার মতো আঘাত।

সাগরিকা—তবে তাই বলুন। আপনার কাব্যধারার একটু ভাগ আমাদের দিন।

দিব্যেন্দু—'তুমি' বলবো? তবে শোনো—

নীল স্বপ্ন চূর্ণ ক'রে উর্মি কলোচ্ছ্বাস
শুভ্রতার জাগরণে দীপ্ত করে তোমার প্রকাশ।
নিঃস্ব আমি তটে ব'সে ভিক্ষা মাগি প্রসাদকণিকা
—অয়ি সাগরিকা।

[সাগরিকা উঠিয়া দাঁড়াইল। দিব্যেন্দু এক পা অগ্রসর হইল। দুজনে মুখোমুখি। সাগরিকা চোখ ফিরাইয়া লইল।]

সাগরিকা—আমাকে যেতে হবে।

দিব্যেন্দু—কোথায়?

সাগরিকা—সুনন্দার সঙ্গে সিনেমায়।

দিব্যেন্দু—জানি।

সাগরিকা—সিনেমায় যেতে আর একটুও ইচ্ছে করছে না। তার চেয়ে—(থামিল)

দিব্যেন্দু—তার চেয়ে?

সাগরিকা—ইচ্ছে করছে ইডেন গার্ডেনে ঘাসের উপর বসে কবিতা শুনি।

দিব্যেন্দু—আজ আর তা কি করে হবে?

সাগরিকা—জানি হবে না। আজকের সন্ধ্যেটা মিথ্যেই হয়ে যাবে।

[সুনন্দার প্রবেশ]

সুনন্দা—সাগরিকা, এসেছিস?

সাগরিকা—হাঁ, চল্ যাই।

সুনন্দা—ভাই, একটা কথা বলবো, কিছু মনে করবি নে?

সাগরিকা—কি?

সুনন্দা—আমার ভীষণ মাথা ধরেছে, আমি আজ সিনেমায় যেতে পারছি না। আজ তোকে একাই যেতে হবে।

সাগরিকা—একা? সিনেমায়? না ভাই, তার চেয়ে আমি বাড়ী ফিরি।

সুনন্দা—না না, তাহলে ভীষণ বিচ্ছিরি লাগবে আমার। আচ্ছা দাঁড়া, বড়দা ভাই, লক্ষ্মীটি, তুমি যদি যাও আমার বদলে!

দিব্যেন্দু—বাঃ? আমার কাজ?

সুনন্দা—আমি রাত জেগে ব'সে তোমায় সাহায্য করবো। লক্ষ্মীটি বড়দা।

সাগরিকা—আচ্ছা—ওঁকে কেন আবার বিরক্ত করা?

সুনন্দা—কিসের বিরক্ত? আমার বড়দা বড়ো ভালো বড়দা—সব কথা শোনে। যাও আর দেরী কোরো না, আমি মাকে ব'লে রাখছি।

[সুনন্দার প্রস্থান। পরস্পরের দিকে তাকাইয়া উভয়ে হাসিল।]

সাগরিকা—আমি গাড়ীতে রইলাম। তুমি এসো।

[সাগরিকা যেন ভাসিয়া চলিয়া গেল। দিব্যেন্দু চেয়ারে ফিরিয়া স্বপ্নময় চোখে কাগজ গুছাইতে লাগিল]

দিব্যেন্দু—তুমি এসো!

[তবলা আবার বাজিয়া থামিল। আলো স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরিল। সুনন্দার প্রবেশ।]

সুনন্দা—বড়দা, সাগরিকা এসেছে? হর্ণ শুনলাম যেন?

দিব্যেন্দু—(স্বপ্নের ঘোর) এসেছিল।

সুনন্দা—এসেছিল? কোথায় গেলো?

দিব্যেন্দু—(চমকাইয়া) কে কোথায় গেলো?

সুনন্দা—কে আবার? সাগরিকা।

দিব্যেন্দু—আসে নি—দেখতেই তো পাচ্ছিস!

সুনন্দা—তুমিই তো বললে এসেছে?

দিব্যেন্দু—তবে খুঁজে দেখগে কোথায় লুকিয়ে রেখেছি আমি! কাজের সময় শুধু জ্বালাতন। (কাগজে ঝুঁকিল)

সুনন্দা—বড়দা।

দিব্যেন্দু—বলে ফেলো।

সুনন্দা—একটা টাকা দেবে?

দিব্যেন্দু—কি করবি?

সুনন্দা—সাগরিকা সিনেমার টিকিট কেটেছে। আমার এমনি ক'রে দেখতে খারাপ লাগে। তাই ভাবছি অন্ততঃ বাদাম বা পোট্যাটো চিপ্‌স্ কিছু যদি কিনি—

দিব্যেন্দু—(টাকা দিয়া) নে।

সুনন্দা—দু টাকা? দু টাকা লাগবে না।

দিব্যেন্দু—নিয়ে যা না যা পাচ্ছিস। যদি দরকার হয়, তখন কোথায় পাবি?

সুনন্দা—থ্যাঙ্ক ইউ থ্যাঙ্ক ইউ। তোমার জন্যে কি আনবো বলো। চানাচুর? সল্টেড্ বাদাম? পোট্যাটো চিপ্‌স্?

দিব্যেন্দু—কি হবে ও সব? বাসু সাহেবের মাথাটা যদি কেটে নিয়ে আসতে পারতিস তো হোতো।

সুনন্দা—বাসু সাহেবের মাথা? আমি কালই যাবো বঁটি নিয়ে। মাকে বলে রাখি ছুরি শা—ন কাঁচি শা—ন এলে ডাকতে।

[সুনন্দার প্রস্থান। দিব্যেন্দু শুন্য দৃষ্টিতে কাগজপত্রের দিকে চাহিয়া রহিল। মাথায় কিছুই প্রবেশ করিল না। শুধু আবার তবলা শুরু হইল। তবলা-আলোর ব্যাপার চুকিলে পর্দা ঠেলিয়া বাসু সাহেব প্রবেশ করিলেন।]

বাসু—চৌধুরী।

দিব্যেন্দু—(শশব্যস্তে উঠিয়া) ইয়েস্ স্যার?

বাসু—কাজটা শেষ করে এনেছেন?

দিব্যেন্দু—সবটা হোলো না স্যার, বাড়ীতে—

বাসু—হোলো না? কেন হোলো না?

দিব্যেন্দু—স্যার বাড়ীতে মায়ের অসুখ—

বাসু—(গলা চড়িতেছে) কেন হোলো না?

দিব্যেন্দু—বোনের অসুখ—

বাসু—কেন হোলো না?

দিব্যেন্দু—বাবার অসুখ—ভাইয়ের—

বাসু—(গলা চীৎকারে দাঁড়াইয়াছে) কেন হোলো না?

দিব্যেন্দু—(আর্তনাদে) স্যার বাড়ীশুদ্ধ সকলের অসুখ—বাবা মা ভাই বোন—

বাসু—(গর্জন করিয়া) শাট্ আপ্। (দিব্যেন্দু নিস্তব্ধ। অল্প থামিয়া) আপনার জন্য কোম্পানী বিশ লাখ টাকার কনট্র্যাক্ট হারালো। অতএব কর্তৃপক্ষের নির্দেশ অনুসারে আপনাকে এই মুহূর্তে বরখাস্ত করা হোলো। এ মাসের পাওনা মাইনেও এই সঙ্গে না-মঞ্জুর করা হোলো।

[বাসু ভিতরে চলিয়া গেলেন। দিব্যেন্দু মঞ্চের মধ্যস্থলে মুহ্যমান হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল। দুই দিক হইতে পরিতোষ ও বিশুর প্রবেশ।]

পরিতোষ—কি হোলো দিব্যেন্দু?

বিশু—কি হোলো দিব্যেন্দুদা?

দিব্যেন্দু—চাকরী চ'লে গেলো।

[দুজনে দুঃখিত ভাবে মাথা নাড়িয়া দুইদিকে প্রস্থান করিল। ভিতর হইতে মা ও বাহির হইতে বাবা প্রবেশ করিলেন।]

বাবা ও মা—(একসঙ্গে) কি হোলো দিবু?

[ভিতর হইতে সুনন্দা ও বাহির হইতে নবেন্দুর প্রবেশ]

নবেন্দু ও সুনন্দা—কি হোলো বড়দা?

দিব্যেন্দু—চাকরী চ'লে গেলো।

বাবা, মা, নবেন্দু, সুনন্দা—(একসঙ্গে) আমরা তবে কি খাবো?

দিব্যেন্দু—জানি না!

[দিব্যেন্দু দুই হাতে মাথা চাপিয়া বসিয়া পড়িল। মাথা নীচু করিয়া ধীরপদে সকলে বাহির হইয়া গেল, বাবা ও নবেন্দু বাহিরে, মা ও সুনন্দা ভিতরে। বেয়ারা একটি প্রকাণ্ড সাইনবোর্ড ঘাড়ে করিয়া মঞ্চ পার হইয়া গেল, তাহাতে লেখা—NO VACANCY. তবলা ও আলো। দিব্যেন্দু চটকা ভাঙ্গিয়া উঠিয়া এক গ্লাস জল গড়াইয়া ঢক ঢক করিয়া খাইয়া আবার বসিল। বাহির হইতে বিশুর প্রবেশ।]

দিব্যেন্দু—আরে কি খবর? এসো এসো। তুমি তো এদিকে আসোই না।

বিশু—অনেক দূরে বাড়ী দিব্যেন্দুদা, হয়ে ওঠে না আসা।

দিব্যেন্দু—তা আজ এ পাড়ায় কি মনে করে?

বিশু—পরিতোষদার বাড়ী গেছিলাম, তাই ভাবলাম এসেছি এদিকে, একবার ঘুরে যাই।

দিব্যেন্দু—পরিতোষের বাড়ী? কি, কোনো কাজে না কি?

বিশু—হ্যাঁ, না, কিছুটা কাজেই বটে। মানে—পরিতোষদা বলছিল এবারকার সার্চলাইটের ক্রসওয়ার্ডটা জয়েণ্টলী পাঠাবে। পাঁচটা এণ্ট্রি দুটাকা। পাঁচটা না পাঠালে পাবার চান্স কম।

দিব্যেন্দু—দিলে পাঠিঁয়ে?

বিশু—কই আর হোলো? বৌদি দেখলাম থমথমে। পরিতোষদাও বেশ একটু ইয়ে মতন হয়ে আছে। মানে আবহাওয়াটা সুবিধের নয়। কথাটা পাড়তেই পারলাম না। এদিকে আজ লাস্ট ডেট।

দিব্যেন্দু—তাহলে একাই পাঠিয়ে দাও পাঁচটা।

বিশু—কি করে আর দিচ্ছি? মা বলছে মাসের শেষ। মেরে কেটে একটি টাকা আদায় হোলো। দুটো এণ্ট্রিতে হওয়া মুস্কিল। Shape, shame রয়েছে, তারপর ধরো match আর catch. Cook, book তো আছেই।

দিব্যেন্দু—আমার সঙ্গে শেয়ার করবে?

বিশু—তুমি করবে? মাইরি? তুমি তো লাইফে করো না।

দিব্যেন্দু—দেখি করে একবার। (টাকা দিয়া) এই নাও, ধরো।

বিশু—ক'রে দেখো, ঠকবে না। (পকেট হইতে ছক বাহির করিয়া) এই দেখো, আমি এইটে করেছি—match রেখে। থ্রি ডাউনটা তাহলে হোলো গে—

দিব্যেন্দু—ও তুমিই দেখো ভাই, আমি ওসব বুঝি না। মোদ্দা পেলে আদ্দেক দেবে তো?

বিশু—আলবাৎ। বলো তো লিখে দিয়ে যাচ্ছি।

দিব্যেন্দু—না না, পাগল না কি? লিখবে কি আবার?

বিশু—দিব্যেন্দুদা! এবার ষোলো হাজার—কি নিদেন পক্ষে ন হাজার আমাদের বরাতে নাচছে।

দিব্যেন্দু—চা খাবে?

বিশু—না দাদা, আমি এইটে জমা ক'রে দি আগে। অনেকদূর যেতেও হবে। আর একদিন এসে চা খেয়ে যাবো।

[বিশুর প্রস্থান। দিব্যেন্দু কাজ করিতে সুরু করিল। তবলা এবং আলোর ব্যাপারের পুনরাবৃত্তি। বাহির হইতে নবেন্দুর প্রবেশ।]

নবেন্দু—বড়দা, কলেজ থেকে এক্সকার্শন হচ্ছে টাটানগরে। চল্লিশ টাকা লাগবে। যাবো?

দিব্যেন্দু—টাকা কোথায়?

[নবেন্দুর প্রস্থান। ভিতর হইতে সুনন্দার প্রবেশ।]

সুনন্দা—বড়দা, সুরলহরীর ব্র্যাঞ্চ খুলেছে পাড়ায়। গান শিখতে ভর্তি হয়ে যাবো?

দিব্যেন্দু—টাকা কোথায়?

[সুনন্দার প্রস্থান। বাহির হইতে বাবার প্রবেশ।]

বাবা—দিবু, দেশের বাড়ীটা এই বেলা সারিয়ে নিতে না পারলে ছুটিছাটাতে মাথা গোঁজা মুস্কিল হবে।

দিব্যেন্দু—টাকা কোথায়?

[বাবার প্রস্থান। ভিতর হইতে মায়ের প্রবেশ।]

মা—দিবু, এবার সুনীর জন্মদিনে দুচারজনকে নেমন্তন্ন করা যায় না? অনেকদিন বাড়ীতে খাওয়ান দাওয়ান হয় নি।

দিব্যেন্দু—টাকা কোথায়?

[মায়ের প্রস্থান]

বিশু—(নেপথে) দিব্যেন্দুদা! ও-ও-ও দিব্যেন্দুদা!

দিব্যেন্দু—কে?

[বিশুর প্রবেশ। উচ্ছ্বসিত অবস্থা।]

বিশু—মেরে দিয়েছি দিব্যেন্দুদা—মেরে দিয়েছি! বলেছিলাম কি না তোমাকে? বলো—বলেছিলাম কি না?

দিব্যেন্দু—কি? কি হয়েছে কি?

বিশু—(টেবিলে পত্রিকা আছড়াইয়া) ষোলো হাজার দিব্যেন্দুদা, ষোলো হাজার! ফার্স্ট প্রাইজ! (দিব্যেন্দুকে জাপটাইয়া এক পাক নাচিয়া লইল) তোমার আট আমার আট। উঃ কি দুর্দান্ত লাক তোমার দিব্যেন্দুদা! আমি আজ ছ বচ্ছর ক্রসওয়ার্ড

করছি—বারো আনার একটি ফাউণ্টেন পেন শুধু পেলাম একবার। আর তোমার সঙ্গে এই একবার করেই ফার্স্ট প্রাইজ!

দিব্যেন্দু—ফা—র্স্ট প্রা—ইজ্!

বিশু—সাতদিনের মধ্যে চেক পৌঁছে যাবে। তুমি কি কিনবে দিব্যেন্দুদা? আমি তো একটা স্কুটার কিনে তবে অন্য কথা! ঘ র্ র্ পীপ্!

দিব্যেন্দু—আমি কি কিনবো? না হে, শোনো বিশু। একটু ঠাণ্ডা মাথায় ভাবো দিকি।

বিশু—মাথা ঠাণ্ডা করা কি সোজা এখন?

দিব্যেন্দু—কিন্তু এইটাই মাথা ঠাণ্ডা করবার সময়। শোনো, ওড়াতে সুরু করলে আট হাজার আর কদিন? তার চেয়ে ধরো তোমার আট আমার আট দিয়ে যদি কিছু ব্যবসা ট্যাবসা ফাঁদা যায়? আচ্ছা আট না হোক—সাত সাত চোদ্দো? হাজার টাকা করে না হয় এদিক ওদিক সখের জিনিসেই দেওয়া গেলো।

বিশু—কথাটা মন্দ বলো নি দিব্যেন্দুদা। তাহলে বছরে বছরে চোদ্দো দুগুনে আটাশ, তিন চোদ্দোং বিয়াল্লিশ, চার চোদ্দোং—চার চোদ্দোটা কতো যেন?

দিব্যেন্দু—ছাপ্পান্নো।

বিশু—হ্যাঁ হ্যাঁ, ছাপ্পান্নো। ছাপ্পান্নো হাজার—অ্যাঁ! কিন্তু কিসের ব্যবসা করা যায়?

দিব্যেন্দু—কন্ট্রাকটারীতে নেমে পড়া যাক। ওটা তো এ অফিসে দেখা গেছে খানিকটা। চোদ্দো হাজারে বেশ জমিয়ে সুরু করা যাবে।

বিশু—হ্যাঁ, গোড়াতেই বেশ জমকালো এস্টাব্লিশমেণ্ট খুলে বসলে—টাকায় টাকা আনে, বুঝলে দিব্যেন্দুদা? কিন্তু এঞ্জিনীয়ারিং যে জানি না কিস্যু?

দিব্যেন্দু—আরে ও আর জানবার কি আছে? ইঁট চুণ সিমেণ্ট দিয়ে বানিয়ে দিলেই হোলো। আর পয়সা ফেললে এঞ্জিনীয়ারের ভাবনা কি?

[দুজনে সম্মুখে ফিরিয়া বসিয়া, চোখ স্বপ্নময়। টেলিফোন বাজিল। দিব্যেন্দু কাল্পনিক রিসিভার তুলিয়া লইল।]

দিব্যেন্দু—হ্যালো, চৌধুরী স্পীকিং...ইয়েস্ চৌধুরী সেন এ্যাণ্ড কোম্পানী...ও আই সী...আই সী। আচ্ছা...হ্যাঁ...হ্যাঁ, এখন একটা প্রাভিশ্নাল এস্টিমেট করে দেবো। ...নমস্কার।

[দিব্যেন্দু ফোন রাখিয়া দিল। বিশু কাল্পনিক বোতাম টিপিয়া ঘণ্টা বাজাইল। পুরাতন বেয়ারাটি প্রবেশ করিয়া সেলাম করিয়া দাঁড়াইল।]

বিশু—এই চিঠিখানা এখুনি টাইপ করে দিতে বলো টাইপিস্ট বাবুকে।

বেয়ারা—জী।

[কাল্পনিক চিঠি লইয়া বেয়ারার প্রস্থান]

বিশু—দিব্যেন্দুদা, আমাকে একবার সুবর্ণ ব্যাঙ্ক বিল্ডিং-এর কনস্ট্রাক্শন্ সাইটে যেতে হবে। তোমার কি গাড়ীটা লাগবে?

দিব্যেন্দু—না, তুমি নিয়ে যাও। আমার যদি দরকার পড়ে, জীপটা তো আছেই।

[বিশুর প্রস্থান। দিব্যেন্দু ফাইল সই করিতে লাগিল। তবলা ও আলোর ব্যাপার। সাগরিকার প্রবেশ। স্বপ্নের সাজ নয়, তবে যথেষ্ট সাজ। চলন বলন গদ্যময়।]

সাগরিকা—সুনন্দা!

দিব্যেন্দু—(ধড়মড় করিয়া উঠিয়া) কে? ও, ও—আপনি? ইয়ে সুনন্দা, মানে—আপনি বসুন? (চেয়ার আগাইয়া দিল)

সাগরিকা—বসবো? কেন, সুনন্দা নেই না কি?

দিব্যেন্দু—না—হ্যাঁ, আছে—মানে—এক্ষুনি আসছে। আপনাকে বসতে বলে গেছে।

সাগরিকা—বসতে বলে গেছে? কোথায় গেলো? আমার তো আসবার কথা ছিল?

দিব্যেন্দু—কোথাও যায় নি—মানে আছে, ভিতরেই আছে।

সাগরিকা—আছে? একটু ডেকে দেবেন দয়া করে?

দিব্যেন্দু—হ্যাঁ, হ্যাঁ দিচ্ছি। দিচ্ছি। ইয়ে—আপনি বসবেন না?

সাগরিকা—(অবাক হইয়া) ঠিক আছে, আপনি ব্যস্ত হচ্ছেন কেন? ওকে বলবেন একটু তাড়াতাড়ি করতে, বড়ো দেরী হয়ে গেছে।

দিব্যেন্দু—সুনন্দা কাপড় ছাড়ছে বোধ হয়। এক্ষুনি আসবে। আপনি বসুন না?

সাগরিকা—ও।

[বসিয়া একবার দিব্যেন্দুর দিকে চাহিল। দিব্যেন্দু একটু সরিয়া গেল।]

দিব্যেন্দু—(গলা পরিষ্কার করিয়া) আপনি—আপনারা—সিনেমায় যাচ্ছেন বুঝি?

সাগরিকা—হ্যাঁ। কেন, সুনন্দা বলে নি?

দিব্যেন্দু—হ্যাঁ বলছিলো। বলছিলো—সিনেমায় যাবে। এই একটু আগে বলছিল। (গলা শুকাইয়া আসিল) ইয়ে—চা খাবেন?

সাগরিকা—না, চা খেয়েছি। আমাকে নিয়ে ব্যস্ত হবেন না। আপনি খেয়ে নিন।

দিব্যেন্দু—আমি? আমি কি খাবো?

সাগরিকা—ঐ যে দুধ রয়েছে আপনার টেবিলে? আপনি খেয়ে নিন।

দিব্যেন্দু—দুধ? ওঃ!

[দিব্যেন্দু লজ্জায় মাটিতে মিশিয়া দুধের গ্লাস পিছনের শেল্‌ফে সরাইয়া ফেলিল।]

সাগরিকা—ও কি, সরিয়ে রাখলেন কেন? আপনি খান। আমি না হয় ভিতরে গিয়ে বসছি। (উঠিয়া দাঁড়াইল)

[সুনন্দার প্রবেশ]

সুনন্দা—ও মা, তুই কখন এলি? আমি সেজে গুজে সেই থেকে ঘর বার করছি—এতো দেরী করবার কোনো মানে হয়?

সাগরিকা—তা তুইও তো রেডী ছিলি না?

সুনন্দা—রেডী ছিলাম না? বল্লেই হোলো। বড়দাকে জিজ্ঞেস কর্ না? বড়দা আমি সেই কোন্‌কালে এসে বলে গেছি না—সাগরিকা এলেই আমায় ডেকে দিও?

[সাগরিকার চোখে বিস্ময়, এবং খানিকটা সন্দেহ দিব্যেন্দুর মস্তিষ্কের সুস্থতা সম্বন্ধে। দিব্যেন্দুর অবস্থা সুবিধার নহে।]

দিব্যেন্দু—হ্যাঁ, না—ইয়ে—তোরা বেরিয়ে পড়—আরম্ভ হয়ে যাবে নইলে—

সুনন্দা—চল্ চল্!

[সুনন্দা বাহির হইল। সাগরিকা যাইবার সময়ে আড়চোখে একবার দিব্যেন্দুকে দেখিয়া গেল। সে দৃষ্টির সামনে দিব্যেন্দু কুঁচকাইয়া গেল। ওরা যাইবার পর খানিকটা স্তব্ধ থাকিয়া দিব্যেন্দু সহসা টেবিলে একটি হিংস্র মুষ্ট্যাঘাত করিল। মা প্রবেশ করিয়াছিলেন, চমকাইয়া উঠিলেন।]

মা—কি রে, কি হোলো?

দিব্যেন্দু—(সামলাইয়া) না, কিছু না! এই অফিসের সাহেবের কথা ভেবে হঠাৎ বড়ো রাগ ধরে গেলো।

মা—কেন রে? সায়েব কি করেছে?

দিব্যেন্দু—শনিবার বিকেলে বসে অফিসের কাজ করো, রবিবার অফিসে ছোটো।

মা—কাল অফিস যাবি না কি?

দিব্যেন্দু—তবে আর বলছি কি?

মা—মুখপোড়া সাহেবের একটু আক্কেল নেই? হপ্তায় একটা দিন ধীরে সুস্থে একটু ভালো করে খাবে, তা না সেই নাকে মুখে গুঁজে ছোটো? মুখপোড়া সাহেবের মরণ হয় না।

দিব্যেন্দু—আমিও ঠিক ঐ কথাই ভাবছিলাম। (কাজ লইয়া বসিল)

মা—কই, গেলাসটা কি করলি?

দিব্যেন্দু—গেলাস?

মা—দুধের গেলাসটা?

দিব্যেন্দু—ঐ যে ওখানে আছে।

মা—(শেলফের কাছে গিয়া) ও মা, খাস নি? এ যে একেবারে ঠাণ্ডা হিম হয়ে রয়েছে রে? ছি ছি ছি। দাঁড়া, গরম করে আনি।

দিব্যেন্দু—আর আনতে হবে না। দরকার নেই দুধ। আর শোনো, তোমার মেয়েকে একটু দেখাশোনা কোরো।

মা—কেন রে? সুনী আবার কি করলো?

দিব্যেন্দু—করে নি কিছু, কিন্তু যা সব বন্ধু বান্ধব জুটেছে ওর—

মা—কই কি—আমি তো কিছুই জানি না। আমি তো শুধু দেখি ঐ গীতাকে, আর কি যেন নামটা ওর—রুবীকে, আর সাগরিকাকে। আর মাঝেমধ্যে—

দিব্যেন্দু—ঐ সাগরিকার কথাই বলছি।

মা—যাঃ! সাগরিকা বেশ মেয়ে। মাসীমা মাসীমা ক'রে আসে। সেদিন নারকেল নাড়ু খেয়ে গেলো, চিঁড়েভাজা—

দিব্যেন্দু—থাক গে। আমরা গরীব মানুষ—ওসব বড়োলোকদের সঙ্গে মেলামেশার দরকারটা কি? ওরা আসে, মেশে, খায়—আবার আড়ালে হয় তো হাসে!

মা—তা সে বড়োলোক আছে, নিজের বাড়ীতে আছে। আমার বাড়ী এলে আমি চিঁড়ে মুড়ি যা ঘরে থাকবে দেবো। তারপর কে কি বললো না বললো আমার মাথাব্যথা নেই।

[মায়ের প্রস্থান। দিব্যেন্দু একটা নিস্ফল উত্তেজনায় দুইবার পায়চারি করিল। তারপর জামাটা হিঁচড়াইয়া খুলিয়া ফেলিল। দুই হাতে চুলের বিন্যাস নষ্ট করিয়া কাজ লইয়া বসিল। খানিকটা কাজ করিয়া বাকি পাতাগুলি গুনিল। অনেক পাতা। দিব্যেন্দু একটা ভয়ার্ত আক্রোশে সম্মুখে চাহিয়া বসিয়া রহিল। তবলা ও আলো। বাসু সাহেব আসিয়া দিব্যেন্দুর পিছনে দাঁড়াইলেন।]

বাসু—(প্রায় ভৌতিকস্বরে) চৌ—ধু—রী। কা—জটা হ—য়েছে?

দিব্যেন্দু—(না ফিরিয়া ভয়ার্ত চীৎকারে) কে?

বাসু—(পূর্ববৎ) কা—জটা হ—য়েছে?

[দিব্যেন্দু ধীরে ধীরে উঠিয়া বাসু সাহেবের মুখোমুখি দাঁড়াইল। তাহার মুখে হিংস্র অর্ধউন্মাদ ভাব।]

দিব্যেন্দু—না হয় নি। হওয়া সম্ভব নয়। (ওজস্বিনী বক্তৃতার সুরে) অফিসে চাকরী করি বলে কি আমি আপনার চাকর? আপনি অফিসার বলেই কি যা খুশী তাই অত্যাচার করে যেতে পারেন? সপ্তায় একটা দিন ছুটির অধিকার কি আমাদের নেই? আমরা কি যন্ত্র? আমরা কি রক্তমাংসের মানুষ নই? (গলা চীৎকারে দাঁড়াইয়াছে) আমাদের কি ঘরের কাজ নেই? আমোদ আহ্লাদ নেই?

বাসু—(অবিচলিত) কা—জটা হয়েছে?

দিব্যেন্দু—(শান্ত দৃঢ়কণ্ঠে) না। একটু বাকি আছে। সেটুকু এখুনি শেষ ক'রে দিচ্ছি।

[দেরাজ হইতে একটি পিস্তল বাহির করিয়া দিবোন্দু গুলি করিল। একবার, দুইবার, তিনবার। বাসু যন্ত্রবৎ তিন পা পিছাইয়া চেয়ারে এলাইয়া মরিয়া রহিলেন। নির্জীব দুই বাহু দুই দিকে দুলিতে লাগিল। বেয়ারা ছুটিয়া আসিল।]

বেয়ারা—(দুই হাত উপরে ছুঁড়িয়া) খুন! খুন! খুন! (তারপর সহসা পুলিসের ভঙ্গি গ্রহণ করিয়া দিব্যেন্দুর হাতে কাল্পনিক হাতকড়া পরাইয়া দিল) চলো থানামে।

[বেয়ারা দিবোন্দুকে ঠেলিয়া পিছনে লইয়া গেল। দুজনে পাশাপাশি পিছনে ফিরিয়া নিশ্চল হইয়া রহিল। বাসু চাঙ্গা হইয়া টেবিলে মুষ্টাঘাত করিলেন।]

বাসু—Order. Order in the court!

[বেয়ারা দিব্যেন্দুকে লইয়া বাসুর নিকট দাঁড় করাইয়া দিল]

বাসু—(বিচারকী কণ্ঠে) টমলিন্‌সন, জেন্‌কিন্‌সন্ এ্যাণ্ড কোম্পানীর ক্যালকাটা ব্র্যাঞ্চের ম্যানেজার মিষ্টার এন. সি. বাসুকে ইচ্ছাকৃতভাবে হত্যা করার অপরাধে তোমার প্রাণদণ্ড হোলো। এ বিষয়ে তোমার কিছু বলবার আছে?

দিব্যেন্দু—(শহীদী গাম্ভীর্যে) না।

বাসু—সাগরিকা রায় তোমার সঙ্গে একবার দেখা করতে চায়। দেখা করবে?

দিব্যেন্দু—না।

বাসু—সাগরিকা রায় কাল রাত থেকে না খেয়ে না ঘুমিয়ে এইখানে বসে আছে। তবু দেখা করবে না?

দিব্যেন্দু—না। ওর সঙ্গে আমার কোনো সম্পর্ক নেই।

বাসু—আসামীকে সেলে বন্ধ করে রাখো। কাল ভোরে ফাঁসী হবে। বিচারসভা এখানেই শেষ হোলো।

[বাসু ধীরপদে বাহির হইয়া গেলেন। বেয়ারা দিব্যেন্দুকে তাহার চেয়ারে ঘাড় ধরিয়া বসাইয়া দিল। তারপর প্রস্থান করিল। দিব্যেন্দু শূন্যদৃষ্টিতে বসিয়া রহিল। আবার তবলা এবং আলো।]

বেয়ারা—(নেপথ্যে) চাউধুরী বাবু। চাউধুরী বাবু ঘোরে আছেন?

দিব্যেন্দু—(সভয়ে) কে? কে?

[বেয়ারার প্রবেশ]

দিব্যেন্দু—(ভয় তখনও যায় নাই) তুমি? কি, কি ব্যাপার?

বেয়ারা—বাসুসাব বোললেন কি কাল কাম্ হোবে না।

দিব্যেন্দু—সে কি?

বেয়ারা—কাল আপিস বন্ধ্ থাকবে। বাসুসাব বোম্বই যাবেন।

দিব্যেন্দু—কেন, কি হোলো?

বেয়ারা—ক্রোড়ো রুপেয়াকা কোনট্রাক মিলছে কোম্পানীকা। বাসু সাব কাল হাওয়াই জাহাজসে বোম্বই যাবেন—হেড আপিস।

দিব্যেন্দু—কিন্তু এই টেণ্ডার? (কাগজ দেখাইল) এ যে সোমবার দিতে হবে?

বেয়ারা—(দাঁত বাহির করিয়া) উ সব ওয়েস্ট পিপার বাস্কিটমে ফেক্ দিতে বোলিয়েছেন। ছোটা কাম কোম্পানী এখোন লিবে না। ইস্টাফ্ লাই। (দিব্যেন্দু ফ্যাল ফ্যাল করিয়া চাহিয়া রহিল) হামি চোলছে বাবুজী। সোমবার আপিস যেতে কুছ দের হোবে। এখোন তো দো চার রোজ এ আপিসে কাম কম হোবে।

দিব্যেন্দু—(সচকিত হইয়া) একটু দাঁড়াও। (ছাড়া জামার পকেট ঘাঁটিয়া একটি আধুলি বার করিল) এই নাও, জলপানি খেও।

বেয়ারা—(দাঁত বাহির করিয়া সেলাম ঠুকিল) সেলাম হুজুর।

[দিব্যেন্দু প্রসন্ন হাস্যে এ সম্মান গ্রহণ করিল। বেয়ারার প্রস্থান। মায়ের প্রবেশ। হাতে দুধের গ্লাস।]

মা—এই নে। এবার আর ফেলে রাখিস নি বাবা। অনেকক্ষণ খালিপেটে আছিস।

দিব্যেন্দু—মা, কাল অফিস যেতে হবে না। অফিসের লোক এসে বলে গেলো।

মা—যেতে হবে না? যাক বাবা। কাল তাহলে নবু বাজার থেকে মাংস আনুক, কি বলিস?

দিব্যেন্দু—আনুক। মা, এখন কিছু খেতে দিতে পারো? বড়ো খিদে পাচ্ছে।

মা—(খুশী হইয়া) তা পাবে না? সেই কখন বেলা নটায় খেয়েছিস। লুচি ভাজি?

দিব্যেন্দু—ভাজো!

মা—হালুয়া দিয়ে খাবি, না বেগুন ভাজবো?

দিব্যেন্দু—দুই-ই করো।

মা—(উচ্ছ্বসিত আনন্দে) তুই দুধটা খা ততোক্ষণ, আমি দশমিনিটে করে দিচ্ছি সব।

[দুধ রাখিয়া মায়ের দ্রুত প্রস্থান। দিব্যেন্দু দুধ হাতে কাগজগুলি বাতাসে ছড়াইতে লাগিল।]

□

কোথায় গেল!

কিরণ মৈত্র

(১৯২৪)

চরিত্র

নিমাই
অতুল

[পট উঠলে মঞ্চ অন্ধকার দেখা গেল। দেশলাই কাঠি একটা জ্বলে উঠল। অস্পষ্ট ভাবে দুটি মানুষকে দেখা গেল। একটা বড় মোমবাতি জ্বালানো হল। ঘরটা কিছুটা আলোকিত হলে দেখা গেল একটা ভাঙ্গা পোড়ো বাড়ীর একটা ঘর। ঘরের প্লাসতারা খসে খসে পড়েছে। জানলা দরজাগুলো আধ ভাঙ্গা। একটা পায়া ভাঙ্গা খাটিয়া আধ শোয়ানো আছে। ভাঙ্গা মাটির কলসী, কিছু ন্যাকড়ার পুঁটলি, ছেঁড়া কাগজ ইত্যাদি ঘরময় ছড়ানো। নিমাই আর অতুল এদিক ওদিক দেখতে থাকে। বয়েস দুজনেরই ৩৫/৩৬-র কোঠায়। ছেঁড়া ময়লা জামাকাপড় পরনে। গোঁফ দাড়িতে মুখ ভরা। রুক্ষ চুল। সময় রাত প্রায় বারোটা। ঝিঁ ঝিঁ পোকার ডাক শোনা যাচ্ছে।]

নিমাই—জায়গাটা মন্দ না! কি বলিস?

অতুল—চমৎকার ঘর। ভেঙ্গে পড়তে যা বাকী।

নিমাই—ফুটপাতের চেয়ে তো ভালো। ক'দিন আরামে থাকা যাবে।

অতুল—কাল সকালেই দেখবি বাড়ীর মালিক এসে হাজির। কান ধরে বার করে দেবে।

নিমাই—দিক। এতো আর প্রথম নয়। এর আগেও তো কয়েকবার কানমলা খেয়েছি।

অতুল—সেবারে মনে আছে? দারুণ শীত। কনকনে ঠাণ্ডায় জমে যাচ্ছি। খোলা পেয়ে একটা মোটর গ্যারেজে শুয়ে ঘুমিয়ে ছিলাম।

নিমাই—মনে আছে। খুব ঘুমিয়েছিলাম।

অতুল—কিন্তু ঘুম ভেঙ্গেছিল দ্বারোয়ানের লাথি খেয়ে। বুট জুতোটা না থাকাতে দ্বারোয়ানের পায়ে খুব লেগেছিল।

নিমাই—লাথির কথাটা মনে নেই। তবে ভদ্রলোকের সেই কথাটা খুব মনে আছে, যা, ছেড়ে দিলাম। নেহাৎ আমি ভালো লোক তাই পুলিসে দিলাম না।

অতুল—মারের কথা তোর মনে না থাক আমার আছে। গ্যারেজটার পাশের নর্দমার ধারে ক'ঘণ্টা মুখ থুবড়ে ছিলাম। গায়ে-পিঠের বেদনায় তিন দিন আমি নড়তে চড়তে পারি নি।...তবে দেখে শুনে মনে হচ্ছে এ ঘরে কেউ থাকে না!

নিমাই—থাকলেই তো বিপদ। ঘরের অবস্থা তো দেখতেই পাচ্ছিস! যে কোন মুহূর্তে ভেঙ্গে পড়লেই হল।

অতুল—কিংবা হয়ত কর্পোরেশন ভেঙ্গে ফেলবার অর্ডার দিয়েছে।

নিমাই—তবে কিছু দিন আগেও এ ঘরে—ইস্।

অতুল—কি মাড়ালি?

নিমাই—কুকুরে বোধ হয়—

অতুল—শেয়ালের নয় তো—

নিমাই—দূর! কোলকাতায় আবার শেয়াল আসবে কোত্থেকে?

অতুল—এ জায়গাটা আর কোলকাতা বলিস না। ট্যাক্স বেশী করে পাওয়া যাবে বলে কর্পোরেশনের মধ্যে ঢুকিয়ে রেখেছে। ...ঘুম পাচ্ছে।

নিমাই—খাটিয়াও রয়েছে একটা। শুয়ে পড়। আরামে ঘুমোতে পারবি।

অতুল—ইঁটও রয়েছে কয়েকখানা। মাথার বালিশ করা যাবে।

নিমাই—আর দুটো দেওয়াল থেকে খসিয়ে নিয়ে আয়, বালিশ হয়ে যাবে। (খাটিয়াটা শোয়াতে শোয়াতে) এই এর পা-গুলো যে নড়বড় করছে। দুজনে শুলে আবার ভেঙ্গে পড়বে না তো?

অতুল—দুজনে শোবার কি দরকার! তুই খাটিয়ার ওপর শো। আমি বরঞ্চ মাটিতে শোব।

নিমাই—তোর তো একটুতেই ঠাণ্ডা লেগে যায়। মাটিতে শুবি, আর সকালে উঠে কাশতে সুরু করবি। তুই খাটিয়াতে শুস্, আমি বরঞ্চ মাটিতে শোব।

অতুল—না। তা হতে পারে না।

নিমাই—খুব হতে পারে।

অতুল—আচ্ছা বাবা, এক কাজ করা যাক। তুই প্রথম রাতটা খাটিয়ায় শো। আমি শেষরাতে শোব।

নিমাই—(আফশোষের সুরে) অনেকদিন খাটে শুই নি, না?

অতুল—এটা খাট নয় রে, হতভাগা, খাটিয়া।

নিমাই—ঐ হলো। (খাটিয়ায় বসে) বাঃ বেশ স্প্রিং করছে তো!

অতুল—স্প্রিং-এর চোটে সারারাত জেগে না কাটাতে হয়।

নিমাই—খালি পেট জ্বলতে সুরু করলেই হবে।

অতুল—মাঝে মাঝে জলের ধাক্কা দিয়ে নেব।

নিমাই—তাহলে ঐ কলসীটায় জল ভরে নিয়ে আয়।

অতুল—নিশ্চয়ই ফুটো। নইলে ফেলে যায়!

নিমাই—ঠিক বলেছিস্, ও আর দেখতে হবে না।

অতুল—দেখ্ দিনের পর দিন জল খেয়ে আর বেঁচে থাকতে ইচ্ছে করছে না।

নিমাই—বাজে কথা বকিস না। পরশু সকালে ভাত খেয়েছি।

অতুল—আজ আমার ভাত খেতে ইচ্ছে করছে।

নিমাই—ওঃ, কত সাধ! রোজ রোজ ভাত খাবেন?

অতুল—বড্ড খিদে পাচ্ছে।

নিমাই—পাবেই তো! সকালে কুলিগিরি করে চার আনা পয়সা পাওয়া গেছে। বললাম কচুরি খাওয়ার দরকার নেই। মুড়ি কেন। দেখতে অনেকগুলো হবে। দু

বেলা খাওয়া চলবে। পেটটাও ভরা থাকবে। তা নয়—

অতুল—গরম গরম আর ইয়া ফোলা ফোলা কচুরিগুলো দেখে আর লোভ সামলাতে পারলাম না।

নিমাই—আসবার সময় একটা পানের দোকানের সামনে অনেকগুলো ডাব পড়ে থাকতে দেখেছিলাম। দাঁড়া, কটা কুড়িয়ে আনি। ভেঙ্গে তার শাঁসগুলো খাওয়া যাবে।

অতুল—দূর পরের এঁটো খাব না।

নিমাই—(হো, হো, করে হেসে উঠে) এঁটো! বেশ মজার কথা শোনালি!

অতুল—ক্যাঁক, ক্যাঁক করে হাসিস না তো! ভালো লাগে না! একে খিদে পেয়েছে—

নিমাই—বললাম তো ডাবের শাঁস খা। ভিটামিন আছে। তাল শাঁস তো আর জুটবে না।

অতুল—কতবার বলবো যে খাবো না।

নিমাই—তাহলে কল থেকে এক পেট জল খেয়ে আয়।

অতুল—দূর, এমনি করে আর বেঁচে থাকতে ভালো লাগছে না।

[অতুল খাটিয়ার ওপর শুয়ে পড়ে]

নিমাই—বেঁচে থাকবার জন্যে কে মাথার দিব্যি দিয়েছে?

অতুল—আচ্ছা নিমাই, ধর আমরা দুজনে ঘুমোচ্ছি।

নিমাই—কিংবা খিদের জ্বালায় ঘুমোতে না পেরে এপাশ ওপাশ করছি।

অতুল—তাই যেন হলো। এই বাড়ীর ছাদটা হঠাৎ ভেঙ্গে পড়ল। আমরা তার তলায় চাপা পড়ে রইলাম। ফায়ার ব্রিগেড থেকে—

নিমাই—দূর। ও ভাবে মরে লাভ কি? কেউই তো জানতে পারবে না। কতদিন না খেতে পেয়ে, ঘুমোতে না পেয়ে কত কষ্ট করে আমরা মরে গেছি।

অতুল—তাহলে চল্ দুজনে ট্রেনের তলায় মাথা দিয়ে দি। পকেটে এক টুকরো কাগজে লিখে রেখে দেব, যে আমরা ভালো হতে চেয়েছিলাম। তাই ভালো ভাবে খেতে পাই নি।

নিমাই—ভালো ভাবে কি রে? বল খেতেই পাই নি।

অতুল—আমরা লোকের বাড়ী সিঁদ কাটি নি—

নিমাই—তাই লোকের বারাণ্ডাতেও একটু পড়ে থাকতে পারি নি।

অতুল—বরং তাড়িয়ে দিয়েছে। চোর ভেবে দূর দূর করে তাড়িয়ে দিয়েছে।

নিমাই—চুরি করতুম বলে জেল খেটেছি। কিন্তু কেন চুরি করতুম! বৌ ছেলের পেট চালাতেই তো! একবার জেল খেটে ফিরে গেলাম দু বছর বাদে। কারুর দেখা পেলাম না। বন্যার জলে কোথায় ভেসে গেছে কে জানে?

অতুল—আমিও তো ভাই বোনেদের পেট চালাতে পকেট কাটতুম। কতবার মার খেলুম। একবার জেল খাটলুম। কিন্তু ফিরে গিয়ে—

নিমাই—আমারই মত তাদের দেখতে পেলি না।

অতুল—না। শুনলাম অনেক দিন না খেয়ে কাটিয়ে আমার ফেরার জন্যে অপেক্ষা করেছে। তারপর, তারপর একদিন হাত ধরাধরি করে ওরা কোথায় বেরিয়ে গেছে।

নিমাই—এই চল্, আবার সিঁদ কাটি!

অতুল—দূর, সিঁদ আমি কাটতে পারবো না। তার চাইতে পকেট কাটতে পারি।

নিমাই—কিন্তু আমরা মা কালির পা ছুঁয়ে প্রতিজ্ঞা করেছি যে আর চুরি করব না। চুরি করা খুব খারাপ কাজ।

অতুল—রেখে দে খারাপ কাজ! বড়লোকরা চুরি করার চাইতে আরও অনেক খারাপ কাজ করে।

নিমাই—কিন্তু তাই বলে তো আমরা প্রতিজ্ঞা ভাঙ্গতে পারি না।—আচ্ছা ধর—হঠাৎ যদি কয়েক হাজার টাকা পেয়ে যাই—

অতুল—পাগলের মত একটু কিছু ধরলেই তো হল না।

নিমাই—আহা, মনে করতে দোষ কি!

অতুল—হঠাৎ দুচার ঘা মার খেয়ে যেতে পারি এ কথা মনে করতে পারি। কিন্তু টাকা পেয়ে যাব এ কথা—

নিমাই—আহা মনেই কর না। তাহলে কি হবে?

অতুল—কি আবার হবে! বেমালুম পাগল হয়ে যাব।

নিমাই—তুই হতে পারিস। আমি হবো না।

অতুল—তাহলে তো মজাই হবে। একাই সব টাকা—

নিমাই—আচ্ছা আমি একা সব টাকা নিয়ে মজা করব, তুই ভাবতে পারলি? তাহলে তুই কি করবি?

অতুল—পাগল হয়ে রাস্তায় টো টো করে বেড়াব।

নিমাই—কক্ষনো না। ঐ টাকা দিয়ে তোকে পাগলা গারদে দিয়ে সারিয়ে আনব।

অতুল—তাহলেই হয়েছে।

নিমাই—আমাকে অবিশ্বাস করছিস? আচ্ছা এই তিন বছর ধরে তোতে আমাতে এক সঙ্গে আছি। যেদিন খাবার জুটেছে সেদিন সমান ভাগ করে খেয়েছি। যেদিন পাই নি সেদিন দুজনে না খেয়ে কাটিয়েছি। বল্ ঠিক কিনা—

অতুল—তা ঠিক।

নিমাই—তাহলে তুই বললি কেন যে টাকা পেলে তোকে আমি ফাঁকি দেব।

অতুল—দেখলাম কথাটা শুনে তোর রাগ হয় কিনা!

নিমাই—আমার এমন রাগ হয়ে গিয়েছিল মনে হচ্ছিল তোকে এক চাঁটি কষিয়ে দি।

অতুল—দিলি না কেন? (গভীর বেদনায়) জানিস খুব ছোটবেলায় বাবা একবার

আমাকে চাঁটি মেরেছিল। তিন দিন ভাত খাইনি রাগ করে। মা কত সেধেছে তবু খাই নি—আর আজ—

[অতুল কান্না চাপতে চেষ্টা করে]

নিমাই—(গায়ে হাত বুলিয়ে) আর আজ ভাতও নেই, সাধবারও কেউ নেই।

অতুল—(হঠাৎ নিমাইকে জড়িয়ে ধরে) সাধবার জন্যে তুই তো আছিস!

নিমাই—কিন্তু ভাত নেই এই যা তফাৎ।

অতুল—আমাদের কেউ নেই। কিছু নেই।

নিমাই—আমরা আগাছার দল।

অতুল—আমরা ফালতু।

নিমাই—আমরা সমাজের পাপ।

অতুল—সরকারী ভাষায় সমাজ বিরোধী। দূর দূর...এ ভাবে বেঁচে থাকতে ভালো লাগে না।

নিমাই—কিন্তু মরতেও তো মন চায় না।

অতুল—তার জন্যই তো এতদিন মরতে পারিনি।

নিমাই—আমরা কেন, কেউ মরতে চায় না।

অতুল—একদল লোক বেশী করে বাঁচবে—

নিমাই—তাই আমাদের কম করেও বাঁচতে দেয় না।

অতুল—যাকগে, ও সব বড় বড় কথায় আমাদের দরকার নেই।

নিমাই—পুলিশে ধরে নিয়ে যাবে।

অতুল—আহা, তাই যেন যায়, আজকাল জেলেও বড় বড় আর্টিষ্টরা গান শুনিয়ে যায়—

নিমাই—তুই-ই তো আবার বড় বড় কথা সুরু করলি!

অতুল—পেট ফাঁকা থাকলে মুখের ফাঁক দিয়ে ও রকম বড় বড় কথা বেরোয়।

নিমাই—বড্ড বাজে বকিস তুই।

অতুল—আচ্ছা এইবার চুপ করলাম।

নিমাই—হাঁ, যা বলছিলাম, যদি হঠাৎ কয়েক হাজার টাকা পেয়ে যাই—

অতুল—এখনও তোর মাথায় ঐ সব কথা ঘুরছে!

নিমাই—আহা, বললাম তো ধরতে ক্ষতি কি!

অতুল—আচ্ছা ধরলাম। কত হাজার ধরব বল্।

নিমাই—ধর্ দশ হাজার...কি করবি?

অতুল—গাঁয়ে ফিরে যাব। ছোট্ট একটা ঘর তুলব। তারপর দুজনে মিলে একটা দোকান দেব।

নিমাই—ঠিক আছে। আমার প্ল্যানের সঙ্গে মিলে যাচ্ছে। তোর একটা বিয়ে দিয়ে

টুকটুকে বৌ আনব। তোর বৌ রাঁধবে...বাড়বে...আমরা খাব। আর মজাসে দোকান চালাব।

অতুল—তাহলে চল্।

নিমাই—এই রাত্তির বেলা আবার কোথায় যাব!

অতুল—(পরিহাসতরল সুরে) দেখি, কোথাও টাকা পড়ে আছে কিনা—প্রথমেই এই ঘরটা খুঁজে দেখি—

নিমাই—নেই কাজ তো খই বাছ।

অতুল—(ঘুরতে ঘুরতে) এই করেই না হয় রাতটা...(একটা ছেঁড়া কাগজ তুলে নিয়ে) আহা, এটা যদি হাজার টাকার নোট হত! (কয়েকটা পড়ে থাকা ইঁটের টুকরো নিয়ে) আহা, এগুলো যদি সব সোনার তাল হতো...

নিমাই—কিরে! পাগল হয়ে গেলি নাকি?

অতুল—পাগল তো তুই করে ছাড়লি! (পড়ে থাকা কয়েকটি গাছের পাতা তুলে নিয়ে) আহা এগুলো যদি দুটাকার নোট হতো...

নিমাই—সবই তে দেখলি! ঐ যে কোণে একটা ন্যাকড়ার পুঁটলি পড়ে আছে। ওটা খুলে দেখ।

অতুল—আমার লাকটা ভালো যাচ্ছে না। তুই খুলে দ্যাখ। বলা যায় না তোর কপাল জোরে খোলা মাত্রই মুক্তো ঝরে পড়তে পারে।

নিমাই—তাহলে তুই-ই দ্যাখ।

অতুল—না। তুই-ই দ্যাখ।

নিমাই—আচ্ছা বেশ এক কাজ করা যাক। আমরা দুজনে ঘরের এই কোণ থেকে ছুটে যাব। যে আগে ধরবে, সেই খুলবে।

অতুল—ঠিক আছে।

নিমাই—অল্ রাইট। স্টার্ট।...

[দুজনেই ছুটে গেল। প্রায় একসঙ্গেই পুঁটলিটা ধরল]

অতুল—আমি আগে ধরেছি।

নিমাই—কক্ষনো না। আমি আগে।

অতুল—ঠিক আছে, তাহলে তুই-ই খোল।

নিমাই—না তুই-ই খোল।

[দুজনে বসল। অতুল খুলতে লাগল]

নিমাই—লাগ্ লাগ্ ভেল্কি লেগে যা...মণি মুক্তো ঝরে যা...লাগ্ লাগ্...

[অতুল খুলেই চমকে উঠল। তাড়াতাড়ি ন্যাকড়াটার মুখ বন্ধ করে উঠে দাঁড়াল। মুখ বাড়িয়ে বাইরেটা দেখবার চেষ্টা করল। ভাঙ্গা দরজাটা বন্ধ করতে চেষ্টা করতে লাগল। অতুল নিমাই-এর হাবভাবে বিস্মিত হয়ে পুঁটলির মুখটা আবার খোলামাত্রই সে চমকে উঠল।]

অতুল—(অবাক বিস্ময়ে) এই, সত্যি সত্যি টাকা যে রে!

[নিমাই কাছে এসে ভয়ে ভয়ে, উত্তেজনায়, পুঁটলি থেকে একটার পর একটা দশ টাকার নোটের বাণ্ডিল বার করতে লাগল। তারপর আবার পুঁটলিটা বেঁধে ফেলল।]

নিমাই—চল, পালাই।

অতুল—না, এখন পালান ঠিক হবে না। ভোর রাতে সরে পড়লেই হবে।

নিমাই—ঠিক বলেছিস! কোথায় রাখা যায় টাকাগুলো!

অতুল—কলসীটার মধ্যে ঢুকিয়ে রেখে কলসীটাকে উলটে রেখে দে।

[নিমাই তাই করল]

নিমাই—কত টাকা হবে বল তো?

অতুল—আট হাজার তো মনে হলো!

নিমাই—এত টাকা এখানে এল কি করে বল তো!

অতুল—আমিও তাই তো ভাবছি।

নিমাই—আমি কিন্তু আগে পুঁটলিটা দেখেছি।

অতুল—আমি যদি ঘরটা খুঁজতে না সুরু করতাম...তাহলে তো পুঁটলিটা ঐখানেই পড়ে থাকত, আমরা চলে যেতাম।

নিমাই—তাহলেও আমি দেখেছি।

অতুল—আমি কিন্তু আগে ছুঁয়েছি।

নিমাই—তুই ছুঁয়েছিস না আমি!

অতুল—উহুঃ, আমি।

নিমাই—উহুঃ, আমি।

অতুল—আচ্ছা কি কথা হয়েছিল।

নিমাই—যে আগে ছোঁবে, সেই খুলবে।

অতুল—আমি খুলেছি। অতএব আমি আগে ছুঁয়েছি।

নিমাই—বাঃ, আমি তো তোকে খুলতে বললাম।

অতুল—(হঠাৎ হো, হো, করে হেসে ওঠে) আমরা কি বোকা! পুঁটলি আগে কে দেখেছে, কে ছুঁয়েছে, সেই নিয়ে তর্ক করে মরছি কেন! ও যেই দেখুক না কেন টাকাটার মালিক তো আমরা দুজনেই।

নিমাই—(হেসে উঠে) সত্যি আমরা কি বোকা না! আমরা কি বোকা!...

[নিমাই হাসতে হাসতে খাটিয়ার ওপর শুয়ে পড়ে]

নিমাই—উঃ আর আমাদের পথে পথে না খেয়ে ঘুরে বেড়াতে হবে না।

অতুল—আর আমাদের চুরি জোচ্চুরির কথা ভাবতে হবে না।

[অতুল খাটিয়ায় ঠেসান দিয়ে মেঝেতে বসে পড়ে]

নিমাই—এবার অনেক দূর কোন গাঁয়ে গিয়ে—

অতুল—এই একটা কাজ করলে হয় না!

নিমাই—(খাটিয়ার উপর থেকে ঝুঁকে পড়ে) কি!

অতুল—আয়, টাকাটা আমরা দুজনে আধাআধি ভাগ করে নিয়ে যার যে দিকে ইচ্ছে চলে যাই। এক বছর বাদে আমরা আবার দেখা করব। হিসেব করে দেখব কার টাকাটা বাড়ল, আর কে কমিয়ে ফেলল।

নিমাই—(উঠে বসে) তা কথাটা মন্দ না। তবে এখুনি ঠিক করে কাজ নেই। এখান থেকে আগে টাকাটা নিয়ে সরে পড়া যাক্। তারপর ভেবে চিন্তে ঠিক করা যাবে।

[নিমাই খাটিয়ায় শুল। অতুল একটু দূরে মেঝেয় গড়াল]

অতুল—ঘুমোন যাক্। কি বলিস?

নিমাই—হ্যাঁ, বড্ড ঘুম পাচ্ছে।

[কিছুক্ষণ চুপচাপ। তারপর অতুল ডাকে]

অতুল—নিমাই! (সাড়া না পেয়ে) নিমাই। (উঠে বসে) নিমাই, ঘুমিয়ে পড়লি নাকি!

[উঠে আসে পা টিপে টিপে, নিমাই-এর কাছে]

অতুল— নিমাই!

[সাড়া পায় না। তারপর ধীরে ধীরে কলসীটার কাছে গিয়ে সেটাকে সোজা করতে চেষ্টা করে। নিমাই-এর যেন ঘুম ভাঙ্গে। একটু মুখ তুলে জিজ্ঞেস করে]

নিমাই—কি করছিস রে ওখানে?

অতুল—(চমকে) ভাবছিলাম কত টাকা আছে একবার গুণে দেখব।

নিমাই—এখন আবার গোণবার দরকার কি? পরে গুণলেও চলবে।

অতুল—হাঁ, তা বটে।

[অতুল ফিরে এসে আবার শুয়ে পড়ে]

বড্ড ঘুম পাচ্ছে।

নিমাই—বেশ তো, ঘুম পাচ্ছে তো ঘুমো। আমি তো জেগে আছি।

অতুল—কৈ আর জেগে ছিলি? এই তো ঘুমিয়ে পড়েছিলি!

নিমাই—আমি তো ঘুমোই নি।

অতুল—অতবার করে ডাকলাম, সাড়া দিলি না কেন?

নিমাই—দেখছিলাম তুই কি করিস?

অতুল—(অল্প চীৎকার করে) তুই আমাকে সন্দেহ করছিস?

নিমাই—দূর পাগল। তুই সন্দেহ করবার মত কোন কাজ করলে তবে তো সন্দেহ করব।...আমিও তোকে সন্দেহ করি না। তুইও আমাকে সন্দেহ করিস না। নে, ঘুমো।

[দুজনে আবার কিছুক্ষণ চুপচাপ। একটু পরে নিমাই ডাকে]

নিমাই—অতুল।

[অতুল সাড়া দেয় না]

নিমাই—(আবার ডাকে) অতুল!

[এবারও সাড়া পায় না। নিমাই উঠে বসে। তারপর সেও কলসীটার দিকে আগাতে যায়। এবার অতুল পাস ফিরতে ফিরতে বলে]

অতুল—ওদিকে যাবার চেষ্টা করিস না। শুয়ে পড়।

[নিমাই এসে শুয়ে পড়ে। একটু পরে অতুলের নাক ডাকার শব্দ পাওয়া যায়। নিমাই এইবার উঠে বসে। আস্তে আস্তে কলসীটার কাছে যায়। পুঁটলিটা বার করে কলসী থেকে, তারপর বেরিয়ে যাবে এমন সময় অতুল উঠে বসে।]

অতুল—বিশ্বাসঘাতক শয়তান কোথাকার! টাকাগুলো নিয়ে পালিয়ে যাওয়া হচ্ছে!

[তারপর হিংস্র ব্যাঘ্রের মত নিমাই-এর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে।]

নিমাই—বেশ করব, নেব। এ টাকা আমার!

অতুল—কক্ষনো না, এ টাকা আমার!

[অতুল নিমাই-এর হাত থেকে পুঁটলিটা কেড়ে নিতে গিয়ে তা খুলে যায়। নোটের বাণ্ডিলগুলো ছড়িয়ে পড়ে স্টেজের ওপরে। সেদিকে ভ্রূক্ষেপ না করে ওরা পরস্পর মারামারি সুরু করে। তারপর হঠাৎ অতুলের এক প্রচণ্ড ঘুঁসি খেয়ে নিমাই ছিটকে পড়ে যায়। অতুল নোটের বাণ্ডিলগুলো কুড়োতে কুড়োতে পুঁটলিতে ভরতে সুরু করে। তারপর একটা নোটের বাণ্ডিল নিয়ে হঠাৎ সে যেন থমকে দাঁড়ায়। তারপর মোমবাতির আলোয় তা ভালো করে দেখতে থাকে। তার মুখ বিবর্ণ হয়ে যায়।]

অতুল—এ কিরে, এগুলো যে সব জাল নোট।

[অতুলের হাত থেকে পুঁটলি পড়ে যায়। নিমাই প্রায় গড়াতে গড়াতে একটা বাণ্ডিল হাতে তুলে নেয়। অতুল মোমবাতিটা তার কাছে ধরে। নিমাই একটু দেখে বাণ্ডিলটা ছুঁড়ে ফেলে দেয়। হাসতে চেষ্টা করে। কিন্তু পারে না। হাসি যেন কান্নায় রূপান্তরিত হয়ে যায়।]

অতুল—সব জাল নোট। নিশ্চয়ই কেউ ধরা পড়বার ভয়ে লুকিয়ে রেখে গেছে। কিংবা এই বাড়ীতেই নোট জাল হতো...

[অতুল নোটের বাণ্ডিলগুলো পুঁটলির মধ্যে ভরে কলসীর মধ্যে রেখে দেয়। তারপর আস্তে আস্তে নিমাই-এর কাছে এসে তার পিঠে হাত বুলোতে বুলোতে]

খুব লেগেছে, না রে?

নিমাই—(অতি কষ্টে উঠে বসে) হাঁ, তা একটু লেগেছে বৈকি! তোর লাগে নি?

অতুল—তা লেগেছে বৈকি! তুই-ও তো কম মারিস নি।

[অতুল নিমাই-এর গায়ে হাত বুলোতে থাকে। নিমাইও অতুলের। হঠাৎ অতুল নিমাইকে জড়িয়ে ধরে বলে—]

অতুল—হঠাৎ আমরা কত ছোট হয়ে গিয়েছিলাম, নাঃ!

নিমাই—চল্। চলে যাই। এখানে থেকে কাজ নেই।

অতুল—তাই চল্।

[অতুলের কাঁধের ওপর ভর দিয়ে নিমাই দাঁড়ায়। তারপর ধীরে ধীরে বেরিয়ে যায়। যাবার আগে বাতিটা ফুঁ দিয়ে নিভিয়ে দিয়ে নিমাই মোমবাতিটা পকেটে ভরে নেয়। মঞ্চ অন্ধকার হয়ে যায়। দু-দিকের পর্দা এসে মেশে।]

□

জীবন যৌবন

অমর গঙ্গোপাধ্যায়

(১৯৩০)

চরিত্র

রথীন

সমরেশ

রাজীব

শংকর

সলিল

বিমল

[নিস্তব্ধ দুপুরের জনবিরল রেষ্টুরেন্ট। আসবাবপত্র অতি সাধারণ। নিপুণভাবে সাজানো, তিনটি টেবিলকে কেন্দ্র করে বারো খানা চেয়ার। দেওয়ালে রামকৃষ্ণ, বিবেকানন্দ, মহাত্মা গান্ধী, নেতাজী আর জবাহরলালের ছবি টাঙানো আছে। প্রত্যেকটি ছবির ওপরে ঝুলছে বেশ কয়েকদিনের বাসি গাঁদা ফুলের মালা।

রথীন একটা চেয়ারে বসে কাগজ পড়ছে। কলার ছিঁড়ে যাওয়া একটা সার্ট গায়ে। বোতাম খোলা থাকায় ছেঁড়া গেঞ্জির অনেকখানি দেখা যাচ্ছে। অবিন্যস্ত চুল। চোখে আশ্চর্য রকম উদাস দৃষ্টি। ঠিকমত বোঝা যায় না সত্যিই কাগজ পড়ছে, না, মনে মনে অন্য কিছু ভাবছে।

রেষ্টুরেন্টের বয় বিমল ফাঁকা একটা টেবিল ঝাড়ন দিয়ে মুছছে। অল্পবয়সের চটপটে ছোকরা। চোখে বুদ্ধির ছাপ। মুখে সামান্য আভিজাত্যের ছাপ আছে। পরণে বেশ পরিষ্কার ধুতি আর গেঞ্জি।

সব চাইতে কোণের টেবিলটায় চুপ করে বসে আছেন রাজীববাবু। পরণে শতচ্ছিন্ন একটি উকিলের কোট আর প্রাগৈতিহাসিক প্যান্ট। মুখে অযত্নবর্দ্ধিত দাড়ি। চোখে উদ্ভ্রান্ত দৃষ্টি। দেখলে মনে হয় পৃথিবীটাকে উনি কিছুতেই বুঝে উঠতে পারছেন না।]

রথীন—(বিমলকে কিছু বলতে গিয়ে চেপে যায়। তারপর কি ভেবে বলে) বিমল এক কাপ চা দে তো।

বিমল—(রথীনের দিকে না তাকিয়ে টেবিল মুছতে মুছতে) বাবু আপনাকে চা দিতে বারণ করে গেছেন।

রথীন—বারণ করে গেছে! কে? কেষ্টমোহন? নাঃ, হতভাগা জ্বালালে দেখছি। তা বাপজীবন, তোমার মধ্যে কি কৃতজ্ঞতার ছিঁটে ফোঁটাও নেই? চাকরীটা জুটিয়ে না দিলে, না খেয়ে শুকিয়ে মরতে যে। যাও বাবা, বেশ ভালো করে এক কাপ চা নিয়ে এসো। (কাশতে কাশতে) কৃতজ্ঞতা প্রকাশের এমন সুযোগ দিনে একবারের বেশি দুবার পাবে না।

বিমল—আঁজ্ঞে, আপনিই তো বলেছেন, মনিবের কথা অমান্য করবি না।

রথীন—বলেছি! (মাথা চুলকে) তাহলে তো নিজের বারোটা নিজেই বাজিয়েছি। (বিমলের চিবুক ধরে) তা মাণিক, আমার সব কথাই যখন গুরুবাক্য বলে মেনে নিয়েছ, তখন দয়া করে এই বাক্যটিও মেনে নাও। যাও, নিয়ে এসো এক কাপ চা।

[সমরেশের প্রবেশ]

সমরেশ—এই যে রথীনবাবু! দুদিন ধরে আপনাকে গরু খোঁজা খুঁজছি মশায় (চেয়ারে বসে)।

রথীন—গরু খোঁজা! আমাকে গরু ভেবে খুঁজছিলেন? না, গরুর মত খুঁজছিলেন?

সমরেশ—আপনারা মশায় নাট্যকার মানুষ। আপনাদের সঙ্গে কি কথায় পারবো। (বিমলকে) দু কাপ চা দাও তো ভাই।

রথীন—(বিমল ইতস্ততঃ করছে দেখে) আর ভাবিস না হতভাগা। দুকাপ চা নিয়ে আয়।—এই এক ঝামেলা হয়েছে মশায়; পকেটে নগদ পয়সা নেই যে অন্য দোকানে গিয়ে চা খাব। এদিকে কেষ্টমোহন হতভাগা আমার স্বাস্থ্যরক্ষা করছে (কাশতে থাকে)।

বিমল—ঠিকই তো করছে। এদিকে হরদম কেশে মরছেন, তার ওপর দিনে দশ বারো কাপ চা।...

রথীন—জীবনে তো বুদ্ধির চর্চা করলি না। করলে বুঝতিস দিনে দশ বারো কাপ চা খেলে বুদ্ধি কি নিদারুণভাবে সাফ হয়। যা বাবা নিয়ে আয়।—আহা, মুখ গোমড়া করিস না।—যা..

[বিরক্ত মুখে বিমলের প্রস্থান]

তারপর, বলুন আমার মত অভাজনকে (তীব্র কাশির ধমকে কথা বন্ধ হয়ে যায়। অনেক কষ্টে কাশিটা সামলে ওঠে রথীন)।

সমরেশ—সত্যি, আপনার ডাক্তার দেখানো উচিত।

রথীন—(ম্লান হেসে) ডাক্তার দেখিয়ে লাভ নেই। কেঁচো খুঁড়তে সাপ বেরিয়ে পড়বে। আজ শুধু কাশছি। একদিন কাশির সঙ্গে রক্ত উঠবে। রোগটা সেদিন স্পষ্টভাবেই ধরা পড়বে। যাক সে সব কথা। বলুন কেন খুঁজছিলেন আমাকে।

সমরেশ—বেশ জমাট আর নতুন ধরনের একটা নাটক চাই।

রথীন—কি চাই?

সমরেশ—কোন নতুন theme-এর ওপরে বেশ জমাট একটা নাটক।

রথীন—বিমল, এক কাপ চা নিয়ে আয়।

সমরেশ—কেন? এক কাপ চা কেন?

রথীন—আপনার চা খাবো, অথচ নাটক দেবো না, এটা কি উচিত হবে! তাই ভেবে দেখলাম চা-টা না খাওয়াই ভাল।

সমরেশ—কেন? নাটক দেবেন না কেন? আরে আপনার ভরসাতে সবাইকে কথা দিয়েছি।...

রথীন—অসম্ভব। নাটক আর লিখবো না।

রাজীব—(হঠাৎ উঠে দাঁড়িয়ে) মিথ্যে কথা। It's a damn lie. ধর্মাবতার! আমি প্রশ্ন করছি, ফরিয়াদী যদি বাধা না দিয়ে থাকে তাহলে আসামীর হাতে কামড়ের দাগ এলো কি করে? আমি প্রশ্ন করছি, মেয়েটি তখন চীৎকার করে উঠেছিল কেন? বিচারের ইতিহাসে টাকা দিয়ে সাজানো মিথ্যে আসল সত্যকে বহুবার ঢেকে দিয়েছে। Here is an example, I repeat Me Lord, it's a lie; damn lie.

সমরেশ—(অবাক চোখে তাকিয়ে থাকে। রথীন ইঙ্গিতে বুঝিয়ে দেয় মাথার গোলমাল আছে) তা হঠাৎ নাটক লিখবেন না ঠিক করলেন কেন?

রথীন—কেন ঠিক করলাম!—মানুষের জীবনে এমন অবস্থাও আসে যখন নাটক লেখাটাও বিলাসিতা মনে হয়। বোনটা এক বছর ধরে T.B.-তে ভুগছে। বাবা সামান্য মাইনের স্কুল মাস্টার। পয়সার অভাবে চিকিৎসা তো দূরের কথা, পথ্যটা পর্যন্ত ঠিক মত জোটে না। এই অবস্থায় দাদা হয়ে আমি সখের নাটক লিখে বেড়াবো, এটা শুধু পাঁচজনের কাছে নয়, আমার নিজের কাছেও একটা crime।

রাজীব—(ঝানু উকিলের মত দৃঢ় ঋজু পদক্ষেপে ক্রমশঃ এগোতে এগোতে) Is this society made for crime and criminals? ধর্মাবতার! একটি সহায় সম্বলহীন নারী সুবিচারের আশায় আইনের আশ্রয় নিয়েছে। একদিকে টাকায় তৈরী সাক্ষীর জঘন্য মিথ্যে ভাষণ; আর একদিকে সামান্য কয়েকটি সৎ নাগরিকের সত্যনিষ্ঠা। বিচার করুন ধর্মাবতার, সত্যাসত্যের মানদণ্ডে সৎ অসতের বিচার করুন।

রথীন—(রাজীববাবুর দিকে তাকিয়ে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে) নাটক আর লিখবো না সমরেশবাবু। একদিন ভেবেছিলাম চোট খাওয়া মানুষের বলতে না-পারা কথাগুলো মানুষের মনের দরজায় পৌঁছে দেব। (বিমল বিরক্তমুখে চা দিয়ে যায়) ছিঁড়ে খুঁড়ে যাওয়া কিছু মানুষকে রূপ দিয়েছিলাম আমার নাটকে। তারা নিজেদের রক্তাক্ত ক্ষতটার কথা নাটকীয় ভাষায় তারস্বরে ঘোষণা করেছে। আপনারা বাহবা দিয়েছেন। কোন কোন দর্শক চোখের জল ফেলেছেন। কিন্তু আজ বোনটার রক্ত লেগে থাকা ঠোঁটের ফ্যাকাশে হাসিটুকু দেখে বুঝেছি, আমার সাজানো চরিত্রগুলো শুধু চীৎকার করে কথা বলে গেছে। কিন্তু বলতে পারে নি কিছুই। তারা স্পষ্ট করে দেখাতে পারে নি, বুকের রক্ত কেমন করে মুখে উঠে আসে।

সমরেশ—রথীনবাবু, আপনার পারিবারিক ঘটনা নিয়ে একটা নাটক লিখে দিন। We would produce it in such a way...

রথীন—আমার পারিবারিক জীবন! It's a tragedy, but no drama. নাটকীয় চরিত্র আছে। আমার বাবা সহজ সরল গ্রাম্য স্কুল মাস্টার। পৃথিবী আর মানুষের ওপরে তাঁর আশ্চর্য রকম বিশ্বাস। সন্তানের জন্য তাঁর অপরিসীম মমতা। অথচ মাস কাবারে একশ পঁচিশ টাকা অন্যান্য বহু জিনিষের মত ঐ মমতাটুকুকেও অবান্তর করে রেখেছে। আমার বোন, বাসি রজনীগন্ধার মত করুণ একটি মেয়ে। অভাবের সংসারে রোগটা তার বিরাট লজ্জা। আমি ওকে স্বপ্নের ঘোরে বলতে শুনেছি, আমাকে ডেকে নাও; ভগবান, তোমার কোলে আমাকে ডেকে নাও। (কান্নায় ভিজে আসা গলাটাকে একটু সময় দিয়ে ম্লান হেসে) তারপর আমি স্বয়ং! A tragic relief! জগৎ-জোড়া বেকার-সমস্যায় অতিরিক্ত একটা সংখ্যা মাত্র। বন্ধুদের চোখে পথভ্রষ্ট প্রতিভা! বাবার চোখে এখনো নাবালক শিশু। আর বোনটার

কাছে এমন একটা মানুষ যাকে ও ছাড়া এই পৃথিবীতে আর কেউ চিনল না।

রাজীব—ভাল করে দেখুন, চিনতে পারেন কিনা। অপমানিত মুখের দিকে চেয়ে দেখুন। দমকা ঝড়ে এলোমেলো হয়ে যাওয়া ওকে চিনতে পারেন? ভাঙা স্বপ্ন নিয়ে ও আপনার দিকে তাকিয়ে আছে। বলুন ওকে কোথায় দেখেছেন?

রথীন—(রাজীবের দিকে তাকিয়ে ছিল। হঠাৎ কিছু বলতে গিয়ে কেশে ওঠে। কাশি থামলে) আশ্চর্য তিনটি নাটকীয় চরিত্র! একজন সারাজীবন জ্বলে পুড়েও পৃথিবীর ওপর বিশ্বাস হারাল না। একজন নিজের রোগটাকে অন্যায় অপরাধ ভেবে, নিজেকে একেবারে গুটিয়ে নিল। আর একজন সব জায়গায় হেরে গিয়ে আশ্রয় নিল দার্শনিক চিন্তায়। চেনা চরিত্র না হলে এদের নিয়ে আমি জ্বালাময়ী নাটক লিখতে পারতাম। কিন্তু আমার অত্যন্ত পরিচিত এই তিনটি চরিত্রের পরস্পরের সঙ্গে দেখা শোনা হয় খুব কম। কথা হয় আরও কম। আর ঘটনা! সোমবারের সঙ্গে শনিবারের কোন তফাৎ নেই। আষাঢ়ের সঙ্গে ফাল্গুনের কোন তফাৎ নেই। এক কথায় আছে সবই—নেই শুধু action!

[শংকরের প্রবেশ। স্মার্ট চেহারা। তীক্ষ্ণ উজ্জ্বল চোখ। দৃঢ় প্রত্যয় ছড়িয়ে আছে গোটা মুখে।]

শংকর—সুখবর আছে রথীন। পিটার এ্যাণ্ড মরিসনের চাকরীটা পেয়ে গেলাম। Starting প্রায় তিন শ' টাকা।

রথীন—এবার বেশ সুন্দরী দেখে একটা মেয়েকে বিয়ে কর। মাকে বিশ্রাম দে। আর পান খাওয়া ধর। আমার মতে, ঠিকমত পান চিবোতে না জানলে জমিয়ে সংসারী হওয়া যায় না।

শংকর—শ্যামলী আজ কেমন আছেরে?

রথীন—যে নিজে থাকা না-থাকার বাইরে চলে গেছে, বাইরে থেকে তার কিছু বোঝা যায়?

শংকর—(রথীনের দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে) তোর নাটকে একটা চরিত্র বড় অদ্ভুত একটা প্রশ্ন করেছিল, পাল ছিঁড়ে গেছে বলে কি হালটাও ছেড়ে দিতে হবে?

রথীন—ওটা আমার নাটকের একটা চরিত্রের প্রশ্ন। কিন্তু যে নাটকে আমি নিজে একটা চরিত্র সে নাটকে আমার একমাত্র প্রশ্ন, পাল যখন ছিঁড়েই গেছে, তখন হাল ধরে কি লাভ?

শংকর—ব্যবসাদারীর মাল নিয়ে যারা নৌকো বোঝাই করছে, লাভ-লোকসানের হিসেবটা তাদের জন্যই তোলা থাক। বল, শ্যামলী আজ কেমন আছে।

রথীন—এক কথায় যদি বুঝতে পারিস, বুঝে নে—আজ তিনদিন বাদে ওর জন্য দুটো বেদানার যোগাড় হয়েছে।

শংকর—(রথীনকে সান্ত্বনা দিয়ে) রথীন ভেঙ্গে পড়াটা...

রথীন—জানি, জানি—ভেঙে পড়াটা পুরুষের জন্য নয়। কেঁদে ফেলাটা মেয়েলি ব্যাপার। কিন্তু বলতে পারিস, আমার ভেতরের দাদাটা কোথায় গিয়ে তার লজ্জা লুকোবে? শ্যামলীর চোখের দিকে আমি তাকাতে পারি না। ওর আশ্চর্য দুটো চোখ আমাকে সান্ত্বনা দিতে চায়। মুখের রক্তটুকু মুছে ও হেসে উঠতে চায়; কিন্তু কাশির একটা ধমকে সমস্ত হাসিটা রক্তাক্ত হয়ে ওঠে।

শংকর—রথীন, ঐ রক্তটুকু মুছে দিতে হবে। তারপর যা থাকবে সেইটুকু তোর আমার লাভ। রোগটা দুরারোগ্য নয়।

রথীন—তা জানি। কিন্তু আরোগ্যের পথটা খুব কঠিন—দুরারোহ।

শংকর—ওকে আমি স্যানাটোরিয়ামে পাঠাব রথীন। আমার মাসকাবারের তিনশ' টাকা, তার ওপরে টিউশনির টাকা। ওকে আমরা বাঁচিয়ে তুলবই। এক বুক অভিমান নিয়ে ওকে কিছুতেই যেতে দেব না।

রাজীব—তবু চলে যায়। তবু যেতে দিতে হয়। কই, আমি ত ধরে রাখতে পারলাম না? যাবার আগে সমস্ত সংসারের দিকে আঙ্গুল বাড়িয়ে সে বলে গেল, একে পাল্টাও। কই, পাল্টাতে ত পারলাম না?—You, you brave young man! যদি পার, দুই হাতে শয়তানটার গলা টিপে ধরো। মনে রেখ, ওর নখে বিষ মাখানো আছে। ওর চোখে ভুল ঠিকানার হদিস। মিষ্টি হেসে ও সব কিছু ভুলিয়ে দেয়। Bright boys! যদি পার শয়তানটাকে—থাক। ওটা আমিই করব। ওটা আমিই করব।

শংকর—বেচারা! ছেলেটা মারা যাবার পর থেকে—রথীন, তুই কি এখন বাড়ীর দিকে যাবি?

রথীন—না। কেন বল ত?

শংকর—তোর ওখানেই যাব আমি। বহুদিন আগে শ্যামলীকে একটা কথা দিয়েছিলাম...

রথীন—পরে গেলেও চলবে। তোর আগের record অনুযায়ী সেটা খুব দোষের হবে না।

শংকর—পাঁচ বছর আগের শংকর আর আজকের শংকরে যে অনেক তফাৎ সেটা তুইও বুঝিস। শুধু মুখে স্বীকার করিস না। যাক, তুই বোস। আমি কিছুক্ষণের মধ্যেই আসছি।

[প্রস্থান]

রথীন—(শংকরের যাওয়ার পথের দিকে উদাসভাবে তাকিয়ে) জন্তু-জানোয়ারের সঙ্গে মানুষের একটা মাত্র তফাৎ আছে; জন্তু-জানোয়ারেরা বদলায় না, কিন্তু মানুষ বদলায়। পাঁচ বছর আগেও শংকর ছিল—(সমরেশ সিগারেট বাড়িয়ে দেয়) বিমল, দেশলাইটা দে তো।

[বিমলের প্রবেশ]

রাজীব—Here is the fire my boy! প্রমিথিউসের চুরি করে আনা আগুন। বর্তমানে পৃথিবীতে সর্বশেষ খাঁটি জিনিস। এক নিমেষে সব মেকী পুড়িয়ে ছাই করে দিতে পারে। (সিগারেট দুটো ধরিয়ে দিয়ে) এক কাপ চা খাওয়াবে?

সমরেশ—এক কাপ চা দাও তো ভাই।

বিমল—বাবু ওনাকে চা দিতে বারণ করে গেছেন। সকলের কাছে উনি চা চেয়ে বেড়ান। এতে দোকানের বদনাম হয়।

রথীন—যা, এক কাপ চা নিয়ে আয়। লোকটাকে দেখে তোর কি একটুও মায়া হয় না?

[বিমল চলে যাচ্ছিল। রথীনের শেষ কথায় হঠাৎ ঘুরে দাঁড়ায়। একটা কিছু বলতে গিয়েও চুপ করে যায়।]

রথীন—রাজীববাবু, আপনার খাওয়া হয়েছে?

রাজীব—চুপ! Keep quite. শুনতে পাচ্ছ না? মাটির তলা থেকে একটা কান্না উঠে এসে সমস্ত আকাশটাকে কাঁদিয়ে দিয়ে গেল। কে কাঁদছে জানো? মানুষের ভালবাসা। মানুষ যাকে জোর করে গলা টিপে মেরে ফেলেছে। তারপর তাকে মাটি চাপা দিয়ে তার ওপরে বানিয়েছে সভ্যতার ইমারত। (নিজের চেয়ারে গিয়ে বসে।)

সমরেশ—আশ্চর্য লোক তো?

রথীন—এককালে নামকরা উকীল ছিলেন। একটা নারীধর্ষণ case-এ ফরিয়াদী পক্ষ নিলেন। বলতে গেলে উনিই মেয়েটিকে দিয়ে নালিশ করিয়েছিলেন। আসামী যখন বুঝতে পারল, আইনের প্যাঁচে জেতা যাবে না, তখন টাকা দিয়ে ওঁকে কিনতে চাইল! কিন্তু পৃথিবীতে একজাতের মানুষ আছে যারা কিছুতেই বিকিয়ে যায় না। তারপর একদিন বাড়ী ফেরবার পথে পড়লেন গুণ্ডাদের হাতে। লাঠির এক ঘায়ে অজ্ঞান অচেতন হয়ে পড়লেন। কয়েকদিন বাদে জ্ঞান ফিরে এলো, কিন্তু চেতনা আর ফিরল না।

সমরেশ—রথীনবাবু, এঁকে নিয়ে নাটক হয় না? It's a symbolic character.

রাজীব—না। না। না। ধর্মাবতার! এ শুধু নারী নির্যাতনের প্রশ্ন নয়। টাকা এসে আজ মনুষ্যত্বকে অপমান করছে। চাঁদির পাহাড়ে নিরাপদে বড় হচ্ছে লালসার কালসাপ। বিচার করুন কে বড়। একদিকে মানুষের তৈরী টাকা, টাকায় তৈরী মানুষ; আর একদিকে শুধু মানবতা, সোনা রূপার মত কেনা যায় না বলে যা আজ লাঞ্ছিত অবমানিত।

রথীন—(ম্লান হেসে) যে সমাজটা ভেতরে বাইরে বিষিয়ে গেছে, সেখানে উনি মানুষের মত বাঁচতে চেয়েছিলেন। ভুলের খেসারৎ দিতে হয়েছে। একমাত্র ছেলে নিরুপায় দুই চোখের সামনে বিনা চিকিৎসায় মারা গেছে। সব হারিয়ে উনি পথে ঘাটে রেষ্টুরেণ্টে রকে একটি মাত্র case plead করে চলেছেন, 'বিচার করুন। ধর্মাবতার,

সত্যাসত্যের মানদণ্ডে সৎ ও অসতের বিচার করুন।' (শেষদিকে কান্নায় ভিজে আসা গলায় হঠাৎ কাশির ধমক ওঠে। কাশতে কাশতে মুখ চোখ লাল হয়ে ওঠে। বিমল রাজীববাবুর টেবিলে চা রেখে অবাক চোখে তাকিয়ে থাকে।) ভয় নেই। বোধ হয় কান্না চাপতে গিয়ে, এই বিভ্রাট হয়েছে। (বিমলকে) তুই হাঁ করে তাকিয়ে আছিস কেন?

[বিরক্তভাবে বিমলের প্রস্থান। সলিলের প্রবেশ। খাঁটি বোহেমিয়ান চেহারা। জামা-কাপড়ের আভিজাত্য আছে, কিন্তু সবই অশ্রদ্ধায় অবিন্যস্ত। মুখে আশ্চর্য হাসি, কিন্তু চোখের গভীরে বেদনার সজলতা।]

সলিল—(সুর করে) হাম তো পিকে চলে। আব তো আপনে ভালাই সে দুনিয়া জ্বলে। কেয়া জানে মহব্বত মিলে না মিলে।—কিরে! ভাবছিস দুপুরেই কয়েক পেগ চড়িয়ে এসেছি! (চেয়ার টেনে হাতলের ওপর বসে।)

রথীন—এই! হাতলের ওপর বসিস না। কেষ্টমোহন দেখতে পেলে...

সলিল—Hang your কেষ্টমোহন। মেজাজ খুলে গেলে আমি শূলে বসতে পারি, আর হাতলে বসতে পারবো না। হাম তো পিকে চলে—গানটার মানে বুঝছিস? গানটা আমার জন্যই লেখা। আমি নিজের ভাষায় মানেটা বলে দিচ্ছি, শোন,—আমি আকণ্ঠ পান করে চলেছি। হতভাগা দুনিয়াটা আমার ভালমানুষিতে জ্বলে পুড়ে মরছে। জানি না কারো ভালবাসা আমার ভাগ্যে আছে কি না।

রাজীব—ভালবাসা! What is ভালবাসা? মানুষের মনের অক্ষম আবেগ! প্রচুর আকাঙ্খার সঙ্গে সামান্য সঙ্গতির eternal conflict, বাপের চোখের সামনে তার ছেলে কেন বিনা চিকিৎসায় মরে জানো?—বলব না; কিছুতেই বলব না। উত্তর তোমাকে খুঁজে নিতে হবে। বাপের চোখে ছেলের মৃত্যু সংবাদ পড়ে নিতে হবে। শুকিয়ে যাওয়া সমুদ্রটাকে টেনে বার করতে হবে তার দুই চোখ দিয়ে।

সলিল—যাঃ বাবা। আমি জানতাম এখানে আমি একমেবাদ্বিতীয়ম। রথীন, বিপদ হয়ে গেল যে! এক ঘরে তো দুই পাগলের স্থান নেই।

রথীন—দেখ সলিল, সব কিছু জেনে তুইও যদি ওঁকে পাগল বলিস!...

সলিল—এই দেখ। না, তোকে নিয়ে পারব না। কতদিন ত বলেছি, don't be serious. দিনগুলোকে গড়ানো পয়সার মত ছেড়ে দে। জীবনটাকে রঙীন ওড়নার মত উড়িয়ে দে। মনস্তাত্ত্বিকরা বলবে, পলায়নী মনোবৃত্তি। করজোড়ে সবটুকু মেনে নিয়ে বলবি, বাবা নিজের চরকায় তেল দাও। চরকা দেখলেই তেল ঢালতে এসো না।

রথীন—এভাবে হয়তো হাসা যায়। কিন্তু কান্না চাপা যায় কি?

সলিল—কিছুতেই না। গোপনে চোখের জল ফেলে চোখটা ভাল করে মুছে নিবি। তারপর যখন হাসবি তখন কেউ বুঝতেও পারবে না। সমুদ্র থেকে জল শুষে

তবেই আকাশে রামধনু তৈরী হয়। ছোটবেলায় মা হারিয়েছি। একটা ভাই নেই, বোন নেই। নিজের অনন্যসাধারণ চরিত্রগুণে কোন্ মেয়েকে ভালবাসলাম না। হৃদয়টাকে যখন প্রায় মরুভূমি করে এনেছি, তখন হঠাৎ মনে হল জল চাই। বাবার দেরাজ থেকে মদের বোতলটা বার করলাম।

[বিমলের প্রবেশ]

বিমল—আপনি হাতলের উপর বসেছেন কেন?

সলিল—টেবিলের উপর বসিনি বলে।

বিমল—না—আপনি নেমে বসুন।

সলিল—দেখ, উচ্চস্থানে বসলে আমার মনে উচ্চভাবের প্রাদুর্ভাব হয়। এখন আমি একটু ধ্যানস্থ হব। কোনরকম ইয়ার্কি মারবি না এখন।

বিমল—না। বাবু দেখলে বকবে।

সলিল—বাবু দেখলে শুধু বকবে। কিন্তু এখানে বেশীক্ষণ ট্যাক ট্যাক করলে আমার কাছে ধোলাই খাবে।

রথীন—যা বিমল। ও হতভাগা নামবে না। চিনিস তো ওকে। (বিমল ধ্যানস্থ সলিলের দিকে একটু তাকিয়ে বিরক্ত হয়ে চলে যায়।)—হ্যাঁ রে সলিল, জীবনটা কি এইভাবে কাটবে?

সলিল—মনে তো হয় না! তবে যতদিন সত্যযুগ না আসে এইভাবে কাটিয়ে দেব। শ্যামলী কেমন আছে রে?

রথীন—আশ্চর্য! শ্যামলীর খবর তুই কোন দিন জানতে চাস নি!

সলিল—ভেবেছিলাম খুব তাড়াতাড়ি মরে যাবে। আজ হঠাৎ মনে হল ও মরে গেলে চলবে না। ওকে বাঁচতে হবে। (রথীন অবাক হয়ে তাকিয়ে আছে দেখে) শংকরের সঙ্গে পথে দেখা হল, ঠিক বুঝতে পারলাম না ওর চোখে জল দেখলাম, না আগুন দেখলাম।

রথীন—মানুষের চোখে তুই কবিতা খুঁজে বেড়াচ্ছিস সলিল। মানুষের মুখে স্বপ্নের মানুষটাকে দেখতে চাইছিস। আমাকে নিয়েও একদিন মাতামাতি করেছিলি। আজ তাকিয়ে দেখ আমার চোখের দিকে...

সলিল—মরে যাওয়া চোখের দিকে আমি তাকাই না। গম্ভীর কথা আমার মুখে মানায় না। তবু বলছি, শংকরের মনটা ইস্পাত দিয়ে তৈরী। তিন দিন বাদে দুটো বেদানা এনে ও শ্যামলীকে সান্ত্বনা দেবে না। নিজের অন্নটুকুও ও ওর মুখে তুলে দেবে।

রথীন—তুই কি ভাবিস শংকর যেটা পারে, সেটা আমি পারি না? শ্যামলীকে তুই আজও চিনতে পারিস নি। কারোর মুখের অন্ন ও কিছুতেই মুখে তুলবে না। এমন সংসারে ও জন্মেছে যেখানে বাঁচবার স্পৃহাটাই মরে গেছে। নিজের মৃত্যু কামনায় ও মশগুল হয়ে আছে।

সলিল—ওর কানে কানে মালাবদলের সানাই বাজিয়ে দে, দেখবি কামনার পালাবদল হয়ে গেছে।

রথীন—যা বলতে চাস্, খুলে বল।

সলিল—শংকর শ্যামলীকে ভালবাসে।

রথীন—জানি। জানি বলেই ভয় হয়, শংকর হয়তো একদিন শ্যামলীকে চেয়ে বসবে। আমি চাই তার আগেই সব শেষ হয়ে যাক।

সলিল—শেষ না হয়ে শুরু হোক রথীন। ওকে শংকরের হাতে তুলে দে।

রথীন—আমাকে অপমান করিস না সলিল। শংকরের ভবিষ্যৎটা যক্ষ্মার জীবাণু দিয়ে ভরে দেব এমন স্বার্থপর আমি নই।

সলিল—এটা স্বার্থের কথা নয়। শংকরের জন্য শ্যামলীকে বাঁচতে হবে। শংকরের মধ্যে মানুষের সব কটা আবেগ আশ্চর্য রকম বেঁচে আছে। পাঁচ বছর আগের শংকর শ্যামলীকে ভালবেসে নতুন মানুষ হয়েছে। শংকরের সব ভালো-মন্দ জড়িয়ে গেছে শ্যামলীর সঙ্গে। ওকে বাঁচতে হবে রথীন, ওকে বাঁচতেই হবে।

রথীন—(মাথা নীচু করে শুনছিল। আস্তে আস্তে মুখ তোলে। দুই চোখে জল) কাকে বাঁচাবো বল?

সলিল—এ্যাই, এ্যাই, খবরদার। চোখের জল ফেলবি না। I can't stand it. আচ্ছা দাঁড়া। একটু মজা করা যাক। (রাজীবের দিকে) ধর্মাবতার! ঈশ্বরের নামে শপথ করে বলছি, ওই মেয়েটিকে আমি স্বেচ্ছায় যেতে দেখছি।

রাজীব—মিথ্যে কথা। কোথায় যেতে দেখেছেন? ড্রইং রুমে না শোবার ঘরে?

সলিল—ড্রইং রুমে।

রাজীব—অথচ ঘটনাটা ঘটেছে শোবার ঘরে।

সলিল—আজ্ঞে, ড্রইং রুম দিয়েই তো শোবার ঘরে যেতে হয়।

রাজীব—শোবার ঘর কোন তলায়? দোতলায় না তিনতলায়?

সলিল—দোতলায়।

রাজীব—ঠিক করে বলুন, দোতলায় না তিনতলায়?

রথীন—সলিল কি করছিস তুই?

সলিল—চুপ কর না। আজ্ঞে, তিনতলায়।

রাজীব—তবে দোতলায় বললেন কেন?

সলিল—ওই দোতলা দিয়েই তিনতলায় যেতে হয়।

রাজীব—ওই মেয়েটাকেই দেখেছেন আপনি?

সলিল—আমি শপথ করে বলতে পারি..

রাজীব—আলোতে দেখেছেন, না অন্ধকারে?

সলিল—অন্ধকারে।

রাজীব—অন্ধকারে দেখে কি করে চিনলেন?

সলিল—ঠোঁটের কাছে ঐ তিলটা দেখে...

রাজীব—অন্ধকারে তিল দেখলেন কি করে?

সলিল—আজ্ঞে, একতলায় অন্ধকার ছিল। কিন্তু দোতলায় আলো ছিল।

রাজীব—ধর্মাবতার! আপনি জানেন ১লা মার্চ রাত ১১টা থেকে ১২টা পর্যন্ত electric fail করেছিল। অথচ সাক্ষী দোতলার আলোতে মেয়েটির তিলটুকু পর্যন্ত দেখতে পেয়েছে। ধর্মাবতার, বর্তমান সভ্যতায় সোনার কাঠি ছোঁয়ালে মানুষ দিব্য দৃষ্টি লাভ করে।

রথীন—কি হচ্ছে সলিল! মানুষটাকে আপন খেয়ালে থাকতে দে।

সলিল—ওঁর কথায় নিজেকে চিনতে পারি। তাই খুঁচিয়ে কথা বলাই। ওঁর চারপাশে জমে-ওঠা অন্ধকার ওঁর মনের আগুন নিভিয়ে দিতে পারেনি। রথীন, তুই তো নাট্যকার। পারবি ওঁকে তোর নাটকে রূপ দিতে?

রথীন—আমার চার পাশে অনেক ছাই জমে গেছে। আগুনকে কি করে রূপ দেব বল?

সলিল—আমি পারবো না। কিন্তু শংকর একটা ঝড় তুলে তোর চারপাশের ছাইগুলোকে হাওয়ায় উড়িয়ে দিতে পারে। কথা দে, সেদিন তুই জ্বলে উঠবি?

রথীন—(একটা কিছু বলতে গিয়ে হঠাৎ কাশতে আরম্ভ করে। অনেক কষ্টে কাটিয়ে উঠে) সলিল, তোর ভেতরের মানুষটা কোনদিন মাতাল হল না, না! দুঃস্বপ্নের ঘোরে বাবা মাঝে মাঝে বলে ওঠেন, রথীন শ্যামলীকে ধর। ও যে পালিয়ে যেতে চাইছে। চমকে উঠে বসি। তাকিয়ে দেখি শ্যামলী জানালা খুলে তাকিয়ে আছে এক আকাশ তারার দিকে।

সলিল—তখন গান ধরবি রথীন। ফুসফুসটাকে খেয়ে দেওয়া পোকাগুলো যেন সেই গান শুনে ঘুমিয়ে পড়ে। রথীন, হেরে যাওয়াটা সোজা। জীবনের সব জায়গায় হেরে গিয়ে আমি বুঝেছি, একবার জিততে না পারলে মানুষ বার বার হেরে যায়।

রথীন—আমি হারা না-হারার বাইরে চলে গেছি। আমি একেবারে হারিয়ে গেছি। শ্যামলীকে আমি বুঝতে পারি না। নিজেকে আর চিনতে পারি না। জীবনকে ধরবো বলে দুই হাত বাড়িয়ে দিয়েছিলাম। যখন ধরলাম তখন তার মুখ দিয়ে ঝলকে ঝলকে রক্ত উঠছে।

[শংকরের প্রবেশ। রথীনের দিকে অবাক চোখে তাকিয়ে থাকে]

রথীন—(ম্লান হেসে) আয়, বোস।

শংকর—(না-বসে) রথীন, তোকে একটা কাজ করতে হবে। যেমন করে পারিস শ্যামলীকে তুই রাজী করা।

রথীন—কিসে রাজী করাবো?

শংকর—ওকে কথা দিয়েছিলাম, চাকরী পেলেই ওকে আমাদের ঘরে নিয়ে আসবো।

রথীন—সে তো বহুদিন আগে কথা দিয়েছিলি।

শংকর—বহুদিন পরে ভাঙবার জন্যে সে কথা দিইনি।

রথীন—যখন কথা দিয়েছিলি তখন ও ভালো ছিল শংকর, এখন ওর মুখ দিয়ে রক্ত ওঠে।

শংকর—একটা সুস্থ সবল দেহকে আমি কথা দিইনি, কথা দিয়েছিলাম আমার অনেক কাছে আসা একটি মেয়েকে।

রথীন—সে যদি আজ স্বেচ্ছায় অনেক দূরে চলে যায়?

শংকর—স্বেচ্ছায় নয় রথীন, অভিমানে। নিজেকে ও অনাবশ্যক ভাবে। মনে করে, ধীরে ধীরে মরে যাওয়া ছাড়া আর কোন কাজ নেই ওর। নিজের কাছে দাম কমে গেছে তাই দাম আদায় করার সাহসটুকুও আর নেই।

রথীন—একদিন কথা দিয়েছিলি, তার সুযোগ নেওয়াটাকে দাম আদায় করা বলিস?

শংকর—কথা দিয়েছিলাম—এটাই শেষ কথা নয়, সে কথা থেকে আজও আমি পিছিয়ে যাইনি। ওকে আমার হাতে তুলে দে রথীন, যদি মরে অন্ততঃ এইটুকু বিশ্বাস নিয়ে মরতে পারবে, এই পৃথিবীতে ও অনাবশ্যক নয়।

সলিল—মরবে মানে? মরতে দিলে তো? আরে, আমার মত বেহেড মাতাল যদি অনাবশ্যক না হয়, রথীনের মতো নির্বিকল্প দার্শনিকেরও যদি প্রয়োজন থাকে, তবে শ্যামলী অনাবশ্যক হবে কেন? আমি বলছি শংকর, তুই ঝটপট বিয়ে করে ফেল। রাজী না হলে, চুলের মুঠি ধরে হিড় হিড় করে টেনে নিয়ে আয়। ওকে বুঝিয়ে দে, বুকটা ঝাঁঝরা হয়ে গেলেও একটা ভালোবাসা ও ধরে রাখতে পারে।

শংকর—রথীন, শ্যামলীকে বল...

রথীন—না, তোর সামনে বিরাট পথ শংকর! একটা বোঝা তোর কাঁধে চাপিয়ে দিয়ে তোকে মাঝপথে থামিয়ে দিতে পারবো না।

শংকর—কিন্তু শ্যামলীকে হারালে আমি যে একেবারে থেমে যাবো। পাঁচ বছর আগের শংকরকে ও আশ্চর্য ভালবাসা দিয়ে নিজের মতো করে গড়ে নিয়েছে। ওর অভাবে সেই সাজিয়ে তোলা চরিত্রটাই ভেঙে চুরে তছনছ হয়ে যাবে। শ্যামলীকে তুই বুঝিয়ে বল।...

রথীন—না, না, তা হয় না। আজকের উচ্ছ্বাস একদিন শেষ হবে, সেদিন তুই ওকে সহ্য করতে পারবি না। ওর রক্তমাখা মুখ দেখে তুই শিউরে উঠবি। সেদিন ওর জীবনের হয়ত কোন নতুন বিপর্যয় আসবে না কিন্তু তোর জীবনটা বিষিয়ে যাবে।

সলিল—রক্তমাখা মুখটা মুছে নিয়ে সেখানে চন্দনের ফোঁটা পরিয়ে দেখিস রথীন। দেখবি রক্তমোছা ন্যাকড়াটার চেয়ে অনেক বড়ো সত্য ঐ চন্দনের বাটিটা। জীবনের কোথাও ভালবাসা পাইনি। ভালবাসা থেকে অনেক দূরে দাঁড়িয়ে আমি বুঝতে পেরেছি যেখানে ভালবাসা আছে সেখানে কিছুই বিষিয়ে উঠতে পারে না। আমি

তোকে কথা দিচ্ছি রথীন যদি কোনদিন দেখি ঘৃণা এসে ভালবাসাকে অপমান করেছে সেদিন দুটোকেই আমি গুলি করে মারবো।

শংকর—(অল্প একটু স্তব্ধতার পরে) পাঁচ বছর আগে একদিন ওর চোখে আমি জীবনের নতুন মানে খুঁজে পেয়েছিলাম। সেই মানেটা আজো আমার কাছে সমান সত্য। ভাবতে পারিস কাব্য করছি, কিন্তু বিশ্বাস কর, ওর রক্তমাখা ঠোঁটে আমি হাসি ফোটাতে চাই। ওকে আমি হাসাবো রথীন। আমার সব কিছু দিয়ে ওকে আমি হাসিতে ভরিয়ে তুলবো।

রথীন—কাকে তুই হাসাবি? মনে মনে ও সকলের কাছে বিদায় নিয়েছে। কোন বাঁধন ওকে আর বাঁধতে পারবে না। ও চলে যাবে শংকর। প্রতিদিন ও দূরে, আরো দূরে চলে যাচ্ছে।

সলিল—কাছে রাখতে পারিসিনি, তাই দূরে চলে যাচ্ছে। কাছে টেনে আন, দেখবি কোথাও যেতে চাইছে না। আরে হতভাগা, এই আলো বাতাস পৃথিবী ফুল মাটি ভালবাসা ছেড়ে কেউ যেতে চায়?

রথীন—আলো বাতাস পৃথিবী ফুল মাটি ভালবাসা যখন সব অর্থ হারিয়ে ফেলে, তখন মানুষ দূরে, অনেক দূরে চলে যেতে চায়।

রাজীব—বাতাসে মড়া পোড়ার গন্ধ পাচ্ছ? কাকে পোড়াচ্ছে জান? আমার ছেলেকে। কেন পোড়াচ্ছে জান? মরা ছেলে বুকে করে যদি আমি দেবসভার নাচের আসরে গিয়ে হাজির হই? যদি চীৎকার করে প্রশ্ন করি, বাঁচার সব পথ বন্ধ করে কেন ওকে পাঠিয়েছিলে? তখন কী উত্তর দেবে? বলো, বলো কী উত্তর দেবে?

রথীন—রাজীব বাবু, রাজীব বাবু, আমি—(কাশি) আমি রথীন।

রাজীব—তুমি! তুমিই না নতুন পৃথিবীর স্বপ্ন দেখেছিলে? আমিও দেখেছিলাম। সবুজ! সমস্ত পৃথিবী জুড়ে আশ্চর্য সবুজের সমারোহ। কিন্তু—কিন্তু শ্মশানের ধোঁয়া এসে সব কিছু ঢেকে দিয়ে গেল। আমার সবুজের স্বপ্ন—থাক। তুমি গান করো। তুমি গান করো।

[বিমলের প্রবেশ। অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকে]

শংকর—(অল্প সময়ের তীব্র স্তব্ধতা ভেঙে) শ্যামলীকে তুই...

রথীন—(মাথা নীচু করে বসেছিল, হঠাৎ উঠে) না, না, না, না আজ তিনশ টাকার চাকরী পেয়ে তুই ভাবছিস ওকে টাকার জোরে ভাল করে তুলতে পারবি। তুই জানিস না শংকর, সকলের আগে ও তোর কাছে বিদায় নিয়েছে। তোর সুস্থ সবল জীবনে ও যক্ষ্মার জীবাণু হয়ে আসতে চায় না। তোকে ও নিজের হাতে জ্বালিয়ে দিয়েছে, নিজে তাই নিভে যেতে চায়। (কাশি চাপতে চায়। তীব্র বেদনায় মুখ বিকৃত হয়ে ওঠে)

সলিল—রথীন...

রথীন—চুপ কর। শংকর, শ্যামলী তোকে ফিরিয়ে দিয়েছে। আমি বললেও ফিরিয়ে দেবে। নিজেকে আহুতি দিয়ে ও যৌবনের ব্রত শেষ করবে। নিজের অক্ষমতাকে আমি কোনদিন ক্ষমা করতে পারবো না। কিন্তু একটা অভিমান আমি কিছুতেই ভুলতে পারবো না, আমাদের একজনকেও ও স্বীকার করে নিলো না।

সলিল—আমি চললাম রথীন।

রথীন—কোথায় যাচ্ছিস?

সলিল—শ্যামলীর জানলাটা বন্ধ করে দরজাটা খুলে দিয়ে আসবো।

রথীন—সলিল, যদি পারিস, (কান্নায় গলা বুজে আসে) যদি পারিস তাহলে—। শ্যামলীকে তোরা বাঁচা। সলিল, ওর রক্তাক্ত ঠোঁটে টুকটুকে হাসি ফিরিয়ে আন। ওকে (কাশি) ওকে শংকরের হাতে তুলে দে। ওর সংসারে ও রাজরাণী হয়ে বসুক (তীব্র কাশিতে ভেঙে পড়ে)।

শংকর—রথীন, রথীন।

রথীন—শংকর, ওকে যেতে দিস না। বুক ভরা অভিমান নিয়ে ও আমাদের ক্ষমা করে চলে যাবে।—না, না, শংকর, ওকে বুঝিয়ে দে।

[তীব্র কাশির সঙ্গে এক ঝলক রক্ত বেরিয়ে আসে]

সলিল—এ কি?

শংকর—রথীন!

রথীন—(রক্তাক্ত হাতের দিকে উদভ্রান্তের মতো তাকিয়ে) সমরেশবাবু, নাটক আপনি পাবেন। হয়তো আমার লেখা শেষ নাটক। কিন্তু তাতে কিছু রক্তের দাগ লেগে থাকবে।

[এগিয়ে যায়। সমরেশ, শংকর, সলিল রথীনের সঙ্গে ধীরে ধীরে বেরিয়ে যায়]

রাজীব—(এতক্ষণ চুপ করে বসে দেখছিল। সবাই চলে যেতে উঠে এসে একটা দেশলাই-এর কাঠি ধরায়। কাঠিটা আস্তে আস্তে নিভে যায়। বিমল অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকে) যাঃ! শেষ হয়ে গেল?

বিমল—কি শেষ হয়ে গেল?

রাজীব—একটা নাটক। পঞ্চমাঙ্কে যার শেষ হবার কথা ছিল। প্রথম দৃশ্যে তা একেবারে শেষ হয়ে গেল।

□

লোহার ভীম

উৎপল দত্ত

(১৯২৯-১৯৯৩)

চরিত্র

যুবক সুলতান
সুলতান
চিমন
শম্ভু
কপিল
সুহাস
ক্যামেরাম্যান
সহকারীবৃন্দ
নেপথ্যে রাজিয়া
মাণ্ডবী

[এ নাটক দর্শকের কল্পনাশক্তির ওপর নির্ভরশীল। ঘোড়া বলতে এখানে মঞ্চে আসবে কাঠের অশ্বমুণ্ড ও পুচ্ছ, মাঝখানে জেগে থাকবে অশ্বারোহীর মুখ, অশ্বের ছুটোছুটিটা করবেন অভিনেতা নিজেই, অদৃশ্য পদযুগল ক্লান্ত হবে অশ্বের অনুকরণে। পাঁচতলা বাড়ি বা মিনার বলতে বোঝাবে পেছনের উঁচু প্ল্যাটফর্মটিকে। সেটা আবার রেলের ওভারব্রিজও হতে পারে, কিছুই বলা যায় না। পর্দা উঠতে দেখা যায় একটি নড়বড়ে চেয়ারে বসে আছেন নিঃসংগ এক দড়িপাকানো চেহারার ব্যক্তি, তলোয়ারের মতন সোজা। তাঁর বয়স বোঝা যায় না, তবে চুলে আবছা পাক ধরেছে। এঁর নাম সুলতান খাঁ।]

সুলতান—আমার তুলনা নেই। অরে ইয়ার ম্যায় ছা গয়া, ম্যায় পোপ হুঁ। বোম্বের চলচ্চিত্র জগতের কথ্য বা অকথ্য ভাষায় কথায় কইলাম—গোস্তাকি মাফ করবেন—কারণ আমি ঐ জগতের শাহেনশা। আমি সুলতান খাঁ নামে পরিচিত, মাষ্টার সাব নামেও ডাকে অনেকে। আমি মাষ্টার সুলতান খাঁ, আমার তুলনা নেই। সকলে আমার গলা জড়িয়ে ধরে, পিঠ চাপড়ায়, হাততালি দেয়। আমার সাকরেদরা আমার পায় হাত দিয়ে কদমবুসি করে, প্রণাম করে। আমি ফাইটমাষ্টার। আমার তুলনা নেই। আমি সম্রাট, বাদশা, আমার তুলনা নেই। আমি লোহার ভীম, আমার তুলনা নেই। কি দেখছেন? হ্যাঁ, রামায়ণ-মহাভারত আমার সব পড়া। আব্বাজান পড়াতেন। উঃ, বহুদিন আগে মাথায় চোট লেগেছিল ঘোড়া থেকে পড়ে গিয়ে, সেই থেকে আমার বুদ্ধি কিছু কমে গেছে, লোকে বলে। মানে আমি অনেক সময়ে লোকের কথা বুঝতে পারি না। আর নিজেও এই কথা বলে চলি দম-দেয়া পুতুলের মতন, তোতাপাখীর মতন, বার বার, বার বার, বার বার...। কখনো বা আমার কথা কিছু অসংলগ্ন হয়ে পড়ে, পরম্পরার অভাব ঘটে, অণ্টসণ্ট বকবাস করতা যাতা হুঁ, লোগ কহতে হেঁয়, মগর মুঝে মালুম নহি হোতা। আমি তো বুঝি না যে আমার কথায় অর্থের অভাব ঘটে। বুঝলে অভাব ঘটতে দেব কেন? আমি ফাইট মাষ্টার। ফাইট মাষ্টার মানে হচ্ছে...কি বলে...আমার তুলনা নেই। মাথায় চোট লাগার পর থেকেই আমার এই দশা, নইলে আমি ছিলাম তুখোড়—এবং মুখর। যাই হোক, বোম্বাইয়ের চলচ্চিত্র জগতে আমার কাজ হচ্ছে মারামারির দৃশ্যগুলি অভিনয় করা, এবং আমার সাকরেদদের দিয়ে করানো। মারামারি যত দেখেন—ধাড় করে এক ঘুঁষি, গ্যাঁক শব্দ করে শূন্যে উঠে আছড়ে পড়া—আখ্, মজা আতা হ্যায় ইয়ার সব আমরা করি, ফাইটাররা করি। অথবা তলোয়ার বা ছোরা নিয়ে লড়াই, বা লাফিয়ে জোড়া পায়ে লাথি, কাঁচি মেরে ভিলেনকে ডিগবাজী খাওয়ানো—সব আমরা। আরো দেখবেন—যেখানেই বিপদের সম্ভাবনা সেখানেই

আমরা। ঘোড়া থেকে চলন্ত ট্রেনে লাফিয়ে ওঠা, অথবা উড়ন্ত হেলিকপ্টারের তলায় একটা দড়ি ধরে ঝোলা, মানে হেলিকপ্টারের তলায়...মানে হেলিকপ্টার...। আর ঘোড়ায় চড়া, ঘোড়া থেকে পড়া, পুরো গ্যালপিং ঘোড়ায় লাফিয়ে ওঠা, ঘোড়ায়...মানে ঘোড়া আর আমি তো একাত্ম হয়ে যাই। মনে হয় ঘোড়াটা আমার দেহের নিম্নাংগ, মনে হয় আমারই চারটে পা গজিয়েছে, যা ইচ্ছে করতে পারি। তখন আমি সম্রাট, আমি মংগোলিয়ার ধূসর মরুতে দিগ্বিজয়ী তেমুজিন চেংগিস খাঁ। এতো হবেই, কেন না আমি হায়দ্রাবাদের লোক, ছিলাম নিজামের অশ্বারোহী-বাহিনীর চ্যামপিয়ন ঘোড়সওয়ার। আমি প্রথম বিশ্বযুদ্ধে ফ্রান্সে লড়েছি। কি? দেখে মনে হয় না বুঝি আমার এত বয়স? (হাসেন) কি করে বুঝবেন? আমি মাষ্টার সুলতান খাঁ, খাপখোলা তলোয়ার, আমি আরব সাগরের ওপর দিয়ে হা-হা শব্দে বয়ে যাওয়া তুফান। ফ্রান্সে জর্মন ট্রেঞ্চের দিকে বল্লম নিয়ে চার্জ করে যাওয়া, ছিটকে ছিটকে সাথীরা পড়ে যাচ্ছে ঘোড়া থেকে, মেশিন-গান-জর্মন মেশিন-গান...কিন্তু আমি ফৌজের চাকরী ছাড়লাম কেন? বিপদকে সহোদরের মতন বুকে টেনে নিত যে লোকটা সে নিজামের কাজ ছেড়ে দিল কেন? নিজামের বড় ছেলে বেরারের যুবরাজ বাঘ-শিকারে যাবেন, সংগে যাবে এই গুলাম আর তার জনাছয়েক সাথী। যুবরাজ থাকবেন মগডালে মাচার ওপর, আমরা গাছের নীচে মাটির ওপর। মাটিতে দাঁড়িয়ে বাঘ মারে না, ওটা নিয়ম নয়। তাতেও কিছু এসে যেত না, মরতে আমি থোড়াই পরোয়া করি? আমার তুলনা আছে? লেকিন ইজ্জতকা সওয়াল আয়া, দোস্ত এল ইজ্জতের প্রশ্ন। বাঘ এলেই সবাই একসংগে গুলি চালাতাম, ওপর থেকে বুড়ো যুবরাজও। বাঘ মরতো, কেন না আমরা সবাই ছিলাম অব্যর্থ লক্ষ্য। আমি তো—কী বলব—পাথর আকাশে ছুঁড়ে দিয়ে গুলি করে গুঁড়ো করে দিতাম শূন্যেই? আমার তুলনা কোথায়? কিন্তু যুবরাজ গাছ থেকে নেমে এসে দাঁড়াতো মরা বাঘের পিঠে পা দিয়ে আর তার ছবি উঠতো। ম্যায় মওত সে নহি ডরতা হুঁ, মগর ইজ্জত বেচনেকে লিয়ে তৈয়ার নহি হুঁ, হরগিস নহি। বাঘের হাতে মরতে লোহার ভীম তৈরীই ছিল, কিন্তু আমার যশ কেড়ে নেবে ভীতু কুঁড়ে মদ্যম লম্পট একটা নবাবজাদা, এটা...এটা..ইয়ে বরদাশত নহি কর সকা। ফৌজ ছেড়ে পালালাম, আমি ডিজার্টার, নাম পাল্টে হলাম সুলতান খাঁ, সোজা এলাম বোম্বাই। ফিল্মে খেলা দেখাবো ভাবলাম।

[অশ্বপৃষ্ঠে যুবক সুলতান খাঁ-র প্রবেশ, দৃপ্তভংগীতে। তিনি নানা খেলা দেখাচ্ছেন। সে-খেলা দেখছেন চিত্র প্রযোজক চিমনভাই; তাঁর পেছনে দাঁড়িয়ে আছে পালোয়ান শম্ভুনাথ।]

দেখছেন? আমার দেহে তখন যৌবন খেলছে পোষা সাপের মতন। চিত্র প্রযোজক চিমনভাই বললেন, কী জানো দেখাও। আমি তক্ষুণি ঘোড়ার খেলা দেখাতে লাগলাম। ঐ দেখুন—কি খেলা দেখালাম। অরে বাহ্, জবাব নহি হমারা! কেয়া

বাত হ্যায়। সালা, কসাকরা পারবে ওরকম? পারবে আফগানরা! আমার তুলনা নেই!

[যুবক সুলতান ঘোড়া থেকে নেমে চিমনকে সেলাম করেন।]

চিমন—(ভাবলেশহীন মুখে পান চিবোতে চিবোতে) ঘোড়ার খেলা বোম্বাইয়ে অনেকেই ভাল জানে। শেখ রংগিল আছে, খসরু আছে, চন্দ্রকুমার আছে। আরেকটা ঘোড়-সওয়ারের দরকার নেই আমার।

যুবক সুলতান—তাহলে কী দেখাবো বলুন। আমি সব জানি। আমি চারতলা থেকে লাফিয়ে পড়তে পারি, হাত-পা ভাঙলে ভাঙুক। তলোয়ার ধরবো? তলোয়ার?

চিমন—না, না, সে মুস্তাক আছে, ইকবাল সিং আছে—

যুবক সুলতান—আমি ওদের চেয়ে ঢের ভাল। আপনি বুঝতে পারছেন না, চিমনভাই, আমি আলাদা জাতের। কী কী সব ঘোড় সওয়ারের নাম করলেন—ডাকুন ওদের। একটা মোষ মেরে এনে ফেলুন মাঝখানে। দেখি কে ঘোড়ার পিঠ থেকে শুধু বল্লম নিয়ে মোষ কেড়ে নিতে পারে।

চিমন—তাতে ফিল্‌মের কী হবে? মরা মোষ নিয়ে কাড়াকাড়িটা কোন ফিল্‌মে লাগাবো? আমার এখন ছবি হচ্ছে 'ইস্কাবনের টেক্কা'। তাতে ঘোড়াই নেই। আছে মোটর গাড়ি। বল্লম বলছ? আমার দরকার পিস্তল।

[প্রস্থানোদ্যত]

যুবক সুলতান—চাঁদমারিতে আমার একশ মাইলের মধ্যে কেউ নেই। আমি দুহাতে দুটো পিস্তল নিয়ে পঞ্চাশ গজ দূর থেকে একটা গোলাপ ফুলকে ছিন্নভিন্ন করতে পারি। (ব্যাকুলভাবে পথরোধ করে) হুজুর মালেক, একবার চান্‌স দিয়ে দেখুন।

চিমন—এত ঝুলোঝুলি কেন বলো তো? তুমি কোত্থেকে আসছ? তুমি কী?

যুবক সুলতান—সবই তো বলেছি। আমি লখনৌ-এর এক টাঙাওয়ালা কমস্‌কম একটা চান্‌স দিয়ে দেখুন—

চিমন—এত মিথ্যে বলো কেন? লখনৌ-এর লোক কমস্‌কম বলে না, বলে কমসেকম। তুমি হায়দ্রাবাদী। হুঁ, দেখি হাত। (হাত দেখে) লাগামের কড়া পড়েছে। তুমি নিজামের সওয়ার বাহিনী থেকে পালিয়ে এসেছ, না?

যুবক সুলতান—হুজুরের চোখে ধুলো দেয়া অসম্ভব।

চিমন—ধরা পড়লে তোমার জেল হবে।

যুবক সুলতান—সেইজন্যই আমাকে ফিল্‌মে ঢুকতে হবে, নিজের পরিচয় মুছে ফেলতে হবে, আমাকে—(থেমে যায়)

চিমন—বকসিং জানো?

যুবক সুলতান—জরুর! বকসিং, কুস্তি—

চিমন—(আর্তস্বরে) না, কুস্তি না, কুস্তির নাম নিও না মুখে। হিরো কুস্তি করলে একটা

টিকিটও বিক্রী হবে না। হিরো হবে সম্রাট, মডার্ন। লেংটি পরে কুস্তি করলে তার মান থাকে না, হিরোইন তাকে লাথি মেরে চলে যাবে। (দীর্ঘশ্বাস ফেলে) ছবির জগত পাল্টে যাচ্ছে সুলতান। আমি তাল রেখে চলতে পারছি না। আগে মহাভারত থেকে গল্প নিলেই হিট হোতো। আর আজ? বলে অসভ্য অর্জুনের গায়ে জামা নেই কেন? ভীম অমন মোটা কেন? দ্রৌপদী নাচে না কেন? 'সুভদ্রা-হরণ' ছবি করে পথে বসে গেছি। কি করে—কি করে আমি সুভদ্রাকে দিয়ে 'হো লা লা' গান করাই? লোকের এমন সব দাবী। কুস্তি আর চলবে না। বকসিং যদি জানো তো দেখাও। এ আমার ফাইট মাস্টার শম্ভু পালোয়ান। এ কুস্তি ছাড়া আর কিছু জানে না, আর উৎকট উলংগ হয়ে গায়ে ধুলো মেখে 'বজরং বলী কি জয়' বলে পিলে-চমকানো চীৎকার করে পর পর দুটো ছবি ফ্লপ করিয়েছে। এর সংগে লড়ে দেখাও তো।

যুবক সুলতান—এ তো চর্বির পাহাড় একটা। জুডোর এক প্যাঁচে, বা দুটো স্ট্রেট জ্যার মারলে বসে যাবে—

চিমন—লড়ো। শম্ভু, লড়ো।

[কম্পিতপদে শম্ভু এগিয়ে আসে। যুবক সুলতান হাসেন, তারপর তড়িৎগতিতে এদিকে-ওদিকে সরে ঘুষি, লাথি চালাতে থাকেন। শম্ভু দিশেহারা, ক্ষতবিক্ষত। এক সময়ে সে জাপটে ধরে সুলতানকে, যেন ব্যগ্র প্রার্থনা নিয়ে।]

শম্ভু—(মৃদুস্বরে)—দয়া করো, দোস্ত,আমার চাকরী থাকবে না, বালবাচ্চা মরে যাবে—

যুবক সুলতান—আমারো বাঁচা মরার প্রশ্ন! হট্ সালা—

[পিছলে বেরিয়ে গিয়ে যুযুৎসুর প্যাঁচে শম্ভুকে আছড়ে ফেলেন, বুকে পা তুলে দেন]

শম্ভু—বালবাচ্চা ভূখা মরবে।

চিমন—শাবাশ, সুলতান খাঁ।

যুবক সুলতান—দেখলেন তো? দেখলেন তো? হায়দ্রাবাদের যুবরাজ যেমন বাঘের বুকে পা দিয়ে ছবি তুলতো, তেমনি আমারো ছবি তুলুন, চিমন ভাই!

সুলতান—কোনোদিনই আমার তুলনা ছিল না। সেই মুহূর্তে আমি চিমনভাইয়ের ফাইট মাস্টার হলাম, মাসিক চল্লিশ টাকা বেতনে। আর ঐ মোটা ভুঁদো না লায়েক শম্ভু সিং পালোয়ান—(হাসেন)—তার চাকরী গেল। বালবাচ্চা নিয়ে সে ক্ষুধায় জ্বলতে লাগলো। একদিন আমার মনে পড়লো তার কথা। সেদিন না পারি খেতে, না পারি শুতে। ছুটলাম গোরেগাওঁর সেই বস্তিতে যেখানে থাকে শম্ভু পালোয়ান। গিয়ে শুনি সে খুদকুশি করেছে, আত্মহত্যা করেছে গলায় দড়ি দিয়ে, আর তার বউ আর বাচ্চারা কোথায় চলে গেছে যেন। শম্ভু সিং ছিল রাজপুত, তারো ইজ্জতের জ্বালা! বউ-বাচ্চাকে খেতে না দিতে পারলে ইজ্জত থাকে? তাই বলে সেদিন ওকে হারিয়ে আমার যে মর্যাদা হয়েছিল সেটা থেকে সিকিভাগও আমি কাউকে

দিতে পারবো না বাপু। জেতার কি আনন্দ সেটা খেলোয়াড় মাত্রই জানে। 'ইস্কাবনের টেক্কা' ছবিটা হিট হোলো, তারপর 'পিস্তল-ওয়ালি' তারপর 'নশীন' তারপর 'মওত কি রাত'—পর পর হিট, আর পর পর সুলতান খাঁর মৃত্যুর সংগে কোলাকুলি—সেকি এড্‌ভেঞ্চার সব—

[পরিচালক কপিল দেও, ক্যামেরাম্যান, সহকারীরা সবাই এসেছেন মঞ্চে। যুবক সুলতান মেক-আপ করে প্রস্তুত।]

কপিল—সুলতান, তোমাকে ডিগবাজী খেয়ে আগুনের মধ্যে দিয়ে বেরিয়ে যেতে হবে।

যুবক সুলতান—জী সাব। [তথাকরণ। করতালি]

চিমন—জবাব নহি তুমহারা সুলতান মাস্টার।

কপিল—সুলতান, তোমাকে ঘোড়ায় চড়ে কাঁচের জানলা ভেঙে চলে যেতে হবে।

যুবক সুলতান—জী কপিলভাই। [তথাকরণ। করতালি]

চিমন—শাবাশ, বেটা শাবাশ!

কপিল—সুলতানভাই, আজ ভীষণ পরীক্ষা। চোট আজ লাগবেই, তবু শটটা দরকারি। দেবে এ শট?

যুবক সুলতান—মুখ থেকে কথাটা বার করো না, ভাইয়া, দ্বিতীয়বার আর বলতে হবে না। আমার নাম সুলতান খাঁ।

চিমন—জিয়ো বেটা জিয়ো।

কপিল—হিরোর ঘুঁষি খেয়ে দোতলার ছাদ থেকে পড়বে রাস্তার ওপর। কোনো জাল থাকবে না, খড় থাকবে না। এক শটে নিতে চাই।

যুবক সুলতান—হিরো কে এ ছবির?

কপিল—সুহাস। এই যে—নতুন ছেলে, সুহাস।

[দুজনে ওপরে ওঠেন]

সুহাস—মাস্টারসাব, কোথায় মারবো? কি করে মারবো?

যুবক সুলতান—(নীচের রাস্তার দূরত্বটা মনে মনে মেপে) হুজুর আপনি ঘুঁষি মারবেন আমার বুকে, তাহলে আমি পাল্টি খাবো, পেছন দিকে ডিগবাজী খেয়ে পড়বো।

সুহাস—আপনার লাগবে না?

যুবক সুলতান—না, হুজুর। আপনি জোরে মারবেন কিন্তু। সেটা আমায় পাল্টি নিতে সাহায্য করবে।

সুহাস—জোরে মারলে আপনি বেসামাল হয়ে পড়বেন না?

যুবক সুলতান—(হেসে)—না, ভাইয়া। ডরো মাৎ। শুধু দেখো, আমার মুখে মেরো না। তাহলে মাথাটা হঠাৎ ধাক্কা খেয়ে নীচের দিকে চলে যাবে। কপিলভাইয়া আগে রিহর্সাল চাই?

কপিল—লোকটা পাগল। বেহদ্দ পাগল। এ জিনিষ দুবার করবে বলছে! টেক করবো। প্রথমেই টেক। তুমি রেডি?

যুবক সুলতান—জী হুজুর।

সুহাস—মাস্টারসাব, আপনি ঠিক জানেন আপনার লাগবে না?

যুবক সুলতান—ডরিয়ে মত। ইসমে ডরনে কি কোই বাত নহি। বুকে মারবেন, মুখে নয়। রেডি!

কপিল—স্টার্ট সাউণ্ড!

কণ্ঠ—রানিং।

ক্যামেরাম্যান—রানিং।

সহকারী—(ক্ল্যাপার দিয়ে)—মওত কি রাত, সীন ফর্টি-থ্রি, শট ফোর।

কপিল—একশন!

[সুহাস কম্পিত হাতে দুর্বল আঘাত করে]

যুবক সুলতান—ফির সে মারিয়ে! জোরে। জোরে মারুন! কোনো ভয় নেই।

[সুহাস মারে, ডিগবাজী খেয়ে সুলতান সশব্দে এসে পড়েন নীচে রাজপথে।]

কপিল—কাট!

[সকলে ছুটে যাচ্ছিল, যুবক সুলতান খাঁ তড়াক করে লাফিয়ে উঠে সেলাম জানাল। ধন্য ধন্য রব ওঠে।]

চিমন—এই ইণ্ডাস্ট্রিতে সুলতান খাঁ একজনই আছে।

কপিল—লেগেছে?

যুবক সুলতান—নিশ্চয়ই না। সুহাস ভাইসাব সাবাশ, ঠিক বুকে মেরেছেন।

সুহাস—মাস্টারসাব, আপনার কোথাও লাগেনি?

যুবক সুলতান—না, হুজুর, এ-দেহে ব্যথা নেই।

সুলতান—লেগেছিল অবশ্য। শিরদাঁড়ায় লেগেছিল। তারপর এক মাস বিছানায়। কিন্তু সেখানে অত লোকের সামনে একদম সোজা দাঁড়িয়ে রইলাম, এবং হেঁটে এসে গাড়িতে উঠলাম—এতে নিজের পিঠ চাপড়াই মাঝে মাঝে। আমার তুলনা নেই। চোট যে লেগেছে এটা জানতে দিলে সুলতান খাঁর ইজ্জত থাকতো? লোহার ভীমের আবার লাগতে আছে নাকি? 'মওত কি রাত' সুপারহিট হোলো। চিমনভাই দুটো সিনেমা হাউস কিনে ফেললেন, বান্দ্রায় নূতন বাড়ি কিনলেন আর তিনটে নূতন গাড়ি। আমার মাইনেও মাসে চার শ' টাকা হয়ে গেল। আর সুহাস দশটা ছবি সই করে বড়লোক হয়ে গেল। আমি রেল মজদুরের ছেলে, মাসে চারশ টাকা পকেটে এলে আমার আর কিছু লাগে না, ইয়ার, আমি তখন ধরাকে সরা জ্ঞান করতে পারি, জুতোর ঠোক্করে ধুলো উড়িয়ে চলি যেন একাই এক

বেদুইন কারোয়াঁ। মস্ত্ হোকর চলতা থা। মানে মদ খেয়ে নয়। আমি জীবনে মদ ছুঁইনি, সিগারেট বিড়ি খাইনি। ফাইটাররা ওসব সুখ থেকে বঞ্চিত। ওসব টানলে দম থাকে না, মাংসপেশীগুলো আয়ত্তে থাকে না, যে কোনো সময়ে ফাইটার মরে যেতে পারে। তার বদলে আমি বিয়ে করে ফেললাম। রাজিয়া বড় সুন্দরী। এ রাজিয়া! এ বেগম! বাহর আও তো সহি! ও আসবে না। পর্দানশীন। সম্ভ্রান্ত মুসলিম বধূ। আমার সব সাকরেদ জুটে গেল, ফাইট শেখাই তাদের। সবচেয়ে ভাল করে শেখাই আমার ছেলে মুরশিদকে (হাসেন) এক বছর বয়সে তাকে দড়িতে বেঁধে চারতলার ছাদ থেকে ঝুলিয়ে শোঁ শোঁ করে দোলাতাম যাতে উচ্চতার ভীতি কেটে যায়। সুলতান খাঁর বাচ্চা—দুদিন পরেই সে ব্যাটা দোল খেত আর হি হি করে হাসতো।

[মঞ্চে আসেন সুহাস এবং যুবক সুলতান, একই বেশে একই রকম রূপসজ্জায়]

সুহাস—একি? আয়না দেখছি নাকি?

যুবক সুলতান—জী হুজুর। তাই বলা যায়। আমি আপনার প্রতিবিম্ব। আয়নার ডামি।

সুহাস—কেন? কী সীন আছে আজ?

যুবক সুলতান—জানি না হুজুর। সাজিয়ে দিল এরকম।

সুহাস—আমার নিজেরই গুলিয়ে যাচ্ছে কে আমি। (দুটি বাচ্চা ছেলে অটোগ্রাফ নিতে আসে সুলতানের কাছে; তিনি সুহাসকে দেখিয়ে দেন)

যুবক সুলতান—আরে নালায়েক! ঐ যে সুহাসজী। স্টার চিনতে পারো না, কি অটোগ্রাফ নিচ্ছ!

সুহাস—(সই করে)—ওদের দোষ নেই।

[চিত্রতারকা মাণ্ডবীর প্রবেশ। দুজনকে দেখে তিনি থতমত খান]

মাণ্ডবী—এ কি?

সুহাস—আমি—আমি সুহাস।

মাণ্ডবী—আর ইনি?

সুহাস—ও—ও ফাইট মাস্টার।

মাণ্ডবী—নাম একটা আছে তো নাকি?

যুবক সুলতান—বন্দাকো লোগ সুলতান খাঁ কহতে হেঁয়।

সুহাস—(আড়ষ্ট হাসি সহ)—কি রকম সাজিয়েছে বলো। হুবহু এক রকম করে দিয়েছে দুজনকে। সব পার্থক্য ঘুচে গেছে।

মাণ্ডবী—না, তো ঘোচেনি। ওঁর ফিগারটা তোমার চেয়ে অনেক ভাল। উনি অনেক জোয়ান।

সুহাস—সে বিষয়ে সন্দেহ কি? ফাইটার বলে কথা।

মাগুবী—মানে তুমি যা হতে পারতে, অর্থাৎ তোমার যাবতীয় ত্রুটিগুলো যদি সারিয়ে নিতে পারতে, তাহলে তুমি যা হতে উনি তাই।

সুহাস—মানে উনি সর্বাংগসুন্দর সুহাস।—উনি একদিক থেকে আমার ভবিষ্যত চেহারা।

মাগুবী—জীবনে তুমি অমন হতে পারবে না। উনি তোমার স্বপ্নের চেহারা, ভবিষ্যতের নয়। স্বপ্ন কখনো সত্যি হয়?

যুবক সুলতান—(হেসে) অরে বাহ্ মাগুবীজী খাঁটি কথা বলেছেন। একদিক থেকে, আমি তো স্বপ্নই। আমার কোনো বাস্তব অস্তিত্ব নেই। আমি ওঁর ছায়া বললে আরো ভাল হোতো। ছায়ার চেহারা নেই। সে একটা আকার মাত্র।

[কপিল, চিমন, ক্যামেরাম্যান, সহকারীবৃন্দের প্রবেশ]

কপিল—মেক-আপ রেডি তো আমায় বলোনি কেন এতক্ষণে?

চিমন—শান্ত, শান্ত মনে কাজ করুন। পুলিশের কড়া পিকেট বসে গেছে চারদিকে, ভীড়ভাড় এদিকে আসতে পারবে না।

কপিল—সুলতান! আজকে তোমার জান নিয়ে টানাটানি ওস্তাদ!

যুবক সুলতান—ফরমাইয়ে সরকার।

কপিল—পিঠের ব্যথা সেরে গেছে তো?

যুবক সুলতান—ব্যথা বানান কি হুজুর?

চিমন—(হেসে) মাস্টার সুলতান খাঁ ইস্পাতে তৈরী, ব্যথা-ট্যথা নেই। নিন, শট নিন। লোহার ভীমের আবার ব্যথা কি!

সুহাস—আজ কী সীন? খুব কঠিন কিছু? আমি করতে পারি না?

কপিল—কঠিন না হলে মাস্টারকে সাজাবো কেন? হিরো ওভারব্রিজ থেকে লাফিয়ে মালগাড়ির চলন্ত ইঞ্জিনের ওপর পড়বে। একটু এদিক ওদিক হয়ে গেলে মালগাড়ির চাকায় টুকরো টুকরো হয়ে যাবে।

মাগুবী—(হঠাৎ) এ শট তুমি পারো নাকি কখনো?

সুহাস—না, ভাবছিলাম মাস্টার সাহেবের প্রাণও তো বিপন্ন হচ্ছে। তাহলে আমিই বা কেন ঝুঁকিটা নেব না?

যুবক সুলতান—(সুহাসের হাত ধরে) মেহেরবান, যা বলেছেন তার জন্যই আমি কৃতজ্ঞ। কিন্তু ও ঝুঁকি আপনাকে নিতে দেব না। দশ হাজার টাকার হিরো আপনি, এ কোম্পানির লক্ষ্মী। এ ঝুঁকি নেবে চারশ টাকার চাকর। সেইজন্যই আমাকে পোষেন চিমন ভাই। চারশ টাকার গুলাম মরলে ক্ষতি নেই।

চিমন—চলো মাস্টার, দেখাও তোমার কেরামতি। মাইনে সাড়ে চারশ হয়ে যাবে এ শটটা দিতে পারলে।

কপিল—(সহকরীকে) মাগুবীকে নিয়ে যাও, এঞ্জিনে তোলো।

মাণ্ডবী—সে কি? কেন?

কপিল—বা, তোমাকে ভিলেন নিয়ে যাচ্ছে তো। সেইজন্যই না হিরো ঝাঁপাচ্ছে ওভারব্রিজ থেকে। সেদিন সীনটা নেয়া হোলো না? ভিলেন তোমার মুখ চেপে ধরে স্টেশনে নিয়ে গেল—

মাণ্ডবী—কিন্তু ইঞ্জিনে চড়ে এলে কয়লার গুঁড়োয় আমার মেক-আপের বারোটা বাজবে।

চিমন—ক্লোজ-শটে মেক-আপ আবার ঘষে-মেজে নিও, বেবি এখন শটটা দাও তো।

[সহকারী মাণ্ডবীকে নিয়ে যায়]

কপিল—(হেঁকে) গাড়ি বেশ স্পীডে আসবে। সরিয়ে নাও, পিছিয়ে যাও আধ মাইলটাক। তারপর জোরে চালিয়ে আসবে। কি, মাস্টার? আজ এত মুখভার কেন? যাও ওভারব্রিজে ওঠো।

[যুবক সুলতান ছুটে ওপরে ওঠেন]

চিমন—ছেলে কেমন আছে মাস্টার? বুখার কমেছে তো?

কপিল—ছেলের অসুখ নাকি?

চিমন—ছেলেকে জুহুতে নিয়ে ছুঁড়ে ছুঁড়ে সমুদ্রের জলে ফেলে। বলে সাঁতার শিখবে, জিসম্ তৈরী হবে, লোহাপেটা শরীর হবে, ঠাণ্ডা লেগে জ্বর হয়েছে।

কপিল—সুলতান, আজ তোমার মেজাজ ঠিক নেই। শুটিং বাতিল করে দেব?

যুবক সুলতান—না।

কপিল—ছেলেটা আছে কেমন?

যুবক সুলতান—(উন্মত্ত স্বরে) খামোস! খামোস, কমিনে। তোমরা কি আমায় খুন করতে চাও? কেন মুর্শিদের কথা মনে করিয়ে দিচ্ছ? তোমরা জানো না মনটা একচুল এদিক-ওদিক হলে এ-পেশায় লোক মরে যায়? জানো না এখন আমাকে প্রাণমন দিয়ে সারা শরীর দিয়ে কাজটার ধ্যান করতে হবে? তোমরা পেয়েছ কি? তোমরা কি আমার জান নিয়ে খেলছ? বত্তমীজ! [সবাই চুপ করে থাকে] আল্লা রহমান! আল্লা-উল-রহীম!

[ট্রেনের তীক্ষ্ণ হুইসেল]

কপিল—স্টার্ট ক্যামেরা!

ক্যামেরাম্যান—রোলিং।

[ফোঁস ফোঁস করে ভীষণ ধুম উদ্গিরণ করতে করতে ইঞ্জিন এসে পড়ে ওভারব্রিজের তলায় আর চক্ষের পলকে এক লাফে সুলতান এসে পড়ে কয়লার গাদার ওপর, বলিষ্ঠ দুই বাহুতে জড়িয়ে ধরে মাণ্ডবীকে। সকলে হৈ হৈ করে ওঠে।]

চিমন—মাইনে আজ থেকে সাড়ে চারশ হয়ে গেল তোমার।

কপিল—কাট করো, কাট করো, ওকি? গাধার মত ক্যামেরা চালিয়ে যাচ্ছ কেন?

ক্যামেরাম্যান—জড়িয়ে ধরাটাও রেখে দিলাম—

সুহাস—রাবিশ! কয়লার গাদায় পড়ার সঙ্গে সঙ্গে কাট। তারপর মিডক্লোজে আমি করবো নিজের পার্ট।

কপিল—ন্যাচেরেলি। সুলতান, নামো।

মাণ্ডবী—এখুনি নেমে ছুটবেন না, দাঁড়ান না।

যুবক সুলতান—এবার হিরো আসবেন। আমি তো ছায়া। আপনার গা ছোঁয়ার অধিকার আমার নেই।

মাণ্ডবী—আমি সে অধিকার দিচ্ছি।

যুবক সুলতান—সেই সঙ্গে সাড়ে চারশ টাকাও দিতে হবে, নইলে আমার পেট ভরবে কি করে?

[সুহাস এসে ইঞ্জিনে ওঠে]

সুহাস—মাস্টার সাহেব, আপনি যেতে পারেন। এবার অভিনয়ের ব্যাপার, সেটা আপনার আসবে না।

যুবক সুলতান—জী হুজুর।

[অবতরণ]

মাণ্ডবী—ওঁকে সুযোগ দিলে অভিনয়ও যে তোমার চেয়ে খারাপ করবেন এমন মনে হয় না। তোমার চেয়ে খারাপ একটিং করা কারুর পক্ষেই সম্ভব নয়।

সুহাস—আরে চল্ চল্! ছবির পর ছবি লাগছে আমার একটিং-এর জোরে।

কপিল—জড়িয়ে ধরো, সুহাস। ডায়লগ পড়ে নিয়েছ?

সুহাস—জী হাঁ।

কপিল—ক্যামেরা এখানে। দেখি একটা রিহার্সাল দেখি—জড়িয়ে ধরো। বলো—

সুহাস—'লতা, আমি এসে গেছি!'

মাণ্ডবী—গায়ে একটু জোর আনো বুঝেছ? বাহু দুটো গা ছুঁয়েছে বলে মনে হচ্ছে না।

সুহাস—জোরে ধরলে তুমি চ্যাপ্টা হয়ে যাবে বেবি।

মাণ্ডবী—ধরেছিলেন সুলতান সাহেব। পুরুষ বলে তাকে।

[শুটিং চলছে। আর যুবক সুলতান অবজ্ঞাত ও বিস্মৃত হয়ে দাঁড়িয়ে আছেন অদূরে, তাঁর দিকে আর কারুর নজর নেই।]

সুলতান—সে-ছবিও হিট হোলো, সুপারহিট। ছবির নামটা ভুলে যাচ্ছি। যেদিন রিলিজ হয় সেই দিনই জর্মনরা সোভিয়েৎ দেশকে আক্রমণ করে। হ্যাঁ, মনে পড়েছে—'মেহনত', ছবির নাম 'মেহনত'। লোকে দেখে আর হিরোর তারিফ করে। সুহাস অভিনয় করতো ভালই, কিন্তু লোকে শুধু বলে—কি তিবড়মবাজ হিরো, কি স্মার্ট, কিরকম ওভারব্রিজ থেকে লাফিয়ে ট্রেনের ওপর পড়লো, কিরকম মোটরসাইকেল চালিয়ে ভাঙা পোল থেকে জলে পড়লো, তারপর সাঁতরে গিয়ে ভিলেনের বজরা ধরলো। আমি শুনি আর ঝুমের মধ্যে সদ্য খোলা সোডার

বোতলের মতন হাসির ঝাঁজ অনুভব করি। এ-ও সেই হায়দ্রাবাদের যুবরাজের বাঘ-শিকারের মতনই। কে মারলো বাঘ জানের ঝুঁকি নিয়ে, আর কার বা ফোটো ওঠে? কে লাফালো পুল থেকে আর যশ হয় কার? এ আবার ইজ্জতের প্রশ্ন। কিন্তু আমি আর রাগারাগি করলাম না। আর তুলনা নেই। আমি শান্ত নির্বিকার জীব। সব আসক্তি ত্যাগ করেছি। রাজিয়া, রাজিয়া, চা দাও, চা খাবো। (খানিক অপেক্ষা করে) দেবে না। যাকগে। সব আসক্তি ছাড়ি নি। মুর্শিদকে হিরো বানাবো, এই একটা ইরাদা, একটা বাসনা আমায় পেয়ে বসেছিল। মুর্শিদ হবে এমন হিরো যে নিজেই ঘোড়া চালাবে, চারতলা থেকে লাফাবে, তলোয়ার খেলবে, পাল্টি নিয়ে জলে পড়বে। লোক ভাড়া করে এনে বকমলে লড়াই করবে না, প্রক্সি দিয়ে বিপদকে পাশ কাটাবে না, এমন এক হিরো হবে মুর্শিদ।

একদিন দেখি বত্তমীজ সিগারেট ফুঁকছে! বুঝুন শয়তানটার আত্মঘাতী শখ। ফুসফুসের দফারফা করে বেওকুফ তুই কী ফাইটার হবি? তলোয়ার খেলার ফাঁকে যে সিগারেট ফুঁকতে পারে, সে মদ খেয়ে নিজের মাকে অপমান করতে পারে। সেদিন মারলাম তাকে—হাতে পায়ে তলোয়ারের পাশ দিয়ে। মারি আর পড়ে যায়, মারি আর পড়ে যায়। (একটু নীরব থেকে) আমি কিনা তোকে ঘিরে স্বপ্ন রচনা করে চলেছি, আর তুই—। পরদিনই মুর্শিদ আমায় তাক্ লাগিয়ে দিল। একটা ছবিতে ফাইটারের কাজ দিয়েছিলাম। সে ছবিতে স্রেফ দড়ি ধরে তর তর করে ছ'তলা উঁচু একটা বাড়ির ছাতে উঠে গেল, দেয়ালে একবার পাও ঠেকায় নি। সুলতান খাঁর বাচ্চা মুর্শিদ খাঁ। ও ওটাই ভাল পারে, ঝোলার কাজ খুব ভাল জানে। ট্র্যাপীজ শিখিয়ে তৈরী করেছি যে। পুরো বাহু দিয়ে ঝোলে, শুধু কব্জী দিয়ে নয়। ভাবছিলাম ওকে টার্জেন সাজালে ফাটিয়ে দেবে।

[চিমনভাই নিজের হাতে শ্যাম্পেন দিচ্ছেন কপিলকে, সুহাসকে, মাণ্ডবীকে। যুবক সুলতানকে দিতে তিনি প্রত্যাখ্যান করেন।]

যুবক সুলতান—মাফ করবেন চিমনভাই, আমাদের মদ খাওয়া বারণ।

চিমন—আবার ছবি হিট করছে সুলতান মাস্টার, এক ঘুঁট তো পিও।

যুবক সুলতান—আমার সাকরেদরা আমার পা ছুঁয়ে শপথ করে যতদিন লাইনে থাকবে ততদিন মদ ছোঁবে না। আমি ওস্তাদ হয়ে কি করে খাই?

চিমন—তারা জানতে তো পারছে না।

যুবক সুলতান—আমি তো জানব।

মাণ্ডবী—সুহাস, এটাও তোমার শেখা উচিত। যে রেটে মদ গিলছ্ আজকাল, ভুঁড়ি বেরুলো বলে।

সুহাস—নিজের ফিগার দেখ। নিজের চরকায় তেল দাও।

কপিল—লোকে ছবি দেখছে আর বলছে এমন স্মার্ট হিরো কখনো আসেনি।

চিমন—সুহাসের দৌড়-ঝাঁপের খুব প্রশংসা হচ্ছে।

মাণ্ডবী—দৌড়ঝাঁপের প্রশংসা হলে তো সেটা সুলতান খাঁর প্রাপ্য। মানে এ ছবি হিট করেছে সুলতান খাঁর জন্য।

যুবক সুলতান—না, না, এ কী বলছেন?

সুহাস—সুলতান খাঁর জবাব নেই।

চিমন—কিন্তু অভিনেতা হচ্ছো তুমি। একটিং যদি বলো—

সুহাস—না, বলি না, কেউ একটিং-এর কথা বলছে না। সবাই বলছে, সুহাস কেমন লাফালো। কিন্তু আমি লাফাই নি। লাফিয়েছে ঐ লোকটা! (চীৎকার করে) ঐ—ঐ লোকটা!

মাণ্ডবী—বেশি শরাব খেয়েছে! চেঁচিও না!

সুহাস—চারশ টাকার জন্য জান কুরবান করতে রাজী এমন বেহুদা ঐ লোকটা। আমার জিন্দগী বরবাদ করে দিল ঐ আমার ডামি, আমার ছায়া। কায়ার চেয়ে ছায়ার কদর বেশি, খোকার চেয়ে ঘুনশি বড়।

কপিল—কেন? সুলতান মাস্টার তো এ-প্রশংসা দাবী করতে আসছে না। সব প্রশংসা তো তুমি পাচ্ছ।

সুহাস—সে প্রশংসা আমার গায়ে আগুনের ছ্যাঁকার মতন লাগছে। এটা বোধহয় তোমার মাথায় ঢোকে না যে শরীফ লোকেরা অপাত্রে প্রশংসা সইতে পারে না। আমাকে যখন লোকে এসে বলে, সুহাস তুমি ইঞ্জিনের ওপর কেমন চমৎকার লাফিয়ে পড়লে, তখন ইচ্ছে করে রেললাইনে মাথা পেতে শুয়ে থাকি গে। ও লোকটা এমন নকল সুহাস সেজে নামে যে আসল সুহাস দাঁড়াতে পারছে না। সালা, আমার তারিফে ভাগ বসাতে এসেছে।

মাণ্ডবী—এক্ষুনি শট নেবে তুমি এত মদ খেলে কেন?

সুহাস—ও-লোকটাকে দিয়ে বিপজ্জনক শটগুলো করানোর চেয়ে নিজে সে শট দিতে গিয়ে মরে যাওয়া ভাল ছিল।

মাণ্ডবী—কপিল ভাই, শট নিন নইলে এ মাতলামি শুরু করবে।

সুহাস—(সুলতানকে)—আজকে আবার আমার মতন পোষাক পরে এসেছ কেন? আজ আবার কোন খেল দেখাবে?

যুবক সুলতান—হুকুম হয়েছে, তাই এরকম সেজেছি।

সুহাস—তুমি কি জানো লোকে জানতে পারলে আমার গায়ে থুতু দেবে?

যুবক সুলতান—কি করে জানবে হুজুর?

সুহাস—তুমি বলে বেড়াও না তো?

চিমন—ওরা পেশাদার ফাইটার সুহাস, বলে বেড়ানো ওদের স্বভাব নয়।

সুহাস—হ্যাঁ, গোপন কথাটাকে বুকে চেপে রেখো না-মরা পর্যন্ত। (একটু পরে) তবু

আমি তো জানবো। আমি তো জানব আমি মেকী, আমি অকেজো স্থবির একটা আধা-মেয়েমানুষ। আমি তো জ্বলে পুড়ে জানছি আমি একটা ফাঁকি।

কপিল—খুব হয়েছে, এবার শট নিতে দাও। সুলতান, পাইপ বেয়ে ঐ বাড়ির দোতলায় উঠতে হবে। হিরো যাচ্ছে হিরোইনের সঙ্গে দেখা করতে, কারণ হিরোইনের বাপ—

সুহাস—হিরো নিজেই এ-শটটা দিতে পারে, ফাইটারের দরকার নেই।

মাণ্ডবী—পাগলামি করো না—

সুহাস—পাগলামি কী আছে এতে? সহজ শট। পাইপ বেয়ে উঠেছি বহুবার। কলেজে থাকতে মেয়েদের হোস্টেলে ঢুকতাম ঐভাবে। (হাসে)

চিমন—পড়ে টড়ে গেলে আমার শুটিং বন্ধ হয়ে যাবে, হিরো—

সুহাস—পড়বো না।

কপিল—শোনো সুহাস, হাত পিছলে গেলে—মানে তোমার ভালর জন্যই বলা।

সুহাস—দয়া করে আমার ভাল আর কোরো না। কি ভাব আমাকে বলো তো? এটাও করতে পারি না? কবে বলবে মাণ্ডবীকে চুমু খাওয়ার সীনটা করবে মাস্টার সুলতান খাঁ, কারণ সুহাসের ঠোঁটে চোট লেগে যেতে পারে!

কপিল—তাহলে ওঠো পাইপ ধরে।

চিমন—সাবধানে উঠো।

সুহাস—আপনি আরো বাড়ি, আরো গাড়ি কিনবেন মশাই, এই শটটার জন্য। তাই চুপ করে থাকুন।

যুবক সুলতান—আমার আর্জি যদি শোনেন হুজুর, এ-শট আমাকে করতে দিন।

সুহাস—না মাস্টার। তুমি চুপ করে তাকিয়ে দেখ।

[তৈরী হয় শটের জন্য]

কপিল—ক্যামেরা ফোকাস করেছ?

ক্যামেরাম্যান—জী। অল লাইট্স্।

কপিল—রেডি সুহাস?

সুহাস—ইয়েস।

মাণ্ডবী—বন্ধ করো এই তামাসা। কপিল ভাই, ও পারবে না।

কপিল—দেখাই যাক। স্টার্ট ক্যামেরা।

ক্যামেরম্যান—রোলিং।

কপিল—একশন্।

[সুহাস দ্রুত উঠতে শুরু করে; কিন্তু খানিকটা উঠে থেমে যায়; হাঁপাচ্ছে। নীচের দিকে দেখে বোধহয় বুক কেঁপে ওঠে। উঠতেও পারছে না, নামতেও পারছে না।]

চলো! ওঠো আরো!

[সুহাসের দেহ থরথর করে কাঁপছে। আরো হাতখানেক ওঠে সে; তারপর অস্ফুট স্বরে গোঙাতে থাকে।]

মাগুবী—কী করছে? উঠছেও না, নামছেও না।

যুবক সুলতান—কাট করুন, স্যার।

কপিল—কাট।

যুবক সুলতান—মাথা ঘুরছে ওর। নামিয়ে আনি?

চিমন—এখুনি।

[তরতর করে সুলতান উঠে যান কাছে; তারপর প্রায় পিঠে তুলে নিয়ে এক-পা এক-পা করে নেমে আসেন। নীচে ছুটোছুটি পড়ে গেছে ততক্ষণে। সুহাসকে এনে বসানো হয়, ঘাম মুছিয়ে দিচ্ছে মাগুবী, বাতাস করছেন চিমন নিজে।]

যুবক সুলতান—ব্র্যাণ্ডি দাও ওঁকে। (তারপর স্বহস্তে খেলোয়াড়ি ম্যাসাজ করতে থাকেন, হাতে, পায়ে, পিঠে।)

সুহাস—দেখলেন তো মাস্টার সাহেব? আমি কোন কর্মের নই। আমি একটা কাপুরুষ। এই যে কাঁপছি দেখছেন? ভয়ে কাঁপছি।

যুবক সুলতান—এতে তো লজ্জার কিছু নেই, মালেক। এসব আমার লাইন, আপনি পারেন না। আবার অভিনয়টা আপনার লাইন, আমি পারি না। ফিলিম লাইনে কাজ ভাগ না করে নিলে চলে নাকি? কপিলভাই কি ক্যামেরা চালাতে পারেন না বলে লজ্জা পান? তাছাড়া জনাব, একটা কথা মনে রাখবেন। হিরোরা নিজেরাই এসব করতে থাকলে আমরা ফাইটাররা না খেয়ে মরবো যে!

সুহাস—দোস্ত তোমার তুলনা নেই।

যুবক সুলতান—সে রকম চৌকস হিরো একটাই তৈরী হচ্ছে, হুজুর। আমার ছেলে মুর্শিদ। ওর ফাইটার লাগবে না। আর অভিনয়েও হুজুরের সঙ্গেও লড়ে যাবে আর দুতিন বছরের মধ্যে।

সুহাস—এবার তুমি শট দাও বন্ধু, আমি বসে বসে তোমাকে দেখি আর ভাবি কেন আমি সুলতান খাঁ হতে পারলাম না!

সুলতান—ভয় যে আমি জীবনে পাই নি সেকথা সত্যি নয়। ভয় পেয়েছি। কিন্তু কখনো থামিনি। থামলেই তাকে প্রশ্রয় দেয়া হয়। থামতে নেই, চিন্তা করতে নেই। চট করে করে ফেলতে হয়। আর তনুমন সব থাকবে দড়ি বা একটা হাতল বা পাইপ, বা লাফাতে হলে নীচের একটা জায়গায় নিবদ্ধ। অর্জুন যেমন পাখীর চোখ ছাড়া আর কিছুই দেখতে পান নি। আর চাই দেহের শক্তি ও ক্ষিপ্রতা। এই দেখুন, এই সাঁড়াশিটা ফেলে গেছে রাজিয়া। পঁয়ষট্টি বছর বয়স হোলো আমার—পঁয়ষট্টি বছর বয়সে এটাকে বাঁকিয়ে...বাঁকিয়ে বাঁকিয়ে গোল করে...দিতে পারি...আশ্চর্য, গত বছরও তো পারতাম।

[মোগল-যুগের পোষাকে সুহাস ও যুবক সুলতানের প্রবেশ। পেছনে মাণ্ডবী, মোগল শাহাজাদীর পোষাকে, তারপর কপিল, চিমন ও অন্যান্যরা।]

সুহাস—এ কি? আজ আমার মতন সাজেন নি যে?

যুবক সুলতান—আজ আমি ভিলেনের ডামি হরিশ চোপরা সাহেবের সাবষ্টিচুট!

সুহাস—দ্যেৎ! এ চিমনভাই। এটা কী করছেন? সুলতান খাঁ আমার বাঁধা ডামি। আমরা হরিহর আত্মা হয়ে গেছি, অচ্ছেদ্য বাঁধনে আটকে গেছি। জুটি ভাঙছেন কেন?

চিমন—হরিশ চোপরাকে তোমার তলোয়ারের খোঁচা খেয়ে ওপর থেকে পড়তে হবে। বোম্বাইয়ে কোনো ফাইটার রাজী হোলো না। সবাই বলে, নীচে জাল লাগাতে হবে, দুটো শট নিতে হবে। এদিকে আবার নাছোড়বান্দা এক ডাইরেক্টর জুটেছে, বলে এক শটে নেবে।

কপিল—তা ছাড়া কি? সুলতান মাস্টার থাকতে ভাবনা কি?

চিমন—হ্যাঁ, হ্যাঁ, লোহার ভীম রয়েছে তো!

মাণ্ডবী—লোহার ভীম হচ্ছে সঠিক বর্ণনা। হাত তো নয়, লোহার দস্তানা। গত সপ্তাহে ঘোড়ায় তুলে নেয়ার সীনটায়—বুঝলে সুহাস—আমার কাঁধ দুটো টন টন করে উঠলো এঁর হাতের স্পর্শে।

যুবক সুলতান—আপনার লেগেছিল?

মাণ্ডবী—ভাল লেগেছিল। মজা আগয়া থা! কামাল হ্যায়।

চিমন—তারপর মাস্টার, তোমার ছেলে তো শুনছি তোমারই মতন ফাইটার হয়েছে। মেহরা-সাহেব খুব তারিফ করছিলেন তার।

যুবক সুলতান—ওর দেহের গড়নটা মহেন্দ্র সাহেবের মতন। তাই মহেন্দ্রের ডামি হচ্ছে দু-চারটে ছবিতে। তবে ও ফাইটার থাকবে না, হিরো হবে। যা চেহারা!

মাণ্ডবী—হুঁ, সেটা আপনাকে দেখে আন্দাজ হয়।

সুহাস—এখন চুপ করো। পার্ট মুখস্ত করছি।

কপিল—চলো, শুরু করো। হরিশ চোপরার আসতে দেরী হবে। তাই যুদ্ধটা পরে নিচ্ছি আগে শেষ শট! কি বলো, মাস্টার?

যুবক সুলতান—হ্যাঁ, ঝামেলা আগে চুকিয়ে ফেলুন সরকার!

কপিল—সুহাস আর হরিশ তলোয়ার খেলছে কেমন?

যুবক সুলতান—জোর রিহার্সাল দিয়েছি! ভালই খেলছে।

মাণ্ডবী—ছাই খেলছে। কপিল ভাই, আমি দেখেছি রিহার্সাল। মাস্টার সাহেব যা শেখাচ্ছেন তার সিকি ভাগও সুহাস তুলতে পারছে না। সে পৌরুষই নেই, সেই স্টাইল গ্রেস কায়দাই নেই। আসলে সে শরীরই নেই।

কপিল—ওঠো, মিনারে ওঠো, এই, লাইট দাও।

ক্যামেরাম্যান—অল লাইটস্।

যুবক সুলতান—চলুন হুজুর।

[ওপরে যান]

মাগুবী—(সুহাসকে) দেখো তোমার মাথা ঘুরবে না তো? তোমার তো আবার ভার্টাইগো আছে।

সুহাস—এভাবে কেন বিঁধিয়ে বিঁধিয়ে বলো সব সময়ে?

মাগুবী—বা, তোমার ভালর জন্য বলা।

সুহাস—কিন্তু হচ্ছে আমার সর্বনাশ। আমি...আমি আজকাল নার্ভাস হয়ে যাচ্ছি। শুটিং-এর নামে জ্বর আসছে আজকাল।

মাগুবী—তাহলে মাপ চাইছি। কিন্তু আমি চেয়েছিলাম তোমার পৌরুষ জাগ্রত করতে।

সুহাস—ঈর্ষায় পুড়িয়ে মারলে পৌরুষ জাগে না!

মাগুবী—বাঃ, ঈর্ষা হচ্ছে তাহলে? সেটাও একটা লাভ।

সুহাস—যেভাবে তাকিয়ে থাকো সুলতান খাঁর দিকে, ঈর্ষা হবে না?

মাগুবী—বা, লোহার ভীমের দিকে চোখ যাবে না?

সুহাস—ও। কিন্তু লোহার ভীমই শেষ কথা নয়। ধৃতরাষ্ট্র সে ভীমকে জড়িয়ে ধরে গুঁড়ো করে দিয়েছিলেন।

কপিল—হিরো-হিরোইন কি গুজগুজ করবেন সারা দিন? তাহলে বলুন প্যাক-আপ করে দিই।

[সুহাস মিনারের ওপর গিয়ে ওঠে। সুলতান তাঁকে তলোয়ার দেন।]

যুবক সুলতান—শেষ স্টেপ কটা মনে আছে তো?

সুহাস—হ্যাঁ।

যুবক সুলতান—রিহার্সাল!

ক্যামেরাম্যান—মাইক এসে যাচ্ছে, মাইক উঁচু করো।

কপিল—হ্যাঁ, একশন!

[সুহাস তলোয়ার চালাতে চালাতে এগোয়, মিনারের একেবারে ধারে এসে দুজনের তরবারি বেধে যায়, তখন সুহাস বাঁ হাত তোলে মারতে]

সুহাস—দেখ্ শয়তান, পিতা কা খুন কা বদলা লে রহা হুঁ।

যুবক সুলতান—মোটামুটি ঠিক আছে। আরো হাল্কা চালে এগোন হুজুর। তলোয়ার খেলার পায়ের কাজ নাচের মতন। আর বাঁ হাতে যে মারবেন, বুকে মারবেন। জোরে মারবেন, কিন্তু বুকে। মুখে মারলে আমি বেসামাল হয়ে যাবো, সত্যিই পড়ে যাবো। মনে থাকবে?

সুহাস—নিশ্চয়ই। এরকম একটা শট দিয়েই আমার ফিল্মী জীবন শুরু হয়েছিল। আপনি হাতে ধরে শুরু করিয়েছিলেন।

কপিল—হাও ওয়াজ সাউণ্ড, বাবা?

কণ্ঠ—ও কে টেক করুন।

কপিল—টেক করবো, সুলতান?

যুবক সুলতান—জরুর। হম তৈয়ার হেঁয়।

কপিল—(ক্যামেরাম্যানকে) একবারই হবে এ-শট। পরে বলবে না টিল্ট ডাউন করতে পারি নি।

ক্যামেরাম্যান—না, আমি রেডি।

কপিল—স্টার্ট সাউণ্ড।

কণ্ঠ—সাইলেন্স্! ক্যামেরা!

ক্যামেরাম্যান—ক্ল্যাপ।

সহকারী—'হারেম', সীন হাণ্ড্রেড এণ্ড টু, শট ফর্টি সেভেন, টেক ওয়ান।

কপিল—একশন্।

[তড়িৎগতিতে তলোয়ার চালাতে চালাতে ব্যাঘ্রবিক্রমে সুহাস সুলতানকে ঠেলে আনে মিনারের দ্বারে। তলোয়ার আটকে যায়।]

সুহাস—(হিংস্র চীৎকার করে) 'শয়তান, দেখ—বদলা—বদলা লে রহা হুঁ।'

[এবং প্রাণপণ শক্তিতে সে আঘাত করে সুলতানের মুখে। মাথাটা পেছন দিকে হেলে যায়, ভারসাম্য হারিয়ে মুহূর্তে সুলতানের দেহ আছড়ে পড়ে মাটিতে।]

কপিল—কাট! ওয়াণ্ডারফুল শট।

চিমন—মাইনে পাঁচশ হয়ে গেল আজ থেকে।

[কিন্তু সুলতান ওঠেন না। ওপরে সুহাস বিস্ফারিত চোখে তাকিয়ে হাঁপাচ্ছে।]

মাণ্ডবী—কি হয়েছে? সুলতান খাঁ উঠছেন না কেন?

সুহাস—(বিকৃতস্বরে চীৎকার করে) লেগেছে ওঁর। জখম-হয়েছেন। ঘুঁষি মুখে লেগে গেছে! উনি সত্যিই পড়ে গেছেন!

[সকলে 'জল' 'বরফ' 'ডাক্তার' প্রভৃতি বলতে বলতে ছুটে যায় সুলতানের কাছে। সুহাসও এসে মাথাটা কোলে নেয়, তার হাতে লেগে যায় রক্ত।]

দোস্ত! লেগে গেছে! মুখে লেগে গেছে ঘুঁষি! আমি নার্ভাস হয়ে পড়েছিলাম, তাই লেগে গেছে। দোস্ত, তুমি শুনতে পাচ্ছ?

কপিল—(চাপাস্বরে)—তুমি চাইছিলে ও মরুক, তাই না সুহাস?

সুহাস—না! না! এ আমার উস্তাদ! কি করে তা চাইব? লেগে গেছে! এক্সিডেন্ট! আচমকা লেগে গেছে!

সুলতান—তখনই লাগলো। মাথায় লাগলো, পায়ে লাগলো, কোমরে, পাঁজর ভাঙলো। আর কপাল ভাঙলো। (হাসেন) ধৃতরাষ্ট্রের আলিংগনে লোহার ভীম চূর্ণ হলো।

সেই থেকে বসে আছি। আজ কুড়ি বছর বসে আছি। ছেলের রোজগারে খাচ্ছিলাম। তারপর মুর্শিদ সে হেলিকপ্টারের তলায় ঝুলছিল। সে ছবির নাম 'এজেন্ট ফিফটি ফাইভ'। মহেন্দ্রের ডামি আমার ছেলে মুর্শিদ হেলি—হেলি—হেলিকপ্টারের তলায় ঝুলছিল। (চীৎকার করে) মুর্শিদ! পুরো বাহুর মাংসপেশীর ওপর ভারটা নে! শুধু কব্জী নয়! মুর্শিদ! নালায়েক! বুকের কাছ দড়িটা ধর। এই শিখেছ এতদিনে? নির্বোধ!

নেপথ্যে রাজিয়া—আস্তে, আস্তে পাগলামি করো না।

সুলতান—মুর্শিদ দুশ ফুট পাক খেতে খেতে পড়লো জলে। এত শেখালাম। পুরো...পুরো বাহুর শক্তি দিয়ে...। মুর্শিদ চলে যেতে একটু অসুবিধে হোলো। ফাইটারদের ইনশিওরেন্স হয় না, জীবন বীমা হয় না।

নেপথ্যে রাজিয়া—কাজে যাবে না আজ?

সুলতান—হ্যাঁ, যাচ্ছি।

[ততক্ষণে সুলতান উঠে দাঁড়ান। দেখি একটা পা নেই, এবং সর্বাংগ কেমন যেন দোমড়ানো। পঙ্গু সুলতান খাঁ ক্রাচে ভর দিয়ে গুটি গুটি চলেন। তারপর থেমে বলেন—]

সুলতান—কাজ ছাড়া তো লোকে বাঁচে না। এই অবস্থাতেও কাজ আমি করেই চলেছি। আমার তুলনা নেই। চিমনভাই আমাকে বড় ভালবাসেন। চিরদিন বেসেছেন। তাঁর এখন বারোটা সিনেমা হাউস। তারই একটা হোলো অনধেরিতে—'বাসন্তী সিনেমা'। তার সামনে ফুটপাথের ওপরে পুলিশকে ঘুষ দিয়ে উনি আমাকে একটা ভিক্ষে করার পার্মানেন্ট জায়গা করে দিয়েছেন। সারা সন্ধ্যে ঐ কাজটা করি। (আবার একটু এগিয়ে) চিমনভাই তাঁর এই ভাঙা লোহার ভীমকে এখনো ভালবাসেন, ভিক্ষে করার বাঁধা জায়গাটা উনি না হলে পেতামই না। ভিক্ষের মধ্যেও এখন আর বেইজ্জতির কিছু দেখি না। ক্ষুধার কাছে ইজ্জত দাঁড়াতে পারে না। আমার তুলনা নেই।

[খুট খুট করতে করতে তিনি কাজে চলে যান]

□

সিজ ফায়ার

পার্থ বন্দ্যোপাধ্যায়

(১৯৩১-১৯৮২)

চরিত্র

অর্জুন সিং
তেজবাহাদুর
সুরিন্দর সিং
রামলাল
হুকুমচাঁদ
মীরখান
কিষণরাজ
আনন্দ
আপ্পারাও
কাপুর
হাবিলদার ভল্লা
নানজিং
আনোয়ার

পরিবেশ ইংগিত ['A Army'র দুটি তাঁবু দেখা যায়। একটিতে Soldier-রা রয়েছে, অপরটি Battalion Commander-এর। (এই নাটিকার স্থান, কাল, পাত্র সবই কাল্পনিক) ধরে নেওয়া যাক পার্বত্য অঞ্চলে লড়াই চলছিল 'A Army'র সঙ্গে Eastern Force-এর। আঁধার নামার সাথে সাথে আজকের মত লড়াই প্রায় থেমেছে। মাঝে মাঝে দু'চারটি গোলাগুলির আওয়াজ এখনও ভেসে আসছে। দূরে বনভূমি দাউ দাউ করে জ্বলছে। আর মনে হচ্ছে যেন তারই ছোঁয়াচ লেগে দিগন্ত হয়েছে লাল।

Commander অর্জুন সিং Soldier-দের তাঁবুতে যায়। সমস্ত দিন কঠোর সংগ্রাম করে Soldier-রা ক্লান্ত হয়ে পড়েছে। কেউ শুয়ে পড়েছে, কেউ বা আপন মনে Mouth Organ বাজাচ্ছে, আর একজন ফটো দেখছে, বোধহয় আপন জনের]

অর্জুন সিং—Firing বন্ধ হয়েছে। আমাদের মত ওরাও নিশ্চয় ক্লান্ত হয়ে পড়েছে। হয়তো বিশ্রামের প্রস্তুতি চলেছে ওদের তাঁবুতে। নিঝুম পাহাড় কিছু সময়ের মধ্যে ওদের ঘুম পাড়িয়ে দেবে। তারপর শুরু হবে আমাদের অভিযান। তিন নম্বর ঘাঁটি ছিনিয়ে নেবার অভিযান। (Soldierরা অবাক হয়ে তাকায় তাদের Commander-এর দিকে) আমি বুঝতে পারছি আমরা ক্লান্ত, সমস্ত দিনের কঠোর সংগ্রামের অবসাদ আমাদের আচ্ছন্ন করেছে। কিন্তু বন্ধুগণ! এই চরম সুযোগ! আজ রাতে তিন নম্বর ঘাঁটি দখল না করতে পারলে অনাহারে মরতে হবে আমাদের সকলকে। প্রচুর খাদ্য আর রসদ আছে ঐ তিন নম্বর ঘাঁটিতে। আমাদেরও রসদ ফুরিয়ে এসেছে, সুতরাং রাতের অন্ধকারে ঝাঁপিয়ে পড়তেই হবে আমাদের। (Soldier-রা মাথা নোয়ায়, অর্জুন সিং হাতের ঘড়িটা দেখে নিয়ে) এখন 19-20 hours, by 23 hours আমাদের তৈরি হতে হবে। তোমরা বিশ্রাম কর। 22 hours-এ আসবো। Attack-এর programme তখন chalk out করা যাবে। OK! Good night!

[অর্জুন সিং নিজের তাঁবুতে চলে যায়। Soldier-দের মধ্যে কথাবার্তা শুরু হয়]

তেজবাহাদুর—প্রায় চার ঘণ্টা সময় হাতে। সুরিন্দর সিং, আয় ফুর্তি করা যাক। বলা যায় না, তিন নম্বর ঘাঁটিতেই হয়তো চিরকালের জন্য বিশ্রাম নিতে হতে পারে।

সুরিন্দর সিং—তা তো বুঝলাম। কিন্তু ফুর্তি করার সামগ্রী কোথায়? আমার কাছে কিছুটা 'Rum' আছে।

তেজবাহাদুর—বার কর শালা। এতক্ষণ চেপে রেখেছিস?

[তেজবাহাদুর রামলালের হাত থেকে বোতলটা কেড়ে নিয়ে কিছুটা 'রাম' গলায় ঢালে। সঙ্গে সঙ্গে সুরিন্দর সিং বোতলটা ছিনিয়ে নেয়। ক্রমে বোতলটা নিয়ে কাড়াকাড়ি শুরু হয়।]

—Prince কে একটু দে। কই দেখি! (বোতলটা কেড়ে নিয়ে এগিয়ে দেয় Prince অর্থাৎ হুকুমচাঁদের দিকে)—কই Prince ভায়া, গলাটা ভিজিয়ে নাও!

হুকুমচাঁদ—তোমাদের মত আমার গলা শুকিয়ে যায়নি।

[সকলে হাসে]

সুরিন্দর সিং—সে কি Prince! চার ঘণ্টা পরে আগুনে ঝাঁপ দেবে!

রামলাল—দে, আমায় দে। Prince মৃত্যুকে ভয় পায় না।

হুকুমচাঁদ—আমি মরবো না।

তেজবাহাদুর—মানে?

হুকুমচাঁদ—আমি যে একদিন General হব!

রামলাল—General?

হুকুমচাঁদ—হ্যাঁ, General.

সুরিন্দর সিং—General মানে বোঝ? তোমার বাপ, তার বাপ, তার ঠাকুর্দা, আর ঐ ঠাকুর্দার বাবার বাবা কখনো General হয়েছে?

তেজবাহাদুর—দেখি চাঁদু! চাঁদ মুখখানা দেখি একবার!

রামলাল—পাতলুনটা খুলে মারতে হয় এক লাথ। General!

কিষণরাজ—আহা, তোরা ক্ষেপছিস কেন? হুকুমচাঁদ যদি মনে করে ও General হবে—

তেজবাহাদুর—তুই থাম। General হবে! আমাদের অর্জুনসিংকে দেখ না! তিন-তিনটে লড়াই গেল। স্রেফ ঐ Battalion Commander, আর এগুতে হলো না। হ্যাঁ—

সুরিন্দর সিং—তাছাড়া অর্জুন সিং-এর হিম্মৎটা দেখ! গত লড়াইয়ে মাত্র কুড়িটা লোক নিয়ে বিমান ঘাঁটি বাঁচিয়েছে।

কিষণরাজ—আরে, হুকুমচাঁদ তো সেই ভরসাতেই রয়েছে। ভাবছে, অর্জুন সিংয়ের মত Commander-এর নির্দেশে লড়াই করে মরবে না।

তেজবাহাদুর—মরবে না—কি করে ভাবছে? তিন নম্বর ঘাঁটির শক্তি সম্পর্কে আমাদের সুস্পষ্ট ধারণা আছে কি?

কিষণরাজ—তা নেই বটে!

তেজবাহাদুর—তাহলে? সে যাক্‌গে—কিন্তু General হবার স্বপ্ন দেখছে কি করে?

কিষণরাজ—কি মুশকিল! ও যা খুশি স্বপ্ন দেখুক না, তোর-আমার কি? এসো হুকুমচাঁদ!

[হুকুমচাঁদকে নিয়ে তাঁবুর বাইরে চলে যায়]

আনন্দ—মাল গেছে? অসহ্য লাগে আমার আলালের ঘরের দুলালগুলোকে! শালা বাপ-ঠাকুর্দা টাকা রেখে গেছে—বাপ-ঠাকুর্দা টাকা করেছে কি করে, সেটা পাঁচজনকে ঠকিয়ে তবে না?

আপ্পারাও—Yes, prosperity is the result of theft, Economics-এ পড়েছি।

সুরিন্দর সিং—হলো, আবার Economics!

আনন্দ—জ্ঞান দিবি না শালা। চেপে যা। হ্যাঁ, যা বলছিলুম! সোনার চামচ মুখে নিয়ে জন্মেছে তো, ভাবছে এই General হনু বলে!

মীরখান—বড় লোকের ছেলে বুঝি? তা Military-তে কেন?

কাপুর—ও হরি! তাও জানিস না? তবে শোন। পশ্চিমে বাড়ি। প্রচুর টাকা-পয়সা আর বিষয়-সম্পত্তি রেখে গেছে বাপ। B.A. পাশ করেছে। হঠাৎ বাবুর কি ঝোঁক হয়েছে Military General হবে। সবাই সেলুট করবে!

সুরিন্দর সিং—হাঁদা! আরামে জীবন কাটাতে পারতো, তা নয়, মরতে এলো Military তে!

তেজবাহাদুর—মজার কথা শোন না! আসার দিন মাকে নাকি বলেছে, 'কাঁদছো কেন মা, একবার ভাবো তো তোমার ছেলে যখন Military General হবে, যুদ্ধে জিতে গলায় মালা নিয়ে ফিরে আসবে তোমার কাছে—তোমার তখন কেমন লাগবে মা?'

রামলাল—আবার প্রেমিকাকে বলেছে—Military General হয়ে তবে বিয়ে করবে।

সুরিন্দর সিং—মেয়েটার কপাল ফাটলো। আর কিছুক্ষণ বাদেই—ব্যস!

মীরখান—ওকথা বলিস না ভাই। বিবিজানের জন্য মন কেমন করছে! বিয়ের পর মাত্র চারদিন একসঙ্গে ছিলুম!

[সকলে হাসে]

কাপুর—বিবিজানের জন্য মিছেই ভাবছিস। তোর ছোট ভাই আছে না?

মীরখান—হ্যাঁ। কিন্তু তাতে কি?

কাপুর—ব্যস্! তোদের জাতে তো বড় ভাই না থাকলে, বড় ভাইয়ের বিবিকে ছোট ভাই ইয়ে করে। তোর বিবিরও সুরাহা হয়ে যাবে।

[সকলে হাসে]

তেজবাহাদুর—মেয়েমানুষের কথা তুলে মেজাজটা বিগড়ে দিলি! আঃ—শালা এখন যদি একটা মেয়েমানুষ পেতাম না!

রামলাল—একটা মেয়েমানুষ?

তেজবাহাদুর—আরে থাম। মোটে মিলছে না—

সুরিন্দর সিং—কেন? তখন আমরা পশুর মত হয়ে যেতাম। মারামারি কাড়াকাড়ি সুরু করতাম।

কাপুর—হয়ে যেতাম কি? হয়ে গেছি বল! আর হব না-ই বা কেন?। এই তো আর কিছুক্ষণ পরেই হয়ত জানটা চলে যাবে।

আপ্পারাও—আমাদের অবস্থা—

'We are not to make reply
We are not to reason why?
We are but to do and die
Into the valley of death.'

আনন্দ—আবার জ্ঞান? আপ্পারাও, জ্ঞান দিবি না। মেজাজ খারাপ, দেবো শালা!

কাপুর—থাক-থাক, ছেড়ে দে। অনেক বই পড়েছে তো। পেটের ভেতরটা গুড় গুড় করছে। খানিকটা বমি করে দিক।

[সকলে হাসে। হাবিলদার ভল্লা এসে জানান দিয়ে যায়, Commander অর্জুন সিং আসছে। সঙ্গে সঙ্গে সকলে রেডি হতে থাকে। কিষণরাজ ও হুকুমচাঁদ তাঁবুতে ফিরে আসে।]

হাবিলদার ভল্লা—Attention! Commander অর্জুন সিং!

কাপুর—আপ্পারাও, চটপট আর দুটো কবিতা আওড়ে নে। পেটটা হাল্‌কা হয়ে যাবে। খাদে নামতে হবে তো! পেট হাল্‌কা থাকলে মজা পাবি।

[সকলে হাসে]

তেজবাহাদুর—আর ক'টা Theory শুনিয়ে দে।

[সকলে হাসে]

সুরিন্দর সিং—একটা প্রেমের কবিতা শোনা ভাই Prince কে! আহা! Prince-এর প্রেমিকা প্রতীক্ষায় রয়েছে, কবে প্রিয়তমে General-এর বেশে ফুল-মালা গলে! আহা!

[মীরখান পকেট থেকে ছবি বার করে বার বার দেখে। রামলাল ছবিটা কেড়ে নেয়]

রামলাল—কার ছবি রে? আহা! বেড়ে চেহারা মাইরী!

মীরখান—খবরদার শালা কুত্তা!

আনন্দ—ওর বিবির ছবি। একেবারে পশু হয়ে গেছিস!

কিষণরাজ—আশ্চর্য! পেটের ক্ষুধা না মিটিয়ে—

আপ্পারাও—Surely, hunger for bread—

তেজবাহাদুর—আবার?

রামলাল—আর তুই শালা! একটু আগেই তো বললি, 'একটা মেয়েমানুষ যদি পেতাম না!'

[সকলে হাসে। কাপুর ধীরে ধীরে এগিয়ে যায় আনোয়ারের কাছে। আনোয়ার কিন্তু আপন মনে Mouth organ বাজিয়ে চলেছে। আক্রমণের সময় এগিয়ে আসছে, আর Mouth organ-এর সুর হচ্ছে করুণ]

কাপুর—আনোয়ার। (সকলে সেদিকে তাকায়)—আনোয়ার! (কাপুর আনোয়ারের কানের কাছে গিয়ে ডাকে) আনোয়ার তাহলে কানে শোনে না। এমন মিঠে সুর ছড়িয়ে দিচ্ছে আনোয়ার পাহাড়ে, আকাশে, বাতাসে—অন্ধকার রাত অবাক হয়ে শুনছে আনোয়ারের বাজনা—অথচ আনোয়ারের কানে পৌঁছুচ্ছে না সে সুর।

Mouth organ-এর সুর যেন বলছে, 'কেন এ পাশবিকতা? শুনছো, তোমরা যুদ্ধ থামাও!'

[কাপুরের মুখের দিকে তাকিয়ে আনোয়ার বোঝে ডাক এসেছে লড়াইয়ের। ধীরে ধীরে Mouth organটা নামিয়ে রেখে তৈরি হয়ে নেয়]

আনন্দ—আহা! কি কষ্ট বল দেখি! এই তো কিছুদিন আগে কত কথাই বলেছে—'এ যুদ্ধে কাজ নেই আনন্দ ভাই। ভাবতে পারো কি দারুণ ধ্বংসের নেশায় আমরা মেতে উঠেছি। আমি সহ্য করতে পারি না আনন্দ ভাই। আমরা সবাই প্রকৃতি-মা'র সন্তান। হিংসার উন্মাদনায় একে অন্যকে মা'র কোল থেকে ছিনিয়ে নিচ্ছি কেন। আমি কেন মেতে উঠলাম এ কাজে? আমি—আমি তো বুঝি এ জ্বালা। মায়ের কোলে আশ্রয় আমি কখনও পাইনি। আমার মাকে আমি জানি না।'

আপ্পারাও—Survival of the fittest.

আনন্দ—আবার? আচ্ছা যন্ত্রণায় পড়া গেছে এই জ্ঞানবাবুকে নিয়ে! ওরে বাবা থাম্! দেশে ফিরে ইডলি খেতে খেতে বউকে জ্ঞান দিস।

[সকলে হাসে]

হাবিলদার ভল্লা—Attention! Commander অর্জুন সিং!

[সকলে steady হয়ে যায়। অর্জুন সিং তাঁবুতে আসে। একটা উঁচু জায়গায় বসে পড়ে]

অর্জুন সিং—শোন! (সকলে গোল হয়ে বসে) আমরা দুটো গ্রুপে এগিয়ে যাবো দু'ধার দিয়ে। আগ্নেয়াস্ত্র ব্যবহার করবো না। কারণ, তিন নম্বর ঘাঁটির man power আমাদের চেয়ে অনেক বেশি! তা ছাড়া, ওদের হাতে রসদও প্রচুর আছে। এ লড়াই হবে সম্পূর্ণ বুদ্ধির লড়াই। রাতের অন্ধকারে bomb করে তাড়িয়ে নিয়ে যেতে হবে ওদের। অতর্কিত আক্রমণে ওরা নিশ্চয় ছত্রভঙ্গ হয়ে পড়বে। আমি সন্ধান পেয়েছি তিন নম্বর ঘাঁটির Defence force শুধু মাত্র পুব দিকটা সম্পর্কে সচেতন। কারণ, ওদের Battalion Commander আশঙ্কা করছে আক্রমণ আসবে পুব দিক থেকে। অবশ্য other side মোটে guarded নয়, এ আমি বিশ্বাস করি না। তবুও আমাদের sudden attack রোধ করার মত sufficient arrangement নেই বলেই আমার মনে হয়। তেজবাহাদুর, D'-bomb আমাদের হাতে কত আছে?

তেজবাহাদুর—মাত্র তিন ডজন, Commander!

অর্জুন সিং—তিন ডজন মাত্র! (অর্জুন সিংকে যেন কিছুটা চিন্তিত বলে মনে হয়) Flame bomb বোধহয়—

তেজবাহাদুর—একটা আছে।

অর্জুন সিং—Quite insufficient! উপায় নেই! তিন নম্বর ঘাঁটি আমাদের হাতে না এলে—enemy force will move forward at a galloping speed.

Anyway, শোন পুব দিক দিয়েই আমরা proceed করবো ঘাঁটিতে। Flame bombটা প্রথমে ফেলবো far west-এ। ওরা wrongly guided হবে। ভাববে, principal attack আসছে west থেকে। Automatically defence force move করবে towards west-এ। সে সুযোগে আমরা bombing শুরু করবো south-west এবং north-west থেকে। তাড়িয়ে নিয়ে যাবো ওদের far west-এ, এবং east দিয়ে ঘাঁটিতে উপস্থিত হব। Now—আমরা plan দেখে movement ঠিক করবো। হুকুমচাঁদ—Plan! (হুকুমচাঁদ back pocket-এ হাত ঢোকায়) কি হল? (পাগলের মত খুঁজতে থাকে হুকুমচাঁদ) Planটা কি হারিয়েছে? নিশ্চয়! (হুকুমচাঁদ তাঁবুর চারপাশে খুঁজে বেড়ায়, Plan পায় না) হুকুমচাঁদ! (হঠাৎ কঠিন হয়ে ওঠে Commander অর্জুন সিং) Where is that Plan? I say where is that?

হুকুমচাঁদ—হারিয়ে গেছে।

অর্জুন সিং—What? We are finished! You bloody man, only for you so many soldiers will die helplessly. Shoot him—সুরিন্দর সিং!

[তেজবাহাদুর আর রামলাল হুকুমচাঁদকে চেপে ধরে]

হুকুমচাঁদ—না! না! না! আমি General হব। আমার মার কাছে—

অর্জুন সিং—Yes, you are to pay the penalty.

[সুরিন্দর সিং গুলি ছোঁড়ে। আর্তনাদ করে হুকুমচাঁদ লুটিয়ে পড়ে মাটিতে। সকলে এসে মাথা নিচু করে দাঁড়ায় মৃতদেহের সামনে।]

অর্জুন সিং—Remove it. (তেজবাহাদুর আর রামলাল bodyটা বাইরে রেখে আসে) Now, কোন উপায় নেই। Direction আমার যা মনে আছে, শোন, বলছি। আমরা almost center-এ আছি। তেজবাহাদুর, তুমি machineguns and other arms আর চার-পাঁচজনকে নিয়ে proceed করো right direction, অর্থাৎ east-এ। সুরিন্দর সিং, তুমি Flame bomb আর একজনকে নিয়ে left end-এ যাও। Flame bombটা যেন right point-এ ফেলা হয়। তেজবাহাদুর, Flame bombটা ফেলার পর তুমি wait করবে। So that defence force west-এর দিকে move করে। আর আমি proceed করছি left-এ। OK! Good bye!

[Soldierরা forward march করে। মঞ্চ পুরো অন্ধকার। Light change. মাঝে মাঝে গুলির আওয়াজ আসে। কিছু সময় বাদে শুরু হয় firing, non-stop firing. অর্জুন সিং-এর দল defend করতে পারে না। তার পর firing বন্ধ হয়। Survive করেছে শুধু তেজবাহাদুর। তেজবাহাদুর পিছিয়ে আসতে গিয়ে হঠাৎ থমকে দাঁড়ায়, মনে হয় যেন বেঁচে আছে একজন]

নানজিং—জল! জল! (তেজবাহাদুর এগিয়ে যায় নানজিং-এর কাছে। অন্ধকারে দেখতে পায় না)

তেজবাহাদুর—কে? কে তুমি?

নানজিং—একটু জল!

তেজবাহাদুর—তুমি কে?

নানজিং—আমি 'A Army'র soldier!

তেজবাহাদুর—ও friend! চল। Firing বন্ধ হয়েছে। ওরা যে কোন মুহূর্তে এগিয়ে আসবে। আমাদের entire division smashed. পালানো ছাড়া অন্য কোন উপায় নেই।

নানজিং—কিন্তু ভাই, আমি যে চলতে পারবো না! আমার ডান পায়ে বুলেট লেগেছে।

তেজবাহাদুর—সর্বনাশ! তাহলে?

নানজিং—আমায় একটু জল এনে দাও ভাই!

তেজবাহাদুর—জল! জল কোথায় পাই? আচ্ছা দেখছি! (তেজবাহাদুর বেরিয়ে যায়। কিছু সময় বাদে ফিরে আসে)—পেয়েছি। Water bottle! Dead soldier-এর water bottle!

নানজিং—দাও! (Water bottle নিয়ে ঢক ঢক করে জল খায়) আঃ, বাঁচালে বন্ধু!

তেজবাহাদুর—বুলেট কোথায় লেগেছে বললে?

নানজিং—ডান পায়ে।

[তেজবাহাদুর নানজিং-এর পা'টা দেখে। ক্ষত জায়গায় হাত পড়তেই নানজিং চেঁচিয়ে ওঠে]

নানজিং—লাগছে।

তেজবাহাদুর—বুলেটটা বার করে দিলে আরাম পাবে। চেষ্টা করবো? আমার বেয়নেটের সাহায্যে হয়তো বুলেটটা বের করা যেতে পারে!

নানজিং—যন্ত্রণা সহ্য করতে পারবো না। আমার মনে হচ্ছে হাড়ের মধ্যে রয়েছে। হাড় কেটে তবে—

তেজবাহাদুর—অন্ধকারে সেটা সম্ভব নয়। তাছাড়া আমি খুব অল্প দিন Armyতে এসেছি। Bullet wound সম্বন্ধে আমার খুব বিশেষ জ্ঞান নেই। তার চেয়ে আমি বরং ব্যাণ্ডেজ করে দি, কি বল?

নানজিং—কষে bandage করলে হয়তো বা চলবার চেষ্টা করতে পারি।

[তেজবাহাদুর তাঁর কামিজ ছিঁড়ে bandage করে দেয়]

তেজবাহাদুর—এখন কিছুটা আরাম লাগছে?

নানজিং—হ্যাঁ, কিন্তু চলার ক্ষমতা আমার নেই।

তেজবাহাদুর—না, চলার চেষ্টা করো না। Bleeding বন্ধ হবে না।

নানজিং—আমার জন্য তুমি অনেক করলে বন্ধু। এবার তুমি পালাও। আমাকে এই ঘাসের ওপর শুয়ে অসহায় ভাবে মৃত্যুবরণ করতে দাও!

তেজবাহাদুর—তা কি হয়! আমি অক্ষত দেহে রয়েছি। তোমাকে বয়ে নিয়ে যাবার ক্ষমতা আমার আছে।

নানজিং—না-না। আমাকে বাঁচাতে গেলে তোমাকেও মৃত্যুবরণ করতে হবে। কারণ, আমার এই ভারী দেহটাকে নিয়ে move করা কতক্ষণ সম্ভব? তাছাড়া, তুমি না থাকলে তো আমার ওই হালই হত।

তেজবাহাদুর—কি হ'ত জানি না। তোমার সঙ্গে দেখা হল, আর জানলাম তুমি অক্ষম, সুতরাং এখন আমার duty তোমাকে help করা।

নানজিং—আর একটু জল! (তেজবাহাদুর water bottleটা এগিয়ে দেয়)—আঃ, কিন্তু পাহাড় কি রকম উত্তপ্ত হয়েছে বলতো?

তেজবাহাদুর—হবে না? তিন নম্বর ঘাঁটি থেকে non-stop firing করেছে ৩০ মি. ধরে—আগুনের হল্‌কায় পাহাড় তেতে গেছে।

নানজিং—ভাবছি, এখন যদি বাড়ির নরম বিছানায় শুতে পারতাম, ঠাণ্ডা বাতাস লেগে সমস্ত শরীরটা জুড়িয়ে যেত! জানো বন্ধু, আমাদের বাড়ির পাশেই ঝরণা। ঝরণার জল কি মিষ্টি! রিমঝিম সুরে ঝরণার জল পড়ে, আর তারই পরশে শীতল হয় বাতাস। রাতে বিছানায় শুয়ে আমি কান পেতে শুনতাম ঝরণার গান। চাঁদের আলোতে ঝিকমিক করত রুপোলি জল। ভাবলে কি মজা লাগে তোমায় বলে বোঝাতে পারবো না।

তেজবাহাদুর—আমি তোমায় বাড়ি পৌঁছে দেব।

নানজিং—তুমি পৌঁছে দেবে ঠিক, কিন্তু আমার বাড়ি যাবার উপায় নেই।

তেজবাহাদুর—কেন বন্ধু?

নানজিং—অনেকদিন আগের কথা—কেন্‌টাক পাহাড়ে আমার বাড়ি।

তেজবাহাদুর—কেন্‌টাক পাহাড়?

নানজিং—কেন্‌টাক পাহাড়ের মানুষগুলো সরল। কিন্তু বড় বদ-খেয়ালী। মানুষগুলোর সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে মিশলেও তুমি তাদের বুঝতে বা জানতে পারবে না। হঠাৎ এমন কাজ করে বসে ওরা, যার কোন মাথা-মুণ্ডু নেই। খেয়াল হল, অমনি দু'জন মানুষ পাহাড়ের মাথায় চড়ে লড়াই শুরু করল। লড়াইয়ে একজন মেরে ফেললো আর একজনকে। আর সে অমনি ভয়ে পাহাড় ছেড়ে পালালো। কারণ, তারপর সেই মৃতের আত্মীয়-স্বজন বেরিয়ে পড়লো তার সন্ধানে। তারা দৃঢ়প্রতিজ্ঞ, ঐ ব্যক্তির মুণ্ডু না নিয়ে তারা ঘরে ফিরবে না। কি সর্বনাশা রীতি বলতো!

তেজবাহাদুর—নিশ্চয়! ভয়ঙ্কর! কিন্তু তুমি ঘরে ফিরবে না কেন? তোমার জীবনেও তেমনি কোন ঘটনা—

নানজিং—হ্যাঁ বন্ধু! কেমন করে ঘটেছিল ঠিক মনে নেই। বীরবাহাদুরের সঙ্গে লড়াই হয়েছিল আমার। ঠিক মনে নেই, বীরবাহাদুরের সঙ্গে আলোচনা করতে করতে উত্তেজিত হয়েছিলাম আমি। বীরবাহাদুর আমার চেয়ে বয়সে ছিল অনেক বড়। ঠাট্টা করে বলেছিল, 'ছেলেমানুষের অত উত্তেজনা ভাল নয়, আগে শরীরে তাগদ আনো, লড়াই করার মত তাগদ সঞ্চয় করে তবে মানুষকে আঁখ দেখাবে। বুঝলে?' আমার মাথায় খুন চেপেছিল। আমি বলেছিলাম, 'তোমার ধারণা লড়াই করার শক্তি আমার নেই। বেশ তো, চল, তাহলে শক্তির পরীক্ষা হয়ে যাক!' বীরবাহাদুর প্রথমে হেসেছিল, তারপর আমি যখন ক্ষেপে বলেছিলাম, 'লড়াই তোমাকে করতেই হবে, নইলে এই মুহূর্তে আমি তোমার রক্তে মাটি রাঙাবো।' বীরবাহাদুর এগিয়ে চললো, পেছনে আমি। সবাই অবাক হয়ে দেখলো। দীর্ঘ সময় ধরে লড়াই চললো। তারপর অকস্মাৎ আমার ছোরা বিদ্ধ হলো বীরবাহাদুরের বুকে। ফিন্‌কি দিয়ে রক্ত ছুটলো। বীরবাহাদুরের ছেলে তেজবাহাদুর পিতৃহত্যার প্রতিশোধ নিতে ছুটে এলো হুঙ্কার দিয়ে। আমি ভয়ে পালালাম। ঘুরতে ঘুরতে এসে ঢুকলাম 'A Army'তে। জানি, তেজবাহাদুর হয়তো আজও খুঁজে বেড়াচ্ছে আমাকে।
আঃ, গলাটা আবার শুকিয়ে কাঠ হয়ে গেছে!

[অন্ধকারে তেজবাহাদুরের চোখ দুটো জ্বলে উঠলো]

একটু জল দাও না বন্ধু!

তেজবাহাদুর—জল? না, জল নয়। তোমার দেহের রক্ত দেবো তোমায় পান করতে। নিজের রক্ত পান করে তেষ্টা মেটাবে।

নানজিং—কি বলছো? কে? কে তুমি?

তেজবাহাদুর—তোমার সন্ধানে যে এতদিন দেশ-দেশান্তরে ঘুরেছে!

নানজিং—তেজবাহাদুর!

তেজবাহাদুর—আঁতকে উঠলে যে কুত্তা? তোমার মুণ্ডু ছিঁড়ে নিয়ে যাবো কেন্‌টাকে। মুণ্ডুটা ঝুলিয়ে দেবো শাল গাছের মাথায়। সবাই জানবে বীরবাহাদুরের ছেলে তেজবাহাদুর প্রতিশোধ নিয়েছে। অনেক ঘুরেছি তোমার খোঁজে। এবার মৃত্যুর জন্যে তৈরী হও।

নানজিং—মৃত্যুর জন্যেই তো আমি অপেক্ষা করছি তেজবাহাদুর। কিন্তু আমাকে মেরে কি তোমার মন শান্ত হবে?

তেজবাহাদুর—তোমাকে না মারলে আমি শান্তি পাবো না।

নানজিং—যখনই তোমার মনে হবে, তুমি একটি অক্ষম লোককে মেরেছো, তখন নিজের ওপর তোমার ঘেন্না ধরে যাবে তেজবাহাদুর। লড়াইয়ের নেশায় আমরা শান্তির পথ থেকে অনেক দূরে সরে যাচ্ছি। তেজবাহাদুর, বৃহত্তর লড়াই থেমেছে। হয়তো কাল সকালেই 'A Army' সিজ ফায়ার declare করবে। তখন যুদ্ধের

ফলাফল দেখে আঁতকে উঠবে দুই দেশ। ভাববে, এ ধ্বংসের কি প্রয়োজন ছিল? আর আমাকে মেরে তুমি কেন্টাকের মানুষের লড়াইয়ের নেশা আরও বাড়িয়ে দেবে। অথচ আজ যদি আমরা দু'জন এক সাথে কেন্টাকে যাই! সবাই জানবে, তেজবাহাদুর—নানজিংকে বাঁচিয়েছে। পিতৃহত্যার অপরাধ ক্ষমা করেছে। তোমার আদর্শে অনুপ্রাণিত হবে কেন্টাকের মানুষ। কেন্টাকের ইতিহাসে লড়াই পর্ব হবে শেষ।

[তেজবাহাদুর ধীরে ধীরে এগিয়ে আসে। নানজিং-এর দেহটাকে তুলে নেয় পিঠে, আর শান্তির সন্ধানে ফিরে চলে কেন্টাকে।]

□

হরিপদ কেরানী

রবীন্দ্র ভট্টাচার্য

(১৯৩৪)

চরিত্র

হরিপদ

অন্য সব চরিত্র নেপথ্যে

[একটি নিতান্ত সাধারণ ঘর। একটি টেপ রেকর্ডার চলছে। গালে হাত দিয়ে যুবক হরিপদ একটি সানাই-এর সুর বাজিয়ে চলছিল। হরিপদ উঠে ফুলদানিতে ফুল ঠিক করতে থাকে। ঘরটি সাজানোর দিকে নজর দিচ্ছে বোঝা যায়। টেপের সানাই বন্ধ করে। টেপের ব্যবহার মঞ্চে অথবা নেপথ্যে হতে পারে।]

হরিপদ—আসলে ঘরটা আমি যতই সাজাবার চেষ্টা করি না কেন ঠিকমতো গোছাতে পারবে মালতী।

[গুণগুণ করে সানাই-এর সুর ভাঁজে]

মা'র কথা প্রায়ই মনে পড়ে। মা বেঁচে থাকলে আমার জীবনটা তো এমন ছন্নছাড়া হয়ে যেত না। অবশ্য আত্মীয়েরা বলেন, এই রকম জীবন আমি ইচ্ছে করেই...। থাক। এসব কথা আজ না ভাবাই ভালো। আজ এমন শুভদিনে...

[আবার টেপে সানাই বাজাতে থাকে। সঙ্গে সঙ্গে নিজে পাঞ্জাবী পরে।]

হাসি পাচ্ছে।

[নিজের আনন্দ প্রকাশ করতে থাকে। কাপড়ের কোঁচা পাট করতে থাকে। চুল ব্রাশ করা ইত্যাদির মধ্যে আনন্দ প্রকাশিত হতে থাকে। টেপ বন্ধ করে।]

টেপটা অঞ্জনের কাছ থেকে নিয়েছি। এ ক্যাসেটটা ও আমাকে ব্যবহার করতে দিয়েছে। এ কথাটা ভাবলে বেশ আনন্দ লাগে যে বন্ধুভাগ্য আমার বেশ ভালো। মালতী এ কথাটা অনেকবার বলেছে। প্রথমে বলেছিলো...

[নেপথ্য থেকে কোলকাতার রাস্তায় বাস চলার শব্দ...ট্রামের শব্দ শুনতে পাওয়া যাবে।]

সেদিন শরীরটা বেশ খারাপ। সওদাগরী অফিসের কেরানী। অফিসে না গেলে মাইনে কাটা যাবে। নইলে ট্রামে তো উঠি না। সত্যি কথা বলতে কি—পঁয়ত্রিশ মিনিট হেঁটে খরচা বাঁচাই। সেদিন ট্রামে উঠলাম। বিপত্তি ঘটলো নামবার সময়। কি করে যে ঘটলো।

[নেপথ্যে ট্রামের শব্দ আর 'গেল গেল' আওয়াজ, বেশ গোলমাল]

প্রচণ্ড জোরে ধাক্কা লাগলো মেয়েটির সঙ্গে। একটি সাধারণ মেয়ে। সত্যি খুবই সাধারণ মেয়ে—মালতী। মালতী নাকি রাস্তা পার হবার জন্যে অপেক্ষা করছিলো। ও না থাকলে আমি তো বাঘ মার্কা বাসের তলাতেই পড়তাম। অন্য মেয়ে হলে কি বলতো তাতো বোঝাই যাচ্ছে। মালতী কিন্তু...।

[নেপথ্যে মালতীর গলা]

মালতী—(নেপথ্যে) একি! আপনার কাঁধের কাছটা কি হ'ল দেখুন! আপনার জামায়

রক্ত! শুনছেন, আপনার এখুনি হাসপাতালে...।

হরিপদ—মালতীর হাতটা খুব জোরে আঁকড়ে ধরেছিলাম। জামায় রক্ত দেখে, আরও নারভাস হয়ে সেই মুহূর্তে অজ্ঞান হয়ে মালতীর গায়ে পড়ে যাই। আর লোকজনের চেষ্টায় তখনই হাসপাতালে..। জ্ঞান ফিরতে বুঝলাম আমার জামা ছিঁড়ে খুলে নেওয়া হয়েছে। কাঁধের কাছে ব্যাণ্ডেজ। শুনলাম কয়েকটা সেলাই দিতে হয়েছে। আর দেখলাম মালতীকে। কেমন করুণ সুন্দর মেয়ে মালতী। সাধারণ মেয়ে। আমাদের ঘরের সাধারণ মেয়ের মতো। এ জগতে যারা অসাধারণ, তারা যে সাধারণের থেকে আলাদা এটা মালতী অভিজ্ঞতা দিয়ে বুঝেছিলো। এখানে আগে বলে রাখি, আমি কিনু গোয়ালার গলির হরিপদ কেরানীর মধ্যে নিজের মিল খুঁজে পাই। হরিপদ কেরানীর আমি হরিপদ। মালতী সাধারণ মেয়ের মধ্যে নিজেকে পেয়েছে—সাধারণ মেয়ে। মালতীর মধ্যে আমার দেখা মালতীর অমিল খুঁজে পাওয়া ভার। মালতী তার ভালোলাগা কবিতাটা আওড়ায়। আমারও ভালো লাগে ওর অভিযোগগুলো—

[কথা বলতে বলতে টেপ চালায়। মালতীর কণ্ঠ শোনা যায়। কবিগুরুর 'সাধারণ মেয়ে' আবৃত্তি শোনা যেতে থাকে। হরিপদ বুকের ওপর হাত রেখে ঘুরে ঘুরে বেড়ায়।]

মালতী—(নেপথ্যে) তোমার শেষ গল্পের বইটি পড়েছি, শরৎবাবু,
'বাসি ফুলের মালা'।
তোমার নায়িকা এলোকেশীর মরণদশা ধরেছিল
পঁয়ত্রিশ বছর বয়সে।
পঁচিশ বছর বয়সের সঙ্গে ছিল তার রেষারেষি—
দেখলেম তুমি মহদাশয় বটে,
জিতিয়ে দিলে তাকে ॥
নিজের কথা বলি।
বয়স আমার অল্প।
একজনের মন ছুঁয়েছিল
আমার এই কাঁচা বয়সের মায়া।
তাই জেনে পুলক লাগত আমার দেহে—
ভুলে গিয়েছিলেম অত্যন্ত সাধারণ মেয়ে আমি,
আমার মতো এমন আছে হাজার হাজার মেয়ে,
অল্প বয়সের মন্ত্র তাদের যৌবনে ॥
তোমাকে দোহাই দিই,
একটি সাধারণ মেয়ের গল্প লেখো তুমি।
বড় দুঃখ তার।

তারও স্বভাবের গভীরে
অসাধারণ যদি কিছু তলিয়ে থাকে কোথাও
কেমন করে প্রমাণ করবে সে—
এমন কজন মেলে যারা তা ধরতে পারে!
কাঁচা বয়সের জাদু লাগে ওদের চোখে,
মন যায় না সত্যের খোঁজে—
আমরা বিকিয়ে যাই মরীচিকার দামে ॥

[নেপথ্য কণ্ঠ বন্ধ হয়]

হরিপদ—ওর—মানে মালতীর ভালোলাগে এই কবিতাটা। আমি যখনই ওকে জিজ্ঞেস করেছি কেন তোমার ভালো লাগে! তার উত্তরে ও একটা কথাই বলে এসেছে, কবিতার সঙ্গে আমি মিশে যেতে পারি বলে! আমার কাছে এসব কথা খুব হেঁয়ালী মনে হয়। অবশ্য ওকে ঠিক মতো বুঝতে পারিনি এমনও হতে পারে। একথা সকলকে বলাটা বোধহয় ভালো দেখাবে না। মানে—আজ যার জন্যে অপেক্ষা করছি। মানে আজই আমাদের স্থির সিদ্ধান্ত নিয়ে আগামী দিনে পরিকল্পনা মতো এগোবার বাসনা করছি, ঠিক তখন আমার ভাবী ঘরণীকে এখনও বুঝতে পারিনি কথাটা খুবই বেমানান। আচ্ছা...! (চিন্তা করে) আমি তো মালতীর সঙ্গে কেমন করে আলাপ হল সেটা শেষ করিনি। আজ মালতী আসবে। আমরা আগামীকাল আমাদের বিবাহের কাজ সেরে নেবো। দু-পক্ষের কম করে চল্লিশজন নিমন্ত্রিত। মানে সবই ঠিক। মালতী আজ তার মা-বাবাকে বলে চলে আসবে। আজ ওর বন্ধু মঞ্জুলিকার বাড়ীতে থাকবে।

এই প্রথম আমার ভাড়া বাড়ীতে মালতী আসবে। আসলে প্রথম বলেই যে ভালো লাগছে তা নয়। মালতী এতদিন তো কিছুতেই রাজী হতে পারছিল না। তাই আজ ভালো লাগছে। ভীষণ ভালো লাগছে। আমি ওর বাড়ীতে গেছি। গেছি মানে গিয়ে থেকেছি। হাসপাতাল থেকে এখানে চলে আসার কথা। মালতীর বাবা-মা বাধা দিলেন। বললেন—আমাদের অনেক অভিজ্ঞতা, আমাদের কথা শোন। ওখানে তোমাকে দেখার কেউ নেই। এখন কদিন একটু সেবা-শুশ্রূষা প্রয়োজন। আমাদের ঘরে কদিন থাকবে চলো! এখানে মালতীর ভূমিকা কতোখানি ছিলো জানি না। কিন্তু ওদের আন্তরিকতায় যে কোন মানুষই মুগ্ধ হবে। আমার কেরানী মনে কেমন যেন লাগছিলো। মনে হচ্ছিলো এরা আমাকে দয়া করছেন। কিন্তু...

কিন্তু নিশ্চয়ই তা নয়। মালতীর মা হঠাৎ আমার কপালে হাত দিয়ে বললেন—তোমার এখনও জ্বর চলছে। কোন মা কি ছেলেকে এভাবে ছেড়ে দিতে পারে বাবা! আমার চোখের জল গাল বেয়ে গড়িয়ে পড়ছিলো। মালতীর মা সযত্নে তাঁর আঁচল দিয়ে মুছিয়ে দিলেন।

আমার মা'র কথা মনে এলো। আমি তখন ছোট। আমাদের গাঁয়ের বাড়ীতে আমি কালাজ্বরে ভুগছি। মা মাথার শিয়রে বসে চুলের ভেতরে তার আঙুল দিয়ে আমাকে ঘুম পাড়াবার চেষ্টা করছেন। মা বোধহয় কাঁদছিলেন। বোধহয় কেন! মা কাঁদছিলেন। তার গলার স্বরেই তার পরিচয় পাচ্ছিলাম।

[নেপথ্যে হরিপদর মা'র কণ্ঠস্বর]

মা—(নেপথ্য থেকে) তুই আবার এমন বিদঘুটে জ্বর বাধালি বাবা। দেখ দেখি সকাল থেকে জ্বরটা বেড়েই চলেছে। কবরেজ মশাই বললেন চারটে পুরিয়া খেলেই হরিপদর জ্বর নামতে থাকবে। কিন্তু...

হরিপদ—কিন্তু জ্বর নামার কোন লক্ষণই দেখতে পাওয়া যাচ্ছিলো না তখন। এবার একমাত্র উপায় হচ্ছে এ্যালোপ্যাথিক ট্রিটমেন্ট করা। কিন্তু...

মা—(নেপথ্যে) কিন্তু বাবা, সেন ডাক্তারকে দেখাতে তো অনেক পয়সা লাগবে। আমি কি করি বলতো! রায় বাবুদের উঠোনে ঢেঁকিতে পা দিলে নিদেন দুটো ট্যাকা হতো। তোকে ফেলে যাব কি করে বল্! তাছাড়া...

হরিপদ—তাছাড়া মা জানতো দুটো টাকায় আমার ওষুধ ভিজিট...সেন ডাক্তার দেখানো সম্ভব নয়। এছাড়া পথ্য তো আছেই। আসলে মা দিদির কথা ভাবছিলো বোধহয়। দিদিকে আমারও মনে আছে। বেশ আঁট-সাট চেহারা। কুড়ি বছর বয়সেই দিদিকে একটা গিন্নী-গিন্নী মনে হতো। তবে দিদি—গিন্নী বলে নিজেকে দাবীও করতে পারতো। দিদি গাঁয়ের স্কুলে মাস্টারী করতো। বাবা হঠাৎ মিছিলের মধ্যে মারা যাওয়ার পর পার্টির লোকেরা অনেক চেষ্টা করে আমার দিদিকে প্রাইমারী স্কুলে চাকরীটা দিয়েছিলো।

দিদির হয়তো কষ্ট হতো। হলেও আমরা যা হোক তা হোক করে, ডাল-ভাতটা খেতে পাচ্ছিলাম। মা বলতো কাজল তুই এত খাটিস, একটু খাওয়া-দাওয়া কর। নইলে শক্ত অসুখে পড়বি। দিদি আমার দিকে তাকিয়ে হাসতো। ওঃ, কি সুন্দর দিদির চোখ দুটো ছিলো!

আমি বোধহয় ঠিকমতো বলতে পারবো না। সঠিক বর্ণনা আমি করতে পারি না। সে ক্ষমতা আমার নেই। কাজল—হ্যাঁ, দিদির ঐ নামই ছিলো। মা বলে, ওর সুন্দর চোখদুটো দেখে তোর মাসীমা ঐ নাম রেখেছিলেন। দিদিকে সবাই নাকি হিংসে করতো। ঐ গাঁ-ঘরে অমন সুন্দর চেহারা। তার ওপর পদ্মাক্ষী, অনেকের হিংসের কারণ হয়েছিলো। মা বলেছিলেন ওতেই ওর অমন হলো।

একদিন স্কুল থেকে দিদি জ্বর নিয়ে ফিরলো। রাতে খুব কষ্ট হচ্ছিলো দিদির। আমার মনে আছে—মনে আছে আমার হাতটা নিয়ে দিদি খুব চাপ দিয়ে জোরে জোরে নিঃশ্বাস ফেলছিলো। মা কালোজিরের গন্ধ শোকাচ্ছিল দিদিকে। মাঝরাতে সরষের তেল গরম করে মালিশ করলো। ভোরের আলো সবে দেখা দিলো। মা

দৌড়ে চলে গেলো সেন ডাক্তারের বাড়ী। সেদিন কি দৌড়োদৌড়ি। পাড়ার অনেকে এসেছিলো। সদর থেকে বরফ আনা হলো। প্রতিবেশীরা যে কতো ভালো সেদিন বুঝেছিলাম। মা-র পাতানো দিদির বাড়ীতে সেদিন রাতে আমার খাওয়ার বন্দোবস্ত হলো। যাবার আগে দিদিকে বলতে গেলাম। শুনতে পেলো না দিদি। দিদি ভুল বকছিলো। ওর ইস্কুলের ছাত্র-ছাত্রীদের নাম ধরে মাঝে মাঝে শাসন করছিলো।

মা'র রাঙা দিদির বাড়ীতে খাওয়ার পরও আমাকে ওরা ওখানেই শোয়ার ব্যবস্থা করে দিয়েছিলো। মা'র রাঙা দিদির ছেলে মদন আমার বন্ধু। রাতে আমার সঙ্গে শুয়েছিলো। মদন বললে—কাজলদির খুব বাড়াবাড়ি। তাই আমাকে নাকি এখানে এনে রেখেছে রাঙামাসি। রাতে ঘুম হয়নি। সকালের দিকে বোধহয় ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। রাঙামাসি মুখ ধুইয়ে চিঁড়ে খেতে দিলো। তারপর নিয়ে এলো আমাদের বাড়ীতে। বাড়ীর সামনে খুব ভীড়। গা ছম্‌ছম্ করছিলো। ভেতরে গেলাম। মা কাঁদছিলো। আমাকে পেয়ে জড়িয়ে ধরে চীৎকার করে কেঁদে উঠলো। দিদির মুখটা দেখলাম, যেন হাসছে। ভাবতেই পারা যাচ্ছিল না, দিদি আর কথা বলবে না। সোনা বলে দিদি আর ডাকবে না, একথা আমার মনে হতেই আমি কেঁদে ফেললাম। মা'র বুকের তলায় মুখ রেখে ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগলাম। বাবার মৃত্যুর কথা আমার মনে নেই। আমার বয়স তখন মাত্র ছয়। তারপর কতো বছর কেটে গেছে। দিদি মারা যেতে পারে এমন ভাবনা কোনদিন করিনি।

গাঁয়ের অনেকে বলতেন, তোর কাজলা দিদি শুধু তোকে কাঁদালো না হরি, আমরাও কেঁদে কেঁদে মরি। আমি ভুলতে পারিনি—আজও না। দিদিকে ভোলা যায় না—কখনও না। একটা কবিতা পড়তাম ছোটবেলায়, ভাবতাম আমার দিদিকে মনে করে কবি এই কবিতা রচনা করেছেন।

কবিতাটা অনেক চেষ্টা করেও সবটা আবৃত্তি করতে পারিনি কোনদিন। চোখের জলে অক্ষরগুলো ঝাপ্‌সা হয়ে উঠতো। অনেক দিন পর আমার চোখের জলে ঝাপ্‌সা অক্ষরগুলো গায়কের কণ্ঠে ধ্বনিত হয়ে আমার মনকে টেনে নিতে পেরেছিলো। মনে হয় যেন—আমার কাজল দিদি দূরে আমার থেকে দূরে চলে যায়নি। গানটা চলতে থাকলে আমি স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে শুনি। এখনো গাঁয়ে আমাদের চালা ঘরের উত্তর দিকের কোণে চাঁদ ওঠে, ঝিরঝিরে বসন্তে কচি কচি বাঁশপাতার দোলদোলানির ছবি ভেসে ওঠে। জ্যোৎস্নার আলোকে ভোরের আগমন মনে করে কোকিলের কুহু কুহু রবের উল্লাস আমার মনকে নাড়া দেয়। সেই সঙ্গে ফিরে পাই আমার হারিয়ে যাওয়া কাজল দিদিকে।

[হরিপদর কণ্ঠ ভারী হয়ে আসে। নেপথ্য থেকে গান শোনা যেতে থাকে। হরিপদর চোখে জল।]

[নেপথ্যে গান]

বাঁশ বাগানের মাথার উপর
চাঁদ উঠেছে ঐ,
মাগো আমার শোলোক বলা
কাজলা দিদি কই।

[হরিপদ চোখের জল মোছে।]

হরিপদ—আজকের দিনে এরকম একটা...। আচ্ছা বলতে পারেন, কবি যতীন্দ্রনাথের কি কাজলা বলে কোন বোন ছিলো? হয়তো ছিলো—হয়তোই বা বলছি কেন! নিশ্চয়ই ছিলো। না হলে এমন কবিতা এমনভাবে অন্তর থেকে কেউ লিখতে পারতো না। কি আশ্চর্য! আজ এরকম মিলনের দিনে চোখের জল ফেলা কি উচিত!

[জল মোছে, ম্লান হাসে।]

তবে মুখে যতোই বলি আসলে মনে প্রাণে আজকের দিনে দিদির উপস্থিতিটা চাইছি। থাকলে আমাকে একা একা এসব চিন্তা করতে হতো না।

মালতীকে আমি দিদির কথা বলেছি। মালতী কাঁদছিলো। সেদিন কার্জন পার্কে খোলা আকাশের নীচে একটা নাটক হচ্ছিলো। নাটকটা খুব ট্রাজিক। এক পুত্রশোকাতুরা মা জবাব চাইছে জনগণের কাছে। তার এক পুত্র প্রবীর নাটক দেখতে এসে পুলিশের গুলীতে মারা গেছে।

সত্যি ভাবতে অবাক লাগে। নাটকে যা বলা হয়েছিলো তাতে নাকি পুলিশের উষ্মার কারণ ঘটেছিলো। ব্যাস, আর যায় কোথায়! গুড়ুম! গুড়ুম! ভাবুন তো বাড়ীতে বিধবা মা তো এসব জানেন না। রাতের ভাত নিয়ে ছেলে ফেরার আসায় বসেছিলেন। তারপর...।

আমি ক্রমশঃ আমার সুখের দিনটা থেকে দূরে সরে যাচ্ছি। রাজ্যের ভাবনা নিয়ে বসে থাকলে আমাকে তো গন্ধমাদন পর্বত মাথায় ধারণ করে চলতে হয়। আমি তা পারবো কি করে? একটা কথা বলতেই হবে। আমি মনে করি আমার দিদিকেও মেরে ফেলা হয়েছে। আমরা গরীব বলে দিদির চিকিৎসা হবে না কেন? এ সংসারে সামান্য সর্দিজ্বর হলে পাঁচটা ডাক্তার আসে এমন বাড়ীতো কম নয়। তা হলে আমার দিদির বেলায়...হ্যাঁ প্রবীরকে যেমন মেরে ফেলা হয়েছে, আমার দিদিকেও তেমনি মারা হয়েছে। আসলে আমিও বিশ্বকবির আর এক হরিপদ কেরানী। নামে কাজে সবেতেই এই মিল আছে।

পার্থক্য আছে শুধু এক জায়গায়। আমি তো...মালতী আসবে বলে পালিয়ে বাঁচিনি। কবির ঐ ভাবনাটাতে আমার হাসি পায়। ঘর করবো ঘরণী থাকবে না কি রকম! পুরুষ হয়েছি আর সিংহ না হয়ে বেড়াল হবো কেন? সত্যি হাসি পাচ্ছে,

কবির হরিপদ কেরানীর কথা ভেবে... [আবৃত্তি করে]

ধলেশ্বরী নদীতীরে পিসিদের গ্রাম—
তাঁর দেওরের মেয়ে,
অভাগার সাথে তার বিবাহের ছিল ঠিকঠাক।
লগ্ন শুভ, নিশ্চিত প্রমাণ পাওয়া গেল—
সেই লগ্নে এসেছি পালিয়ে।
মেয়েটা তো রক্ষে পেল,
আমি তথৈবচ।
ঘরেতে এল না সে তো, মনে তার নিত্য আসা যাওয়া—
পরনে ঢাকাই শাড়ি, কপালে সিঁদুর ॥

[বাইরে একটা শব্দ]

হরিপদ—কে? কে ওখানে? মালতী? মালতী এলো বোধহয়। এবার আমাদের দুজনের সঙ্গেই পরিচয় হবে আপনাদের। মালতী এস!

[বাইরে যায়। আবার ভেতরে আসে]

এই লোকগুলোর জন্যে স্ত্রী জাতির একটা চিরকালের সন্দেহ রয়ে গেছে পুরুষের ওপর। আশ্চর্য! এ লোকগুলোকে খুন করা উচিত।

[নেপথ্য থেকে মাতালের চিৎকার]

নেপথ্যে—কোন শালা মাতাল হ্যায়! যো বোলতা হ্যায় উসকা বাপ মাতাল হ্যায়। উসকী মাদার ভি মাতাল হ্যায়।

হরিপদ—দুঃখ হরণ চক্রবর্তী। আমার ওপর তলায় থাকেন। চাকরী করেন, মাইনের চেয়ে উপরি বেশী। আমার মতো মাইনে কাটা যায় না। আর গেলেই বা কি! উপরি তো আছে।

নেপথ্যে—শালা নিজের চরকায় তেল দে রে আঁটকুড়ো ব্যাটা।

হরিপদ—আমাকে ঐ নামেই ডাকেন ভদ্রলোক। মানে দুঃখ হরণ বাবু। আমিও অবশ্য ওনাকে সুখ হরণ বলেই ডাকি। আমাকে একলা থাকতে দেখেন—মানে সত্যি কথা বলতে কি, বয়স তো হয়েছে। এখনও বিয়ে থা কিছু...।

নেপথ্যে—কড়া নেড়েছি বেশ করেছি। তোর দরজায় কড়া থাকে কেন? নিজে মাতাল হয়ে কাক-কাঁকুড় জ্ঞান থাকে না আবার অপরকে বলিস মাতাল! শালা মাতাল কাঁহেকা!

হরিপদ—আমাকে উনি মাতাল বলেন। অবশ্য উনি যখন মাতাল হন তখনই বলেন। আচ্ছা মাতালকে মাতাল বলবো না, বলুন তো!
উনি উঠবেন তিন-তলায়। কিন্তু মাতাল হয়ে বাড়ী ফিরে প্রতিদিন আমার দরজায়

কড়া নাড়বেন। রাত দুটোয় ফিরলেও আমার দরজায় ধাক্কা দিতে তার ভুল হয় না। একদিন কড়া করে বলেছিলাম, তাতেই কাল হয়েছে। পাগলকে সাঁকো নাড়াতে নিষেধ করার মতো অবস্থা আর কি!

নেপথ্যে—শালা মেয়েমানুষ ঠ্যাঙ্গাই বলে আমাকে ঠাট্টা করিস শালা। তোর বাপের মেয়েমানুষ! শালা তোর বউ না আমার বউরে! তোর বউকে ঠেঙ্গাইরে হারামজাদা! আঁটকুড়ো হয়ে আমার বউকে রক্ষে করতে ছুটে আসতে লজ্জা করে না শালা!

হরিপদ—ভদ্রলোকের কাজই হচ্ছে রাতে এসে বউকে ধরে হেনস্তা করা। ভদ্রমহিলা যেদিন মাংস রেঁধে ওকে খুশী করতে চাইবেন, সেদিন বলবেন—নিরামিষ রাঁধতে পারিসনি শালী! আবার পরদিন যদি নিরামিষ রাঁধা হয় তো ভদ্রলোক চিৎকার করবেন—শালী কাঁড়ি কাঁড়ি টাকা আনছি কি তোর বাপের বাড়ী পাঠাবার জন্যে! অথচ—কিসের দুঃখ বলুন! একটি মাত্র ছেলে হোষ্টেলে থেকে পড়াশুনা করছে। মা ছেলেকে এখানে আনেন না। বাপের কীর্তিকলাপ থেকে ছেলেকে দূরে রাখেন। মনে হয় উপরি পয়সায় কেউ সুখী নয়। কি জানি আমার বিচার ঠিক কি না!

[দরজার কাছে যায়,দেখে]

ভদ্রলোক চলে গেছেন—অথবা স্ত্রী ধরে নিয়ে গেছেন ওপরে। তবে যাই হোক, মালতীকে নিয়ে আমার ঐ প্রতিবেশীকে ওপরে রেখে, আমার থাকা চলবে না। এত কম টাকাতে ভাড়া কোথায় পাবো? এমনিতেই ভাড়া বাড়বে বলে মৌখিক নোটিশ হয়ে গেছে। একটু সুস্থির হতে গেলেই নানা সমস্যা এসে পিঠে ধাক্কাতে শুরু করে। এই জন্যে এতকাল ঘর বাঁধার কথা—।

এ বিষয়ে মালতী বেশ ভালো বলে। ওকে বলেছিলাম তুমি এতকাল বিয়ে করনি কেন? ঘর বাঁধার স্বপ্ন নেই বুঝি! মা হতে চাওনা তুমি! লজ্জা পেয়েছিলো মালতী!

বলেছিলো—পঁয়ত্রিশ বছরে মরণদশা পেয়েছে। এসব উত্তর দিতে লজ্জা করে না একটুও। অথচ বিশে কি পঁচিশে কেউ একথা বললে মুখ-চোখ রাঙা হয়ে যেতো। মাথা তুলতে পারতাম না। ছুটে পালিয়ে আসতে হ'ত। মালতীর কথা শুনে আমার মনটা বেদনায় ভরে গিয়েছিলো।

মালতী আমার মতই হতভাগী। ওর এক দাদা বিজ্‌নেস্ করতো বন্ধুর সংগে শেয়ারে। কাজের সুবাদে ওরা দুজনেই হাজারীবাগ গিয়েছিলো। দাদা ফিরলো না। পাহাড় থেকে পড়ে গিয়ে তিনি মারা গেছেন। মারা যে গেছেন তার প্রমাণ আছে। কিন্তু কেমন করে পড়ে গেলেন তা নাকি বন্ধুটি মোটেই জানতে পারেন নি।

তারপর?

নটে গাছটি মুড়োলো বলতে পারলেই বোধহয় ভালো হতো। কিন্তু তা কেমন করে হবে? মালতীর বাড়ীতে তার বৃদ্ধ বাবা-মা আর ছোট দুই ভাইবোন। মালতীর

বাবা রিটায়ার করে জমানো টাকা যা পেয়েছিলেন ছেলের বিজ্‌নেস্‌-এ পাই পয়সা পর্যন্ত ঢেলেছেন। ছেলে তার মর্যাদা দিয়ে যাচ্ছিল ঠিকই। সবাই খেয়ে পরে বেঁচে-বর্তে ছিলো। কিন্তু...।

উত্তর মেলে না।

উত্তর আমিও দিতে পারবো না। বিজ্‌নেস্‌-এর পার্টনার নিজের নামে সব কিছু করে নিয়েছে। মালতীর বৃদ্ধ বাপ অনেক হাঁটা-হাঁটি করে অনেক চোখের জলের বন্যা এনে মালতীর জন্যে তার পুরোনো অফিসে একটা চাকরীর বন্দোবস্ত করতে পেরেছিলেন। মালতীর পঁচিশ বছরে, দেখা তার দাদার সাধারণ বন্ধুটি এখন অসাধারণ হয়ে গেছেন। কখনও-সখনও তার নিজের কারে পেছনের সিটে হেলান দিয়ে ডালহৌসি পাড়ায় দেখা যায়। আর মালতী মাঝে মাঝে আবৃত্তি করে চলে—

[নেপথ্যে মালতীর আবৃত্তি...]

মালতী—(নেপথ্যে) তোমাকে দোহাই দিই,
একটি সাধারণ মেয়ের গল্প লেখো তুমি।
বড় দুঃখ তার।

আবার আমরা দুজনে যখন টাটা সেণ্টারের সামনের মাঠে গাছ তলায় দাঁড়িয়ে ভিক্টোরিয়ার দিকে তাকিয়ে থাকি তখন একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ছেড়ে মালতী তার প্রিয় কবিকে স্মরণ করে অন্তর থেকে বেরিয়ে আসা শব্দগুলো আস্তে আস্তে উচ্চারণ করতো।

[নেপথ্যে মালতীর কণ্ঠ শোনাগেল]

মালতী—(নেপথ্যে) পায়ে পড়ি তোমার, একটা গল্প লেখো তুমি শরৎবাবু,
নিতান্ত সাধারণ মেয়ের গল্প—
যে দুর্ভাগিনীকে দূরের থেকে পাল্লা দিতে হয়
অন্ততঃ পাঁচ-সাতজন অসামান্যার সঙ্গে—
অর্থাৎ সপ্ত রথিনীর মার।
বুঝে নিয়েছি আমার কপাল ভেঙ্গেছে,
হার হয়েছে আমার।
কিন্তু, তুমি যার কথা লিখবে
তাকে জিতিয়ে দিও আমার হয়ে—
পড়তে পড়তে বুক যেন ওঠে ফুলে।
ফুলচন্দন পড়ুক তোমার কলমের মুখে।
তাকে নাম দিও মালতী।
ওই নামটা আমার।

ধরা পড়বার ভয় নেই।
এমন অনেক মালতী আছে বাংলাদেশে,
তারা সবাই সামান্য মেয়ে,
তারা ফরাসী জর্মান জানে না,
কাঁদতে জানে ॥
কী করে জিতিয়ে দেবে?
উচ্চ তোমার মন, তোমার লেখনী মহীয়সী।
তুমি হয়তো ওকে নিয়ে যাবে ত্যাগের পথে
দুঃখের চরমে, শকুন্তলার মতো।
দয়া কোরো আমাকে।
নেমে এসো আমার সমতলে।

হরিপদ—হঠাৎ মালতী ভয়ঙ্কর ক্রুদ্ধ হয়ে চিৎকার করে উঠলো। বললে—তোমার সাধারণ মেয়ে এই পর্যন্ত থাকতে পারে। দোহাই জিতিয়ে দেবার জন্যে তাকে বিলেতে পাঠাতে হবে না। কোন অসৎ ব্যবসায়ীর প্রচুর টাকা আছে বলে তার সঙ্গে ঘর করবার স্বপ্ন দেখিও না মালতীকে। মালতী জিততে জানে—সে পরাজয় মানবে না। সে মানুষ চিনতে পেরেছে, এটুকু অন্ততঃ বুঝতে দিও তোমার পাঠককে। দোহাই শরৎবাবু, ওকে লোভী করো না—ওকে অমানুষ তৈরী করতে যেও না। আরও চিৎকার করে বললো মালতী—ভুলে গিয়েছিলেম—অত্যন্ত সাধারণ মেয়ে আমি, আমার মতো এমন আছে হাজার হাজার মেয়ে।
মালতী এখনও হতাশা কাটিয়ে উঠতে পারেনি। মালতীর বাবা-মা, মালতী তার পছন্দ মতো এক বন্ধু পেলে সে সুখী হবার জন্যে তার সঙ্গে ঘর করুক, এটা মনে প্রাণে চায়। তারা সাগ্রহে এতে অনুমতি দিয়েছেন। আমি দেখা করে যখন সব কথা খুলে বলি, তারা অন্তর থেকে আমাকে আশীর্বাদ করেছেন। মালতীর মা চোখের জল মুছতে মুছতে কান্নাভরা গলায় আমাকে বললেন—ওকে সুখী করো বাবা। সারা জীবন নিজেকে দিয়ে ও আমাদের দেখেছে। আমার চিরদুঃখী মেয়ে একটু সুখী হ'ক, একটু শান্তি পাক, মরবার আগে এ-টুকুই শুধু দেখতে চাই বাবা। ওকে সুখী করো। বড় ভালো মেয়ে আমার মালতী!
আমি চোখের জল ধরে রাখতে পারিনি। অনেক চেষ্টা করেও গলার স্বরকে বাঁধতে পারিনি। শুধু বলেছিলাম—আমিও গরীবের ছেলে মাসীমা। অর্থসুখ আমার নেই, দিতে পারবো না। মনের সুখ দিতে সর্বস্ব দেব। মালতীর বাবা বাইরের জানলার দিকে তাকিয়ে থেকেই বললেন—আমার মালতী সাধারণ মেয়ে হরিপদ! অসাধারণ কিছু আশা করে না। যা ওর পাওনা নয়, তা মালতী চায় না। ওকে সুখী করতে পারবে খুব সহজভাবে। তবে সব ঠিকের পরেও একটা বেঠিক

হয়েছিলো। মালতী অনেক পরে সেকথা জানালো। আমি স্তম্ভিত হয়ে হতবাক ছিলাম মালতীর কথা শুনে!

[মালতীর কণ্ঠ ভেসে আসে—]

মালতী—(নেপথ্যে) আমি যে কোনদিন আবার মনে আশা করবো, এতটুকু বাসার, তা বাবা-মা ভাবতেই পারেনি। আমার সেই সাধারণ ছেলেটি অসাধারণ হয়ে ওঠার পর আমি অনেক বিজ্ঞ হয়ে গেছি, আমি যে চক্ষুষ্মান হয়ে উঠেছি তা ওরা বুঝে নিয়ে আমাকে ও প্রসঙ্গ বলা বন্ধ করেছিলেন। আমিও নিশ্চিন্ত হয়ে ওঁদের সেবা করে চলেছিলাম। কিন্তু কোথা থেকে কি হয়ে গেলো। একজন...।

হরিপদ—এরপর মালতী খিল খিল করে হেসে উঠেছিলো। সামান্য সময়। কয়েক মুহূর্ত মাত্র। তারপর—

[মালতী নেপথ্যে বলতে থাকে—]

মালতী—(নেপথ্যে) আমার বাবা-মা বলছেন তাদের একটা অভিজ্ঞতা আছে। তিনি ঐতিহ্যকে ত্যাগ করতে পারেন না। আমার বিয়ের পর আমার উপার্জন তাঁরা গ্রহণ করতে পারেন না।

দ্যাখো, তারা আমার সুখের জন্যে হাসিমুখে গ্রহণ করছেন আমাদের। আমার বিয়ের পর তাদের কি অবস্থা হবে ভাবতো? আমার কাছে কি নিজের সুখটাই বড়? সত্যি করে বলতো, আমি কি এতে সুখী হতে পারবো! তারা চরম দারিদ্রের মধ্যে উপবাস করবে। আমার ভাই-বোনেরা হয়তো...।

হরিপদ—মালতী আর বলতে পারেনি। তার গলার আওয়াজ বন্ধ হয়ে গেল। ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠেছিলো মালতী। আমাকে ওরা আবিষ্কার করেছিলো সাধারণ ছেলে হিসেবে। আমি অসাধারণ কিছু করতে পারি না—বলতে পারি না।

মালতীকে সান্ত্বনা দিলাম। ও চুপ করলো। আমি স্বভাব গম্ভীরভাবে মালতীকে বললাম—বাবা-মা যাই বলুন, এভাবে তাদের ছেড়ে আসা ঠিক হবে না মালতী, তোমার বাবা কি ভীষণ রকমের গোঁড়া তা আমি জেনেছি। তবু অন্য কোন্ ভাবে রাজী করাতে পারলে ভালো হয়।

মালতীর বড়মামা এ বিষয়ে সাহায্যের জন্যে এগিয়ে আসেন। মালতীর বাবা প্রায় রাজী হয়েছেন শুনলাম। আজ বড়মামা ওদের বাড়ীতে সকালে আসবেন। ওখানে থেকে খাওয়া-দাওয়া করে এ ব্যাপারে ফাইনাল করে দেবেন। বড়মামা বলেছেন, তোমরা ফাইনাল ধরে নাও। মামাবাবু আমার কথায় শেষ পর্যন্ত সম্মত হয়েছেন। সব জেনে তবে আমরা আজ ফাইনাল ডেটটা ঠিক করবো বলে স্থির করেছি। কিন্তু মালতীর তো আসবার সময় হয়ে গেছে। ও আসছে না কেন?

আশ্চর্য! নিজের প্রয়োজন বলে আজ শহরের গাড়ী-ঘোড়ার অবস্থার কথাও ভুলে গেছি মনে হচ্ছে। সময় ঠিক রাখা কি সম্ভব? বিশেষতঃ এই বিকালে অফিস ছুটির

সময়। তার ওপর একজন মহিলার পক্ষে!

[একটা চিঠি উড়ে এসে পড়ে জানালা দিয়ে। হরিপদ চেয়ে দেখে সেটা কুড়িয়ে নেয়।]

একি! এতো মালতীর হাতের লেখা। কে দিলো? চিঠি কে দিয়ে গেলো?

[জানালার দিকে দৌড়ে যায়। চীৎকার করে ওঠে—]

কে দিলো? এ চিঠি কে দিয়ে গেলো? শুনছো কেউ কি আছো ওখানে! আমার ঘরে চিঠি ফেলে গেলো কে?

[দরজা দিয়ে ছুটে বাইরে যায়। আবার প্রবেশ করে।]

চিঠিটা গোপনে দিয়ে গেলো কেনো? মালতীর আসার সময় হয়ে গেলো অথচ—

[খাম খুলে চিঠি বার করে—]

মালতী লিখেছে। প্রিয় বন্ধু—

[নেপথ্যে মালতীর কণ্ঠ। পত্র মালতী পড়ছে—]

মালতী—(নেপথ্যে) বাবা রাজী হয়েছিলেন, বড়মামা আমাদের বিয়ের দিন সম্বন্ধে ফাইনাল করবেন বলে সকালে এসেছিলেন। বাবার রাজী হওয়ার পেছনে যে এত বড় মূল্য দিতে হবে তা কখনো ভাবতেও পারিনি। এতবড় আঘাত কেমন করে সহ্য করতে পারবে বুঝতে পারছি না। বাবা—বাবা, কাল রাতে গলায় দড়ি দিয়েছে।

[হরিপদ স্থির স্থবিরের মতো দাঁড়িয়ে থাকে। হরিপদর চোখে জল। নেপথ্যে সানাই-এর করুণ সুর। সেই সঙ্গে আবৃত্তি চলতে থাকে।]

নেপথ্যে—লগ্ন শুভ, নিশ্চিত প্রমাণ পাওয়া গেল—

সেই লগ্নে এসেছি পালিয়ে।
মেয়েটা তো রক্ষে পেল,
আমি তথৈবচ।
ঘরেতে এল না সে তো, মনে তার নিত্য আসা-যাওয়া—
পরণে ঢাকাই শাড়ী, কপালে সিঁদুর ॥

□

খেলা

শিশিরকুমার দাশ

(১৯৩৬)

চরিত্র

শশধর

কৌশল্যা

কমল

দীপঙ্কর

সুবোধ

অশোক

শ্যামলী

এক

[নতুন দিল্লির একটি আধুনিক বসতি। সুন্দর সুসজ্জিত ড্রইং রুম। সকাল বেলা। বিরাশি বছরের বৃদ্ধ শশধর খবরের কাগজ পড়ছেন। একটু দূরে বসে তাঁর স্ত্রী কৌশল্যা আপন মনে বিড়বিড় করছেন। তিনি চোখে ভাল দেখেন না। মাথারও গোলমাল আছে। তাঁর বয়সও পঁচাত্তর-ছিয়াত্তরের কম নয়। শরীর দুজনেরই ভাল। শশধর আস্তে আস্তে খবরের কাগজটা ভাঁজ করে টেবিলের ওপর রাখেন। শশধরকে একটু উত্তেজিত মনে হয়। উঠে দাঁড়ান। তারপর কৌশল্যার দিকে তাকান। কৌশল্যা নিজের মনে কথা বলছেন। শশধর রঙ্গমঞ্চের বাঁদিকে জানালার ধারে গিয়ে উঁকি মারেন।]

শশধর—তুমি আবার এখানে এলে কেন? সারারাত তো ঘুমোওনি।

কৌশল্যা—ঘুমোব কি গো। বল কী। ঘুমোনো যায়! তুমি ঘুমিয়েছ?

শশধর—না।

কৌশল্যা—ওরা কতক্ষণে আসবে?

শশধর—কারা? কারা কতক্ষণে—

কৌশল্যা—কারা? আশ্চর্য! অশোক, বৌমা—

শশধর—ও, ওরা।

কৌশল্যা—তবে আর কে? আর দিদু—কত গল্প হবে আজ কত ছড়া, কত গান, কত খেলা হবে—খেলা খেলা হবে—(সুর করে) আজ খেলা হবে। (গান গেয়ে ওঠে)

কী করি আজ ভেবে না পাই
পথ হারিয়ে কোন বনে যাই
কোন মাঠে যে ছুটে বেড়াই সকল ছেলে জুটি।

শশধর—(অস্বস্তির সঙ্গে) শোন, ওরা আসবে না।

কৌশল্যা—আসবে না।

শশধর—না।

কৌশল্যা—(হাসে) আসবে আসবে। আমি বলছি আসবে। মনে আছে অশোক যখন ছোট ছিল তখন সেই যে ছড়াটা বলত দুলে দুলে—

মিটমিট মিটমিট ছোট ছোট তারা
আমি ভাবি বসে বসে তোরা সব কারা
কত দূর কত উঁচু চোখ নাহি যায়
হিরের টুকরো সব আকাশের গায়

শশধর—আচ্ছা, আচ্ছা। তুমি ভেতরে যাও।

কৌশল্যা—বাঃ অশোক আসবে যে। আমি এখানেই থাকব।

শশধর—শোন, অশোক আসবে না।

কৌশল্যা—কেন?

শশধর—কেন আমি কী করে বলব।

কৌশল্যা—তুমি যে বললে। কালইতো বলেছিলে, আসবে। তাই আমি ঘুমোইনি। (ভেবে) তাহলে আমি কী করব এখন?

শশধর—এখন তুমি ওষুধ খাবে। (স্নেহার্দ্র স্বরে) চল—চল।

কৌশল্যা—(হঠাৎ চিৎকার করে ওঠে) কেন? কেন আসবে না? কেন, কেন?

শশধর—(বিরক্তির সঙ্গে) থাম। থাম। (চিৎকার করে ডাকে) সুবোধ—সুবোধ।

কৌশল্যা—(আদরের সুরে) না, আমি বরং রোদে বসি গিয়ে।

[কৌশল্যা চলে যায়। শশধর অসহায় ভাবে দাঁড়িয়ে থাকে। মনে হয় সে যেন মনে মনে কোন একটা ব্যাপার নিয়ে অত্যন্ত চিন্তিত। কয়েক সেকেণ্ডের নিস্তব্ধতা। শশধর টেলিফোনের কাছে গিয়ে দাঁড়ায়। কিছু একটা ভাবে। কী করবে বুঝতে পারে না। ঘরে ঢোকে কমল। বছর পঞ্চাশ বয়স। দু-একটা চুল পাকা। চলা-ফেরা কথাবার্তা অত্যন্ত স্মার্ট এবং অমায়িক। হাতে ব্রিফ কেস্।]

শশধর—দ্যাখো, কমল, আমি এখনও মন স্থির করে উঠতে পারিনি।

কমল—কাকাবাবু, আমি আপনার দ্বিধার কারণ বুঝতে পারছি না তা নয়। তবে আমি তো আর এ ব্যাপারে জোর করে কিছু করতে চাই না। আপনার ইচ্ছে। আপনি রাজি হয়েছিলেন বলেই—(চুপ করে থাকে একটু) তা আপনার আপত্তি থাকলে—ঠিক আছে।

শশধর—তুমি যেন আবার ভুল বুঝোনা, কমল। ভুল বুঝোনা। আমি ঠিক বুঝতে পারছি না। কী করা উচিত।

কমল—না, ভুল বোঝার কিছু নেই। এমন হতেই পারে।

শশধর—তুমি কি ওদের বলে দিয়েছ?

কমল—হ্যাঁ, বলে দিয়েছি। ওরা আজই আসবে। মানে আসার কথা। তবে আপনার আপত্তি থাকলে তো আর আসতে পারে না। বা আসার কোন মানে হয় না। আপনার 'কোঅপারেশন' ছাড়া তো কিছুই হবে না।

[শশধর কোন কথা বলে না। অস্থির ভাবে পায়চারি করে। কমল সহানুভূতির সঙ্গে তাকায়।]

আজ কাকিমা কেমন আছেন?

শশধর—ভাল নেই, ভাল নেই। সকাল থেকেই 'এক্সপেক্ট' করছেন। বলছেন অশোক আসবে। বৌমা আর মুড়কি—আমাদের নাতনি—সবাই আসবে। She is very restless—very restless.

কমল—বুঝতে পারছি। এই বয়সে এতটা 'লোনলিনেশ'—

শশধর—হ্যাঁ, দীর্ঘ জীবনের অভিশাপ। বড় বেশিদিন বেঁচে আছি কমল। প্রয়োজনের অতিরিক্ত। তাই এই কষ্ট।

কমল—না—না। এটা ঠিক কথা নয়। আর এটা শুধু আপনার একার সমস্যা নয়। এ হলো গিয়ে এই সেঞ্চুরির প্রবলেম। মানে শতাব্দীর ব্যাধি। ছেলেমেয়েরা দূরে ছড়িয়ে যাচ্ছে, বুড়ো মানুষদের দেখা শোনার কেউ নেই, তাদের নিঃসঙ্গতা বাড়ছে, কথা বলার লোক নেই। সারা পৃথিবীতেই এই সমস্যা, কাকাবাবু।

শশধর—হুঁ। তোমার কাকিমার বয়স হল ছিয়াত্তর। একটা চোখ পুরো অন্ধ। তোমাদের ডক্টর পট্টনায়ক অনেক কায়দা-টায়দা করলেন। অপারেশন হল। কিন্তু শেষ পর্যন্ত বললেন, 'সরি'। আর একটা চোখেও ভাল দেখেন না। তারপর এই গত ছ-সাত মাস ধরে মাথাটা—(চুপ করে যায়) আমি তবু কোন রকমে এখনও বেঁচে আছি। কিন্তু—

কমল—আপনার অন্য কোন আত্মীয় স্বজন—(একটু ইতস্তত করে বলে) কেউ যদি কয়েকদিন—

শশধর—না। তারাও বৃদ্ধ, অশক্ত। তাদের ছেলেমেয়েরাও ছড়িয়ে আছে, তারাও ব্যস্ত। আর আমাদের দুর্ভাগ্য কমল, আমাদের বড় ছেলে দশ বছর আগে আমেরিকায় মোটর দুর্ঘটনায়—সেতো জানোই।

কমল—হ্যাঁ। সব জানি। কমলদার মৃত্যু—

শশধর—ছোট ছেলে অশোক ক্যালিফোর্নিয়ায়। পাঁচ বছর আগে একবার এসেছিল। এখন শুনি অসুস্থ নয়তো ব্যস্ত। কী করে আসবে। তাই বলছি এ আমাদের দুর্ভাগ্য। কিংবা তুমি যে বললে, শতাব্দীর ব্যাধি। এ ব্যাধি বড় কঠিন ব্যাধি।

কমল—(আলোচনার বিষয় পরিবর্তন করতে চায় এমন একটা মুখভঙ্গি করে) কাকাবাবু, দীপঙ্কর হয়তো এসে পড়বে। এ সব ক্ষেত্রে ওর কোন কর্মচারী এসে আগে ব্যাপারটা বুঝিয়ে দিয়ে যায়। কিন্তু আমার অনুরোধে ও নিজেই এসে আপনার সঙ্গে দেখা করবে। তা ওকে কি তাহলে জানিয়ে দেব যে আপনি শেষ পর্যন্ত রাজি হলেন না।

শশধর—হ্যাঁ, হ্যাঁ। কমল, তাই কর। আমি ওঁর সময় নষ্ট করতে চাই না।

কমল—বেশ। (টেলিফোন ডায়াল করে)।

শশধর—আর এজন্য যদি কিছু—কী বলে নিয়ে কোনো Compensation দিতে হয়, আমি অবশ্যই দেব।

কমল—(টেলিফোন তুলে) না, না। কোন Compensation দিতে হবে না। ও অবশ্য আমার অনুরোধে আপনার জন্য 'rate' খুবই কম—(টেলিফোন নামিয়ে আবার ডায়াল করে) দীপঙ্কর কিছুই মনে করবে না। তবে আপনাকে 'হেল্প' করতে পারলে ও খুবই খুশি হত। আর কাকিমারও—হ্যাঁ—মিস্টার দত্ত আছেন—দত্ত

অফ দি প্যাঙ্কার এ্যাণ্ড কোম্পানী—হ্যাঁ, হ্যাঁ—আমি একজন ক্লায়েণ্ট—বেরিয়ে গেছেন—আই সি। না—কোন 'মেসেজ' নেই। থ্যাঙ্ক ইউ। (রিসিভার রেখে দেয়) কাকাবাবু। দীপঙ্কর বেরিয়ে পড়েছে। যদি এখানে আসে—হয়ত আসবে—আপনি বলে দেবেন যে—(বেরিয়ে যাবার জন্য ব্রিফ কেস্‌টা তুলে নেয়।)

শশধর—তুমি কি উঠছ? আচ্ছা। না, না, একটু থেকেই যাও। মানে যদি থাকো তো ভাল হয়। আমি একটু অস্বস্তি বোধ করছি। কমল, খুব অসুবিধে হবে কি তোমার?

কমল—না, কাকাবাবু। ঠিক আছে, আমি না হয় একটু বসছি।

শশধর—বেশ। তোমার বন্ধুর অর্গানাইজেশনটার নাম—

কমল—দি প্যাঙ্কার অ্যাণ্ড কোম্পানী। নিজের নাম দীপঙ্কর—সেটাকেই একটু ভেঙে চুরে, একটু অ্যাংমালিসাইজড্ করে—দি প্যাঙ্কার—

শশধর—হ্যাঁ হ্যাঁ। দি প্যাঙ্কার অ্যাণ্ড কোম্পানী। তোমার বন্ধু খুবই ভাল কাজ করছেন। এসব খুবই ভাল কাজ।

কমল—ও আমেরিকায় ছিল অনেকদিন। সেখানেই ওর মাথায় এই আইডিয়া-টা আসে। বুড়োবুড়িদের জন্য ওর একটা real concern আছে। সেই জন্যই অর্গানাইজেশনটা এত ভাল চলছে। বহু লোক খুবই 'হ্যাপি অ্যাণ্ড স্যাটিস্‌ফায়েড'। সেজন্যই আমি আপনার কথা ওকে বলেছিলাম।

শশধর—সেতো বটেই। তুমি ভাল মনেই বলেছ। আমাদের ভাল করতেই চেয়েছ বাবা। সে বিষয়ে আমার কোন সন্দেহ নেই। কোন সন্দেহ নেই। কিন্তু, কিন্তু আমার মন যেন কিছুতেই সায় দিচ্ছে না। তাই—

কমল—আপনি সঙ্কুচিত হবেন না কাকাবাবু। এ নিয়ে আদৌ ভাববেন না। (একটা গাড়ি থামার শব্দ শোনা যায়) নিচে একটা গাড়ি থামল। মনে হচ্ছে দীপঙ্করের গাড়ি। আপনি ওর সঙ্গে আলাপ করুন। কথাবার্তা বলুন। আপনি রাজি নন একথা বললেই হবে। এসেছে, একটু গল্প গুজব করবে। এক কাপ চা খাবে। চলে যাবে ব্যাস। এত চিন্তার কোন কারণ নেই।

শশধর—ওহো, ভাল বলেছ। আমি চায়ের কথা ভুলেই গিয়েছিলাম। আমাদের এই যে মেয়েটি—বাসন্তী—ও বেশ ভাল চা তৈরি করে। আমি একটু বলে আসি। দীপঙ্করবাবু এলে তুমি—

কমল—হ্যাঁ হ্যাঁ। আমি দেখছি। আপনি ব্যস্ত হবেন না।

[শশধর ভেতরে যায়। কমল উঠে জানালার ধারে দাঁড়ায়। দীপঙ্কর প্রবেশ করে। দীপঙ্কর মাঝারি উচ্চতার লোক। মাথায় চুল খুবই কম। যেটুকু আছে তা সযত্নে আঁচড়ানো। মুখে অমায়িক ভাব। চোখে আধুনিক ফ্রেমের চশমা। স্যুট পরা। হাতে একটি ব্রিফকেস। বাংলায় হিন্দী শব্দের ব্যবহার করেন সন্তর্পণে, ইংরেজি উচ্চারণ করেন আমেরিকান কায়দায়।]

দীপঙ্কর—হাই, কমল। এভরিথিং রেডি?

কমল—তোমাকে এক্ষুণি ফোন করেছিলাম। শুনলাম তুমি বেরিয়ে পড়েছ।

দীপঙ্কর—কেন? আমার তো আসার কথা ছিল। হোয়্যার ইজ আওয়ার ক্লায়েন্ট?

কমল—ভেতরে গেছেন। এক্ষুণি আসবেন। শোন, উনি রাজি হচ্ছেন না।

দীপঙ্কর—রাজি হচ্ছেন না। হোয়াটস্ দি প্রবলেম? কালতো অত আগ্রহ দেখালেন শুনলাম। বুড়োদের নিয়ে এই একটা ঝামেলা!

কমল—আর তোমার কারবার বুড়োদের নিয়ে।

দীপঙ্কর—ইয়া! আই নো, আই নো। তা কী বলছে।

কমল—বলছেন, যে এটা এক ধরনের চিটিং—

দীপঙ্কর—চিটিং। ওয়েল—ইট্ ডিপেন্ড্স্ হাউ ইউ লুক অ্যাট ইট! যাইহোক যখন এসেই পড়েছি তখন একটু বাতচিত্ হওয়াই ভাল।

কমল—হ্যাঁ, আমারও তাই মনে হয়। ইউ আর এ ওয়ান্ডারফুল সেলস্ম্যান, ইয়ার!

দীপঙ্কর—থ্যাঙ্কস্। (শশধর ঘরে ঢোকে। দীপঙ্কর উঠে দাঁড়ায়, খুব বিনীতভাবে নমস্কার করে) নমস্কার, আমি দীপঙ্কর দত্ত।

শশধর—নমস্কার। আপনি দীপঙ্কর দ—

দীপঙ্কর—নো, নো। নো, আপনি। তুমি, তুমি। আমি শুধু অশোকের বন্ধু নই—আপনার ছেলের চেয়েও চার বছরের জুনিয়ার। ইন্ ফ্যাক্ট আমরা এক কলেজে পড়তাম। বসুন, বসুন।

শশধর—নিশ্চয়ই, নিশ্চয়ই। আপনি—তুমি বোস। বাবা, কমল, তুমিও। হ্যাঁ—আমি কমলকে বলেছিলাম, রাজিও হয়েছিলাম। কিন্তু—

দীপঙ্কর—নেভার মাইণ্ড। আমাদের 'রিলেশন' তো শুধু একটা বিজনেস্ ট্রানজাকশন নয়। আপনার সঙ্গে দেখা হওয়াটা একটা 'সওভাগগিয়' (সৌভাগ্য) বলা যায়।

শশধর—যাক, তুমি যে রাগ করনি, তাতে আমি খুবই স্বস্তি বোধ করছি! এর জন্য যে ক্ষতিপূরণ—

দীপঙ্কর—'ফরগেট্ ইট্'। দেখুন মিস্টার চট্টোপাধ্যায়—কাকাবাবু—আমার এই কোম্পানী যে শুধু একটা বিজনেস কনসার্ন মাত্র তা নয়। আমি আমেরিকায় অনেকদিন ছিলাম—

শশধর—হ্যাঁ, কমল বলেছিল—

দীপঙ্কর—আই হ্যাড্ স্পেন্ট্ অ্যাবাউট্ সিকস্টিন ইয়ারস্ ইন্ দ্যাট্ গড ড্যামড্ কান্ট্রি। ওখানে গিয়ে দেখলাম বুড়ো মানুষদের কী কষ্ট। ইট্স্ নট্ বিকজ অফ্ মাণি—দে হ্যাড এনাফ্ অফ্ ইট্। কিন্তু একটা ভ্যাকুয়াম্—একটা শূননিয়তা (শূন্যতা)। ছেলেমেয়েরা ছড়িয়ে গেছে, কালেভদ্রে দেখা শোনা, মধ্যে মধ্যে টেলিফোন। কখনও একটা কার্ড-জন্মদিনে—ক্রীসমাসে—এর ফলে একটা প্রচণ্ড

লোনলিনেস। তখন থেকেই আমার মাথায় এই কোম্পানীর কথা ঘুরছে। আই মাস্ট্ ডু সামথিং অ্যাবাউট ইট্। কুছ করকে দিখাউঙ্গা। তারপর গেলাম জাপানে—অ্যাণ্ড দ্যাট ওয়াজ দি টার্নিং পয়েন্ট। দেখলাম ওরা এ ব্যাপারে প্রচণ্ড সেরিআস। তখন আমি ঠিক করলাম যে একটা এজেন্সি খুলব। আচ্ছা, চা এসে গেছে। ভেরি গুড্।

[ছোকরা ভৃত্য সুবোধ একটা ট্রে নিয়ে ঢোকে। তাতে চায়ের সরঞ্জাম। সুবোধ টেবিলের ওপর চায়ের কাপগুলো নামিয়ে রাখে। কেউ কোন কথা বলে না। হঠাৎ ভেতর থেকে একটা তীক্ষ্ণ নারীকণ্ঠ শোনা যায়, কণ্ঠস্বরের মধ্যে ক্রোধ প্রার্থনা এবং প্রত্যাশা মিশে যায়—'ওখানে কারা কথা বলছে, সুবোধ?' শশধর অস্বস্তির সঙ্গে দরজার দিকে তাকায়।]

সুবোধ—দিদিমা আবার পাগলামি করছেন।

শশধর—হুঁ।

দীপঙ্কর—আপনার?

শশধর—স্ত্রী।

সুবোধ—খালি বলছেন ওখানে কারা এসেছে। অশোক কখন আসবে?

শশধর—তুই যা। (দীপঙ্করের দিকে) আজ একটু বেশি ডিস্টার্ব্ড্।

[আবার চিৎকার শোনা যায়, 'অশোক']

শশধর—সুবোধ, তুই যা। আমরা চা ঢেলে নিচ্ছি।

সুবোধ—ঠিক আছে। (একটু থেমে) সত্যি কি বড়দা আসছেন না?

শশধর—আ! তুই যা। (সুবোধ চলে যায়) কমল, দীপঙ্কর—তোমরা একটু চা খাও।

দীপঙ্কর—সুয়োর। (চায়ের পেয়ালা তুলে নেয়) কমল আমাকে সব বলেছে। আমি সেই সব ইনফরমেশনের ভিত্তিতেই প্রোগ্রামটা তৈরী করেছি।

শশধর—হ্যাঁ, জানি! কী যে করা উচিত—

দীপঙ্কর—ইয়েস্, যা বলছিলাম—জাপানে যা দেখলাম তা খুবই ইন্টারেসটিং। মানুষের ইমোশনাল রিকোয়ারমেন্ট পূর্ণ করার জন্য খুবই চিন্তিত। (শশধর অন্যমনস্কভাবে কথা শোনেন। চামচ নাড়তে থাকেন) ধরুন আপনার কোন বন্ধু নেই, কথাবার্তা বলার কোন লোক নেই। তা আপনি এজেন্সিকে জানালেন, তারা ধরুন, ঘণ্টাখানেকের জন্য আপনার সঙ্গে কথাবার্তা গল্পগুজব করার জন্য একজন লোক পাঠালেন। আপনার কিছুটা সময় বেশ কেটে গেল।

শশধর—লোক পাঠাল?

কমল—হ্যাঁ। একঘণ্টা, দেড়ঘণ্টা, যেমন দরকার। ট্যাক্সির মতো আর কী। যতটা যেতে চান যাবেন। খরচ সেই অনুসারে।

শশধর—(যান্ত্রিকভাবে উচ্চারণ করে) খরচ সে-ই অনুসারে।

কমল—সেটাই আপনাকে বলছিলাম সেদিন। আপনি পয়সা দেবেন, আর এজেন্সি

সেই অনুসারে লোক পাঠাবে।

দীপঙ্কর—কাকাবাবু। প্রত্যেক জিনিসেরই একটা প্রাইস্—কিমৎ—আছে। (কমলের দিকে তাকিয়ে) বাংলায় কী যেন বলে—দাম—হ্যাঁ, মূল্য আছে। এই যে বাড়ি, জামা, জুতো, খবরের কাগজ, চায়ের কাপ সবই একটা দাম দিয়ে কিনতে হয়। প্রাইস্ ইজ ডিটারমিন্ড্ বাই দি অ্যাভেলেবিলিটি অফ দি—ইয়ে-ইয়ে—কমোডিটি। সোনার দাম বেশি। কেন? না, সোনা ইজ নট ইজিলি অ্যাভেলেবেল। জলের দাম নেই কিংবা কম—ইয়েস্ ওয়াটারচার্জ দিতে হয়—ওয়াটার এখনও সহজে পাওয়া যায়। হাওয়ার জন্য দাম দিতে হয় না, কিন্তু যেভাবে পলিউশন বাড়ছে, একদিন দেখবেন আমাদের হয়ত অক্সিজেন সিলিণ্ডার নিয়ে ঘুরতে হবে। সেই রকমই—যখন মানুষের ইমোশনাল রিকোয়ারমেন্টগুলোর অভাব ঘটতে থাকে—তখন তার ভ্যালু বাড়তে থাকে। তখন যদি আপনাকে কেউ সব জিনিস একটু একটু সাপ্লাই করে, তারএকটা প্রাইস্ দিতে হবে, তাই না! কী বল, কমল।

কমল—সে তো বটেই।

দীপঙ্কর—আই নো—আই নো, যে বন্ধুত্ব, অ্যাফেক্শন্, ভালবাসা ইত্যাদির প্রাইসিং করা সম্ভব নয়। কিন্তু যখন কেউ এগুলোর একটা অলটারনেটিভ্ সাপ্লাই করতে চায় তখন তো একটা সারভিস্ চার্জ দিতেই হয়। সেটাই ঐ সব এজেন্সি করে থাকে। আমিও করি। (চায়ে চুমুক দিয়ে কাপটা টেবিলের ওপর নামিয়ে রাখে) গুড্ টী। আমি তাহলে চলি।

শশধর—আচ্ছা, আচ্ছা। আমি তোমাকে আশীর্বাদ করি, বাবা। অবশ্য আশীর্বাদের কোন ভ্যালু আছে কিনা—

দীপঙ্কর—আছে, আছে। ইট্ অল্ ডিপেন্ড্স, কার দরকার, কেন দরকার। এবং (একটু হেসে) সে ক্ষেত্রে আমরা তা সাপ্লাই করি।

শশধর—কী সাপ্লাই কর! আশীর্বাদ!

দীপঙ্কর—(একটু হেসে) হ্যাঁ। দরকার হলে করি বৈকি!

শশধর—তার জন্য দাম দিতে হয়?

দীপঙ্কর—তা দিতে হয়! আসলে আপনি বাড়িভাড়া, ট্যাক্সিভাড়া—ইয়ে ইলেকট্রিক বিল ইত্যাদির সঙ্গে তুলনা করে এই ব্যাপারে একটা বানিয়া-বানিয়া গন্ধ পাচ্ছেন জানি। সংস্কৃতিবান বাঙালী 'কেনা' 'বেচা' ইত্যাদি শব্দগুলিকেই ঘৃণা করে। তবে একথা স্বীকার করাই ভালো যে কেনা-বেচা, লেন-দেন নিয়েই সংসার। (উঠে দাঁড়ায়) আমি বক্তৃতা দিতে আসিনি। তবে যদি কখনও দরকার বোধ করেন (পকেট থেকে কার্ড বের করে) হিয়ার ইজ মাই কার্ড। চলি। নমস্কার। কমল, বাই।

[প্রস্থান]

কমল—আমিও আসছি।

[কমল যাবার আগেই কৌশল্যা ঢোকে। তার পেছনে সুবোধ]

কৌশল্যা—অশোক কি চলে গেল! তুমি ওকে যেতে দিলে?

শশধর—না, না। ও অশোক নয়।

কৌশল্যা—কে তবে? অশোকের বন্ধু না!

শশধর—হ্যাঁ, হ্যাঁ। অশোকের বন্ধু—

কৌশল্যা—সুবোধ, ডেকে আন। ডেকে আন। হ্যাঁগো, তুমি তো কমল—তুমিতো অশোককে চেন। অশোক কি আসবে না? (কমলের হাত ধরে) অশোক কি আসবে না? বলো, অশোক কি আসবে না?

কমল—কেন আসবে না, আসবে।

কৌশল্যা—কবে আসবে? (হঠাৎ প্রচণ্ড উত্তেজিত হয়ে ওঠে) কবে আসবে? কখন আসবে? আজ, আজ, আজ আসবে? বলো বলো, বলো, আজ আসবে?

কমল—আজ—হ্যাঁ—তা—

শশধর—বাবা, সুবোধ—শোনো, তুমি ভেতরে যাও।

কৌশল্যা—হ্যাঁ, সুবোধ চল, আমাদের এখন অনেক কাজ। তুমিও বসে থেক না—অশোক আসছে, বৌমা আসছে। মুড়কি আসছে, তাই না কমল, তাই না। কী গো, তুমি অমন ভাবে দাঁড়িয়ে আছ কেন?

শশধর—ঠিক আছে, ঠিক আছে তুমি যাও। সুবোধ, দাঁড়িয়ে আছিস কেন? (সুবোধ কৌশল্যার হাত ধরে ভেতরে নিয়ে যায়। কমল একটু অস্বস্তির সঙ্গে দাঁড়িয়ে থাকে। শশধর হঠাৎ খুব উত্তেজিত স্বরে বলে) দেখছ কমল, দেখছ। একটা পাগল। একটা পাগল, এর রিকোয়ারমেণ্ট (শব্দটা জোর দিয়ে উচ্চারণ করে, যেন ব্যঙ্গ করতে চাইছে) কি কেউ পূর্ণ করতে পারে? কী?

কমল—তা (আমতা আমতা করে)—

শশধর—এর রিকোয়ারমেণ্ট পূর্ণ করতে পার?

কমল—কিছুটা পারা যায়, পুরোটা তো—

শশধর—কিছুটা! ছেলেকে আনতে পার? বৌমাকে আনতে পার? স্নেহ, ভালবাসা—এসব পূর্ণ করতে পার?

কমল—আপনি রাগ করছেন। দীপঙ্করের ভাষায় বলি, আমরা সব প্রয়োজন—রিকোয়ারমেণ্ট অনুযায়ী মাল সাপ্লাই করে থাকি।

[দ্রুতবেগে দীপঙ্করের প্রবেশ]

দীপঙ্কর—মাল শব্দটা ভাল লাগবে না জানি। অর্ডার সাপ্লাই বলতে পারেন। আমার নোটবুকটা ফেলে গিয়েছি, নিতে এলাম। (দীপঙ্কর টেবিল থেকে নোটবুক তুলে পকেটে ভরে)

শশধর—আচ্ছা, দীপঙ্কর, ধর, আমি রাজি হয়েছি। কোন গোলমাল হবে না তো। ওঁর অবস্থাটাতো দেখছ।

দীপঙ্কর—কোন ভয় নেই। আমরা এরকম ক্লায়েন্ট্ আগেও ডিল করেছি। আমাদের লোকজন ট্রেন্ড্ তবে আপনার কো-অপারেশন দরকার। অশোক সম্বন্ধে আমরা ডিটেল্ড্ ইনফরমেশন্ সংগ্রহ করেছি—অশোক কী খেতে ভালবাসত, আপনার স্ত্রী তাকে ছোটবেলায় কোন গান শিখিয়েছিলেন—আপনি কী গল্প বলতেন—পুরো লাইফ-হিস্ট্রি বা এসেনসিয়াল ডাটা সবই জানা হয়েছে। না ভয় নেই। এ এক ধরনের খেলা। লীলাও বলতে পারেন।

শশধর—লীলা!

দীপঙ্কর—একটা এন্‌এ্যাক্টমেন্ট্, একটা নাটক। এর উদ্দেশ্য মানুষকে তৃপ্তি দেওয়া, ভুলিয়ে রাখা, কিছুক্ষণের সান্ত্বনা। নাথিং রং, নাথিং রং ইন্ ইট্। শুধু খেলা।

শশধর—শুধু খেলা?

দীপঙ্কর—শুধু খেলা। এ খেলায় হার নেই, জিৎ নেই, শুধুই মজা।

শশধর—কোন প্রতারণা নেই!

দীপঙ্কর—না। প্রতারণা নয়, খেলা, খেলা। আপনাকেও খেলতে হবে। সবাই মিলে খেলা। সবাই মিলে খেলা।

[কৌশল্যা আস্তে আস্তে প্রবেশ করে]

কৌশল্যা—কী খেলা তোমাদের! কোথায় খেলা হবে?

দীপঙ্কর—এখানে। এখানেই।

কৌশল্যা—কখন খেলা হবে।

শশধর—(উৎসাহের সঙ্গে) আজ! আজ!

কৌশল্যা—আজ! তাহলে, অশোক খেলবে না?

শশধর—খেলবে, খেলবে বৈকি! সবাই খেলবে, তুমি খেলবে, (ক্লান্ত স্বরে) আমিও খেলব।

[বৃদ্ধা কৌশল্যা আনন্দে উচ্ছ্বসিত হয়ে ওঠে। দীপঙ্কর ও কমল দাঁড়িয়ে দেখে। শশধর কৌশল্যাকে ধরে একটা চেয়ারে বসায়]

কৌশল্যা—খেলা খেলা খেলা।

[ফুটবল মাঠের রেফারির হুইস্‌লের মতো একটা আওয়াজ শোনা যায়। পর্দাটা নেমে আসে। আবার আস্তে আস্তে ওঠে]

দুই

[সন্ধ্যে হয়ে গেছে। জানালা দিয়ে দেখা যায় বাইরে অন্ধকার। একটা টেবলল্যাম্প জ্বলছে ঘরের ভেতর। তার পাশে বসে আছে শশধর। কৌশল্যা প্রবেশ করে। তার মুখে হাসি।

শরীরে চাঞ্চল্য। শশধর তাকে কিছু বলার আগেই পেছনে পেছনে আসে অশোক আর স্ত্রী শ্যামলী। সবাই খুব খুশি। সমস্ত আবহাওয়াটাই ফুর্তির।]

কৌশল্যা—শোন, তুমি কিন্তু ওদের বলে দাও, আজ যাওয়া হতেই পারে না।

শশধর—সে আমি কী করব। ওদের যখন কাজ আছে—

কৌশল্যা—ওসব কথা আমি শুনছিনে। এতদিন পরে আসা হল, তা আবার ঘোড়ায় জিন দিয়ে। দ্যাখো, বৌমা, আমি তোমাকে কিছুতেই যেতে দিচ্ছি না।

শ্যামলী—আমাদেরই কি যেতে ইচ্ছে করছে, মা। (হাত দুটো ধরে) কিন্তু উপায়তো নেই। আর মুড়কি—একা আছে।

কৌশল্যা—না, না। তোমরা মাত্র কয়েক ঘণ্টার জন্য আসবে আর এইভাবে চলে যাবে। হ্যাঁগো, তুমি যে চুপ করে বসেই রইলে।

শশধর—আমি কী করব?

কৌশল্যা—কথা শোনো। শুনছিস অশোক। কথা শুনলে গা জ্বলে যায়। 'আমি কী করব?'

অশোক—না, মা, অত রাগ কোরো না। বাবাতো চিরকালই ঐ রকম, তার মানে কি বাবা চাচ্ছেন যে আমরা চলে যাই। আসলে এভাবে হঠাৎ আসা হবে ভাবিনি। (একটা দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলে) সময় হয়ে গেল। এবার যেতে হবে মা।

কৌশল্যা—কেন? একটা দিনও থাকতে পারিস না। কেন? কেন? তুমি কিছু বলছ না।

শশধর—আমি কী বলব বলো। ওদের যেতে তো হবেই।

কৌশল্যা—ঐ এক কথা। বৌমা—

শ্যামলী—মা, বুঝতে পারছি আপনার খুব কষ্ট হচ্ছে। আমারই কী কম খারাপ লাগছে। অশোক কোম্পানির কাজে কুয়েত যাচ্ছিল। আমরা বায়না ধরলুম, যাব, একদিনের জন্য হলেও দিল্লিতে থাকা যাবে। মুড়কিও তো আসতে চাইছিল, কিন্তু ওদের ওখানে ইস্কুলে ভীষণ কড়াকড়ি—

অশোক—সামনের বছর পুজোর সময় একমাস ছুটি নিয়ে আসব। পনের বছর দিল্লির পূজা দেখিনি। এবার সঙ্গে মুড়কিকেও আনব—

কৌশল্যা—সত্যি!

অশোক—সত্যি নয়তো কী।

শ্যামলী—হ্যাঁ, মা। প্রত্যেক বছর পুজোর সময় যে কী খারাপ লাগে। এবার লস্ অ্যাঞ্জেলেসে একটা ছোট পুজো হল—

কৌশল্যা—তোমাদের ওখানে পুজো হয়। বা। মুড়কির একটা ফোটোও আনলে না। অবশ্য, আনলেই বা কী হতো। দেখতে তো পেতাম না।

[শ্যামলী ও অশোক দুজনের চিবুক স্পর্শ করে হাত দিয়ে]

মুড়কিকে চিঠি লিখতে বোল।

শ্যামলী—চিঠি! কাউকে একটা চিঠি লেখে ওরা। তাছাড়া বাংলাটা একেবারেই শিখল না।

কৌশল্যা—তা ওর দোষ কি বাপু! আমেরিকায় থাকবে বাংলা শিখবে কেমন করে। একবার আসুক তো, তখন দেখবে কদিন লাগে বাংলা শিখতে।

শ্যামলী—ঐ সোয়েটারটা কিন্তু মুড়কির পছন্দ। আপনার জন্য। পছন্দ হয়েছে?

কৌশল্যা—(সোয়েটার নেয় শ্যামলীর হাত থেকে। নেড়ে চেড়ে দেখে) বা! বা! আমি কী করব মা, এই সোয়েটার নিয়ে। আজকাল আমার একটুও ঠাণ্ডা লাগে না। অশোক, তোদের ওখানে খুব ঠাণ্ডা, তাই না!

অশোক—(হেসে) হ্যাঁ, তাতো বটেই।

শ্যামলী—এইতো শিকাগোতে এখন মাইনাস বারো। এবার অবশ্য একটু কম।

কৌশল্যা—কম! বলিস কী-রে!

শ্যামলী—অন্যবার তো এ সময় বিশ পঁচিশ হয়ে যায়।

কৌশল্যা—সত্যি তোদের কী কষ্ট। শুনছ! ওখানে ভীষণ ঠাণ্ডা।

শশধর—হ্যাঁ, শুনছি। ওদের সব বেশি, ঐশ্বর্য বেশি, প্রাচুর্য বেশি, ঠাণ্ডা বেশি।

কৌশল্যা—কথা শোন! টাকা পয়সা বেশি হলে বুঝি ঠাণ্ডা বেশি লাগে?

শশধর—তা একটু লাগে বৈকি! যাদের বেশি টাকা-পয়সা তাদের পাড়ায় ঠাণ্ডাও একটু বেশি। (শ্যামলীর দিকে) তোমাদের তো এখনই বেরুতে হবে, তাই না। (দ্বিধান্বিত স্বরে) বৌমা—

শ্যামলী—হ্যাঁ, বাবা। সাড়ে আটটার ফ্লাইট—কাল বিকেলে আবার কলকাতা থেকে ব্যাঙ্কক—

অশোক—ব্যাঙ্ককে এখন একটা নতুন ব্যাঙ্ক খুলেছে আমাদের কোম্পানি। ওখানে দুদিন কি তিনদিন—

শ্যামলী—কতবার বললুম, ব্যাঙ্কক ফ্যাঙ্ককে গিয়ে কাজ নেই। দিল্লিতে দুটোদিন আপনাদের সঙ্গে বরং কাটাই কিন্তু (হঠাৎ) মা, তুমি কি আমাদের একটুও দেখতে পাচ্ছ না?

কৌশল্যা—এই একটা চোখেই যা একটু দেখি—সেও দুপুর বেলা, রোদ থাকলে। এখন আবছা—সব আবছা—কারো মুখ, কারো চোখ নেই, শুধু যেন কারা দাঁড়িয়ে আছে, বসে আছে (শ্যামলীর গায়ে হাত বুলিয়ে) বড়ো রোগা হয়ে গেছ মা—

অশোক—রোগা? হা হা হা।

শ্যামলী—হাসির কী আছে এত!

অশোক—তোমার মেয়েই খোঁটা দেয়। জানো মা, মুড়কি বলে তার মাকে, খুব বেশ মোটাচ্ছ কিন্তু—

কৌশল্যা—মোটা না ছাই। আচ্ছা, দাঁড়াও মনে পড়েছে। (চেঁচিয়ে ডাকে) সুবোধ, সুবোধ।

শশধর—কী চাই? সুবোধকে ডাকছ কেন?

কৌশল্যা—জুতো! জুতো!

শশধর—জুতো? কার জুতো? জুতো কী দরকার?

কৌশল্যা—ওরে সুবোধ। বাবা, জুতো জোড়াটা নিয়ে আয় ত।

অশোক—হ্যাঁ, কিসের জন্য আবার জুতো?

কৌশল্যা—মুড়কির জুতো। মুড়কির জন্য জুতো।

অশোক—মুড়কির জন্য!

কৌশল্যা—মনেও নেই তোর। সেই যে তিন বছর বয়সের—ভেলভেট মোড়া জুতো। মনে নেই তুই কিনে এনেছিলি ওর জন্মদিনে।

অশোক—(বিব্রত হয়ে) আমি? জুতো? না, ইয়ে, আমার তো মনে নেই—

কৌশল্যা—কী করে মনে থাকবে? কতদিন আগের কথা! তাই না বৌমা!

শ্যামলী—(একটু অস্বস্তির সঙ্গে) হ্যাঁ-হ্যাঁ। বুঝতে পেরেছি। সেই যে, তুমি এনেছিলে কনাট প্লেস থেকে—

কৌশল্যা—তোমারও কিছুই মনে নেই বৌমা। কনাট প্লেস হতে যাবে কেন? অশোক কলকাতা থেকে নিয়ে এল না। সেদিন বৃহস্পতিবার, সকাল থেকে বৃষ্টি পড়ছিল—

অশোক—(বোকার মতো) ঠিক ঠিক। (হঠাৎ সে খেয়াল করে যে শশধর চুপ করে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে একটা কঠিন এবং বিদ্রূপপূর্ণ দৃষ্টিতে তাকে দেখছে।)

[সুবোধ জুতোজোড়া নিয়ে ঢোকে। কৌশল্যা আনন্দে চীৎকার করে ওঠে]

কৌশল্যা—এইতো। এই দ্যাখ বৌমা। কাছে এসো। আরো কাছে।

[কৌশল্যা শ্যামলীর হাত ধরে টেনে আনে। অশোক শশধরের কাছে এসে দাঁড়ায়]

অশোক—আপনি কিন্তু যথেষ্ট কোঅ্পারেট করছেন না। এমন আড়ষ্ট হয়ে আছেন কেন?

শশধর—আমি বড়ই অস্বস্তি বোধ করছি। এভাবে প্রতারণা—একজন সরল, প্রায় অন্ধকে—

অশোক—(ফিসফিস করে) কোন প্রতারণা নেই। দিস ইজ এ গেম। খেলা।

শশধর—খেলাটা অবশ্য ভালই চলছে।

অশোক—আর অল্প সময়। প্লিজ কোঅপারেট—

শশধর—চেষ্টা করব।

কৌশল্যা—অশোক, এই দ্যাখ। একটা পাটি।

অশোক—এক পাটি জুতো! আরেকটা গেল কোথায়?

কৌশল্যা—মনে নেই। সেই যে পার্কে হারিয়ে গেল। ঐ ছোট্ট মেয়ে বললে, আমি যে সিনডেরেলা—তাই আমার এক পাটি জুতো ফেলে এসেছি।

শশধর—(হঠাৎ রুদ্ধ স্বরে) কয়েকদিন আগে আমি সিনডেরেলার গল্প বলেছিলাম। সেই যে ছবির বইটা—মনে আছে বৌমা, তুমিইতো কিনে এনেছিলে।

শ্যামলী—(অস্বস্তির সঙ্গে) আমি? হ্যাঁ-হ্যাঁ।

শশধর—(নিজেকে সামলে নিয়ে) বোধহয় আমার ভুল। তোমরা এখন কেউ কাছে নেই। অনেক দূরে। তোমরা সব ভুলে গেছ। আমরা তো ভুলিনি।

কৌশল্যা—(পাগলের মতো হাসতে হাসতে বলে) কিছুই ভুলিনি, বৌমা, কিছুই ভুলিনি। আর আমি যদিওবা কিছু ভুলি, ঐ বুড়ো কিছু ভোলে না। ঐ দ্যাখো, ঐ টেবিলের কোণে সেই বই—সেই সিনডেরেলার বই—সন্ধ্যেবেলায় বসে বসে ছবি দ্যাখে আর নিজের মনে মনে গল্প বলে—

শশধর—(লজ্জিতভাবে) আর তুমি? তুমি কী কর?

কৌশল্যা—আমি শুনি। আমি বুড়ি। আমি গল্প শুনি। (হঠাৎ ভাঙা গলায়) অশোক এই জুতোটা নিয়ে যা। মুড়কিকে দিবি।

শশধর—(উত্তেজিত স্বরে) না! না! এ জুতো তুমি নেবে না।

কৌশল্যা—তুমি বলার কে? আমি দিচ্ছি, তুমি চেঁচাবার কে?

শ্যামলী—থাক, মা। উনি বোধহয় নিজের কাছে রাখতে চান।

কৌশল্যা—উনি রাখতে চান। এ যে আমার বুকের ভেতর রেখে দিয়েছি এতদিন। এই যে আমার সিন্‌ডেরেলার জুতো এ আমার জিনিষ, আমার, আমার। আমি আমার দিদিমণিকে দিচ্ছি।

অশোক—ঠিক আছে। ঠিক আছে। (কৌশল্যাকে দেখিয়ে) উনি বড়ো উত্তেজিত হয়ে পড়েছেন।

শশধর—হ্যাঁ, তুমি এবার একটু বিশ্রাম নাও।

কৌশল্যা—নে, এটা। মুড়কিকে দিবি আর বলবি, রাজপুত্তুর যখন আরেকটা জুতো নিয়ে আসবে, তখন কি আর একটা পা খালি থাকবে। হে—হে—হে—!

অশোক—রাজপুত্তুর যদি জুতোটা পেয়েও যায়, মা, এখনকার মুড়কির পায়ে তো সে জুতো ঢুকবে না। মুড়কির এখন—

শ্যামলী—অ্যাত বড়ো!

কৌশল্যা—ঠিক, ঠিক বলেছিসতো। আমি ভুলেই গিয়েছি।

শ্যামলী—তা যাই হোক, আমি বরং জুতোটা নিয়েই যাই। ছেলেবেলার স্মৃতি তো। একী, বৃষ্টি আরম্ভ হলো বুঝি?

অশোক—হ্যাঁ, আকাশতো বেশ পরিষ্কার ছিল। দ্যাখো এয়ারলাইনস্‌-এর যা হাল, হয়তো ফ্লাইট দেরি হয়ে যাবে।

শ্যামলী—না, না। এ তেমন বৃষ্টি নয়।

কৌশল্যা—বৃষ্টি। বৃষ্টি। হোকনা। আজ তোরা থেকে যা। অশোক, তোর মনে পড়ে সেই বৃষ্টি হলেই ছেলেবেলায় তুই গল্প শুনতে চাইতিস।

অশোক—কেন মনে পড়বে না?

কৌশল্যা—মনে আছে? কোন্ কোন্ গল্প মনে আছে তোর।

অশোক—(হেসে) গল্প কি আর মনে থাকে?

শ্যামলী—গল্প মনে থাকবে ওর! ওর মাথায় শুধু হিসেব আর হিসেব—

শশধর—(অন্যমনস্কভাবে) গল্পগুলো ভোলা কঠিন। সেই সব গল্প, সেই গান। (শশধরের গলাটা থমথমে শোনায়) সে সব ভুলে গেলি? মানুষ কি সব কিছু ভুলে যায়, আমি তো কিছুই ভুলিনি। অশোক (যেন অন্য এক অদৃশ্য অশোককে সম্বোধন করে) তোর মনে পড়ে তুই ইস্কুলের বাস থেকে নেমে আমার হাত ধরে আসছিলি, হঠাৎ দৌড়ে চলে গেলি হাত ছাড়িয়ে এক বন্ধুকে দেখে, ঠিক সেই সময় তীব্রবেগে আসছিল একটা মোটর বাইক, আমি অসহায়, আমি দুহাত তুলে দুচোখ বুজে ঈশ্বরের কাছে কী বলেছিলাম জানি না, ভাবলাম সব শেষ বুঝি। সব। তারপর দেখলাম প্রচণ্ড জোরে গাড়িটা ব্রেক কষল। আর ওপারে তুই—ছোট্ট—ছোট্ট অশোক, তুই—(অশোককে জড়িয়ে ধরতে চায়, কিন্তু নিজেকে সংযত করে নেয়) মনে আছে?

শ্যামলী—(অশোক কিছু বলার আগেই) হ্যাঁ, হ্যাঁ, এ গল্প আমি ওর কাছে কতবার শুনেছি।

অশোক—(শ্যামলীকে ফিসফিস করে) তাড়াতাড়ি কর। এবার যাওয়া দরকার। আর দেরি নয়।

শ্যামলী—(ফিসফিস করে) হ্যাঁ। ব্যাপারটা ক্রমশই কন্ট্রোলের বাইরে চলে যাচ্ছে। (শশধরের দিকে তাকিয়ে) আপনি বুঝি সারাদিন এইসব চিন্তা করেন।

[অশোক ঘরের ভেতর থেকে একটা সুটকেশ টেনে আনে]

এসব ভুলে যান। কই, মা, জুতোটা কোথায়?

অশোক—তাহলে এবার ট্যাক্সি ডাকি।

[টেলিফোনের কাছে যায়]

শশধর—সেভেন টু ফাইফ সেভেন এইট টু ও ফোর।

[অশোক টেলিফোন ডায়াল করে]

শ্যামলী—মা কাঁদছেন কেন? আমরা কিন্তু সত্যি আসব পুজোর সময়। (শ্যামলী আঁচল দিয়ে তার মুখ ঢাকে)

অশোক—হ্যালো। হ্যাঁ—হ্যাঁ, এয়ার পোর্ট যেতে হবে। এক্ষুণি চাই—সিন্ধিয়া রোড, বারো নম্বর। থ্যাঙ্ক ইউ।

শশধর—হ্যাঁ, তোমরা আবার এসো। যখন তোমাদের আসার সময় হবে এসো। আজ তোমাদের আর আটকে রাখব না। ওঁর শরীরটা ভাল নেই। তোমাদের দেখে আজ খুব খুশি কিন্তু খুবই উত্তেজিত হয়ে পড়েছেন। সত্যি সত্যি এত ভাল অনেকদিনই থাকেন নি উনি। তোমরা এলে, এতে আমি খুব খুশি—আই অ্যাম ভেরি গ্ল্যাড—ভেরি গ্ল্যাড—থ্যাঙ্ক ইউ।

শ্যামলী—আপনি কী বলছেন। ছেলে-বৌকে কি এভাবে থ্যাঙ্কস দেয় নাকি। আপনি যে সাহেবদের চেয়েও সাহেব।

কৌশল্যা—পাগল পাগল। আমাকে বলে পাগল, হুঁ।—আসলে—।

শ্যামলী—চলি মা। আসি। (প্রণাম করে)

অশোক—হ্যাঁ। আসি (প্রণাম করে)

কৌশল্যা—থাক, থাক। (অশোকের পিঠে হাত বুলিয়ে) হ্যাঁরে, তোর পিঠে সেই যে একটা উঁচু মতোন ছিল—কী যেন বলে—

শশধর—সিস্ট্!

কৌশল্যা—হ্যাঁ, হ্যাঁ। সিস্ট্—সেটা নেই! সেরে গেছে।

অশোক—(অপ্রস্তুত হয়ে) না—মানে?

শ্যামলী—ঐ তো, ওটা অপারেশন করে—

শশধর—হ্যাঁ, সেতো বছর পাঁচেক হলো। চিঠিতে লিখেছিলে।

অশোক—হ্যাঁ। হ্যাঁ। পাঁচবছর—ভুলে গিয়েছিলাম।

শশধর—আমার মনে আছে। অশোকের সিস্ট্ অপারেশন করা হয়েছিল—

কৌশল্যা—অত কথা কি আর মনে থাকে? যাক্‌গে। হ্যাঁগো, অশোক কবে আসবে?

[অশোক ও শ্যামলী অপ্রস্তুত হয়ে তাকায়। শশধরকে চিন্তিত দেখায়।]

শশধর—কী বলছ তুমি! এই তো অশোক। এরা এখন চলে যাচ্ছে—

কৌশল্যা—ও, ঠিক, ঠিক। কী মন আমার! সব ভুলে যাচ্ছি। এইতো অশোক, এইতো বৌমা। সত্যিই তো! ঠিক, ঠিক—মাঝে মাঝে মাথাটা এমন করে—আসলে তোরা চলে যাচ্ছিস তো—তাই মনটা বড়ো খারাপ লাগছে।

[বাইরে ট্যাক্সির আওয়াজ শোনা যায়।]

শশধর—ঐ তোমাদের ট্যাক্সি এসে গেল।

[অশোক ও শ্যামলী তাদের দুটো স্যুটকেস নিয়ে আস্তে আস্তে বেরিয়ে যায়। শশধর দাঁড়িয়ে থাকে। কৌশল্যা কিছুক্ষণ চুপ করে দাঁড়িয়ে চেয়ারে বসে পড়ে। আবার উঠে দাঁড়ায়। বেশ কিছুক্ষণের নীরবতা।]

কৌশল্যা—বেশ! বেশ! বেশ হল।

শশধর—কী বলছ!

কৌশল্যা—খেলা!

শশধর—খেলা!

কৌশল্যা—হ্যাঁ। ভীষণ ভাল, ভীষণ ভাল লাগছে। ভীষণ ভাল লাগছে এই খেলা।

[শশধর কৌশল্যার চেহারা দেখে ভয় পায়।]

শশধর—শরীর খারাপ লাগছে? শোবে?

কৌশল্যা—না। ওরা আবার কবে আসবে?

শশধর—(ইতস্তত করে বলে) এই তো গেল। আসবে, আবার আসবে একদিন।

কৌশল্যা—খেলাটা কিন্তু বেশ, তাই না।

শশধর—(চমকে ওঠে) খেলা! কোন্ খেলার কথা বলছ?

কৌশল্যা—কেন, এই খেলা। (উঠে দাঁড়িয়ে)

কানামাছি ভোঁ ভোঁ

যাকে পাবি তাকে ছোঁ।

কত টাকা দিতে হয় এই খেলার জন্য?

শশধর—অ্যাঁ।

কৌশল্যা—কত টাকা? আবার কবে খেলা হবে? হ্যাঁগো কত টাকা দিতে হয়। আমি খেলব। এসো আমরা খেলি।

কানামাছি ভোঁ ভোঁ।

[শশধর সস্নেহে কৌশল্যাকে ধরে ঘরের ভেতর নিয়ে যান]

[পর্দা নেমে আসে]

□

অক্টোপাস লিমিটেড

মোহিত চট্টোপাধ্যায়

(১৯৩৫)

চরিত্র

ছেলে

মেয়ে

এজেন্ট

জ্যোতিষী

ম্যারেজ রেজিস্ট্রার

মহিলা

পর্ব এক

[পার্ক। বেঞ্চিতে স্যুটেড-বুটেড মধ্যবয়সী একজন ভদ্রলোক বসে আছেন। ঘাড়টি বাঁদিকে ঈষৎ কাত্ করে ভদ্রলোক যেন দূরে কোথাও তাঁর দৃষ্টি নিবদ্ধ রেখেছেন। মনে হতে পারে, এই ভঙ্গিতে তিনি 'ফ্রিজ' হয়ে আছেন। বাদামের ঠোঙা হাতে ২৭/২৮ বছরের ঝোলা কাঁধে একটি ছেলে এসে বেঞ্চির একধারে বসে—ভদ্রলোকের 'ফ্রিজ'-অবস্থা ভেঙে যায়। ভদ্রলোকের কোলের উপর একটি 'অ্যাটাচি কেস'। ওঁর নাম জানার কোনো দরকারই নেই—কোনো একটি বড় কোম্পানির তিনি 'এজেন্ট', এই পরিচয়ই যথেষ্ট। ছেলেটিরও নাম-ধামের প্রয়োজন হবে না। ছেলেটি ঠোঙা থেকে একটি বাদাম তুলে ভেঙে খায়।]

এজেন্ট—বাদামের খোসা যত্র-তত্র ফেলবেন না!

ছেলে—খোসা ফেলতে আবার কোথায় যাব?

এজেন্ট—তাই বলে আমার পায়ের কাছে ফেলবেন!

ছেলে—(ওঁর পায়ের দিকে তাকিয়ে) সরি!

[ছেলেটি উঠে ভদ্রলোকের পায়ের কাছের বাদামের খোসা পা দিয়ে সরিয়ে দিয়ে বসে। ছেলেটি আর একটি বাদাম ভাঙে, খোসাটা দূরে ছুঁড়ে ফেলে। তারপর বাদামটা মুঠোয় নিয়ে একটু রগড়ে হাতের চেটোয় ফুঁ দিয়ে বাদাম থেকে লাল-খোসা উড়িয়ে দেয়।]

এজেন্ট—ফুঁ দেবেন না। গায়ে পড়ছে।

ছেলে—সরি!

[বাদাম মুখে পুরে ঠোঙাটা বন্ধ করে ছেলেটি। ভদ্রলোক আবার আগের ভঙ্গিতে ঘাড় কাত্ করে 'ফ্রিজ' হয়। ছেলেটি একটু অবাক চোখে ওঁর ভঙ্গিটা লক্ষ্য করে। এসময় ছেলেটির কাছাকাছি বয়সের একটি মেয়ে আসে। ভদ্রলোকের 'ফ্রিজ' ভেঙে যায়। মেয়েটি ছেলেটিকে বলে—]

মেয়ে—একটু আগেই হঠাৎ এক পশলা বৃষ্টি হয়ে গেল—আটকে গিয়েছিলাম। অনেকক্ষণ এসেছ?

ছেলে—এই এলাম। বোসো।

[ভদ্রলোক ছেলেটির পাশেই বসে আছেন। ওঁকে একটু অনামনস্ক লাগে। ছেলেটি ভদ্রলোককে সবিনয়ে বলে—]

ছেলে—একটু সরে বসবেন?

এজেন্ট—(তাকিয়ে) কিছু বলছেন?

ছেলে—একটু যদি সরে বসেন—

এজেন্ট—অসুবিধা আছে।

ছেলে—উনি বসতেন।

এজেন্ট—বসুন না। এধারে তো অনেক জায়গা পড়ে আছে।

ছেলে—তা আছে—তবে...

মেয়ে—তুমি থামো তো। ওখানে বসে যখন ওর আরাম হচ্ছে, বসুন না।

ছেলে—মানুষ কত বিচিত্র!

এজেন্ট—আমাকে কিছু বলছেন?

ছেলে—না মানুষ সম্পর্কে বলছিলাম।

এজেন্ট—আমি কী মানুষের মধ্যে পড়ি না?

ছেলে—পড়েন, তবে আমার দেখা মানুষের মধ্যে পড়েন না।

এজেন্ট—তারা কী রকম?

ছেলে—তারা এসব ক্ষেত্রে অনুরোধ করলে সরে বসেন।

এজেন্ট—বলেছি না, আমার অসুবিধা আছে। (উঠে পড়ে) আপনি আমার জায়গাটায় বসুন।

ছেলে—কেন?

এজেন্ট—বসুন না। কেন অসুবিধের কথাটা বলছি, বোঝাতে সুবিধা হবে। বসুন না। আমি রিকোয়েস্ট করছি—একবারটি বসুন—প্লিজ! (ছেলেটি বসে।)

এজেন্ট—এইবার রাস্তার দিকে তাকান! দূরের রাস্তাটা দেখতে পাচ্ছেন?

ছেলে—হ্যাঁ।

এজেন্ট—আর কিছু দেখতে পাচ্ছেন? রাস্তায়?

ছেলে—না।

এজেন্ট—ঘাড়টা একটু কাত্ করুন।

ছেলে—কোন দিকে?

এজেন্ট—বাঁ দিকে। দুটো গাছ আছে, তার ফাঁক দিয়ে তাকান। (ছেলেটি তাই করে।)

ছেলে—হ্যাঁ, এই রকম করে আপনি তাকাচ্ছিলেন বটে।

এজেন্ট—সেটা মার্ক করেছেন তাহলে? কী দেখছেন?

ছেলে—একটা মোটর গাড়ি।

এজেন্ট—হ্যাঁ। ওটা আমারই গাড়ি। গাড়িটা একটু বিকল হয়ে পড়েছে। আমার ড্রাইভার মেকানিক ডাকতে গেছে। এই সময়টায় পার্কটায় এসে বসেছিলাম। ঠিক ওখানটায় বসলেই গাড়িটার উপর নজর রাখা যায়, আর ড্রাইভার মেকানিক নিয়ে এল কিনা তাও দেখা যায়। একটু সরে বসলে, ব্যস—সব আউট অফ সাইট। ঘাড়টা সরিয়ে দেখুন এবার। (ছেলেটি তাই করে)

এজেন্ট—কী?

ছেলে—হ্যাঁ, আউট অফ সাইট।

এজেন্ট—তবেই বুঝুন, কেন আমি সরে বসতে চাইনি। একটু সরে বসেছি কি...

ছেলে—আসলে—

এজেন্ট—হ্যাঁ, এত সব বুঝবেন কী করে।

ছেলে—(নিজের জায়গায় সরে গিয়ে) নিন, বসুন আপনার জায়গায়।

এজেন্ট—থ্যাঙ্কস।

[এজেন্ট বসে পড়ে। ছেলেটি মেয়েটির দিকে বাদামের ঠোঙাটা বাড়িয়ে ধরে।]

ছেলে—বাদাম।

মেয়ে—তুমি খাও না।

ছেলে—আরে সঙ্কোচের কী আছে—পার্ক তো বাদাম খাবারই জায়গা। (এজেন্টকে) চলবে?

এজেন্ট—থ্যাঙ্কস। আমার সবই 'ফলস টিথ'। প্রেসার সইবে না। ঠোঙাটা দিন তো। (ঠোঙাটা নিজের বাক্সের উপর রাখে) ওরকম ঠোঙা বাড়িয়ে ধরে বাদাম খাওয়া যায়! মাঝখানে রইল—দুজনে তুলে তুলে খান। (মেয়েটাকে) নিন, খান।

[মেয়েটি বাদাম তুলে নেয়। ছেলেটি মেয়েটি বাদাম খেতে থাকে। ভদ্রলোক আবার ঘাড় কাত্ করে দ্যাখে। হঠাৎ সহজ ভঙ্গিতে খুশি গলায় বলে—]

এজেন্ট—যাক্, ঝামেলা চুকলো। ড্রাইভার মেকানিক নিয়ে এসে গেছে। এখন ভালোয় ভালোয় যদি তাড়াতাড়ি গাড়িটা ঠিক হয়ে যায়, বেঁচে যাই। ড্রাইভার জানে আমি এখানে আছি। ও টাইমলি এসে ডেকে নিয়ে যাবে। আর একটু কাল আপনাদের জ্বালাব ভাই। অন্য জায়গায় গিয়ে বসতে পারতাম। কিন্তু আর তো বেঞ্চি নেই। আর, একটু আগে বৃষ্টি হয়ে ঘাস-মাটিও ভিজে। (উঠে পড়ে) নিন, এবার আপনারা কাছাকাছি বসুন।

মেয়ে—না-না ঠিক আছে।

এজেন্ট—ঠিক নেই। সরে বসুন। মিনিমাম সৌজন্যটুকু আমাকে করতে দিন। নিন ভাই, সরে বসুন।

ছেলে—বলছেন, বোসো না।

[মেয়েটি কাছাকাছি বসে। মেয়েটির জায়গায় বসেন এজেন্ট ভদ্রলোক]

মেয়ে—(ছেলেটিকে) ঝালনুন আনোনি? না চাইলে আজকাল দেয় না।

ছেলে—দিল তো। ঠোঙার মধ্যেই আছে মনে হয়।

মেয়ে—হ্যাঁ, আছে।

[ঠোঙার ভিতর থেকে ছোট প্যাকেটগুলো বের করে মেয়েটি ছেলেটিকে একটা দেয় নিজে একটা খুলে খায়। এজেন্ট একটা সিগারেট ধরায়।]

ছেলে—আজ কি বার বল তো?

মেয়ে—বুধবার।

ছেলে—বাদামের খোসাগুলো একটু দূরে ফেলো। আমি তো ওঁর পায়ের ওপরই ফেলছিলাম।

মেয়ে—তুমি তো ঐ রকমই।

ছেলে—আজ কত তারিখ বল তো?

মেয়ে—(বিরক্ত) জানি না।

এজেন্ট—চাকরি-বাকরি বোধহয় করেন না?

ছেলে—জোটেনি। সাত বছর ধরে দুপুরবেলা বাদাম ভাঙছি। ওর অবশ্য একটা টিউশন আছে।

এজেন্ট—সত্যি, দিনকে দিন দেশকালের যে কী হাল হচ্ছে!

[এসময় ওদের কাছাকাছি একজন ভাঙাচোরা চেহারার মধ্যবয়সী লোক আসেন। পরনে ধুতি, সার্ট, বগলে ছাতা, এক হাতে প্লাস্টিকে জড়ানো কিছু মলিন কাগজপত্র। মানুষটি একজন জ্যোতিষী। প্রথমে এজেন্টকে জিজ্ঞাসা করেন]

জ্যোতিষী—ফটো তুলবেন, স্যার?

এজেন্ট—ফটো?

জ্যোতিষী—শুধু হাতখানা বাড়িয়ে দেবেন স্যার—আপনার ভবিষ্যতের ফটো তুলে দেব। আমি একজন Professional Palmist স্যার। এই পার্কটার ধারে ফুটপাতে বসতাম। ফুটপাত অপারেশান হয়ে গেল। পুলিশ বসতে দিচ্ছে না। এখন ঘুরে ঘুরে কাজ করি। Only five rupees, Sir—দক্ষিণা যৎসামান্য। দেখাবেন স্যার? হাত?

এজেন্ট—মাফ করুন।

জ্যোতিষী—(ছেলেটিকে) আপনি, ছোটভাই?

ছেলে—কী হবে?

জ্যোতিষী—কী হবে মানে? নিজের Future-টা জেনে নিচ্ছেন—এর কোন value নেই?

[বলেই ছেলেটির হাতখানা টেনে নিয়ে তার উপর ম্যাগনিফাইং গ্লাস ধরে।]

মেয়ে—ও হাত দেখাবে না বলল তো।

জ্যোতিষী—তাহলে আপনার হাতখানা দেখি দিদিভাই।

মেয়ে—আমার ভবিষ্যৎ আমার জানা আছে।

জ্যোতিষী—বেশ তো—এবার আমি যা বলি তার সঙ্গে মিলিয়ে নিন।

মেয়ে—আমার দরকার নেই।

জ্যোতিষী—দরকার নেই বললে আমার চলবে কেন? ঠিক আছে দু-টাকা concession করে দিলাম। তিন টাকা নেব—একটা হাফ-পাউণ্ড রুটির দামটাতো দেবেন।

আর কথা বলবেন না, মন দিয়ে দেখতে দিন। (দেখতে থাকে ছেলেটির হাতটা) আছে, আছে!

ছেলে—কী আছে?

[ছেলেটির মুখের দিকে তাকিয়ে মুচকি হাসে জ্যোতিষী]

জ্যোতিষী—আয়ু। আপনার তো কচ্ছপের পরমায়ু মশাই! তাছাড়া পাচ্ছেন। নিশ্চয়ই পাচ্ছেন।

মেয়ে—কী পাবে?

জ্যোতিষী—পেলেই বুঝবেন। (হাতে কী লক্ষ্য করে) না, হবে।

ছেলে—কী হবে?

জ্যোতিষী—হলেই বুঝবেন। তবে হবে। নিশ্চয়ই হবে। আমার গণনায় ভুল নেই। (হাতের দিকে তাকিয়ে) ইস্। আছে। পরিষ্কার আছে। ফাঁড়া। ভয়ঙ্কর ফাঁড়া। তবে তার দাওয়াইও আমার কাছে আছে। (পকেট থেকে একটা মাদুলি বের করে) মোটে দশ টাকার বিনিময়ে এটা ধারণ করে নিলে, ফাঁড়া বেমালুম কেটে যাবে।

[হাত সরিয়ে নেয় ছেলেটি]

ছেলে—মাদুলির আগে পর্যন্তই থাক। দক্ষিণা দিয়ে দিচ্ছি।

[ছেলেটি টাকা দেয়]

জ্যোতিষী—ভগবানের মার—মাদুলিটা নিতে পারতেন। ঠাকুরের ইচ্ছার বাইরে তো আপনি যেতে পারেন না—Man is actor, God is director—এই কথাটার value আছে কি না ভাববেন। (এজেন্টকে) স্যার, হাত না দেখান—একটা বিঘ্ননাশক মাদুলি নিয়ে ধারণ করবেন। কমসম করে দেব।

এজেন্ট—আমি নিজে মাদুলি দিয়ে থাকি—সেই আমাকে গছাতে চাইছেন? (বাক্স খুলে একটা লোগো বার করে) এই লোগোটা হচ্ছে আমাদের কোম্পানির মাদুলি—যে এই মাদুলি ধারণ করবে সে রাজা হয়ে যাবে। (বাক্সে লোগো রাখে) আচ্ছা আসুন।

জ্যোতিষী—ও। রাজা হয়ে যাবে? তা আমি ওটা ধারণ করতে পারি?

এজেন্ট—না। আপনি চাইলেই দেব না। মানুষ চাইলেই আমরা দেই না আমাদের ইচ্ছে না হলে কেউ পেতে পারে না—Man is actor, we are directors—বুঝলেন কিছু?

জ্যোতিষী—বুঝলাম! আচ্ছা আসি!

[জ্যোতিষী চলে যায়]

এজেন্ট—বেচারা।

ছেলে—তবু যা হোক করে খাচ্ছেন।

মেয়ে—(ছেলেটিকে) তোমার তো সে যোগ্যতাটুকুও নেই!

[বাক্স খুলে এজেন্ট একটা ম্যাগাজিন বের করে।]

এজেন্ট—সময় কাটাতে এটাই একটু পড়ি। ডিসটার্ব করছি না, আপনারা নিজেদের মতো গল্প করুন।

ছেলে—গল্প আর কী...আমরাও বসে বসে সময় কাটাই।

[এজেন্ট একটু হেসে ম্যাগাজিনে চোখ রাখে। ওরা চুপচাপ বাদাম খায়। একসময় ছেলেটি বলে—]

ছেলে—বুঝলে, আজ একটা কাণ্ড হয়েছে। জ্যোতিষী ভদ্রলোক বল্লেন না—'পাচ্ছেন'?

মেয়ে—তাতে কী?

ছেলে—পার্কে ঢুকে দু পা যেতেই দেখি একটা মানিব্যাগ পড়ে আছে।

মেয়ে—তাই?

[এজেন্ট তার অ্যাটাচি খুলে মানিব্যাগটা বার করে। তারপর রেখে বাক্স বন্ধ করে। তারটা নয় ভেবে নিশ্চিন্ত হয়। ম্যাগাজিনে ফের মন দেয়।]

ছেলে—তুলব কি না, ভাবছিলাম। তারপর তুলেই নিলাম। খুলে কী দেখলাম বলো তো?

মেয়ে—(হেসে) ফক্কা!

ছেলে—নাহে, জিনিস ছিল...গুণে দেখলাম হাজার পাঁচেক হবে।

মেয়ে—আচ্ছা! সত্যি বলছ, না কি?

[এজেন্ট ম্যাগাজিনে চোখ রাখলেও ছেলেটির কথায় কৌতূহলী বোঝা যায়।]

ছেলে—দেখবে? ব্যাগ আছে।

মেয়ে—থাক না পরে দেখব।

ছেলে—টাকাটা নিয়ে কী করা যায় বলতো? অলরেডি তো একটা খরচ করে বাদাম কিনে ফেলেছি।

মেয়ে—দেখি ব্যাগটা দাও তো।

[ছেলেটির কাছ থেকে থলেটা নিয়ে ভিতরে হাত ঢুকিয়ে উঁকি মেরে টাকাটা আছে কিনা দেখে। প্রথমে খুশি ভাব চোখে, তারপর চিন্তিত।]

ছেলে—কী বাজে কথা বললাম?

মেয়ে—টাকাটা খুব 'নিডি' কারুরও হতে পারে।

ছেলে—লোকাল থানায় জমা দেব?

মেয়ে—তাতে ঠিক-লোক পেয়ে যাবে? পায়?

ছেলে—কী জানি।

মেয়ে—কাগজে বিজ্ঞাপন দিতে পার। প্রমাণ দিয়ে যার সে নিয়ে যাবে।

ছেলে—ভাবছি, দুচার দিন সঙ্গে নিয়ে ঘুরি—কেমন ফিলিংটা হয় দেখি। তারপর

ওসব ভাবা যাবে। এতগুলো টাকা সঙ্গে নিয়ে চলার মজাটা একটু টেষ্ট করব না!

[মেয়েটা হঠাৎ হাসতে থাকে।]

ছেলে—অত হাসছ?

মেয়ে—হাসছি, একটা মজার কাণ্ড হয়েছে, তাই!

ছেলে—কাণ্ডটা কী?

মেয়ে—ও তুমি বললে বিশ্বাস করবে না। তবে প্রমাণ আমার সঙ্গেই আছে।

ছেলে—কী বলোই না।

মেয়ে—অদ্ভুত যোগাযোগ!

ছেলে—কিসের যোগাযোগ?

মেয়ে—সে আছে।

ছেলে—হেঁয়ালি রেখে বলবে তো?

মেয়ে—আমিও আজ তোমার মত একটা জিনিস কুড়িয়ে পেয়েছি।

[এজেণ্ট ভদ্রলোক এবার ম্যাগাজিন ছেড়ে তাকায়। ছেলে মেয়েরা তা লক্ষ্য করেনা—নিজেদের প্রসঙ্গেই তারা মশগুল।]

ছেলে—রিয়ালি?

মেয়ে—প্রমাণ আছে। জিনিসটা আমার ব্যাগেই আছে।

ছেলে—কী?

মেয়ে—একগাছা সোনার সরু চেন আর তার সঙ্গে হীরে বসানো দারুণ একটা পেনডেণ্ট! দেখবে?

[মেয়েটা ব্যাগটা খোলে। ছেলেটি উঁকি দেয়। চোখে বিস্ময়। হাত বাড়িয়ে হারটা তুলতে যায়। মেয়েটি ব্যাগ বন্ধ করে।]

মেয়ে—উঁহু...পর দ্রব্যে হাত দিতে নেই।

ছেলে—আরে দেখতাম—খাঁটি না মেকি।

মেয়ে—তার তুমি কী বুঝবে? এসব তোমার চেয়ে আমি বেশি বুঝি। খাঁটি জিনিস। হুকটা ভাঙা। ঐ জন্যই কারুর গলা থেকে কখন খুলে পড়ে গেছে।

ছেলে—কোথায় পেলে?

মেয়ে—একটু আগে যখন বৃষ্টিটা নামল—রাস্তার ধারে একটা দোকানের শেডের তলায় দাঁড়িয়ে ছিলাম। হঠাৎ দেখি পাশের ঘাসের মধ্যে কী একটা চিকচিক করছে। তুলে নিলাম। ভাবছি, আমিও ক'দিন গলায় পরে একটু জেল্লা দিয়ে ঘুরে বেড়াই। তারপর না হয় ভাবা যাবে—এটা কার সম্পত্তি, কী করে ফেরৎ দেওয়া যায়।

[পাশের লোকটি গভীর মনোযোগ দিয়ে শুনছে।]

ছেলে—সত্যি, এরকম যোগাযোগ খুব একটা হয় না। দুজনে একই দিনে, প্রায় একই সময়ে দুটো জিনিস কুড়িয়ে পেলাম।

মেয়ে—আমরা বেশ লাকি আছি, তাই না?

ছেলে—লাকি তো বটেই। আর এতো প্রথম নয়—আগে কতবার কুড়িয়ে পেয়েছি বলো?

এজেন্ট—এই রকম এক সঙ্গে, একই দিনে দুজনে কুড়িয়ে পান?

ছেলে—পাই।

এজেন্ট—মাঝে মধ্যেই পান?

ছেলে—হ্যাঁ।

এজেন্ট—এ ভারি আশ্চর্য তো!

মেয়ে—আমাদের মত লাকি হলে আপনিও পেতেন। আমরা একসঙ্গে এভাবে যেমন পাই তেমনি হারাইও—একসঙ্গে একই দিনে, একই সময়ে।

এজেন্ট—অদ্ভুত! গাড়িটা খারাপ হয়ে একটা দারুণ এক্সপেরিয়েন্স হল তো আমার। না, আপনাদের 'মিট' করে আমিও 'লাকি'। এরকম পেয়ার! ফ্যানটাসটিক।

ছেলে—আচ্ছা, আপনি কী সাজেস্ট করেন?

এজেন্ট—কী ব্যাপারে?

ছেলে—এই যে আমরা টাকা পেলাম, হারটা পেলাম—এটা কী ফেরৎ দেবার চেষ্টা করব?

এজেন্ট—ক্ষেপেছেন। এসব মরালিটির পেটে গুলি মারুন! বরাত জোরে যখন পেয়েছেন—চোখ বুজে ফুঁকে দিন।

ছেলে—তাই?

এজেন্ট—আব্বার কী! চাকরি নেই, বাকরি নেই—দুদিন ঐ দিয়ে ফূর্তি করুন। আজ কী দেখেছেন চারিদিকে, হাতের কাছে যে যা পাচ্ছে দেন অ্যাণ্ডু দেয়ার গিলে ফেলছে। দেদার গিলছে আর ঢেকুর তুলছে। ঢেকুরের আওয়াজে কী ভয়ঙ্কর বায়ুদূষণ হচ্ছে তবু পরোয়া আছে কারুর? এই যে আমি ফল্স টিথ নিয়ে বাদাম চিবুতে পারি না, কিন্তু ফেলুন মুখের সামনে একটা হীরের ড্যালা ওসব মরালিটি-ফরালিটির ধার ধারব না, কুচকুচ করে চিবিয়ে খাব। নইলে তিন ছটাক কলেজি বিদ্যে নিয়ে আমি ঐ দামি গাড়ি নিয়ে ঘুরি! যা পেয়েছেন তা দিয়ে দুদিন আমোদ করুন, বাজে চিন্তা ছেড়ে দিন।

ছেলে—আচ্ছা, আমি বলছিলাম কি—(মেয়েটিকে) বলব ওঁর সামনে?

মেয়ে—কী?

ছেলে—আমাদের সেই ইচ্ছের কথাটা।

মেয়ে—রাখো তো। কিছুতেই তুমি ও ব্যাপারটা ভুলতে পারো না।

ছেলে—খারাপ কথা তো নয়, বলেই ফেলি। (এজেণ্টকে) বুঝলেন, বলছিলাম—ওর গয়নাও হল আর আমার হাতে কিছু টাকাও এল। এই টাকা দিয়ে সংক্ষেপে যদি আমরা বিয়েটা সেরে ফেলি, কেমন হয়?

এজেণ্ট—(অবাক) বিয়ে!

ছেলে—হ্যাঁ।

এজেণ্ট—সম্বল তো পাঁচ হাজার?

ছেলে—সংক্ষেপে সারব। খুব সখ ছিল। মনের মতো সঙ্গীও পেয়েছিলাম। বিয়ে না করেই মরে যাব?

এজেণ্ট—কিন্তু বিয়ে তো একটা কণ্টিনিউড্ খচ্চা। চাকরিও তো নেই বলছেন।

ছেলে—হবে তার সম্ভাবনাও নেই।

এজেণ্ট—তাহলে?

ছেলে—বিবাহিত জীবন নো হোক, অন্তত, বিয়েটা হল—যথা লাভ। কি বলেন?

এজেণ্ট—ভাবিয়ে তুললেন।

[হঠাৎ মেয়েটি খুব হাসতে থাকেন।]

ছেলে—হাসছ কেন?

মেয়ে—হাসব না? যথেষ্ট হয়েছে, এবার থামো।

ছেলে—থামব?

মেয়ে—আমাদের খেলার মধ্যে ভদ্রলোককে কেন জড়াচ্ছ?

ছেলে—ঠিকই বলেছ। আমাদের খেলা আমাদের মধ্যে থাকাই তো ভাল।

এজেণ্ট—খেলা মানে?

ছেলে—কিছু মনে করবেন না—আমি কুড়িয়ে টাকা পাইনি, উনিও হার কুড়িয়ে পাননি। আমরা বসে বসে কী করি—এই রকম মনগড়া সব খেলা খেলি। সময় কেটে যায়।

এজেণ্ট—সত্যি বলছেন?

ছেলে—তাছাড়া কি? এই দেখুন (থলেটার ভিতরটা দেখায়) আছে মানি ব্যাগ? ওর ব্যাগেও ফক্কা!

এজেণ্ট—দিস ইজ অলসো ইণ্টারেস্টিং!

মেয়ে—কেবল কুড়িয়ে পাবার খেলা না, আরও হাজার রকম খেলা আমরা খেলি।

এজেণ্ট—কি রকম?

মেয়ে—বললাম না—সে হাজার রকম।

এজেণ্ট—যাস্ট গিভ মি ওয়ান মোর এক্সাম্প্ল্।

মেয়ে—ধরুন লেকের ধারে বসে আছি। সমুদ্দুর দেখার কোন সুযোগ তো আমাদের নেই, অথচ সখ খুব। কী করি? তাই এরকম খেলি।

ছেলে—এটা আমদের ফেভারিট খেলা। বেশ লাগে খেলতে।

মেয়ে—এক সময় লেকের জল আমাদের চোখের সামনে ফুলে, ছড়িয়ে বিশাল হয়ে ওঠে।

ছেলে—বিলিভ মি—তখন আমরা যেন সত্যি সমুদ্রটাকেই দেখি। আঃ প্রকাণ্ড সেই সমুদ্র।

এজেন্ট—ঢেউ ওঠে?

ছেলে—ওঃ, সে কী ঢেউ! একটার পর একটা। আর কী উঁচু যেন আকাশ ছুঁয়ে দেবে!

মেয়ে—আর সেই ঢেউ-এ যে কত ঝিনুক উঠে আসে।

এজেন্ট—দেখতে পান? ঝিনুক দেখতে পান?

মেয়ে—দেখতে পাই কী—আমি তো কুড়োই।

ছেলে—আমরা দুজনে কুড়োই।

মেয়ে—কুড়োতে কুড়োতে ঝিনুকের পাহাড় হয়ে যায়। আর সে কত রঙের ঝিনুক, কত রকম কাজ-করা ঝিনুক!

এজেন্ট—তারপর আবার রিয়ালিটিতে ফিরে আসেন? কী রকম ফিলিং তখন?

ছেলে—আন্দাজ করুন। আপনার কী রকম ফিলিং হত?

এজেন্ট—আমার এসব আসেই না। আমি যা কিছু করি, নিক্তিতে ওজন করে নিই। যাতে লাভ নেই, তাতে আমি নেই। তবে কী জানেন, আমিও খেলি।

মেয়ে—তাই?

এজেন্ট—আমার খেলাটা আপনাদের খেলার একেবারে উল্টো ব্যাপার।

ছেলে—কী রকম?

এজেন্ট—আপনাদের খেলাটা তো 'ডে ড্রিম' ছাড়া কিছুই না—কল্পনায় গড়া একটা অলীক স্বপ্ন। কিন্তু আমার খেলাটা রক্তমাংস দিয়ে বানানো একটা জ্যান্ত স্বপ্ন। রিয়াল-ভেরি মাচ্ রিয়াল। স্বপ্ন কী? আপনার আকাঙ্ক্ষা, আপনার মনের মতো ভবিষ্যতের ছবি—তাইতো?

ছেলে—নিশ্চয়ই।

এজেন্ট—আমরা খেলতে এসেছি এই আকাঙ্ক্ষা মেটাতে, মানুষের মনের মতো ভবিষ্যৎ গড়ে দিতে। কে গড়বে? গড়বে আমার 'বস্'। আমাদের খেলার নাটের গুরু আমাদের বস্।

মেয়ে—'বস্'?

এজেন্ট—ইয়েস—মাই 'বস্'। এই 'বসে'রাই হচ্ছে সুপার পাওয়ার। তাঁরাই কনট্রোল করতে চলেছেন গোটা পৃথিবী।

ছেলে—কে এই 'বস্'?

এজেন্ট—'বস্' তো একজন নন। তবে আই অ্যাম আনডার মাই বস। আমি তাঁর এজেন্ট। আমার বস্ একজন জায়ান্ট বিজনেসম্যান, এ সুপার হিরো, ওয়ান অফ

দি এম্পারর্স অব দি ফিউচার ওয়ার্লড। হি ইজ দ্য সান ইন দ্য ডে-টাইম অ্যাণ্ড দ্য মুন অ্যাট নাইট। তিনি জগৎ-জোড়া খ্যাতিমান বাণিজ্যসংস্থা 'অক্টোপাস লিমিটেড নাম্বার ওয়ানের' সর্বময় প্রভু।

মেয়ে—অক্টোপাস লিমিটেড! ভীষণ চেনা নাম!

এজেন্ট—অক্টোপাস লিমিটেড নাম্বার ওয়ান। মনে রাখবেন—নাম্বার ওয়ান।

ছেলে—ও আপনারাই নাম্বার ওয়ান?

এজেন্ট—ইয়েস। আমাদের থেকে যে-সব বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানের পজিশন যত কম ততই তাদের নাম্বার বাড়বে—নাম্বার টু, নাম্বার থ্রি, নাম্বার ফোর এই রকম। আমাদের মধ্যে নাম্বার ওয়ান হবার জন্য করপোরেট ওয়ার্ল্ডের লড়াই যে কী রোমাঞ্চকর! কেউ লিখতে পারলে সেটাই হবে বিশ্বের শ্রেষ্ঠতম থ্রিলার, কেউ ছবি করলে সেটাই হবে সর্বকালের সেরা 'ওয়ার ফিল্ম'। আমাদের এ-দিকটা আপনাদের ঠিক বোঝানো যাবে না, সব কথা বলাও যাবে না। আমাদের এদিককার পরিচয় অনেকটাই আপনাদের অজানা থাকে কিন্তু আমাদের আর একটা দিক আজকাল আপনাদের কাছে প্রতি মুহূর্তে তুলে ধরা হচ্ছে। তা হল আমাদের স্পনসরশিপ।

ছেলে—হ্যাঁ হ্যাঁ—টিভি-তে, কাগজে, ব্যানারে হরদম আপনাদের নাম শোনা যায়। আপনারা তো বিরাট স্পনসরার।

এজেন্ট—আমাদের 'লোগো'টিও নিশ্চয়ই লক্ষ বার দেখেছেন—একটা অক্টোপাস তার পাশে লেখা 'ওয়ান'। দেখেননি?

মেয়ে—কে না দেখেছে?

এজেন্ট—পৃথিবীর যত নামি-দামি প্লেয়ারস, অ্যাথলিটস, অভিযাত্রী, শিল্পী—সব হাতে পায়ে গায়ে জামায়, টুপিতে এই লোগো লটকে রেখেছে। পৃথিবীতে আজ সেরা অলঙ্কার আমাদের লোগো। যাবতীয় শিল্পকর্মের ফেস্টিভাল, ফাংশন, ওয়ার্লড কাপ, মায় অলিম্পিকের আসর আমাদের পতাকা তুলতে না চাইলে অমন জাঁকিয়ে কিছুতেই হতে পারবে না। খালি শিল্পী, খেলোয়াড়—ভেবে দেখুন, আপনার দেশটাও স্পনসররা চালাচ্ছে কী না!

[বলেই কুলকুল করে হাসে এজেন্ট]

ছেলে—একটা কথা জিজ্ঞেস করব?

এজেন্ট—নিশ্চয়ই।

ছেলে—এসব ভাষণ আমাদের শোনাচ্ছেন কেন?

এজেন্ট—ভাষণ? কিন্তু সত্যভাষণ নয় কী?

মেয়ে—সত্য হোক, মিথ্যে হোক আমাদের শুনে কী হবে?

এজেন্ট—হবে। আমার মহিমাটি বোঝার সুবিধা হবে। আমরা যে আপনাদের

জীবনটা বদলে দিতে পারি তা বিশ্বাস হবে। জানেন ভাই, এই যে হঠাৎ উত্তেজিত হয়ে এত কথা বলছি তার পিছনে একটা কারণ আছে। ঐ যে আপনাদের বিয়ের সাধটা কল্পনায় মেটাচ্ছিলেন—ঐ ব্যাপারটা হঠাৎ আমার মাথায় চড়াৎ করে একটা আইডিয়া জন্ম দিল। আপনাদের মতো হতভাগ্য বেকারের সংখ্যা তো গুণে শেষ করা যাবে না। এদের বিয়ের সাধ থাকলেও সাধ্য তো হয় না। আমি ভাবলাম আমার কোম্পানিকে বুঝিয়ে আমরা যদি এদের বিয়েটা স্পনসর করতে শুরু করি—তাহলে একটা অভিনব কাণ্ডের বিরাট প্রচারের সুযোগ মিলবেই। আমাদের কাছে প্রচারের সুযোগটাই বড় কথা। সে বড় মাপের প্লেয়ারকে দিয়েই হোক বা আপনাদের মতো অনাথদের দিয়েই হোক। দরিদ্র বেকার যুবক-যুবতীর স্পনসরড্ বিবাহ তৎসহ পাঁচবছরের জন্য স্পনসরড্ বিবাহিত জীবন! আঃ মারভেলাস। ফ্যানটাসটিক আইডিয়া। এক অভিনব ঘটনা, অভিনব প্রচার। দারিদ্র্যের মোকাবিলায় এ-এক অত্যাশ্চর্য পদক্ষেপ। আহা প্রচারের সঙ্গে দেশ জুড়ে কী সহানুভূতিই না পাব। এ আমি কী ভাবলাম—এতো প্রচারের জগতে এক মহান বিপ্লব। চলুন ভাই, আপনাদের বিয়ের আয়োজন করি। শুভস্য শ্রীঘ্রম।

ছেলে—আপনি কী ধরেই নিয়েছেন, আমরা পাগলামিতে মেতে উঠব?

এজেন্ট—পাগলামি বলছেন কেন ভাই।

মেয়ে—তাছাড়া আর কী বলব?

এজেন্ট—দেখুন আমি যা বললাম, তা হবে। আপনারা রাজি না হলেও হবে। দেশে কী আপনাদের মতো পেয়ারের অভাব নাকি? যখন এতে প্রচারের গন্ধ পেয়েছি, আমরা তা কাজে লাগাবই।

ছেলে—তা লাগান। আমাদের নিয়ে টানাটানি কেন?

এজেন্ট—কেন? আপনারা আমার এই চমকপ্রদ আইডিয়ার উৎস। তাই আপনাদের আমি প্রেফারেন্স দিতে চাই। আপনাদের দিয়েই শুরু হবে এক প্রচারের নতুন ইতিহাস। আমি বুঝতে পারছি না, আপনাদের আপত্তিটা কোথায়? বিয়েটা তো আপনারা চান, চান না?

ছেলে—তা চাই। বিয়ের পর?

এজেন্ট—ঐ যে বললাম, পাঁচ বছরের বিবাহিত জীবনের যে খরচা তার দায়িত্বও আমাদের।

মেয়ে—পাঁচ বছর পর?

এজেন্ট—ততদিনে একটা হিল্লে হয়তো করে ফেলবেন। নয়তো আমরা তো আছি। সুযোগটা ছাড়বেন না—মহা লোকসান হয়ে যাবে। দুদিন বাদে কাগজে টিভিতে দেখবেনই যে এই মহা ঘটনাটি ঘটেছে। হাতের লক্ষ্মী পায়ে ঠেলবেন না। আপনাদের মুখের গ্রাস অন্যে খাবে—তা ভালো লাগবে?

ছেলে—কী রকম ভাবতে লাগে না—স্পনসরড্ বিয়ে!

এজেন্ট—তা-বড় তা-বড় খেতাবী লোকেরা স্পনসর ধরার জন্য পাগল হয়ে উঠছে তাদের তো কিছু লাগছে না? আপনাদের যত ইয়ে!

মেয়ে—না, মানে আপনাদের প্রচারের জন্য বিয়েটা হচ্ছে এটা ঠিক...

এজেন্ট—আজ আমাদের পণ্য বিক্রির প্রচারে নামছে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ লোকেরা। আমরা তাদের কায়দা করতে পারলাম, আর আপনাদের যত ইয়ে! তারা আমাদের জন্য কত করছে! কই আপনাদের মত বেঁকে যেতে চাইছে না তো। কত বড় গুণী-গুণী মানুষ সব! ওদের ইনডিপেনডেন্স, স্পর্শকাতরতা, অহংকারের গায়ে তো আমাদের 'লোগো' পরতে কলংকের দাগ হয় না—কেউ তো ওকথা বলে না। দেয়ালে না লটকে ওদের গায়ে আমাদের বিজ্ঞাপন লটকাচ্ছি, কেমন হাসি মুখে মেনে নিচ্ছে। আর কী বাধ্য। যদি বলি মরুভূমিতে দুপুরে ক্রিকেট টুর্ণামেন্ট খেলতে হবে—ওরা গায়ে ফোস্কা তুলে ফেলবে। যদি বলি খেলার চেয়ে লোগোটা বেশি দেখাও, দেখাবে। শুধু প্লেয়ার, আমাদের স্পনসর পেতে, আমাদের লোগো চাটতে সব দিকের কোটি কোটি ট্যালেন্টরা জিভ লক্ লক্ করে নাচাচ্ছে। এদের পাশে গিয়ে দাঁড়াতে জাত যাচ্ছে। এখন তো এতেই ইজ্জত।

ছেলে—তা ঠিক। (মেয়েটিকে) কি গো, রাজি হয়েই যাই?

মেয়ে—তা যা ভাল বোঝ।

এজেন্ট—ব্যস, মিটে গেল! চলুন আপনাদের কোম্পানিতে নিয়ে যাই। কিছু কাজের কথা হোক। চলুন।

[যেতে যেতে মেয়েটি বলে—]

মেয়ে—কটা দিন ভাববার জন্য সময় নিলে হত না?

[এজেন্ট দাঁড়িয়ে পড়ে বলে—]

এজেন্ট—এতে নতুন করে ভাববার কী আছে তা তো আমি বুঝলাম না।

ছেলে—ভেবে কিন্তু সত্যি কূল পাব না।

এজেন্ট—তব্বে! আরে মিলে মওকা লুটো ফ্যায়দা...মেক হে, ম্যান, হোয়াইল দি সান সাইনস...ঝোপ বুঝে কোপ মারাটাই না হালফিলের আর্ট অফ লিভিং। এতে আপনাদের লাভ ছাড়া তো কোন লোকসান নেই। কী আমার আরগুমেণ্টে কিছু ভুল আছে?

ছেলে—আরগুমেণ্ট ঠিক আছে।

এজেন্ট—আপনাদের মতো অন্যদের দিয়েও আমার কাজ চলে যায় তা সত্ত্বেও আপনাদের আমি ফেভার করতে চাইছি। রাজি না হলে পস্তাবেন। আর এতো দয়ার ব্যাপার নয়—আমাদের প্রচারের কাজে আপনারা মদত্ দিচ্ছেন না? তার বদলে আপনারা যা পাবার পাচ্ছেন। এ আপনাদের হকের পাওনা।

ছেলে—(মেয়েটিকে) মনে আর ধন্ধ রেখ না—আমাদের মতো অবস্থায়, এতে দোষটা কোথায়? তোমার হয়ে কেউ ভাববার আছে? ধরো না, দুজনের একধরনের চাকরিই জুটে গেল।

এজেন্ট—তব্বে!

ছেলে—ঠিক হ্যায়—চালাও পানসি!

এজেন্ট—রাইট তো চলিয়ে। ভেবে দেখুন, আমরা কেবল নামি-দামিদের কথাই ভাবছি না—আমরা সবার জন্য। আপনাদের জন্যও দরজা খুলে দিলাম। ঐ যে একটা বিজ্ঞাপনের কথা শোনা যায় না—নাথিং অফিসিয়াল অ্যাবাউট ইট—আ হা!

[মঞ্চ অন্ধকার হয়ে যায়]

পর্ব দুই

[ম্যারেজ রেজিস্ট্রারের ঘর যেমন হয়ে থাকে তেমনি একটি ঘর। রেজিস্ট্রার সিলিং-এর দিকে তাকিয়ে সিগারেট টানছেন। টেবিলে ফোনটার কাছে একটা টেপ-রেকর্ডার। অদূরে এজেন্ট একটা চেয়ারে বসে হাঁটুর উপর একটা ফাইল রেখে পেন দিয়ে কী সব লিখছে। ফোনটা বাজে। এজেন্ট তাকায়। রেজিস্ট্রার ভদ্রলোকের ভ্রুক্ষেপ নেই। ফোনটা বেজেই চলছে—]

এজেন্ট—ফোনটা ধরুন।

[ভদ্রলোক নির্বিকার ভাবে ধোঁয়া ছাড়ছেন। ফোনটা রিঙ হতে থাকে।]

এজেন্ট—আরে! ফোনটা ধরবেন তো! আমার রিজিওনাল বস হয়তো ফোন করছেন! ধরুন ফোনটা!..কী আজব লোক রে বাবা!

[ভদ্রলোক নির্বিকার। এজেন্ট উত্তেজিতভাবে এসে ফোনটা ধরে।]

এজেন্ট—হ্যালো, ও, স্যার আপনি?...সরি, ভেরি মাচ সরি স্যার!...হ্যাঁ স্যার...ম্যারেজ রেজিস্ট্রারের চেম্বার থেকেই কথা বলছি...তিনি আমার কাছেই বসে আছেন।...ইয়েস... ইয়েস...কী করব স্যার...বরকনে সেজে এলেই রেজিস্ট্রারকে নিয়ে আমি অফিসের হল ঘরে চলে আসছি।...আচ্ছা...আচ্ছা হোয়াট টাইম ইজ ইওর প্লেন? অল রাইট...ঠিক সময়েই ওদের নিয়ে চলে আসব স্যার।...আই ওণ্ট টেক লঙ। ইউ নেম দি আওয়ার, অ্যাণ্ড আই স্যাল অ্যাপিয়ার।...হোয়াট টাইম? ও.কে. স্যার। সিওর...সিওরলি...নো, আই অ্যাম অলওয়েজ অ্যাট ইওর সারভিস স্যার।...ডোণ্ট মেনশন ইট স্যার, ইটস মাই প্রিভিলেজ...ও.কে. ও.কে. স্যার।

[এজেন্ট ফোন রেখে দেয়।]

এজেন্ট—এই যে মশাই, আপনার মতো ক্যালাস লোক আমি আর দ্বিতীয়টি দেখেছি বলে তো মনে হয় না। এতো করে ফোনটা ধরতে বললাম—কথা কানে তুললেন

না! আমার রিজিওনাল বস ফোন করলেন...আমি বললাম সে কথা আপনাকে। (ভদ্রলোক অন্য দিকে তাকিয়ে নির্বিকার ধূমপান করেই চলেছেন) এখনও তো দেখছি আপনার কোনো হুঁশই নেই। এই যে, দয়া করে একবার আমার দিকে তাকান।...কী? হল কী!

[এজেন্ট হাত দিয়ে ওর মুখটা নিজের দিকে ঘুরিয়ে আনে।]

এজেন্ট—পেয়েছেন কী আপনি?

রেজিষ্ট্রার—কিছু বলছেন?

[বলেই ভদ্রলোক তার হিয়ারিং এইডটা কানে গুঁজে দেয়।]

রেজিষ্ট্রার—বলুন।

এজেন্ট—এবার বোঝা গেল! যন্ত্র ছাড়া যখন আপনি বদ্ধ কালা তখন এটা পরে থাকেন না কেন? আর ম্যানেজমেন্ট ডিপার্টমেন্টও হয়েছে তেমনি...ঠিক মতো একজন রেজিষ্ট্রারও যোগাড় করতে পারে না। এটা একদম খুলবেন না কান থেকে।

[চেয়ারে গিয়ে এজেন্ট ফাইল তুলে নেয়।]

রেজিষ্ট্রার—আপনি একটা টিফিনের ব্যবস্থা করবেন বলেছিলেন।

এজেন্ট—টিফিন! এদিকে আমার বর-কনে এসে পৌঁছলো না। ফোনে রিজিওনাল বস ধাতাচ্ছেন। দু-ঘন্টা বাদে তার ফ্লাইট ধরতে হবে। আপনাদের নিয়ে, কখন যে আফিস-হলে পৌঁছব! ওখানে ওদের বিয়ের পাট সারতে আপনার কতক্ষণ লাগবে?

রেজিষ্ট্রার—মিনিট কুড়ি। বড় জোর আধা ঘন্টা।

এজেন্ট—যাক্। তবু ভাল। ওখানে তো জনা কুড়ি রিপোর্টার, লোকজন, গেস্টস সব কখন থেকে জমায়েত হয়ে রয়েছে। কেন যে ওদের এত দেরি হচ্ছে!

রেজিষ্ট্রার—স্যার! বলছিলাম—

এজেন্ট—আরে আপনার টিফিন এসে যাবে।

রেজিষ্ট্রার—সে কথা বলছি না স্যার।

এজেন্ট—তবে?

রেজিষ্ট্রার—টিভি-তে বিবাহ কর্মের ছবি তুলবে?

এজেন্ট—অবশ্যই। টিভি, কাগজের লোক—সবাই ছবি তুলবে। একটা ঐতিহাসিক ঘটনা ঘটতে চলেছে, এটা বুঝছেন না?

রেজিষ্ট্রার—বলছিলাম, ঐ সময় যদি এই হিয়ারিং এইডটা খুলে রাখি। তার-ফার নিয়ে এরকম একটা ওয়ারিং করা ফিগার পাবলিক দেখবে এটা কী রকম হবে।

এজেন্ট—সে তখন ভাবা যাবে। এখন এসব আমার ভাবার সময় নেই।

রেজিষ্ট্রার—তাহলে স্যার আপনি ঐ টিফিনের কথাটাই একটু ভাবুন। আপনারা দিচ্ছেন, তাই বাড়ি থেকে টিফিন আনিনি তো।

[ফোনটা বেজে ওঠে। এজেন্ট গিয়ে ধরে।]

এজেন্ট—হ্যালো...স্পিকিং...সে কী...হুঁ...হুঁ...এতো ভাববার কথা...হুঁ...ঠিক আছে। রাখছি।

[ফোনটা রেখে দেয়]

রেজিস্ট্রার—খারাপ খবর স্যার?

এজেন্ট—অক্টোপাস লিমিটেড টু আমাদের পাত্র-পাত্রীকে টারগেট করেছে...এরকম একটা খবর রিজিওনাল অফিসে এসেছে।

রেজিস্ট্রার—সর্বনাশ! স্যার এই বিয়েটা ভণ্ডুল হলে আমার ফিজটার কী হবে?

এজেন্ট—(রাগ চেপে) খবরটা পাকা খবর নয়।

রেজিস্ট্রার—পাকা হলে আমার কী হবে?

এজেন্ট—আমার যা হবে, আপনারও তাই হবে।

রেজিস্ট্রার—আপনার কী হবে সে তো আমি আন্দাজ করতে পারছি না স্যার।

এজেন্ট—আমিও পারছি না! আপনি বড্ড কথা বলেন! চুপ করে বসুন।

রেজিস্ট্রার—এই হিয়ারিং এইডটা পরলে অনেক কিছু শুনতে পাই তাই অনেক কিছু বলি।

এজেন্ট—আপাতত খুলে রাখুন।

রেজিস্ট্রার—এরকম হবে ভেবেই গোড়ায় খুলে রেখেছিলাম।

[রেজিস্ট্রার যন্ত্রটা খুলে রাখে। দূরে একটা শাঁখ বাজার শব্দ। এজেন্ট সচকিত হয়।]

এজেন্ট—ঐ এসে গেছে। (রেজিস্ট্রারকে) এবার যন্ত্রটা পরুন।

[রেজিস্ট্রার কিছু বোঝে না। এজেন্ট ওর কানে যন্ত্রটা গুঁজে দেয়।]

রেজিস্ট্রার—কী হল?

এজেন্ট—এসে গেছে।

রেজিস্ট্রার—এসে গেছে। টিফিন?

এজেন্ট—বর-কনে, বর-কনে।

[রেজিস্ট্রার উঠে টেবিলের টেপটা চালিয়ে দেয়। সানাই বেজে ওঠে।]

রেজিস্ট্রার—শুভ কর্মটি সমাধা করার সময় আমি আমার অফিসে এটা বাজাই।

এজেন্ট—শুভ কর্মটিতো এখানে হচ্ছে না।

রেজিস্ট্রার—তাহলে?

এজেন্ট—আপাতত চলুক। বেশ একটা—

রেজিস্ট্রার—বিয়ে-বিয়ে ভাব আসে, তাই না?

[শঙ্খে ফুঁ দিয়ে একজন সুসজ্জিতা মহিলা বর-কনে বেশে ছেলে মেয়ে দুটিকে নিয়ে ঘরে ঢোকে। বর-কনের মাথায় বিয়ের টোপর, মুখ চন্দনে সাজানো। অক্টোপাসের লোগো রয়েছে টোপরে, জামায় এবং মানানসই ভাবে পোশাকের অন্যত্র। মহিলাও লোগো পরে

আছে। তবে বর-কনের মুখে হাসি নেই কেমন আদুরে গোমড়া মুখ করে রয়েছে দুজনে। এজেন্ট দুখানা চেয়ার পাশাপাশি রাখে।]

এজেন্ট—বসুন, বসুন। একটু টিফিন করে নিন। তারপর (রেজিষ্ট্রারকে দেখিয়ে) এই আপনাদের রেজিষ্ট্রার, ওনাকে সঙ্গে নিয়ে আমরা বেরিয়ে পড়ব।

রেজিষ্ট্রার—হ্যাঁ, টিফিনের ঝামেলাটা চটপট চুকিয়ে নেয়াই ভাল।

মহিলা—টিফিন পাশের ঘরে রাখা আছে।

রেজিষ্ট্রার—যাই?

এজেন্ট—(মহিলাকে) ওকে টিফিনটা খাইয়ে দিন। (বর-কনেকে) মুখ গোমড়া কেন? হাসি ফুটুক!

মহিলা—ওরা তো আসতেই চাইছিল না। তাই তো দেরি হল।

এজেন্ট—কেন? আসতে চাইছিলেন না কেন?

[বর-কনে চুপ]

এজেন্ট—কী, বলুন? আপনাদের মশাই হাজার বায়নাক্কা! মাথায় আবার কী ঢুকেছে?

রেজিষ্ট্রার—(মহিলাকে) যাবেন?

মহিলা—(বিরক্ত) যাচ্ছি। যাচ্ছি।

[এসময় একটা ফোন আসে। রেজিষ্ট্রার তোলে। এজেন্ট ফোনটা ধরতে যেতেই রেজিষ্ট্রার বলে—]

রেজিষ্ট্রার—আপনার নয়, বরপক্ষের ফোন। (ছেলেটিকে) আসুন।

[ছেলেটি ফোন ধরে]

ছেলে—হ্যালো...হ্যাঁ বলুন...হুঁ...হুঁ...এই তো দুজনে এলাম। আচ্ছা আচ্ছা...নিশ্চয়ই আসতে পারেন।...বলছি তো আসুন না।...হুঁ...আচ্ছা...ঠিক আছে, রাখছি।

[ফোন রেখে ছেলেটি এসে গোমড়া মুখে নিজের জায়গায় বসে।]

এজেন্ট—কে আসছেন?

ছেলে—বলছি।

এজেন্ট—রেলেটিভস, ফ্রেণ্ডস?

ছেলে—বলছি। (মেয়েটিকে) কথা শুরু করি তাহলে?

মেয়ে—এখুনি?

ছেলে—ঝুলিয়ে রেখে লাভ কী?

মেয়ে—তাহলে টোপর নামাই?

ছেলে—আমিও নামাচ্ছি।

[দুজনে টোপর নামিয়ে রাখে। এজেন্ট বিস্মিত।]

এজেন্ট—কি হলো, বিয়েটা চাইছেন না। অ্যাদ্দুর এসে ব্যাক আউট করছেন?

ছেলে—ব্যাক আউট করছি কে বললে?

এজেন্ট—তবে টোপর না পরার কী হল?

মেয়ে—অন্য টোপর আসছে।

রেজিষ্ট্রার—আমার এখানে বিয়েতে টোপর কিন্তু এসেনসিয়াল নয়।

এজেন্ট—(ক্রুদ্ধ) আপনি নাক গলাবেন না। যন্ত্রটা খুলে রাখুন তো।

রেজিষ্ট্রার—ঠিক আছে, চুপ করেই থাকছি। যা সব কাণ্ড হচ্ছে—একটু শুনব না।

এজেন্ট—(মহিলাকে) ওকে টিফিনের ঘরে নিয়ে যান না!

মহিলা—(বিরক্ত) আসুন।

[ওরা দুজনে চলে যায়]

এজেন্ট—এ-টোপর পছন্দ হচ্ছে না?

ছেলে—অক্টোপাস লিমিটেড নাম্বার দু-র তরফে ওদের টোপর আসছে।

এজেন্ট—অক্টোপাস লিমিটেড নাম্বার দু! ওরা হঠাৎ সিনে আসে কী করে?

মেয়ে—আমরা তা কী করে বলব? আপনাদের মধ্য থেকেই কোনভাবে 'লিক' হয়েছে। ওরা তাই আমাদের কনট্যাক্ট করেছে।

এজেন্ট—আর অমনি ওদিকে ভিড়ে গেলেন? আমার দৌলতেই না আপনারা এই সুযোগটা পাচ্ছিলেন?

ছেলে—তাই তো ওদের বেটার অফার পেয়ে আপনাদের ছাড়িনি। ওদের দেওয়া অফার আমরা অ্যাকসেপ্ট করব না—যদি আপনি ঐ অফারে রাজি হন?

এজেন্ট—বুঝলেন, আপনাদের এই মুহূর্তে বিদেয় করে দিলে আমাদের কিছু এসে যায় না, নাম্বার টু-রও কিছু এসে যায় না। আসলে ওরা আমাদের পার্টিকে নিজেদের দখলে নিয়ে একটা টক্কর দিতে চায়। তাই কী আমি ছাড়ব? আপনাদের কপাল ভাল, আমাদের প্রেসটিজ ফাইটের মধ্যে ঢুকে পড়ে, টিকে আছেন এখনো। ওরা বেটার অফার দিয়েছে? দাঁড়ান—

[এজেন্ট গিয়ে ফোন করে—]

এজেন্ট—হ্যালো...ও স্যার...আচ্ছা...সব আপনারা জেনে গিয়েছেন...হুঁ...হুঁ...ওরা বড্ড বেড়েছে স্যার...হ্যাঁ...তাই হবে। আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন স্যার। নাম্বার টু-র আগে নাম্বার ওয়ান—তাই থাকবে...হুঁ...রাখছি স্যার।

[এজেন্ট ফোন রেখে ওদের কাছে আসে।]

এজেন্ট—ওরা যে বেটার অফার দিয়েছে, তাই পাবেন, চলুন। (মেয়েটিকে) নিন, টোপর পরে নিন।

মেয়ে—এতেই তো মিটল না।

এজেন্ট—আবার কি?

মেয়ে—(ছেলেটিকে) বল না।

ছেলে—আমাদের ম্যারেজ এবং ম্যারেড লাইফ না হয় ওদের অফার মতোই স্পনসর করলেন।

এজেন্ট—তাই তো ডিমাণ্ড করলেন।

ছেলে—কিন্তু ওরা তো আরও এক ধাপ এগিয়ে গেছে।

এজেন্ট—একটু খোলসা করে বলুন তো।

ছেলে—অক্টোপাস লিমিটেড টু আমাদের বেবিকেও স্পনসর করছে।

এজেন্ট—বিয়েই তো হল না—এখন বেবি কোথায়?

মেয়ে—আমাদের সন্তান থাকবে না, এটাই বা ধরে নিচ্ছেন কী ভাবে?

ছেলে—ওরা ইন অ্যানটিসিপেশন ফিউচার বেবিকে ইন অ্যাডভান্স স্পনসর করছে। লেবার পেইন—

এজেন্ট—লেবার পেইনও স্পনসর করছে?

ছেলে—লেবার পেইন থেকেই বেবির স্পনসরার হচ্ছে।

এজেন্ট—মাই গড। বেবিও স্পনসর করতে চাইছে? নট এ ব্যাড আইডিয়া। যাকে বলে তৃণমূল থেকে ধরা। যদি ফিউচার কালচার আমাদেরই কনডাক্ট করতে হয় তবে তৃণমূল থেকেই বা নয় কেন? ও.কে.—এতেও রাজি। আমরাও আপনাদের বাচ্চাকে স্পনসর করছি। এবার টোপর দুটো পরে নিন।

[এসময় অক্টোপাস লিমিটেড টু-এর লোগো লাগানো একটা বরের অন্যটি কনের টোপর হাতে নিয়ে স্যুটেড-ব্যুটেড অন্য একজন এজেন্ট এসে হাজির।]

মেয়ে—ঐ তো অক্টোপাস লিমিটেড টু-এর তরফে উনি এসে গেছেন।

ছেলে—অক্টোপাস লিমিটেড ওয়ানও বেবিসমেত স্পনসর করতে রাজি আছে।

এজেন্ট (২)—সে তো জানতাম।

এজেন্ট—তবে আর কি—চলুন আপনারা।

[বর-কনে ওঠে।]

এজেন্ট (২)—উঠছেন? আমাদের অফারটা যদি ওদের থেকে বেশি হয়?

এজেন্ট—ওসব কথায় কান দেবার দরকার নেই। আমি আপনাদের খুশি করে দেব।

এজেন্ট (২)—কম পেয়ে খুশি হবেন কি?

ছেলে—ঠিকই তো। এ-ব্যাপারটা ফয়সালা করে নিলেই ভালো হয় না।

মেয়ে—ফয়সালা না করে এক-পাও নড়বে না।

এজেন্ট—তাহলে তো আপনাদের নিলামে চড়তে হয়।

এজেন্ট (২)—চড়বেন। কি আপত্তি আছে?

ছেলে—মনে তো হচ্ছে নিলামই ভাল।

এজেন্ট—আমাদের ডাক—বিয়ে স্পনসর করার পর পার মান্থ পাঁচ হাজার টাকা ফর ফাইভ ইয়ারস।

এজেন্ট (২)—ছ হাজার।

এজেন্ট—ছ হাজার পাঁচশ।

এজেন্ট (২)—সাত হাজার। ডাক এক, ডাক—দুই...

এজেন্ট—আট হাজার। ডাক এক, ডাক—দুই...

এজেন্ট (২)—আট হাজার পাঁচশ।

এজেন্ট—ন হাজার...

[এইভাবে ডাক উঠতে থাকে। ডাকের মধ্যে বর-কনে গিয়ে টেপের সানাই-এর বাজনাটা বাড়িয়ে দেয়—ধ্বনি জোরালো হয়। ডাক চলে। ডাকের উপর পর্দা পড়ে।]

☐

পাখি

মনোজ মিত্র

(১৯৩৮)

চরিত্র

শ্যামা

নীতিশ

চৈতালী চ্যাটার্জী

গোপাল

[ভাঙাচোরা পুরনো বাড়ির একটা ঘর। একদিকে বাইরের দরজা, উল্টোদিকে ভেতরের। ঘরে একটা সাবেকি পালঙ্ক, ওপরে ছেঁড়া গদি। একটা চেয়ার। টেবিলের পের চোঙ্‌বসানো গ্রামোফোন। মাটির ফুলদানি, কিছু রজনীগন্ধা। মোমদানিতে পাঁচটি মোমবাতি বসানো। দেয়ালে নবদম্পতির ছবি। নীতিশ আর শ্যামা। শ্যামার হাতে ফুলের তোড়া, লাজনম্র।

পর্দা সরে যাবার পর প্রথম দৃষ্টিকে হকচকিয়ে দেয় এ ঘরের আশ্চর্য সুন্দর সাজ-সজ্জা। দেয়ালে, জানালায়, দরজায়—পালঙ্কের গায়ে এবং মাথার ওপরে...প্রায় চারধারেই ঝুলছে নানা রঙের নানা আকারের কাগজের শিকলি ফুল, বিচিত্র সব কারুকর্ম। রঙ আর রূপের সমারোহ এ সংসারের মালিন্য ঢেকে দিয়েছে অবশ্যই।

নীতিশ ঘরটাকে সাজাচ্ছিল। গ্রামোফোনে রেকর্ড চালিয়ে দিল। পুরনো দিনের গান বেজে উঠল 'যদি ভাল না লাগে তো দিও না মন।' পালঙ্কের ওপর আধশোয়া হয়ে বিড়ি টানতে টানতে নিজের শিল্পকীর্তি উপভোগ করছে নীতিশ, আর তাল ঠুকছে।

বড় উদ্বিগ্ন ভাবেই বাইরে থেকে শ্যামা ঢুকল। হাতে ব্যাগ। শ্যামা ঘরের চেহারা আর নীতিশের কাণ্ড দেখে বিস্ময়ে হতবাক। শ্যামা একটু রোগা, একটু কালো, কঠিন চিবুক, চোখের কোণে কালি। বড় বড় চোখ আর চুল! সঘন মেঘের মতো রাশিকৃত ঘনকৃষ্ণ কোঁকড়া চুল শ্যামার সারাটা পিঠ ঢেকে রয়েছে।]

নীতিশ—(শ্যামাকে দেখে আনন্দে) এসেছো? যাক বাবা...

শ্যামা—(ভুরু কুঁচকে) তোমার না অসুখ?

নীতিশ—আমার অসুখ! কে বল্লে?

শ্যামা—নিজেই তো চিঠি দিয়েছো! বেদম জ্বর!

নীতিশ—ও! হ্যাঁ, ছেড়ে গেছে।

শ্যামা—এসব কী?

নীতিশ—হাঁপাচ্ছ যে। বসো না!

শ্যামা—(রেগে) বলো, বলো—

নীতিশ—(দুষ্টু হাসিতে) বলছি রে বাবা,—তোমার ছোটদি ভাল আছে?

[শ্যামা গ্রামোফোন বন্ধ করতে ছুটে যায়।]

নীতিশ—এই, এই, আস্তে আস্তে! একটু কেটেকুটে গেলে পুরো দাম গচ্চা দিতে হবে। হুঁ হুঁ বাবা, ভাড়ার মাল। রাত দশটায় অ্যাজ ইট ইজ ফেরত!

শ্যামা—বাক্সটাক্স কই আমার!

নীতিশ—ছাতে...

শ্যামা—আলনা মাদুর বিছানা পত্তর...

নীতিশ—ছাতে ছাতে...

শ্যামা—(ঘরের কোণে তাকিয়ে) ঠাকুর! আমার ঠাকুরের আসন!

নীতিশ—বলছি তো ছাতে!

শ্যামা—(আর্তনাদের মত) কোথায়?

নীতিশ—রোদ পোয়াচ্ছে। এই ড্যাম্প ঘরে আটকে রেখেছ, ঠাকুর একটু আলো বাতাসে হাত পা খেলিয়ে আসুক!

শ্যামা—কী, কী করছ কী তুমি!

নীতিশ—ঘর সাজাচ্ছি!

শ্যামা—কেন?

নীতিশ—সব বলব! ধীরে বৎস ধীরে! গুচ্ছের মালপত্রে গোডাউন বাঁধিয়ে রেখেছ...ওর মধ্যে কি সাজানো যায়! শিকলিগুলো কেমন হয়েছে গো? এই যে...এই যে...ফুল... বিউটিফুল! করেছি! (দু আঙুল কাঁচির মত চালিয়ে) স্রেফ হাতের গুণ! হ্যাঁ হ্যাঁ—চেহারাটা পালটে দিয়েছি তোমার ঘরের...রাতে আলোক সজ্জা হচ্ছে! লাল নীল আলোর রোশনাই!

শ্যামা—নরক, নরক! সাত সকালে বসে বসে নরককুণ্ড পাকাচ্ছে রে। আর কিভাবে আমায় জ্বালাবে রে!

নীতিশ—বাজে বোকো না! নরক ছিল তোমার, আমি স্বর্গ বানাচ্ছি। এমন করছ না, যেন বিবাহ-বার্ষিকীটা আমার একার!

শ্যামা—কী হয়েছে!

নীতিশ—আজ কতো তারিখ?

শ্যামা—কতো তারিখ?

নীতিশ—আজ...সাতুই...ফাল্গুন! আমাদের বিয়ের তারিখ!

শ্যামা—তাই কী?

নীতিশ—তাইতো সব! ম্যারেজ অ্যানিভার্সারি!

শ্যামা—(মাথায় হাত দিয়ে বসে পড়ে) মাথাটা একেবারে গেছে রে!

নীতিশ—কী হলো? মাধবীলতার মতো হেলে পড়লে যে! ওঠো—ওঠো—আজ যে সাতুই ফাল্গুন গো!

শ্যামা—(তেড়ে ওঠে) তবে আর কী? সাতুই ফাল্গুন তো মাথায় আগুন জ্বলে উঠল! হুজুগ! হুজুগ! হুজুগ একটা পেলেই হলো! লাগাও উচ্ছব...লাগাও মচ্ছব! ফ্যাচাং...ফ্যাচাং...ফ্যাচাং একটা না একটা জুটেও যায় তোমার!

নীতিশ—অ্যাই অ্যাই!

[শ্যামা ভয়ংকরভাবে তেড়ে যেতে নীতিশ সভয়ে পিছিয়ে যায়।]

শ্যামা—গেছি কদিনের জন্যে ছোটদির কাছে...এবেলা ওবেলা তলব যাচ্ছে...অসুস্থ শয্যাশায়ী মরণাপন্ন...

নীতিশ—দূর ছাতা, মরণাপন্ন হলেই যেন বেশি খুশি হতে!

শ্যামা—জ্ঞান নেই...গম্যি নেই। এতো যে ঠোকা খাচ্ছে, খুসুনি খাচ্ছে, তবু লজ্জা হবে! বুড়ো বয়েসে বিবাহবার্ষিকী! এখুনি যে লোকে দাঁত কাৎ করে হাসবে—

নীতিশ—ভেঙে দেবো—

শ্যামা—অ্যাঁ!

নীতিশ—যে ব্যাটারা দাঁত বার করবে। আমরা বুড়ো! বলে মাত্তর ফিপথ্ ইয়ার!

শ্যামা—রাখো রাখো! ফেরিওয়ালার অত শোভা পায় না।

নীতিশ—অ্যাই যা-তা বলবে না বলে দিচ্ছি শ্যামা। রেগুলার সেলস্ রিপ্রেজেণ্টেটিভ!

শ্যামা—হুঁ হুঁ সেলস্ রিপ্রেজেন...তেলাপোকা আবার পাখি! হাতে হ্যারিকেন নিয়ে ঘুরে বেড়ায়...

নীতিশ—তা হ্যারিকেন কোম্পানির রিপ্রেজেণ্টেটিভের হাতে কি গোলাপের তোড়া থাকবে?

শ্যামা—না...গাদাগুচ্ছের হ্যারিকেন নাচবে...ঢং ঢং ঢং। হাতে হ্যারিকেন? চারশো টাকা মাস গেলে আর পার হ্যারিকেন বিশ পয়সা কমিশন, লজ্জা করে না গান বাজাতে!

নীতিশ—আরে দুত্তেরি! ওর চেয়ে কম পয়সায় একদিন ইচ্ছে করলে কলের গান ভাড়া করা যায়। যারা করে না তারা মড়া গোমড়া, আমরা করব।

শ্যামা—করো, করো...

নীতিশ—করছি তো। সন্ধেবেলা তো সেজেগুজে বসছি। (শ্যামাকে টেনে পাশে বসিয়ে) ধুতি পাঞ্জাবি...চন্দনের ফোঁটা লড়িয়ে...হ্যাঃ হ্যাঃ...আয় দেখে যা...কে দেখবি দেখে যা...কীগো ননীবাবু...হাঁ হয়ে গেলে যে বাবুরা...কী ভাবছ? দুদিন অন্তর তোমরাই শুধু লড়াতে পার, কুকুরের জন্মতিথি! আমরাও পারি! পঞ্চম বিবাহ বার্ষিকী! ঐ পাঁচটা মোমবাতি তুমি জ্বালাবে শ্যামা!

[শ্যামা নীতিশের হাত ঠেলে ঘরের কোণ থেকে ঝাঁটা তুলে নেয়।]

শ্যামা...

শ্যামা—খোলো, খোলো বলছি ওই দড়াদড়ির ফাঁস!

নীতিশ—এই, এই শ্যামা...

শ্যামা—উঁঃ আবার ফুল তৈরী হয়েছে, ছেলে-ভুলনো খেলনা! ছিঁড়েকুটে ফেলব সব।

নীতিশ—শ্যামা—

শ্যামা—কোথাকার আধমরা রজনীগন্ধা, মেটে ফুলদানি, সস্তার তিন অবস্থা! পোড়া কপাল আমার। আয়োজন দেখলে হাসিও পায়, কান্নাও আসে। ওই দেখে ননীবাবুরা নাকি ভির্মি খাবে। থুতু দেবে...ওরা এতে পাও মোছে না, পাও মোছে না...

নীতিশ—তা কি করব...রোশনচৌকি ভাড়া করতে হবে?

শ্যামা—কে করতে বলেছে! কিছু করতে হবে না...কিছু করতে হবে না! দয়া করে ক্যারিকেচারটা থামাও!

নীতিশ—(নিচু গলায়) অনুষ্ঠান করবে না!

শ্যামা—না (গোপনে চোখের জল মুছে) রাখো, যেখানে যেটা ছিল তুলে রাখো! যাও, ভাড়ার মাল সব ফেরত দিয়ে এসো!

নীতিশ—কেন এমন করছ? লক্ষ্মীটি শ্যামা, শোন না—

শ্যামা—যাও...কাজে বেরোও।

নীতিশ—(চিৎকার করে) কী করব? বিবাহ-বার্ষিকী যে বউ ছাড়া করা যায় না, নইলে তাই করতাম...

শ্যামা—তুমি কাজে বেরোবে কিনা!

নীতিশ—উপায় থাকলে বেরোতাম। বসে বসে তোমার খিঁচুনি শুনতাম না। নেহাৎ ছুটিটা নিয়ে ফেলেছি...

শ্যামা—ছুটি নিয়েছ?

নীতিশ—পাওনা ছিল নিয়েছি, তাতেও দোষ!

শ্যামা—একটা দিন কামাই করার মানে বোঝ? হ্যারিকেন নিয়ে যেদিন না বেরুবে, পার হ্যারিকেন বিশ পয়সার কমিশনও মিলবে না।

নীতিশ—আরে দূর! খালি হ্যারিকেন আর হ্যারিকেন—ড্যাম ইয়োর হ্যরিকেন!

শ্যামা—তাতো বটেই। মাসের মধ্যে পঁচিশ দিন রেশন উঠছে না, বাড়িআলা মুদির কাছ থেকে পালিয়ে পালিয়ে ঘুরছি, আমি মরছি ছোটদি বড়দির কাছে হাত পেতে পেতে...কোথায় দুটো পয়সা বেশি রোজগার করব...না ড্যাম ড্যাম হ্যারিকেন! থাকবে না, থাকবে না, এ চাকরিটাও যাবে!

নীতিশ—হ্যাঁ যাবে! কেরে আমার গণৎকার!

শ্যামা—যাবে যাবে! অতো ফাঁকি মারলে থাকে! যায়নি আগে দু দুবার! আসেনি এত্তোবড় লম্বা খামে ডিসমিস লেটার! আবার এলো বলে!

নীতিশ—জানি করতে দেবে না। সকালবেলায় যত অলুক্ষুণে কথা বলছে। একটা শুভদিন যে...

শ্যামা—শুভদিন না, বড্ড শুভদিন! ওদিকে সে বুড়ি...মা-বুড়ি হাঁ করে পোস্টাপিসের দিকে চেয়ে আছে, কবে তার পুত্তুর দুটো টাকা দেবে সেই আশায়! পুত্তুর এদিকে বৌ নিয়ে বিয়ের দিন পালন করছেন...পুত্তুর এদিকে বিশ্বকর্মা পুজোর ঘুড়ি উড়িয়ে বেড়াচ্ছেন...

নীতিশ—হ্যাঁ, ওড়াচ্ছি...

শ্যামা—কাটা ঘুড়ি ধরবেন বলে লোকের পাঁচিল টপকাচ্ছেন, বাচ্চাদের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে...

নীতিশ—না, বছরের একটা দিন ঘুড়ি ওড়াবে না! বিউটিফুল-ফুল সব ঘুড়িগুলো ভোঁকাট্টা হয়ে চোখের ওপর ছুটে বেড়াচ্ছে!...আরে বিশ্বকর্মা পুজোয় ঘুড়িটা মাস্ট!

শ্যামা—ওইতো! ফ্যাচাং! ফ্যাচাং একটা পেলেই হলো। কবে বিশ্বকর্মা, কবে ঝুলনপূর্ণিমে, একটা না একটা কপালে জুটেও যায় বটে! টাকা পেলে কোথায়?

নীতিশ—কি?

শ্যামা—এই যে পয়সাগুলো ছাইভস্ম করে ওড়ানো হচ্ছে, কোথায় পেলে?

নীতিশ—যেখানেই পাই তোমার সংসারের অ্যাকাউন্ট থেকে নিইনি, ব্যাস!

শ্যামা—আহা হা, সংসারের অ্যাকাউন্ট! কটা টাকা ফেলে দিলে খালাস! সারা মাস কি করে চালাই তার ঠিক নেই! কোত্থেকে এল এসব?

নীতিশ—ধার করেছি, ব্যাস!

শ্যামা—(চোখ বড় বড় করে) ধার করে ফুর্তি করা হচ্ছে?

নীতিশ—ধার না, মানে একজন দিয়েছে...কিন্তু ফেরত নেবে না...মানে, এমনি দিয়ে দিল!

শ্যামা—এমনি দিয়ে দিল?

নীতি—বন্ধু—বলছি তো ভীষণ বন্ধু—যেই শুনেছে পাঁচ বছরে একবারো আমরা বিয়ের দিন পালন করি নি—একবারো তোমায় নেতারহাটে বেড়াতে নিয়ে যাইনি, অমনি পকেট থেকে টাকা বের করে—

শ্যামা—বন্ধুর নাম বলো—ঠিকানা বলো।

নীতিশ—তুমি চিনবে না, দূর সম্পর্কের বন্ধু—

শ্যামা—বন্ধু...দূর সম্পর্কের!

নীতিশ—জানি না যাও! উকিল কোথাকার!

শ্যামা—দেখি কত টাকা! দেখি ব্যাগটা!

নীতিশ—(পকেট থেকে মানি ব্যাগ বার করে) কম নাগো, পাক্কা আটশো...আটখানা কড়কড়ে...নইলে কি ভাবছ খালি হাতে তড়পাচ্ছি?

শ্যামা—(হাত বাড়ায়) দেখি...

নীতিশ—(আলগোছে শ্যামার হাতটা ঠেলে সরিয়ে) যাবে শ্যামা, নেতারহাটে যাবে একবার? দারুণ জায়গা...পাহাড়ের ওপর চারদিক খোলা-মেলা...সবুজ...সবুজ... অরণ্য...উপত্যকা...

শ্যামা—উপত্যকা...খুব সবুজ? (নীতিশের পকেটের দিকে হাত বাড়ায়)

নীতিশ—তোমায় একটা বত্রিশ টাকার গো-গো গগলস কিনে দেব। নেতারহাটে পরে বেড়াবে!

শ্যামা—রক্ষে করো!

নীতিশ—কেন? কেউ তো চেনাশোনা নেই যে দেখে ফেলবে। (শ্যামার হাত ঠেলে সরিয়ে) বাইরে গেলে আমি দেখেছি, সবাই ওসব পরে। কলকাতায় বিশ্রীভাবে থাকে...বাইরে গেলে খোঁদিপেঁচি সব্বাই বেলবট পরে...গুরু পাঞ্জাবি পরে...গুরু গুরু গুরু...(শ্যামা পকেট থেকে ব্যাগটা তুলে নিয়েছে. নীতিশ চমকে ব্যাগ কেড়ে নিল) আই বাপ্!

শ্যামা—(এগিয়ে এসে কাতর গলায়) দাও!

নীতিশ—(চোখ পাকিয়ে) ফিলিঙের মাথায় কি করছিলাম, বাঘের ঘরে ছাগল ছেড়ে দিচ্ছিলাম!

শ্যামা—দাও লক্ষ্মী সোনা দাও, নেতারহাটে যাবো...

নীতিশ—তোমায় আমি চিনি না গুরু। তুমি নেতারহাটে যাবার লোক! সংসার খরচা চালাবে!

শ্যামা—নাগো, সত্যি যাবো, তোমায় ছুঁয়ে বলছি...

নীতিশ—হুঁ হুঁ, গায়ে হাত বুলিয়ে টাকাটা একবার হাতাতে পারলে বোঝ!

শ্যামা—দেবেনা তো?

নীতিশ—ন্যাড়া ক'বার বেলতলায় যায় শ্যামা?

শ্যামা—দাও বলছি!

নীতিশ—বাবার শ্রাদ্ধের সময়...মনে আছে দেড়টি হাজার টাকা এনে দিয়েছিলুম, ওই হাতে। শুধু শ্রাদ্ধটা একটু ধুমধাম করে করব বলে। আত্মীয়স্বজন, বন্ধুবান্ধব সবাইকে নিয়ে বেশ একটা বড় রকমের শ্রাদ্ধ। সেদিনও ঠিক এমনি করে সর্বস্ব কেড়ে নিয়ে আমায় ফকির করে ছেড়েছিলে...

শ্যামা—বেশ করেছিলাম। ধার করে শ্রাদ্ধ করে চুল পর্যন্ত ডুবত। তখন চাকরিও ছিল না...বড় অন্যায় করেছিলাম, না?

নীতিশ—করেছিলেই তো! কার্ড ছাপাতে পারি নি, বন্ধু বান্ধব নেমন্তন্ন করতে পারিনি... কেত্তন গাওয়াতে পারিনি...গঙ্গার ঘাটে বসে নমো নমো করে মাথা কামিয়ে ফিরেছিলাম...

শ্যামা—তাতে পরলোকে তোমার বাবার আত্মার কষ্ট হয় নি, ইহলোকে তোমার যতটা হচ্ছে...

নীতিশ—হচ্ছেই তো। একটা পিতৃশ্রাদ্ধ, তাও করতে দাও নি। জুন মাসের মাইনে পেয়ে, বললুম চলো, দু'জনে একটু চাউচাউ চাইনিজ খেয়ে আসি। মানি ব্যাগটা উধাও করে তুমি আমায় সে রাতে কচুর ঘণ্টা খাইয়েছিলে!

শ্যামা—একদিন চাউচাউ গিলে সারাটা মাস যে চৈ চৈ করে বেড়াতে হত।

নীতিশ—তবু তার একটা মানে থাকত। আর তোমার কথা শুনছিনে। অনুষ্ঠান করব।

করবই! যা যা ইচ্ছে আছে, সব করব। খালি খালি প্রভিডেন্ট ফাণ্ড থেকে টাকা তুলেছি ভেবনা!

শ্যামা—প্রভিডেন্ট ফাণ্ড থেকে তুলেছ?

নীতিশ—তুলেছি।

শ্যামা—তুমি প্রভিডেন্ট ফাণ্ড খুইয়ে...

নীতিশ—ধুত্তেরি! প্রভিডেন্ট ফাণ্ড ছাড়া চ্যারিটি ফাণ্ড কোথায় পাব? বারবার কোন্ বন্ধু আমায় ধার দেবে? বোঝে না!

শ্যামা—কি করব? এ লোককে নিয়ে কি করব আমি! (নীতিশ হাসছে) হাতের তা পাতের তা সর্বস্ব খুইয়ে—

নীতিশ—ও যতই খ্যাচখ্যাচ ফ্যাচফ্যাচ কর...এবার আর ঠেকাতে পারছ না। আমার নেমন্তন্ন টেমন্তন্ন সব করা হয়ে গেছে।

শ্যামা—অ্যাঁ!

নীতিশ—অ্যাঁ নয়, হ্যাঁ। সন্ধেবেলা আসছে সব খেতে।

শ্যামা—কারা?

নীতিশ—ননী, ননীর বৌ...বাচ্চারা...ভুবন...ভুবনের বৌ, ভুবনের রাঙা কাকিমা, তার ছোট বোন...ইন্ অল থারটিন হেড্স আসছে...

শ্যামা—কোথায়?

নীতিশ—তোমার বাড়ি।

শ্যামা—ভগবান!

নীতিশ—বাইরে, হাওয়া খাচ্ছে!

শ্যামা—আমি এক্ষুনি চলে যাচ্ছি!

নীতিশ—এই, এই শ্যামা...

শ্যামা—(চুলে গিঁট বেঁধে শ্লিপার খুঁজতে খুঁজতে) যাচ্ছি ছোড়দির বাড়ি! তিনমাসের মধ্যে এমুখো যদি হই...

নীতিশ—(শ্যামার পিছু পিছু) মরে যাবো শ্যামা...ইনভাইট করা হয়ে গেছে, সবাই খাবে, শ্যামা...

শ্যামা—(দুপাশ থেকে কনুই দিয়ে নীতিশকে সরাতে সরাতে) তোমার মত শয়তানকে কি করে জব্দ করতে হয়...

নীতিশ—একদম কেলেঙ্কারি হয়ে যাবে শ্যামা...তুমি না থাকলে...

শ্যামা—কেন? ইনভাইট করবার সময় আমায় বলে করেছিলে?

নীতিশ—আরে দূর! বল্লে করতে দিতে...

[শ্যামা সরোষে দৃষ্টি হেনে দরজার দিকে অগ্রসর হয়।]

(ছুটে গিয়ে) শ্যামা, শ্যামা...ননী..ননীর বৌ খুব পয়সাআলা ঘরের মেয়ে...একদম

বারোটা বাজিয়ে দেবে আমার...ননীর বাচ্চারা ফুটফুটে একদম সাহেবের বাচ্চার মত দেখতে...ভুবনের রাঙা কাকিমা...তুমি না থাকলে গেছি...শ্যামা...এবারটা ক্ষমা কর, আর কোনদিন হবে না।

শ্যামা—সাতগুষ্টির লোককে গেলাবো কী?

[দরজার দিকে ছোটে]

নীতিশ—হয়ে যাবে...সব হয়ে যাবে...তুমি একটু চুপ কর! তোমার মত বৌ ঘরে থাকলে...

শ্যামা—শয়তান, বদমাস, হাতে-হারিকেন!

নীতিশ—(ক্ষেপে) আহি ফের ওসব বলবে না বলে দিচ্ছি। আমার প্রভিডেণ্ট ফাণ্ড আমি ভাঙব, আমার যাদের খুশি খাওয়াব, তুমি তাদের সাতগুষ্টির লোক বলার কে?

[শ্যামা ছুটে বেরোতে যায়, নীতিশ আটকায়]

(শ্যামাকে বসায়) সুযোগ পেয়ে খুব শোধ তুলে নিচ্ছ। কি ভেবেছ কী? নিজের ইচ্ছেমত কিছু করতে দেবে না? ঠুঁটো জগন্নাথ করে রেখে দেবে? বন্ধুরা সব বলছে কবে খাওয়াবি নিতু, কবে খাওয়াবি?...ভাবলাম ছেলের অন্নপ্রাশনে বলা যাবে...(থেমে) ছেলেরই দেখা নেই!

[শ্যামা উঠতে যায়। নীতিশ তৈরী ছিল, কাঁধে চাপ দিয়ে বসিয়ে দেয়। বাইরের দরজায় বৃদ্ধা মিস চৈতালী চ্যাটার্জি এসে উঁকিঝুঁকি দিচ্ছে। চৈতালী চ্যাটার্জি উকিল, গায়ে মহিলা-উকিলের পোশাক। হাতে ব্রিফকেস। স্বামী স্ত্রীকে একত্রে দেখে মুখ ঘুরিয়ে মাত্রাতিরিক্ত গাম্ভীর্যে প্রচণ্ড একটা গলা খাঁকারি দেয়।]

নীতিশ—আ-আপনি!

চৈতালী—যেন ভূত দেখছেন?

নীতিশ—ভূত, ভূত কেন! (আমতা আমতা করে শ্যামাকে) মিস্ চ্যাটার্জি মানে আমার সেই কেসের উকিল...

চৈতালী—(গটগট করে শ্যামার সামনে এসে) মিস চৈতালী চ্যাটার্জি...অ্যাডভোকেট। আমি আপনার স্বামীর হয়ে দাঁড়িয়েছিলাম।

নীতিশ—হ্যাঁ আপনি না থাকলে নির্ঘাৎ আমার একটা জেল কি জরিমানা...

চৈতালী—আপনার হাজব্যাণ্ড...আমার ফিসের টাকা চোট করেছেন।

শ্যামা—শয়তান!

চৈতালী—চিরকাল উকিল মোক্তারদের দুর্নাম দেওয়া হয়, তারা মক্কেলদের কাঁদায়! এমন মক্কেলও থাকে, যারা মোক্তার উকিলদের ফাঁসায়!

শ্যামা—ঐ তো!

চৈতালী—আমি ওর নামে কেস করব।

শ্যামা—করুন।

চৈতালী—আমি ওকে লক-আপে ঢোকাব—

শ্যামা—আমি একটুও কাঁদব না—

নীতিশ—ইয়ে, বসবেন না উকিলবাবু—

চৈতালী—সাট আপ! এতবড় সাহস, অ্যাডভোকেটের ফিস চোট করে পালিয়ে বেড়ায়! বলে কেসটা লড়ে যান, পরে সব বিল করে দেবেন। পাঁচ টাকার কোর্টপেপারও আমায় দিয়ে কিনিয়েছে। ঘুঘু দেখেছে, ফাঁদ দেখেনি। এই পাড়ায় আমায় টেনে এনেছে!

নীতিশ—কেন এলেন? আমি তো বলেইছি...মানে একটু সুবিধে হলেই আপনার টাকা মিটিয়ে দেব।

চৈতালী—ইউ! ইউ! দেড়বছর সময় দিয়েছি, এখনো সুবিধে! আপনার স্বামীর মত আসামী আমি খুব কম দেখেছি।

শ্যামা—আমিও কম দেখেছি!

চৈতালী—রাস্তায় দেখা হলে চিনতে পারে না!

শ্যামা—মাঝে মাঝে কাউকেই চিনতে পারে না। আমাকেও না!

চৈতালী—চিনিয়ে দেব! সিওর পানিশমেণ্ট থেকে ছাড়িয়ে আনলুম, ফিস দেবেনা? চৈতালী চ্যাটার্জি—কোর্ট কাঁপিয়ে সওয়াল করে দত্ত মজুমদারের উকিলকে তুলে আছাড় মেরে নির্ঘাৎ জেল জরিমানা বাঁচিয়ে আনল—

শ্যামা—কেন গেলেন বাঁচাতে? মরতো ঘানি টেনে! ওই বয়েসের মানুষ যদি লোকের ঘরের দোরে ক্রিকেট খেলতে যায়—

চৈতালী—খেলা, হোয়াট ডু ইউ মীন বাই খেলা? রেগুলার পেটাপেটি করেছে। ইয়োর হ্যাজব্যাণ্ড, অ্যান এ্যাডাল্ট অব থারটিওয়ান, দত্ত মজুমদারের প্রাইভেট প্যাসেজে ডিউস বল পেটাপেটি করেছে! টাঁই টাঁই—এদিকে হাঁকড়াচ্ছে, ওদিকে হাঁকড়াচ্ছে!

শ্যামা—জানলার কাঁচ ফাটিয়ে, অ্যাকোরিয়াম ফাটিয়ে...

চৈতালী—দত্ত মজুমদারের মাদার-ইন-ল'র মাথার রক্ত ছুটিয়ে দিল ওয়ান সানডে মর্নিং! ওয়াজ দ্যাট খেলা? গুণ্ডামির জায়গা পান নি! টাকা ছাড়ুন।

নীতিশ—টাকা? নেই দিদিমণি...

[চৈতালী ব্রিফকেস খুলে প্যাড বার করে খসখস লিখতে থাকে।]

শ্যামা—আর পারি না ভগবান, কতদিক সামলাবো? এই লোকটাকে নিয়ে—

চৈতালী—(লিখতে লিখতে চাপা হিংস্র হাসিতে) ভুলে গেছে, আমাকে ভুলে গেছে! ইচ্ছে করলে দশটা কেসে ফাঁসিয়ে দিতে পারি। অমন মুখমিষ্টি মিছরির চাকু আমি কিছু কম দেখি নি। ইন মাই লাইফ, বহু দেখেছি। ওরা শুধু ঠকাতে জানে।...স্পেশাল পাওয়ার খাটিয়ে, ওয়ারেণ্ট বার করে হ্যাণ্ডকাপ পরিয়ে আজ আমি ওকে...

নীতিশ—আজই! আজকের দিনটা ছেড়ে দিলে হয় না? (চৈতালী স্যাট স্যাট প্যাডের পাতা ছিঁড়ে পরের পাতায় লিখছে) আপনার তো অনেক বড় অবস্থা দিদিভাই, দুশোটা টাকার জন্যে...

চৈতালী—দুশো নয়, সাড়ে পাঁচশো। ফাইনের টাকাটাও আমাকে জমা দিতে হয়েছে! ভুলে গেছ? একটা পেটি হ্যারিকেনওয়ালা আমাকে ঠকাবে! অসহ্য!

নীতিশ—মাত্তর একটা রোববার একটু পেটাপেটির জন্যে ফাইনের টাকা গচ্চা দিতে কারুর মন চায়! আমার মত পুওরম্যান—আপনি বলুন না।

শ্যামা—আপনার টাকা, না! কিছু করতে হবে না আপনাকে। ওকে ধরুন। টাকা আছে ওর কাছে।

নীতিশ—শ্যামা!

শ্যামা—আছে, ধরুন, ওই গেঞ্জির ভেতরে আছে।

নীতিশ—শ্যামা!

শ্যামা—না যদি দেয়, হাতকড়ি পরিয়ে নিয়ে যান।

[শ্যামা ভেতরে চলে গেল। নীতিশের জাল-গেঞ্জির ভেতর নোটের তাড়া উঁকি দিচ্ছে, চৈতালী সেইদিকে চেয়ে চোখ পিটপিট করে। নীতিশ কুড়িটা টাকা বার করে ধরে।]

চৈতালী—কুড়ি টাকা!

[নীতিশ আর একটা একটাকার নোট বাড়িয়ে দেয়।]

হোয়াট? বারগেনিং? অ্যাডভোকেটের সঙ্গে চিংড়ি মাছের দরাদরি!

[চৈতালী লিখতে থাকে]

নীতিশ—এসকিউজ...মানে ছেড়ে দিন,...এর থেকে আর দিলে মুশকিলে পড়ে যাবো দিদিভাই।

চৈতালী—দিদিভাই?

নীতিশ—হ্যাঁ, না মানে ওই ননী, ননীর বৌ, তিনটে বাচ্চা...

চৈতালী—বাচ্চা...

নীতিশ—ফুটফুটে বাচ্চা...এইরকম ফুটফুটে...আর ভুবন...ভুবনের রাঙা কাকিমা...অনেক খরচা...তারপর নেতারহাট...

চৈতালী—হেল! হেল! নেতারহাট...হেল অব ইয়োর...

[বাইরের দরজায় গোপালের কণ্ঠস্বর : ধরো...ধরো...বাজার এসে গেছে।]

নীতিশ—পুওর ম্যান...একদম পুওর ম্যান...খেতে পাই না।

[পেল্লায় এক বাজার বোঝাই চ্যাঙারি নিয়ে কোনরকমে টলতে টলতে গোপাল ঢুকছে। মস্ত বড় এক ঘিয়ের টিন তার মাথায় উঁচিয়ে আছে।]

গোপাল—বাপরে বাপ! দেড়মণ ওজন...তোমার বাজার বইতে বইতে...কই গো ধর...

নীতিশ—(হাতের ইশারায় গোপালকে বেরিয়ে যেতে বলছে, চোখ টিপছে, আর চৈতালীকে) পুওর ম্যান, ভেরি পুওর...

গোপাল—হ্যাঁ পুওরম্যান। মোটমাট তিনশো সত্তর টাকা দশ পয়সার কাঁচা বাজার। কিছু কেনাকাটা করলে বটে। ধরবে না কিরে বাবা—ধরুন তো মাসিমা...

চৈতালী—সাট আপ!

[ধমক খেয়ে গোপাল চ্যাঙারি সুদ্ধ বসে পড়ে। নীতিশ ছুটে বেরিয়ে যায়।]

হু আর ইউ?

গোপাল—মাসতুতো ভাই!

চৈতালী—মাসতুতো ভাই! চোরে চোরে...

গোপাল—হুঁ! না। আমি বেকবাগানে থাকি।

চৈতালী—বেকবাগান থেকে এসে তুমি এদের বাজার করছ যে?

গোপাল—আমি না করলে কে করবে মাসিমা? আজ যে এদের বিবাহ-বার্ষিকী।

চৈতালী—ও! ম্যারেজ অ্যানিভার্সারি!

গোপাল—সব কিনতে হলো। মায় এক সেট কাঁটাচামচ! (কাঁটা তুলে ধরে)

চৈতালী—কিপ ইট।

গোপাল—(জোরে) কে গো নিতুদা?...আপনি কে?

চৈতালী—লোকের বাজার বয়ে বেড়াচ্ছ, অফিস যাবে কখন?

গোপাল—আমার অফিস-টফিস নেই!

চৈতালী—বেকার! চাকরি পাও না?

গোপাল—কেন পাব না! প্রায়ই একটা দুটো পাই, করি না।

চৈতালী—পাও....কিন্তু কর না?

গোপাল—দশটা পাঁচটা চেয়ারে বসে থাকা আমার পোষায় না মাসিমা!

চৈতালী—কী পোষায়?

গোপাল—লোকের উপকার টুপকার করা।

চৈতালী—কি রকম উপকার?

গোপাল—মহা জ্বালায় পড়লুম তো...

চৈতালী—আন্সার মি!

গোপাল—লোকের বাজার-হাট করে দিই, ওষুধ এনে দিই, হাসপাতালে নিয়ে যাই... তারপর শ্মশানে নিয়ে গিয়ে ঠিকমত পোড়াই...দশটা পাঁচটা ফিট হয়ে গেলে কখন ফ্রি-সারভিস দেব?

চৈতালী—ও, পরহিতৈষী!

গোপাল—আজ্ঞে হ্যাঁ। ফ্রি-সারভিসের লোভে কেউ আমায় ছাড়তে চায় না। আমার অ্যাপয়েন্টমেন্ট লেটার এলেই পাড়ায় সে কী কান্নার রোল ওঠে—গোপলা বুঝি

চলে গেল রে...

[গোপাল পালাবার চেষ্টা করে]

চৈতালী—(ধমকে) দাঁড়াও। আমায় একটু হেল্প কর গোপলা। চট করে একটা ট্যাক্সি ডেকে দাও।

গোপাল—ট্যাক্সি? (হাঁকতে হাঁকতে দরজার দিকে অগ্রসর হয়) ট্যাক্সি, ট্যাক্সি...

চৈতালী—আর তোমার মাসতুতো দাদার মালটা তাতে তুলে দাও।

গোপাল—এ আর বেশি কি? এর চেয়ে কতো বড় বড় উপকার করে বেড়াই আমি।

[গোপাল চ্যাঙারি টানছে। শ্যামা লাফিয়ে ঢোকে।]

শ্যামা—অ্যাই অ্যাই! ছাড়্ ছাড়্ বলছি...

চৈতালী—ম্যারেজ অ্যানিভার্সারির মার্কেটিং হচ্ছে...পুওর ম্যান...গোপাল, ট্যাক্সিতে মাল তোলো...

গোপাল—(চ্যাঙারি টানতে টানতে হাঁকে) ট্যাক্সি, ট্যাক্সি...ছেড়ে দাও বৌদি, মাসিমার উপকার করতে দাও।

শ্যামা—(চ্যাঙারি ধরে টেনে) ছাড় ছাড়...সাতগুষ্ঠির লোক আসছে খেতে। তাদের পাতে দেব কী?

চৈতালী—ফ্রড! জোচ্চোর! আমার সঙ্গে চালাকি!

শ্যামা—অ্যাই গালাগাল দেবেন না কিন্তু...

চৈতালী—গোপাল, ট্যাক্সি...

গোপাল—ট্যাক্সি—ই—ই...

শ্যামা—অ্যাই...অ্যাই...

চৈতালী—(নিজেই চ্যাঙারি টানে) আই ওয়ারন ইউ...লক আপে দেব...দুজনকেই ঘুঘু দেখিয়ে দেব...মিস চৈতালী চ্যাটার্জি...অ্যাডভোকেট...

শ্যামা—দূর দূর, আমার বলে মাথা ভেঙে বাজ পড়েছে!

[শ্যামা ও চৈতালী দুপাশ থেকে টানছে। আর কোমর বেঁধে ঝগড়া করছে। গোলমালের মধ্যে আলো নিভে যায়।]

[আলো জ্বললে দেখা যায়, বিকেল। ঘরে নীতিশ ও গোপাল। নীতিশ টাকা গুণছে। গোপাল প্লেটে মাংস চাখছে আর গাইছে—]

গোপাল—ঝঞ্ঝাট ঝামেলা কেটে যাক...আনন্দে দিন যাক্ কেটে যাক....(গান থামিয়ে) আঃ ফার্স্টক্লাস হয়েছে! কি গন্ধ ছেড়েছে। এই নিতুদা, দেখ না কি গন্ধ ছেড়েছে। আরে দেখই না...(প্লেট বাড়িয়ে ধরে)

নীতিশ—(হিসেব করতে করতে অন্যমনস্কের মত বলে) গন্ধ দেখতে হয় না। (নাক টেনে) বেশ গন্ধ ছেড়েছে। আমার বৌটা রাঁধে ভালো বুঝলি গোপাল!

গোপাল—কার বৌদি দেখতে হবে তো...! বেলবট পরবে নিতুদা, যোগাড় করে আনব?

নীতিশ—ধ্যাৎ, বিয়ের দিন বলে কথা। ধুতি-পাঞ্জাবি পরতে হয়!

গোপাল—ফোট! তোমার আবার বাড়াবাড়ি। বেশ বেলবট চড়িয়ে বৌদির পাশে দাঁড়ালে—সেই থেকে কি গুণছ একশবার?

নীতিশ—কত রইল দেখছি। মিস চৈতালী চ্যাটার্জি পুরো একখানা পাত্তি নিয়ে বেরোলো। উঃ আসবি আয় ঠিক আজই...

গোপাল—কমের ওপর গেছে। চ্যাঙারি নিয়ে গেলে বিবাহ-বার্ষিকীর বারোটা বাজিয়ে দিত—

[প্লেট রেখে মুখ মুছে গোপাল ওঠে]

নীতিশ—(সপ্রশ্ন চোখে) কী রে?

গোপাল—কাটি।

নীতিশ—কাটবি কি রে?

গোপাল—না...যাই দেখি, বেকবাগানের দিকে আবার কি হচ্ছে। কার কি দরকার পড়ে—আজকাল খুব বসন্ত হচ্ছে।

নীতশ—বোস! একবার বেকবাগানে ঢুকে পড়লে সন্ধেবেলা তোকে আর পাওয়া যাবে? সাত দিনের ভেতর টিকি দেখা যাবে না। দই মিষ্টিগুলোর কি হবে?

গোপাল—ও হ্যাঁ হ্যাঁ...দাও টাকা দাও...

নীতিশ—শ্যামা, রান্নার কদ্দূর?

শ্যামা—(নেপথ্যে) সব হয়ে গেছে, ফিসফ্রাইটা ওরা এলে ভেজে দেব।

নীতিশ—তুমি একটু সাজবে গুজবে তো শ্যামা।

শ্যামা—(বাইরে থেকে) সাজব আবার কি, রান্নার কাপড়টা পাল্টে নেব।

নীতিশ—জানিস গোপাল, সাজলে গুজলে তোর বৌদিকে এমন দেখায় না, আমার আবার ওকে বিয়ে করতে ইচ্ছে করে! (গুনগুন করে) তোমায় সাজাবো যতনে...

গোপাল—কুসুম যদি বা আছে আমার রতন নেইরে...

নীতিশ—সাড়ে তিনটে বাজে, দই মিষ্টিটা এনে রাখ—পরে আর সময় পাবিনা...ডেকরেটারের দোকানে আমার তেরোটা ফোল্ডিং চেয়ার বলা আছে...শ্যামা, পান আনবো, তবক দেওয়া পান?

শ্যামা—(বাইরে) তোমার ইচ্ছে হলে আনাও, কিন্তু ওরা পান খায় তো?

নীতিশ—বুঝলি তো, ম্যাক্সিমাম সাইজের নিবি মিষ্টিগুলো,...ওঃ হো গোপলা, চকোলেট! বড়রা তো এসে সরবতের গেলাস ধরবে...বাচ্চাদের হাতে একটা কিছু ধরিয়ে দিবি তো...

গোপাল—(বাইরের দরজার ওপাশ থেকে চিঠি কুড়িয়ে) তোমার চিঠি।

নীতিশ—চিঠি! কোত্থেকে এল?

গোপাল—দ্যাখো তো, মনে হচ্ছে দেশ থেকে মাসিমা—

নীতিশ—মা? কই দে দে। (চিঠিটা নিয়ে পকেটে রাখে)

গোপাল—পড়লে না?

নীতিশ—পড়ব'খন।

গোপাল—দ্যাখো হয়ত জরুরি।

নীতিশ—হ্যাঁ হ্যাঁ জরুরি।

গোপাল—মাসিমার অসুখ হয়েছিল, কেমন আছে...

নীতিশ—সেরে গেছে, সব সেরে গেছে—

গোপাল—(খপ করে চিঠিটা তুলে নিয়ে) বৌদি, চিঠি!

নীতিশ—চিঠি! চিঠি! (চিঠি কেড়ে নিয়ে) মাথায় এক ভূত চাপলে নামতে চায় না! ডোবাতে চাস!

গোপাল—দ্যাখো না কেমন আছে মাসি...

নীতিশ—ভাল আছে। এঁঃ মা'র পোড়ে না মাসির পোড়ে।

গোপাল—মাসির জন্যে বড় কষ্ট হয় নিতুদা!

নীতিশ—তোর?

গোপাল—বুড়ো মানুষ, একা একা গাঁয়ে পড়ে থাকে...তোমাদের সাতপুরুষের ভিটে আগলে! কেউ দেখার নেই। তুমি তো খোঁজ খবর নাও না...টাকা পাঠাতে ভুলে যাও!...কোনদিন শুনবে বুড়ি পুকুরঘাটে পা হড়কে, কি ভোরবেলা শিউলিতলায় শীতে জমে...

নীতিশ—তুই এসব ইমাজিন করিস?

গোপাল—এক একদিন রাতে ঘুম আসে না...সব বুড়োবুড়ি, কেউ যাদের দেখার নেই, সবার মুখগুলো ভাসে নিতুদা...

নীতিশ—কোথাকার ইন্টারন্যাশনাল পরহিতৈষী!

গোপাল—চিঠিটা দাওনা...দেখি বুড়িটা বেঁচে আছে কিনা!

নীতিশ—আছে, এখন সলতে পাকাচ্ছে। সাঁঝের বেলা তোর নামে পিদিম জ্বালবে। বাবা, বেঁচে কি মরে সেটা কি আর ঘন্টাকয় পরে জানলে ভারতবর্ষ উলটে যাবে?

[শ্যামা ঢোকে]

শ্যামা—যাবে। সব কিছু বাদবাদ করে বাদ দিয়ে রাখলে চলেনা। পড়ে দ্যাখো কি হয়েছে মা'র। মাঘ মাস থেকে বুড়ি শয্যাশায়ী! সাত সাতটা চিঠি দিয়েছে, সব তুমি ছিঁড়ে ফেল। মা'র নাম পর্যন্ত মুখে আনো না।

নীতিশ—দোহাই তোমাদের। এতগুলো ভদ্দরলোকের ছেলেকে যখন নেমন্তন্ন করেই ফেলেছি, আর উটকো ঝঞ্ঝাট বাধিয়ো না!

শ্যামা—(গোপালের দিকে ঘুরে) মা হ'লো উটকো ঝঞ্ঝাট!

নীতিশ—একবার পেছনে যখন লেগেছে...সাধ্য কি আমার কিছু করার!...ওই যে দেখছে রয়েছে...টাকা রয়েছে, ব্যস...চারধার থেকে সব...কটা টাকা তুলে এনেছিলাম...উকিলটা খামচা দিয়ে নিয়ে গেল..আবার...

শ্যামা—(গোপালকে) দেখছো রাশ রাশ টাকা উড়োচ্ছে আর সেদিকে...

গোপাল—দরকারের বেলায় তুমি বড্ড কিপ্টে নিতুদা।

নীতিশ—চুপ কর! ব্যাটা শুঁড়ির সাক্ষী মাতাল। ছিল, আমার চিঠি পড়ে ছিল...তুই তুলতে গেলি কেন?

শ্যামা—মাতাল হয়েছ তুমি! নইলে ফুর্তি ছেড়ে আগে চিঠিটা পড়তে...

নীতিশ—শ্যামা, সব জ্বালিয়ে পুড়িয়ে দেব কিন্তু...

গোপাল—কী লোক তুমি মাইরি নিতুদা। পৃথিবীতে একজনও নেই যে হাতে চিঠি পেয়ে না খুলে থাকতে পারে।

শ্যামা—বলো, বলো তোমরা...পাগল কি গারদে থাকে, না থাকে সংসারে?

নীতিশ—পাগল, হ্যাঁ আমি পাগল! ছেলেবেলা থেকে উপোস করে করে আমি পাগল হয়ে গেছি। আমার বন্ধুদের কারো কোন অভাব নেই। তারা কত কী করে! আর আমি?...মাঘ মাস থেকে মা বলছে দেখতে যেতে, পারি না...খালি হাতে দেখতে যাবো কি! মা যে কিছু আশা করে। চিঠি কেন ছিঁড়ে ফেলি!...পাড়ার লোক ধরে ধরে মা পত্তর দেয়। প্রত্যেকটা পত্রে অবস্থা খারাপ...আরো খারাপ...আরো! এতে কী লেখা আছে...কী লেখা থাকতে পারে আমি জানি...সেই এতটুকু বয়েস থেকে জানি কখন কোন্ চিঠি কোন্ খবর নিয়ে আসে। ভাল খবর কখনো আসে না রে—। সকাল থেকে আজও জানতাম আসছে...একটা খবর আসছে! ভয় করছিল আমার। তাই হলো! আজকের দিনে এটা আমি পড়তে পারব না। একটা দিন...মাত্তর কয়েক ঘণ্টা আমাকে তোমরা ছেড়ে দাও। জীবনে আর কোনদিন কিছু চাইব না। (শ্যামা অদূরে মুখ নিচু করে দাঁড়িয়ে) গোপলা—

গোপাল—উঁ?

নীতিশ—(টাকা দেয়) চকোলেট।

গোপাল—চকোলেট!

নীতিশ—(টাকা দেয়) দই মিষ্টি পান...

গোপাল—রোজ ওয়াটার...

নীতিশ—(টাকা দেয়) ডেকরেটার।

গোপাল—তেরটা ফোল্ডিং চেয়ার। মনে আছে! বৌদি...এই বৌদি, কথাই বলছ না, তোমার জন্যে একটা বেলফুলের মালা আনব?

[নীতিশের ইশারায় গোপাল চলে যায়। নীতিশ শ্যামার কাছে যায়। আনত বিষণ্ণ মুখখানি তুলে ধরে]

নীতিশ—(একটু থেমে) কথা বলবে না?

শ্যামা—(ঠোঁট কামড়ে) কী করতে হবে বলো?

নীতিশ—ওদের যে আসার সময় হলো।

শ্যামা—যা বলবে সব...সব করে দিচ্ছি।

[শ্যামা ঘরের কোণে রাখা ভাঁজ করা চাদরটা এনে পালঙ্কের ওপর বিছোয়। নীতিশ হাত লাগায়।]

নীতিশ—বাঃ বাঃ ফাইন, ফাইন! (দুজনে ঘুরে ঘুরে চাদরের কোণাগুলো মুড়ছে) দ্যাখো তো আর দেখা যাচ্ছে...ছেঁড়া গদি...হুড়হুড় করে তুলো বেরুচ্ছে, দেখা যাচ্ছে আর...

শ্যামা—(অস্ফুট স্বরে) না।

নীতিশ—তবে! একটু চেষ্টা করলে সব যখন ঢাকা যায়...অন্তত ঘণ্টা কয়েকের জন্যে দিব্যি ঢেকে রাখা যায়...(নীরবে চাদরের ওপর সুতোর কাজে হাত বোলাচ্ছে) বাঃ। বারে বা! কতদিন বাদে দেখছি, তবু কী সুন্দর লাগছে। সেলাইয়ের কাজ বড্ড ভাল জানতে গো! মনে আছে, বিয়ের পরে তুমি সেই রং বেরঙের সুতো আর চুমকি বসিয়ে একটা হরিণ তৈরী করেছিলে...লিখেছিলে সোনার হরিণ কোন্ বনেতে থাকো...আর এই চাদরের কাজটা! এতো সুন্দর! কেউ পারে, কারো বৌ পারে এমন ছেঁড়া কাপড়ের সুতো দিয়ে তুলতে এমন সুন্দর 'এক ডালে দুই পাখি!' মনে আছে তোমার, ছোড়দি প্রথমবার বেড়াতে এসে কী বলেছিল? একটা পাখি নিতু, আর একটা পাখি শ্যামা।

[শ্যামার চোখ ঘিরে বর্ষার কালো ছায়া]

শ্যামা—তোমার ঘরে ক'পয়সার ন্যাপথলও কি জুটল...একটা পাখি পোকায় কেটে দিল।

নীতিশ—(হুমড়ি খেয়ে পড়ে) আরে আরে তাই তো! ইস, একবারে শেষ করে দিয়েছে।

শ্যামা—একটা পাখি আমার শেষ করে দিয়েছে, কুরেকুরে কেটে কেটে...

নীতিশ—শ্যামা!

শ্যামা—(আঙুল দিয়ে দেখিয়ে) ছোড়দি বলেছিল না, একটা পাখি তুমি আর একটা আমি! এই শেষ হয়ে যাওয়াটা আমি...

নীতিশ—সত্যি তুমি একেবারে পালটে গেছ...সেই তুমি...আর এই তুমি...

শ্যামা—(ঝরঝর করে কেঁদে ফেলে) বলছি তো, বলছি তো, আমি শেষ হয়ে গেছি!

নীতিশ—শ্যামা...এই শ্যামা, কেঁদোনা, কেঁদোনা, সব ঠিক হয়ে যাবে শ্যামা...(হঠাৎ কি

মনে পড়ে) শ্যামা, আই বাস, সেটা তোমায় দেখানো হয়নি।

[নীতিশ ছুটে গ্রামোফোনের কাছে যায়]

বলতো কী এনেছি? (একটা রেকর্ড বার করে) সেই গানটা...তুমি বিয়ের পর গাইতে।

শ্যামা—(চোখ মুছে) কোন্‌টা?

নীতিশ—সেই যে সারাক্ষণ গাইতে...ধ্যাৎ, তোমার মনে নেই? রবীন্দ্রসঙ্গীত...

শ্যামা—উঁহু, কোন্‌টা বলো তো?

[নীতিশ রেকর্ড চালিয়ে দেয়। গান বেজে ওঠে : 'ও জোনাকি কী সুখে ওই ডানাদুটি মেলেছ']

নীতিশ—কী? মনে পড়েছে? মনে পড়েছে? ও জোনাকি কী সুখে ওই ডানাদুটি মেলেছ।

[শ্যামার চোখেমুখে বিদ্যুৎ চমকে ওঠে। শ্যামা ছুটে গিয়ে রেকর্ড থামিয়ে গেয়ে ওঠে।]

শ্যামা— ও জোনাকি কী সুখে ওই ডানাদুটি মেলেছ...
এই আঁধার সাঁঝে বনের মাঝে উল্লাসে প্রাণ ঢেলেছ...
তুমি নও তো সূর্য নও তো চন্দ্র...তাই বলি কি কম আনন্দ...
তুমি আপন জীবন পূর্ণ করে আপন আলো জ্বেলেছ...
ও জোনাকি কী সুখে ওই ডানাদুটি মেলেছ...

[বাইরে হর্নের শব্দ]

নীতিশ—(তড়াক করে লাফিয়ে) এসে গেছে। ননীর গাড়ি, সাদা গাড়ি...ফাইভ টু থ্রি নাইন...(দরজা অবধি ছুটে গিয়ে) ডাইং ক্লিনিঙের টেম্পো! ধুস!

শ্যামা—এতো বেলা থাকতে আসবে নাকি, সব কাজের মানুষ।

নীতিশ—আরে দূর দূর, কাজ! কুত্তাবাবুর আবার কাজ!

শ্যামা—কুত্তাবাবু!

নীতিশ—জানো না...বলিনি তোমাকে...ননীর কাজ তো কুকুর নিয়ে...

শ্যামা—কুকুর নিয়ে?

নীতিশ—হ্যাঁ গো, অল ইণ্ডিয়া ডগ...ডগ...মানে ওই কুকুর নিয়ে কি একটা ফেডারেশন আছে। কুকুর মানে ভাল কুকুর...দামী দামী বিদেশী দারুণ দারুণ...নেড়িকুত্তা না তা বলে। তা ননী হলো তার প্রেসিডেন্ট, সেক্রেটারি...অল ইন অল...

শ্যামা—বাবা, কুকুর নিয়ে ননীবাবু অত বড়লোক!

নীতিশ—বড়লোক মানে! রেগুলার রইস পার্টি! বাড়ি...গাড়ি...টাকা, প্রেস্টিজ! এই কনফারেন্স হচ্ছে...মিটিং হচ্ছে...বিরাট বিরাট পার্টি দিচ্ছে...এই শুনল অমুক জায়গায় ডালকুত্তার সর্দি হয়েছে, হুট করে প্লেনে চেপে, হুস করে ননীবাবু চলে গেল। বড়লোকদের ব্যাপার স্যাপারই আলাদা...

শ্যামা—অত বড়লোকের সঙ্গে তোমার বন্ধুত্ব...

নীতিশ—কি করে হলো! আরে এক কেলাসে পড়তুম যে। ওঃ ননীটা তখন কি ট্যারাই ছিল ! জানো, ভূগোল-স্যার ম্যাপে রাশিয়া দেখাতে বললে, স্ট্রেট আমেরিকার দিকে তাকাত।

শ্যামা—ও বাবা, সে যে বিশ্ব-ট্যারা গো—

নীতিশ—হুঁ! কেলাস থেকে বেরিয়ে ওর কেলাস আর আমার কেলাস আলাদা হয়ে গেল।

শ্যামা—বাচ্চারা তো বলো খুব সুন্দর!

নীতিশ—হ্যাঁ খুব সুন্দর। ফুটফুটে, সায়েবের মত গায়ের রং, খুব মিষ্টি...আমি গেলেই কাঁধে চড়বে...ননীর বাচ্চাদের দেখলে চোখ জুড়িয়ে যায়...

শ্যামা—একদিন রাখা যায় না? মানে আজকের রাতটা বাচ্চারা যদি আমার কাছে থাকে...

নীতিশ—পাগল না পায়জামা! ননীর বাচ্চারা একরাতেই আমার ট্যাঁক ফাঁক করে দেবে। কত বায়না...ওর চেয়ে নিজের ছেলে হলে কমে হত।

[শ্যামা দুম দুম করে কিল মারে নীতিশের পিঠে।]

(আনন্দে গুনগুন করে) ও জোনাকি কী সুখে ওই ডানাদুটি মেলেছ....

শ্যামা—তোমার বন্ধুরা বড়লোক বলে তোমার খুব দুঃখু—তাই না?

নীতিশ—দুঃখু! আরে না না, তা না! শুধু মাঝে মাঝে কিরকম খোঁচা লাগে...একদম এইখানে। ননীর ছোটমেয়ের মুখেভাতে...ওঃ, সে কী এলাহি ব্যাপার...হ্যাঁ, খাওয়ার টেবিলে খোঁচাটা কড়াং করে লেগেছিল!

শ্যামা—খোঁচা! কী খোঁচা গো!

নীতিশ—ভুবন আমার পাশে বসেছিল। বলল, নিতুর বাড়ি কবে খাচ্ছি আমরা? শুনেই ননী হা হা করে উঠল—যেদিন বৃষ্টি হবে, আর যেদিন বৃষ্টি হবে না...দুটো দিন বাদ দিয়ে নিতু আমাদের খাওয়াবে। কড়াং করে যেন চাবুক পড়ল শ্যামা, এইখানে। সেদিন থেকে তাক করে আছি, একদিন ব্যাটাদের আমি তাক লাগিয়ে দেব! ঠিক! শুধু তোরাই আমায় ডেকে খাওয়াবি, আমি তোদের ডাকতে পারি না! তখন ভাবলাম যা থাকে কপালে...প্রভিডেণ্ট ফাণ্ড তো প্রভিডেণ্ট ফাণ্ডই সই! লড়িয়ে দিলাম!

শ্যামা—কী বা করতে পারছি আমরা...লোকের বাড়ি এক একটা উৎসবে কত হৈ চৈ...কত আলো জ্বলে...কতরকমের বাজি পোড়ে...বাজনা বাজে...ফুলের ভারে দরজাগুলো নুয়ে পড়ে...ছবির মতো...আর তুমি কাগজের শিকলি করেছ।

নীতিশ—(একটু পরে) ভুবন বোধহয় একটা প্রেসার কুকার দেবে।

শ্যামা—(পাকা বুড়ির মত) না গো না, এক প্যাক চানাচুর!

নীতিশ—চানাচুর! অতো বড়লোক, চানাচুর প্রেজেন্ট করবে? ধ্যাৎ!

শ্যামা—হ্যাঁ বাবা হ্যাঁ, মিলিয়ে নিয়ো। বড়লোক কতো দেখলাম। সেবারে তোমার আগের কোম্পানির কার্তিকবাবুর মেয়ের বিয়েতে দেখনি, লাল সোনালি রূপোলি রংবেরং-এ কার্ড দিয়ে অত করে নেমন্তন্ন করে নিয়ে গিয়ে খাওয়ালো খালি এককাপ কফি!...প্রেসার কুকার দিচ্ছে! দিলে যে উপকার হবে একটু! ওই চনাচুরই ঠেকাবে!

নীতিশ—(ক্রুদ্ধ চোখে) আমাদের বিবাহ বার্ষিকীতে ও যদি চানাচুরের প্যাকেট দেয়—(থেমে) ধ্যাৎ, আমরা বড্ড লোভী! কী পাবো তাই ভাবছি। যা খুশি দেবে! আমরা তো আর পাওয়ার জন্যে অনুষ্ঠান করছি না।

[একটা ফোল্ডিং চেয়ার কাঁধে গোপাল ছুটে আসে।]

গোপাল—নিতুদা...

নীতিশ—কিরে...

গোপাল—এসে গেছে...

নীতিশ—এসে গেছে! শ্যামা গেট রেডি... [নীতিশ বাইরের দিকে পা বাড়ায়]

গোপাল—(বাধা দিয়ে) আগে শুনবে তো কে এসেছে!

নীতিশ—কে? ননী না ভুবনের ফ্যামিলি...

গোপাল—ননীও না, ছানাও না! মোড়ের মুদি...

নীতিশ—মুদি! মুদি কেন? তাকে তো ইনভাইট করিনি!

গোপাল—আরে দূর ছক্কা। তাগাদায় এসেছে। তোমার কাছে টাকা পাবে?

নীতিশ—পাবে। সব মুদিই সব গেরস্তের কাছে টাকা পায়। যখন তখন চাইলেই হলো! দেখাচ্ছি!

গোপাল—আরে দাঁড়াও দাঁড়াও। খালি মুদি না, গোয়ালাও...

নীতিশ—গোয়ালাও জুটেছে...

গোপাল—সঙ্গে মাংসঅলা...

নীতিশ—(সভয়ে) রহমৎ!

গোপাল—নবমী পুজোর দিন মাংস এনেছিলে?

শ্যামা—হ্যাঁ এনেছিল!

নীতিশ—এনেছিলাম। নবমীতে মাংসটা খেতে হয়, মাস্ট। নইলে আনতাম না।

গোপাল—ফলআলার কাছ থেকে শাঁকালু এনেছিলে কোনদিন?

শ্যামা—হ্যাঁ এনেছিল।

নীতিশ—কজন এসেছে...খোলসা করে বল তো?

গোপাল—বাজার ঝেঁটিয়ে ধার করে রেখেছো, জন ত্রিশ এসেছে, আরো আসছে...

[নেপথ্যে পাওনাদারের কোলাহল]

নীতিশ—সবাই মিলে হঠাৎ এভাবে ঝাঁপিয়ে পড়ল কেন?

শ্যামা—দেখছে তোমার ঘরে ক্রিয়াকাণ্ড হচ্ছে...

নীতিশ—তার মানে? ওরা কোত্থেকে দেখলে? [বাইরে গোলমাল]

গোপাল—বাঃ রিক্সো করে মোট মোট বাজার আনছি, দেখছে না!

নীতিশ—সক্কলকে দেখিয়ে দেখিয়ে আনছিস কেন?

গোপাল—আরে বাবা, মোট মোট মাল, পকেটে করে আনব? ওরা তো সন্দেহ করেছে...

নীতিশ—কী? আমি লটারি পেয়েছি?

শ্যামা—তোমারও তেমনি! সারা বছর ওদের কাছে ধারে খাবে, নগদ কেনার সময় অন্য জায়গায় পাঠাবে...

নীতিশ—হাঁদার মত কথা বোল না। ওদের ঘরে নগদ বাজারটি করতে গেলে, নগদটি রেখে আসতে হত...বাজারটি হতো না। যা, ওদের ভাগা।

গোপাল—আমি!

নীতিশ—পেছনে পেছনে জুটিয়ে নিয়ে এলি, তা তুই যাবি না তো মুই যাবো! হাটা, দরজা থেকে ভীড় হাটা!

গোপাল—বৌদি...(শ্যামার পিছনে যায়।)

শ্যামা—খামোকা ওকে ঠেলো না। এক-বাজার লোক সরানো ওর কম্ম নয়। দাও...

নীতিশ—কী?

শ্যামা—টাকা দাও...ওরা আজ শুনবে না কিছুতে...

নীতিশ—কেন? কেন শুনবে না? আমার কি হাতিশালে হাতি আর ঘোড়াশালে ঘোড়া উঠেছে? প্রভিডেণ্ট ফাণ্ডের টাকা তুলে কেউ শাঁকালুর দেনা মেটায় না।

শ্যামা—রহমৎ চ্যাঁচাচ্ছে, বিশ্রী কাণ্ড করবে। ওকে জানো তো।

নীতিশ—(দরজার দিকে এগিয়ে) বড়লোক হইনি, লটারি পাইনি...প্রভিডেণ্ট ফাণ্ড ভেঙেছি! (শ্যামা নীতিশের পকেটে হাত ঢোকায়) এই, হাত তোল...ছিঁড়ে যাবে... মাত্তর এই কটা টাকা...

শ্যামা—ধার পুষে রাখা তোমার স্বভাব।

নীতিশ—এখনো অনেক খরচা...

শ্যামা—আগের খরচা আগে করো, বাবুয়ানি পরে হবে, পাড়ার লোকে যে ছি ছি করছে...

[বাইরে চিৎকার]

নীতিশ—শ্যামা ভালো হবে না!

শ্যামা—লজ্জা করে না এর মধ্যে বড়লোক বন্ধুদের সঙ্গে পাল্লা দিতে...

[শ্যামা মুঠোয় টাকা নিয়ে হাত তোলে]

নীতিশ—টাকা, আমার টাকা, দাও বলছি...

শ্যামা—কেন? কেন? তোমার জন্যে অপমান হতে হবে? বাড়ি ঢুকে অপমান করবে তাই সইতে হবে? নিজে তো বাজার হাট যাওয়া বন্ধ করেছ...যেতে হয় আমায়...মুখ দেখাতে হয় আমায়! আমার মান আমায় রাখতে হবে। সরে যাও।

নীতিশ—বিশ্রী! তুমি একটা বিশ্রী! পোকায় কাটা ঐ পাখিটার মতো...

গোপাল—নিতুদা, এই নিতুদা, চুপ করো!

শ্যামা—গোপাল, চল মিটিয়ে দিয়ে আসি!

[শ্যামা ও গোপাল বেরিয়ে এল]

নীতিশ—(অসহায়ের মতো চিৎকার করতে থাকে) শ্যামা...শ্যামা...দিয়ে যাও...ও আমার আলাদা টাকা...

[শ্যামা ফিরল না। নীতিশের চোখে পড়ল মেঝেতে চিঠিটা পড়ে আছে। শ্যামার সঙ্গে কাড়াকাড়ির সময় কখন পকেট থেকে পড়ে গেছে। রাগে গরগর করতে করতে খামের মুখটা ছেঁড়ে, চিটি পড়ে। চিঠির ওপর চোখ বুলিয়েই নীতিশ অস্পষ্ট আর্তনাদ করে ওঠে। নীতিশ চীৎকার করে বিছানার চাদরটা টেনে ছুঁড়ে ফেলে দেয়। সাজানো শিকলি ছেঁড়ে, ফুলদানি আছড়ে ভাঙে, রজনীগন্ধা পা দিয়ে মাড়ায়। এর মধ্যে ঘরের বাল্বটা ফিউজ হয়। অন্ধকারে নীতিশ সেই ধ্বংসস্তুপের মধ্যে চুপ করে বসে থাকে। শ্যামা ঢুকছে।]

শ্যামা—শুনছ, সবাইকে কিছু কিছু মিটিয়ে দিলাম। বুঝিয়ে সুঝিয়ে কিছু টাকা ফেরতও এনেছি। এ কী, বাল্বটা গেল নাকি? সময়কালে কী বিপত্তি! দেশলাইটা জ্বালো না। শুনছ। কোথায় তুমি। প্রদীপটা কোথায় রেখেছ? (পায়ে কী যেন লাগে) একী! এখানে কী পড়ে আছে?

[শ্যামা ছুটে ভেতরে যায় এবং একটা জ্বলন্ত প্রদীপ নিয়ে ঢোকে। প্রদীপের আলোয় শ্যামা ঘরটা দেখে আঁতকে ওঠে।]

ও মাগো! একী! এসব কে করলে! আমার ফুলগুলো...এমন করে সব তচনচ করলে কে?...আমার চাদরটা এমন করে...

[চাদরটা মাটি থেকে বুকের ওপর টেনে নিয়ে]

কেন, আমার সর্বনাশ কেন করলে?

[নীতিশ এতোক্ষণ গুম হয়ে অন্ধকার কোণে বসেছিল।]

নীতিশ—যা চাইছিলে তাইতো হয়েছে!

শ্যামা—কী, কী চাইছিলাম? সব নষ্ট করে দিতে!...কী, কী ভেবেছ কী তুমি! একটা দিন আনন্দ করতে আমার প্রাণ চাইতে পারে না? কী...কী এমন অন্যায় করেছি, এমন করে শোধ তুলবে! হ্যাঁ নিয়েছি...তোমার টাকা কেড়ে নিয়েছি...বোঝো না, চারদিকে তোমার ধার দেনা...বোঝো না সব দায় এড়িয়ে আনন্দ করা যায় না। বোঝো না...

নীতিশ—(হঠাৎ চিৎকার করে) সাজিয়ে রেখে কী হবে শ্যামা...কাদের জন্যে রাখব?

ওরা কেউ আসবে না।

শ্যামা—কারা? কারা আসবে না?

নীতিশ—ননী ভুবন! ওরা তোমার ঘরে নেমন্তন্ন রাখতে আসছে না।

শ্যামা—সেকী!—কেন?

নীতিশ—পড়ো,এই চিঠিখানা পড়ো...

শ্যামা—চিঠি!

নীতিশ—ওটা মা-র লেখা না! ননী লিখেছে। পড়ো, পড়ো...

শ্যামা—(প্রদীপের আলোয় চিঠিটা মেলে ধরে একটুখানি পড়ার চেষ্টা করে) তুমি পড়ো না...

নীতিশ—(চিঠিটা হাতে নিয়ে) শুভেচ্ছা জানিয়েছে। কোথায় একটা চাকরি খালি আছে, দরখাস্ত করতে বলেছে, আর...

শ্যামা—আর...আর কী?

নীতিশ—আর লিখেছে যে খাওয়াতে চেয়েছি, এই ঢের! আমার যা অবস্থা সত্যি সত্যি না খাওয়ালেও চলবে! শ্যামা, ওরা নাকি সত্যি সত্যি আমাদের কাছে খেতে চায়নি!

শ্যামা—চায়নি?

নীতিশ—না। লিখেছে আমি বাহাদুর লোক...এই অবস্থার মধ্যে ওদের নেমন্তন্ন করার সাহস রাখি। আর শেষ লাইন...তুই খুশিতো নিতু, এতোবড় একটা খরচের হাত থেকে তোকে বাঁচিয়ে দিলাম...

শ্যামা—ও! ননীবাবুরা ভেবেছেন যে তাঁরা না এলেই তাঁদের গরিব বন্ধু বেশি খুশি হবে!

নীতিশ—হ্যাঁ, ওরা বিশ্বাসই করে না আমরা ওদের জন্য এতো আয়োজন করে বসে থাকতে পারি! ননী, আমি তোদের বন্ধু, আর তোরা বিশ্বাসই করিস না আমার একটা অন্তর আছে! (দুচোখে জল টলমল করে। মাথা নিচু করে) এতো লজ্জা করছে!

শ্যামা—(অদ্ভুত চাপা গলায়) কেন যাও, কেন যাও ঐ বড়লোক বন্ধুদের কাছে, যারা শুধু আমাদের গরিব বলে করুণা করে! কেন, কেন যাও?

নীতিশ—শ্যামা...

শ্যামা—(বাতিদানে পাঁচটি মোমবাতি জ্বালাচ্ছে) নাইবা এলো ওরা...নাইবা জ্বলল আলো... বাজল বাজনা! কিন্তু আমাদের দিনটা মিছে কেন হবে সাতুই ফাল্গুন...আমাদের একটা দিন! বলো...ওরা কে আমাদের অ্যাঁ, যে এলো না বলে সব নষ্ট করে দিতে হবে? ওরা আমাদের কেউ না গো...কেউ না...

[শ্যামা ও নীতিশ মোমবাতির আলোয় মুখোমুখি তাকায়। দুজনের মুখে হাসি ফুটে ওঠে। ধীরে ধীরে পর্দা নামে।]

□

একটি অবাস্তব গল্প

বিমল বন্দ্যোপাধ্যায়

(১৯৪০—)

চরিত্র

ঘোষক
জেলার
অহীন
কমল
নকুল
রাম সিং
কেষ্ট
বাচস্পতি
ক মণ্ডল
ডাক্তার

[পর্দা উঠতেই দেখা গেল ঘোষক দাঁড়িয়ে আছেন।]

ঘোষক—নমস্কার—একটা কথা প্রথমেই বলে রাখি—আপনারা আজ যে নাটকটি দেখবেন তার গল্পটি কিন্তু অবাস্তব। মানে, বাস্তবে এ ঘটনা ঘটা কখনোই সম্ভব নয়।

আচ্ছা একটা কথা আপনাদের জিজ্ঞাসা করি। আপনারা কি মৃত্যুদণ্ডের পক্ষে? আর সে মৃত্যুদণ্ড যদি ফাঁসি হয়? জানি আপনাদের মধ্যে শতকরা ৬১ জন বলবেন—হ্যাঁ, শতকরা ২৮ জন বলবেন—না এবং শতকরা ১১ জন বলবেন—জানি না—বা ভেবে দেখিনি তো। আপনাদের মধ্যে যে শতকরা ৬১ জন হ্যাঁ বলবেন তাঁদের যদি জিজ্ঞাসা করি, আচ্ছা ফাঁসি ব্যাপারটা সম্বন্ধে কোনো ধারণা আছে আপনাদের? মানে, ফাঁসি কি ভাবে দেওয়া হয়? আপনারা 'না' বলবেন। আমি জানি 'না'-ই বলবেন আপনারা। কেননা যাঁরা ফাঁসি দেন তাঁরা পরে এসে বলতে পারেন না যে, মশাই, আমার এইভাবে ফাঁসি হয়েছিল। তাই বলছিলাম, চলুন একটা চান্স নেওয়া যাক—আজ একজনের ফাঁসি হবে। আপনাদের দেখিয়ে নিয়ে আসি। হ্যাঁ, খড়দহের ক মণ্ডলের ফাঁসি হবে।

আজ থেকে পাঁচ বছর আগে এই ক মণ্ডল তার স্ত্রী চাঁপারানীকে গলা টিপে খুন করে। এবং এই দীর্ঘ পাঁচ বছর ধরে আইনের রথী-মহারথীরা আইনের অণু-পরমাণু ঘেঁটে ক মণ্ডলকে দোষী সাব্যস্ত করেছেন এবং ওর ফাঁসির হুকুম দিয়েছেন। আজ ক মণ্ডলের ফাঁসি হবে।

এখন সময় ভোর সাড়ে তিনটে। ক মণ্ডলকে স্নান করানো হয়েছে। তাকে নতুন ধুতি পাঞ্জাবি পরানো হয়েছে। জেলার সাহেব সস্নেহে তাকে জিজ্ঞাসা করলেন, সে কি খেতে ভালবাসে। সবাইকে চমকে দিয়ে সে বলেছে যে, সে ভোরবেলা লঙ্কা-পোড়া দিয়ে পান্তাভাত খেতে ভালবাসে।

[হঠাৎ ঘোষকের ওপর থেকে আলো সরে যায়। অন্য একটা জোনাল আলোয় দেখা যায় জেলার সাহেব ও জেলের ডাক্তার দাঁড়িয়ে আছেন।]

জেলার—আরে মশাই, আমি কোথায় ভাবলুম ব্যাটাছেলে সারা জীবন ভালমন্দ খেতে পায়নি, নিশ্চয়ই সন্দেশ রসগোল্লা খেতে চাইবে। আমি নিজে গিয়ে বাজারের সেরা মিষ্টি-দই সব কিনে আনলুম, আর ব্যাটা বলে কিনা লঙ্কা-পোড়া দিয়ে পান্তাভাত খাবে! বলুন দেখি, আমি এখন পান্তাভাত পাই কোথায়?

ডাক্তার—আমি বলছিলাম কি জেলার সাহেব, ভাতে জল ঢেলে দিলেই তো পান্তাভাত হয়ে যায়।

জেলার—আরে ধ্যুর মশাই, এত সহজ? ফাঁসির আসামী। আমি ওকে চিট্ করেছি শুনলে গবরমেণ্ট আমায় চিট্ করে দেবে না? ওঃ, ব্যাটা কি বিপদে ফেললে বলুন দিকি আমায়!

ডাক্তার—আমি বলছিলাম কি জেলার সাহেব, পান্তাভাত কি খাওয়াতেই হবে?

জেলার—আপনি বলেন কি ডাক্তার সাহেব! ফাঁসির আসামীর শেষ ইচ্ছে। ওকে পান্তাভাত না খাওয়ালে গবরমেণ্ট আমার চাকরি খাবে। ওঃ! কী বিপদেই পড়লুম বলুন তো! পঁচিশ বছর সুনামের সঙ্গে চাকরি করে শেষে কিনা পান্তাভাতের জন্যে চাকরি যাবে? ওহে নকুল—

[একজন কনেষ্টবল এসে দাঁড়ায়]

নকুল—বলুন স্যার।

জেলার—একবার আমার কোয়ার্টারে যাও। গিয়ে মেমসাহেবকে জিজ্ঞেস কর, কাল রাতে ছোট খোকা ন্যাকার করেছিলো বলে ভাত খায়নি, সেই ভাতগুলো কি ফেলে দিয়েছে?

নকুল—(প্রস্থানোদ্যত) আচ্ছা স্যার।

জেলার—আরে শোন, যাচ্ছো কোথায়? যদি বলেন, হ্যাঁ, ফেলে দিয়েছি। তবে তুমি পরিষ্কার বলে দিও যে, বড়বাবু বলে দিয়েছেন আপনি ছেলেপুলে নিয়ে বাপের বাড়ি চলে যান, বড়বাবু চাকরি খুইয়ে দু'দিন বাদে ওইখানে গিয়ে উঠবেন।

নকুল—আচ্ছা স্যার।

জেলার—আর শোন, যদি বলেন, না, ফেলে দিইনি, জল দিয়ে রেখে দিয়েছি, তবে thank you বলে সেই ভাতগুলো একটা থালায় করে নিয়ে আসবে, সঙ্গে চারটে লঙ্কা-পোড়া।

নকুল—(প্রস্থানোদ্যত) আচ্ছা স্যার।

জেলার—আর শোন, যাবার সময় অফিসের টেব্‌লে দেখবে, কিছু মিষ্টি আর এক ভাঁড় দই আছে। এগুলো নিয়ে মেমসাহেবকে দেবে, ছোট খোকাকে খেতে দিতে বলবে।

নকুল—(প্রস্থানোদ্যত) আচ্ছা স্যার।

জেলার—না-না, শোন। দইটি ওকে দিতে বারণ করবে। ঘোল করে রাখতে বলবে, আমি বাড়ি গিয়ে খাব।

নকুল—আচ্ছা স্যার (দাঁড়িয়ে থাকে)।

জেলার—কি হল, দাঁড়িয়ে রইলে কেন?

নকুল—না স্যার, আর যদি কিছু বলার থাকে—

জেলার—না, আর কিছু বলার নেই, তুমি যাও।

নকুল—(প্রস্থানোদ্যত) আচ্ছা স্যার।

জেলার—আর শোন, একটু তাড়াতাড়ি এস।

[আলো সরে যায়—আবার ঘোষকের ওপর পড়ে।]

ঘোষক—যাই হোক, অনেক কষ্ট করে জেলার সাহেব ক মণ্ডলের শেষ ইচ্ছে অনুযায়ী তাকে পান্তাভাত খাওয়ালেন। তারপর তাকে নিয়ে আসা হ'ল ফাঁসির মঞ্চের কাছাকাছি একটা জায়গায়। সেইখানে সরকারী পুরোহিত শ্রীপঞ্চানন বাচস্পতি মহাশয় তাকে গীতা পাঠ করে শোনাচ্ছেন।

[আলো সরে অন্য জোনে আসতে দেখা গেল, ক মণ্ডল দাঁড়িয়ে আছে। আর সামনে দাঁড়িয়ে পঞ্চানন বাচস্পতি গীতা পাঠ করছেন নিচু স্বরে। একটু দূরে দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করছেন জেলার সাহেব, ডাক্তার, দু'জন অফিসার—অহীনবাবু আর কমলবাবু, তিনজন কনষ্টেবল—নকুল, রামসিং আর কেষ্ট দাঁড়িয়ে, জেলার ঘড়ি দেখে বললেন।]

জেলার—ওঃ, এই আর এক ল্যাঠা! ঠিক ৪টে ৫৫ মিনিটে ঝোলাতে হবে, আর বাচস্পতি সেই থেকে কি অং বং চং করছে কে জানে।

ডাক্তার—ইয়ে, আমি বলছিলাম কি, একটু তাড়া মারুন না।

অহীন—না ডাক্তার সাহেব, তাড়া মারাটা ঠিক হবে না। বুঝলেন না, সরকারী পুরুত—

জেলার—তবে আর কি—সরকারী পুরুত। আরে বাবা, ঘড়ির কাঁটা তো আর সরকারী পুরুতের দিকে তাকিয়ে বসে থাকবে না। সে তো টাইম হলেই ফুড়ুৎ করে ঘুরে যাবে। ও মশাই বাচস্পতি, আপনার হ'ল?

[বাচস্পতি হাতের ইশারায় তাঁকে চুপ করতে বলেন।]

জেলার—ও কমল, তোমরা সব রেডি তো?

কমল—আজ্ঞে হ্যাঁ স্যার।

জেলার—Hangman এসেছে তো?

কমল—হ্যাঁ স্যার।

জেলার—সবই তো ঠিক আছে। কিন্তু বাচস্পতি এত দেরি করছে—ও মশাই বাচস্পতি, আপনার হ'ল?

[বাচস্পতি মন্ত্র পাঠ শেষ করে এগিয়ে আসেন।]

বাচস্পতি—আপনি অত্যন্ত অর্বাচীন। দেখছেন একটা লোক পরপারে চলে যাচ্ছে, তাকে একটু ঠাকুরের নাম শোনাচ্ছি—

জেলার—আরে থামুন মশাই! ঠাকুরের নাম! আপনি ওর কানের গোড়ায় বিড়-বিড় করে ঠাকুরের নাম শোনাচ্ছিলেন না আমায় খিস্তি করছিলেন, শুনতে গেছি? বেশী কথা না বলে কাজ করুন, একদম সময় নেই।

[আলো সরে ঘোষকের ওপর পড়ে।]

ঘোষক—এইবার সবাই মিলে তাকে ফাঁসির মঞ্চের কাছে নিয়ে যায়। তার হাত দুটো

পেছন দিকে বাঁধা হয়। তার সমস্ত মুখটা একটা কালো কাপড়ের মুখোশে ঢেকে দেওয়া হয়। জেলার সাহেব ক মণ্ডলের অপরাধের পূর্ণ বিবরণ তাকে শুনিয়ে দেন এবং মহামান্য আদালতের যে রায়ের বলে তার মৃত্যুদণ্ড হচ্ছে সেই রায়ের পূর্ণ বিবরণটি পাঠ করেন। তারপর ফাঁসির দড়িটা তার গলায় পরিয়ে দেওয়া হয়। জেলার সাহেব দশ থেকে নীচের দিকে গুণতে শুরু করেন এবং যেই শূন্যে এসে পৌঁছল, দড়িতে টান পড়ে। ক মণ্ডলের পায়ের তলা থেকে কাঠের পাটাতনটা সরে যায়। তার দেহটা শূন্যে ঝুলে পড়ে।

[ঘোষকের বর্ণনা অনুযায়ী সমস্ত ব্যাপারটা মঞ্চে ঘটতে দেখা গেল। এবং পেছনের কাটা জানলা দিয়ে দেখা যায় ক মণ্ডলের দেহটা শূন্যে ঝুলে আছে।]

ঘোষক—এইখানেই ক মণ্ডলের জীবন শেষ, আমাদের নাটকের শুরু।

[এই কথা বলেই ঘোষক মঞ্চের বাইরে চলে যান। মঞ্চের সামনের অংশে আলো-আঁধারিতে দেখা যায় জেলার, ডাক্তার সবাইকে। পেছনে অপেক্ষাকৃত উজ্জ্বল আলোয় দেখা যায় ক মণ্ডলের দেহ ঝুলে আছে। এইবার অহীনবাবু ডাক্তারকে সঙ্গে করে পেছনের অংশে ক মণ্ডলের দেহের কাছে যান, তার হাতের বাঁধন ও মুখের ঢাকনা খুলে দেওয়া হয়। ডাক্তার ক মণ্ডলের নাড়ী দেখেন। দেখেই চমকে ওঠেন। আবার দেখেন এবং চীৎকার করে মঞ্চের সামনে চলে আসেন।]

ডাক্তার—My God! he is still alive!

জেলার—Impossible! Absurd! কী বলছেন আপনি!

ডাক্তার—Yes, I swear—he is still alive!

জেলার—হতেই পারে না। ডাক্তার, নিশ্চয়ই আপনার কোথাও ভুল হচ্ছে।

ডাক্তার—ভুল—ভুল আমার হয় না। ডাক্তার হিসাবে মানুষ বাঁচবে কি না তা হয়তো ঠিক ঠিক সময় বলতে পারি না, কিন্তু মানুষ মরে গেছে কি না, ঠিক বলতে পারি।

বাচস্পতি—হবেই তো, মন্ত্রপাঠের সময় এতো বাধা দেওয়া—ও কাজ কি একবারে সফল হবে নাকি?

জেলার—একবারে হবে না মানে? ওকে কি আবার ফাঁসি দিতে হবে নাকি?

কমল—কি করবেন স্যার, সরকারী হুকুম বলছে Hang till death.

জেলার—কিন্তু এ কখনো হতে পারে নাকি? Doctor, is it really possible?

ডাক্তার—Well, I don't really know. সাধারণতঃ ফাঁসি দেওয়ার পাঁচ থেকে দশ মিনিটের মধ্যে মানুষের নাড়ি থেমে যায়, কিন্তু He is still alive.

জেলার—অহীনবাবু—

অহীন—বলুন স্যার।

জেলার—(ক মণ্ডলের দেহটা দেখিয়ে) লাশটাকে নামিয়ে আনুন।

ডাক্তার—Well, জেলার সাহেব, You can't call it a লাশ। He is still alive.

জেলার—আরে থামুন মশাই! একটা কাজ সুষ্ঠুভাবে সারতে পারেন না, আবার আইন দেখাচ্ছেন!

[ইতিমধ্যে অহীনবাবু ও অন্য কনেষ্টবলরা মিলে ক মণ্ডলের বাঁধন খুলে তাকে মঞ্চের সামনের অংশে নিয়ে এসেছে। সে এখন অজ্ঞান অবস্থায়। তাকে মঞ্চের মাঝখানে শোয়ানো হয়েছে।]

জেলার—ও কমল, কি করবো বল?

কমল—কি বলবো স্যার, কিছুই বুঝতে পারছি না। আচ্ছা স্যার এক কাজ করলে হয় না? সবাই মিলে ধরাধরি করে আর একবার দড়িতে লট্‌কিয়ে জোরে জোরে তিন-চারবার হ্যাঁচকা—

অহীন—না কমলবাবু, তাতে আইনে আটকাবে। আইন বলেছে যে, যে-লোকটার ফাঁসি হচ্ছে সে মৃত্যুর পূর্ব-মুহূর্তে জেনে যাবে যে, সে এই অপরাধ করেছিল তাই তার ফাঁসি হচ্ছে। ওর তো কোনো জ্ঞান নেই।

বাচস্পতি—আচ্ছা, এক কাজ করলে হয় না? জলটল দিয়ে কোনো রকমে জ্ঞানটা ফিরিয়ে নিয়ে এসে প্রথম থেকে সমস্ত ব্যাপারটা আর একবার করলে—

জেলার—প্রথম থেকে মানে? সেই পান্তাভাত থেকে? I am sorry. আমার বাড়িতে আর পান্তাভাত নেই।

অহীন—না-না, প্রথম থেকে সব কিছু করার কি দরকার? কোনো রকমে জ্ঞানটা ফিরিয়ে নিয়ে এসে রায়ের বয়ানটা শুনিয়ে—ঝুলিয়ে দিলেই চলবে।

বাচস্পতি—ইঃ, ইয়ারকি আর কি! আমি কি এখানে ঘাস কাটতে এসেছি নাকি? আমার একটা উপরি-পাওনা মাঠে মারা যাবে, তা হবে না। আপনারা ওর জ্ঞান ফিরিয়ে নিয়ে আসুন, আমি আবার মন্ত্র পড়ে শোনাই—

জেলার—দোহাই মশাই, আর মন্ত্রের কাজ নেই। আপনার ওই বোম্বাই অং বং চং শুনেই বোধহয় ওর প্রাণটা বেরুতে চাইছে না। ডাক্তার সাহেব, দেখুন তো কোনো রকমে ব্যাটার জ্ঞানটা ফিরিয়ে আনা যায় কি না।

[ডাক্তার এদিক ওদিক খানিক পরীক্ষা করে হঠাৎ ক মণ্ডলের দু'পাশে পা রেখে ওর বুকের ওপর চেপে বসেন এবং ওর বুকে চাপ দিতে থাকেন। খানিকটা 'মার জুয়ানা—হেঁইও' ধরনের আওয়াজ করতে থাকেন।]

জেলার—ও কি করছেন ডাক্তার সাহেব?

ডাক্তার—(মার জুয়ানা হেঁইও সুরে) একে বলে—হেঁইও।

আরটিফিসিয়াল—হেঁইও।

রেশপিরেশন—হেঁইও।

এমনি করে—হেঁইও। বড় বড়—

সকলে—হেঁইও।

ডাক্তার—হার্টের রোগীর—

সকলে—হেঁইও।

ডাক্তার—হার্ট বন্ধ—

সকলে—হেঁইও।

ডাক্তার—হলে পরে—

সকলে—হেঁইও।

ডাক্তার—হার্টটাকে তো—

সকলে—হেঁইও।

ডাক্তার—চালু করে—

সকলে—হেঁইও।

ডাক্তার—নিন, জ্ঞান এসে গেছে।

জেলার—এসে গেছে? কই দেখি—এই সর সর, সামনে থেকে সর। এই রামসিং, একটা চেয়ার নিয়ে এস জলদি জলদি।

[সকলে ক মণ্ডলকে ঘিরে ধরে নানান টুকরো কথা বলতে থাকে। ইতিমধ্যে রামসিং ভেতর থেকে একটা চেয়ার নিয়ে আসে। মঞ্চের মাঝখানে সেটা রেখে ক মণ্ডলকে তার ওপর বসানো হয়। ক মণ্ডল শূন্য দৃষ্টিতে সামনের দিকে তাকিয়ে বসে থাকে।]

জেলার—ডাক্তার সাহেব, এইবার ওকে বোঝান যে, স্ত্রী চাঁপারানীকে গলা টিপে খুন করার জন্য ভারতীয় দণ্ডবিধির এতো ধারা অনুযায়ী ওকে আমরা ফাঁসিতে ঝোলাব।

ডাক্তার—(ক মণ্ডলের পাশে গিয়ে) ভাই ক মণ্ডল, আমার কথা শুনতে পাচ্ছ?

ক মণ্ডল—(না-বোঝার ভঙ্গিতে) আমাকে কিছু বলছেন?

ডাক্তার—হ্যাঁ, তোমাকে বলছি ভাই, তোমার নাম ক মণ্ডল ভাই।

ক মণ্ডল—কই, আমার মনে পড়ছে না তো।

ডাক্তার—পড়বে ভাই। আমার সঙ্গে কথাবার্তা বললেই মনে পড়বে।

ক মণ্ডল—আমি এখানে কেন?

ডাক্তার—তোমার যে ফাঁসি হবে ভাই।

ক মণ্ডল—ফাঁসি কি?

বাচস্পতি—শাস্ত্রসম্মত উপায়ে গলায় দড়ি দিয়ে ঝোলানো।

জেলার—আঃ, আপনি ফুটকাটা একদিন বন্ধ করবেন!

ডাক্তার—ফাঁসি মানে হচ্ছে ভাই, hang till death—মানে, আমৃত্যু ঝোলানো। তোমাকে না আমরা ঝোলাব।

ক মণ্ডল—আমাকে ঝোলালে কি হবে?

ডাক্তার—তুমি মরে যাবে।

ক মণ্ডল—মরা কি?

বাচস্পতি—বেঁচে না থাকা।

ডাক্তার—তা হ'লে আপনিই বলুন, আমি চলে যাই।

জেলার—(বাচস্পতিকে) দেখুন মশাই, আপনি যদি একটাও কথা বলেন, খুব খারাপ হয়ে যাবে। ডাক্তার সাহেব, please, চালিয়ে যান।

ডাক্তার—মরা মানে ভাই, বেঁচে না থাকা।

ক মণ্ডল—বাঁচা কি?

ডাক্তার—বাঁচা মানে বাঁচা, এই যেমন আমরা বেঁচে আছি।

ক মণ্ডল—আমরা কি বেঁচে আছি?

জেলার—নাও কি উত্তর দেবে দাও। (ডাক্তার ওর দিকে তাকাতেই)—sorry ডাক্তার সাহেব।

ডাক্তার—নিশ্চয়ই বেঁচে আছ ভাই। এই তো তুমি বসে আছ। কাঠের চেয়ারে বসে আছ।

কেষ্ট—(রামসিংকে) ব্যাটা মাউড়া তো মাউড়াই। অপিসে এতগুলো ছারপোকাওয়ালা চেয়ার আছে, তার একটা আনতে পারলিনে? ব্যাটা বসলেই মালুম পেত বেঁচে আছে কি মরে গেছে।

জেলার—এই যে কেষ্ট, চার্জশীট যাবার মতলব যদি না থাকে তবে চুপ করে থাক।

ডাক্তার—হ্যাঁ, তুমি বেঁচে আছ ভাই। এই যে আমি তোমার সামনে দাঁড়িয়ে আছি। তুমি আমাকে দেখতে পাচ্ছ না?

ক মণ্ডল—আপনি কে?

ডাক্তার—আমি ডাক্তার। মানুষের সেবা করি। মানুষকে বাঁচাই।

ক মণ্ডল—আপনি মানুষকে বাঁচান?

ডাক্তার—Usually, মানে সাধারণতঃ।

ক মণ্ডল—তবে এতক্ষণ আপনি আমায় মরার কথা বলছিলেন কেন?

ডাক্তার—ইয়ে, মানে—(জেলারকে) জেলার সাহেব, আমার আর এগুনো ঠিক হবে না। ব্যাপারটা খুব বেয়াড়া জায়গায় এসে গেছে।

বাচস্পতি—সরুন, সরুন, সব সরুন দেখি। আমি দেখছি। (এগিয়ে এসে) ওহে ক মণ্ডল, চেন আমাকে?

ক মণ্ডল—না।

বাচস্পতি—চেন না? ও, তোমার তো চেনার কথাই নয়। তোমার তো আগে কখনো ফাঁসি হয়নি। শোন, আমার নাম পঞ্চানন বাচস্পতি, সরকারী পুরোহিত, পূজা করি।

ক মণ্ডল—কি পূজা করেন?

বাচস্পতি—জেলের সব পূজা। জেলের দুর্গাপূজা, জেলের কালীপূজা, জেলের

সরস্বতী পূজা। তারপর ধর গিয়ে অনুশাসন পূজা। জেলার সাহেবের বাড়ির শনিপূজাও করি আমি।

জেলার—এই মশাই, ওটাকে আবার এর মধ্যে টানছেন কেন? ওটা তো আপনার unofficial duty.

ক মণ্ডল—এখানে পূজা হবে?

বাচস্পতি—হ্যাঁ বাবা, এখানে পূজা হবে, এখানে ফাঁসি পূজা হবে।

ক মণ্ডল—কই, এখানে তো কোনো ঠাকুর দেখতে পাচ্ছি না।

বাচস্পতি—দেখবে কি বাবা, ঠাকুরকে কি চোখ চাইলেই দেখা যায়? ঠাকুরকে উপলব্ধি করতে হয়।

জেলার—ধ্যুর মশাই, হটুন তো! যত সব বোম্বাষ্টিক কথা! (এগিয়ে গিয়ে) ওহে ক মণ্ডল, আমি ডাক্তারও নই পুরুতও নই, আমি হলাম পুলিশ।

ক মণ্ডল—পুলিশ কি?

বাচস্পতি—পুলিশ হ'ল তারা/চোর ধরে যারা।

জেলার—না, ভুল বললেন, পুলিশ হ'ল তারা/পুরুত তাড়ায় যারা। আর একটা কথা বললে এখান থেকে বার করে দেব।

বাচস্পতি—ইঃ, বার করে দেবেন! কত সাধ্যি! আমি সরকারী পুরোহিত। সরকারী কাজে এসেছি, ব্যাস্—আমাকে বার করে দেবার আপনার কোনো এক্তিয়ার নেই।

জেলার—আর একটা কথা বলে দেখুন। এক্তিয়ার আছে কি নেই, বুঝিয়ে দেব। ওহে ক মণ্ডল, যা বলছিলাম, তুমি তোমার স্ত্রী চাঁপারানীকে গলা টিপে খুন করেছ; তার জন্য তোমার ফাঁসি হবে।

ক মণ্ডল—চাঁপারানী কে?

জেলার—চাঁপারানী তোমার বউ, যাকে তুমি খুন করেছ। মনে পড়ছে না?

ক মণ্ডল—না।

জেলার—মনে পড়ছে না, না, ইচ্ছে করে মনে করতে চাইছ না?

ক মণ্ডল—না গো বাবু, সত্যি করে বলছি, আমার কিছুই মনে পড়ছে না।

জেলার—ওঃ! এ তো শালা আচ্ছা ঝামেলায় পড়লুম! ও কমল, কি করি, একটু বুদ্ধি-টুদ্ধি দাও না।

কমল—কি বলব স্যার, কিছুই বুঝতে পারছি না।

অহীন—স্যার, এরকমভাবে হবে না। সেদিনকার ঘটনার একটা vivid description ওকে দিতে হবে।

জেলার—পারলে—আপনি দিন।

অহীন—(ক মণ্ডলের কাছে যায়) ক মণ্ডল, খড়দহে তোমার বাড়ি ছিল। বাড়িতে তোমার অন্ধ বুড়ো বাপ, তিন ছেলেমেয়ে আর বউ চাঁপা। সেখানে একটা rolling

mill-এ তুমি কাজ করতে। মাইনে-টাইনে তোমার ভালই ছিল। কিন্তু তোমার অনেক বদ্ দোষ ছিল। তুমি প্রচণ্ড নেশাখোর ছিলে। ঘরে তোমার সুন্দরী স্ত্রী থাকা সত্ত্বেও তোমার খারাপ পাড়ায় যাতায়াত ছিল। যাই হোক, হঠাৎ একদিন শ্রমিক অসন্তোষের দরুন তোমার কারখানার মালিক তোমাদের কারখানা বন্ধ করে দিতে বাধ্য হয়। তোমার বাড়িতে অভাব দেখা দিল। কিন্তু তবু তোমার নেশার পয়সা যোগাড় করতেই হবে। একদিন যখন তোমার কারখানার গেটের সামনে ইউনিয়নের নেতারা তোমাদের উস্কে দিয়ে বক্তৃতা করছিল তখন তোমার খুব নেশা করতে ইচ্ছে হ'ল। তুমি টাকার সন্ধানে কাবুলীওয়ালার কাছে গেলে। সে তোমাকে টাকা দিলে না। এক বন্ধু তোমাকে খাওয়ালে। নেশায় টং হয়ে তুমি বাড়ি ফিরলে। বাড়ি ফিরেই তুমি তোমার অন্ধ বুড়ো বাপকে টাকার জন্য গাল দিতে লাগলে। তোমার ছেলেমেয়েরা তখন ভাত খাচ্ছিল। তুমি ওদের ওপর রেগে গেলে—আমার মাল খাবার পয়সা নেই, তোরা ভাত খাচ্ছিস! তুমি মারধোর শুরু করতেই চাঁপা ছুটে এল ওদের বাঁচাতে—তখন তুমি চাঁপার কাছে মদ খাবার পয়সা চাইলে—চাঁপা দিতে পারল না। তখন তুমি সামনে পড়ে থাকা একটা থালা তুলে নিলে বিক্রি করে মদ খাবে বলে। চাঁপা বাধা দিতে এলে তুমি ওর গলাটা টিপে ধরলে। সে মরে গেল। (হাঁপাতে থাকে) ক মণ্ডল, শুনলে তো সব কথা? এইবার মনে পড়েছে?

ক মণ্ডল—না।

[সবাই হতাশাব্যঞ্জক আওয়াজ করে]

রামসিং—(কেষ্টকে) আরে ভাই, হিন্দীমে বাতানেসে কুছ ফয়দা হোগা?

কেষ্ট—আরে দূর মাউড়া, দেখছিস বাংলাতে কাজ হচ্ছে না—হিন্দী!

জেলার—ওঃ, শালা এ তো আচ্ছা ঝামেলায় পড়লুম!

কমল—স্যার, আমার মাথায় একটা আইডিয়া এসেছে।

জেলার—ছাড়।

কমল—মানে, বলছিলাম কি—আমরা সবাই মিলে ওর সামনে একটা নাটক অভিনয় করে দেখাই না কেন?

জেলার—তার মানে? কি বলতে চাইছ তুমি?

কমল—বলছিলাম যে, ধরুন আমাদের মধ্যে কেউ ক মণ্ডল সাজলুম—তারপর ধরুন, সেদিনকার ঘটনাটা পুরো ওর সামনে অভিনয় করে দেখালুম।

জেলার—Not a very bad idea—কি বলেন ডাক্তার সাহেব? কাজ হতে পারে বলে মনে হচ্ছে।

ডাক্তার—একটা chance নেওয়া যেতে পারে।

জেলার—বেশ তো, শুরু করা যাক। কমল, তোমার acting-facting ভাল আসে।

তুমি ওর বাপ সাজ। অহীনবাবু, আপনি ক মণ্ডল। তোমরা তিনজন ছেলে মেয়ে। আর ডাক্তার সাহেব, আপনি চাঁপারানী।

ডাক্তার—কে, আমি? না-না, আমাকে ঠিক—না, মানে, সত্যি কথা বলতে কি, এই স্যুট-টুট পরা অবস্থায়—তার চেয়ে I would suggest, বাচস্পতি মশাইকে দিয়ে চাঁপারানীটা—মানে, ওঁর ওই নামাবলীটা শাড়ি হিসাবে কাজে লাগানো যেতে পারে।

বাচস্পতি—কে, আমি? আমার দ্বারা ওসব হবে না। আমার কাজ মন্ত্র পড়া—ব্যাস্।

জেলার—বাজে কথা বলবেন না। সরকারী ব্যাপার, এখানে আমার কাজ বলে কোনো আলাদা কিছু নেই।

বাচস্পতি—আমি করব না—ব্যাস্।

জেলার—আপনাকে করতে হবে, ব্যাস্। না পারলে আপনার নামে report করব, ব্যাস্।

নকুল—স্যার, আমাদের মধ্যেও গণ্ডগোল।

জেলার—তোমাদের আবার কি হ'ল?

কেষ্ট—না স্যার, ওই লোকটারও দুই মেয়ে এক ছেলে। তা আমি নকুল আর রামসিংকে বললুম, তোরা ফিমেল রোল দুটো কর—তা রামসিং রাজী হচ্ছে না।

রামসিং—নেহি, হম জেনানাকো কাম নেহি করেগা।

জেলার—দাঁড়াও দাঁড়াও, হড়বড় করো না। অহীনবাবু, ক মণ্ডলের ছেলেমেয়েদের stage-টা বলুন তো।

অহীন—আজ্ঞে ওর বড় মেয়েটা সাত বছরের—ছোট মেয়েটা চার বছরের, আর একদম ছোট ছেলেটা দু' বছরের।

জেলার—ঠিক আছে—সিনিয়রিটি অনুযায়ী নকুল, তুমি বড় মেয়ে—কেষ্ট, তুমি ছোট মেয়ে; আর রামসিং, তুম্ ছেলেটা। আর ঝামেলা ক'রো না—শুরু কর।

[এই কথার সঙ্গে সঙ্গে দেখা গেল কমল এক জায়গায় বসে খক্ খক্ করে বুড়োদের মতো কাশছে। বাচস্পতি নামাবলী ঘোমটার মতো মাথায় দিয়ে কাল্পনিক উনুনের সামনে বসে রান্না করছে। তিনজন ছেলেমেয়ে খেলা করছে। অহীনবাবু এক কোণ থেকে আসতে থাকে।]

জেলার—(বাধা দিয়ে) অহীনবাবু, কারখানার গেট থেকে—আমি ইউনিয়নের লীডার, বক্তৃতা করছি। (বক্তৃতার সুরে) বন্ধুগণ, আজ এক মাস হয়ে গেল এ কারখানা বন্ধ রয়েছে। মালিক বলেছে—মালিক বলেছে—ও কমল, এরপর কি বলব, একটু বলে দাও।

কমল—মালিকেরা যা বলে থাকে তাই বলেছে।

জেলার—হ্যাঁ, মালিকেরা যা বলে তাই বলেছে। কিন্তু কারখানা আমরা খোলাবই তা সে

কারখানা থাক আর না-থাক, আমাদের ভেঙে পড়লে চলবে না—আমাদের সোজা হয়ে দাঁড়াতে হবে তালগাছের মতন। রবীন্দ্রনাথ ছোটখোকার বইয়ের এক জায়গায় বলেছেন—তালগাছ এক পায়ে দাঁড়িয়ে/সব গাছ ছাড়িয়ে/উঁকি মারে আকাশে। আমাদের সেই তালগাছ হতে হবে। সব্বাই-এর মাথা ছাড়িয়ে উঁকি মারতে হবে। আপনারা সব একজোট হোন। বন্দেমাতরম্। আমাদের নেতা যুগ যুগ জিও!

অহীন—আরে ধ্যুর—বাবুদের বক্তিমে শুনে শুনে কান পচে গেল। এখন একটু নেশা করতে ইচ্ছে করছে। কিন্তু পকেটে একটাও পয়সা নেই। পয়সা পাই কোথায়? (ডাক্তারকে দেখিয়ে) ওই তো—ওই তো রহমৎ খাঁ কাবুলীওয়ালা—ওকে ধরা যাক। রহমৎ—রহমৎভাই।

ডাক্তার—(কাবুলীওয়ালা ঢঙে) কি খোবর মণ্ডলবাবু, কেমোন আছে?

অহীন—ভাল নয় ভাই—ভীষণ বিপদের মধ্যে আছি। আজ এক মাস হয়ে গেল কারখানা বন্ধ, তাই তোমার কাছে এসেছি।

ডাক্তার—হামার কাছে কেনো আসিয়াছে? আমি তো তুমাদের কারখানার মালিক নেহি আছে।

অহীন—মানে, যদি ক'টা টাকা ধার দাও—

ডাক্তার—টাকা ধার দেব তুমাকে? তুমি টাকা ধার লইলে শোধ দিবে কি করিয়া?

অহীন—কারখানা খুললেই সব শোধ করে দেব।

ডাক্তার—তুমার কারখানা আর খুলিবে না।

অহীন—আজ না হয় কাল, একদিন-না-একদিন তো খুলবেই।

ডাক্তার—তখন আমিও টাকা দিবে, যত চাহিবে তত দিবে—এখন এক পয়সাও দিবে না। চাই হিং, চাই হিং—

জেলার—এঃ, ডাক্তার সাহেব—দিলেন সব মার্ডার করে! যে কাবলে টাকা ধার দেয়, সে কখনো হিং বেচে না।

ডাক্তার—বেচে না? সে কি! আমার ধারণা ছিল—

বাচস্পতি—হ্যাঁ হ্যাঁ, বেচে।

জেলার—যা জানেন না তাই নিয়ে ফড়-ফড় করবেন না।

বাচস্পতি—আপনি আমার চেয়ে বেশী জানেন? আমি নিজে—

জেলার—ফের বাজে কথা বলছেন! আপনি নিজে দেখেছেন—যে কাবলে হিং বেচে সে টাকা ধার দেয়?

বাচস্পতি—শুধু দেখেছি নয়—আমি নিজে ধার নিয়েছি আমার ষষ্ঠ পুত্রের অন্নপ্রাশনের সময়।

কমল—থাকগে, ও নিয়ে সময় নষ্ট করার কোনো মানে হয় না স্যার—ওটা খুব minor পয়েন্ট।

জেলার—আর অহীনবাবু, ব্যাপারটা আর একটু realistic করুন। অতো sophisticated কথাবার্তা ক মণ্ডলের ক্লাসের লোকদের মুখে মানায় না। দু'চারটে খিস্তি করুন।

অহীন—পারব না স্যার।

জেলার—কি পারবেন না?

অহীন—খিস্তি উচ্চারণ করতে পারব না, দিব্যি দেওয়া আছে।

জেলার—তার মানে? কিসের দিব্যি?

অহীন—আজ্ঞে স্যার, এই চাকরিতে ঢোকার পর প্রথম প্রথম খুব মুখ খারাপ হয়ে গিয়েছিল। যখন তখন খিস্তি বেরুত। বিয়ের পর প্রথম শ্বশুরবাড়ি গিয়ে শ্বশুর মশাইয়ের সঙ্গে গল্প করতে করতে দুটো কাঁচা খিস্তি বেরিয়ে গেল। সেই থেকে স্ত্রী দিব্যি দিয়েছে, খিস্তি উচ্চারণ করলেই ওর মরামুখ দেখব।

জেলার—এই চাকরি ছেড়ে পাঠশালা খুলে বসুনগে। ও সব থাক্‌গে, চালিয়ে যান।

অহীন—না স্যার, আমি বলছিলাম যে, ক মণ্ডলটা আপনিই করুন। মানে, সত্যি বলতে কি, to make it realistic খিস্তি-টিস্তি একটু করা উচিত—আর, আপনার ওটা আসে ভাল।

বাচস্পতি—না, খারাপ কথা বললে আমি এখানে থাকব না, ব্যাস্।

জেলার—দেখুন মশাই, চাকরি করতে এসে অত পিট্‌পিট্ করলে চলে না। ঠিক আছে, ক মণ্ডলটা আমিই করছি। খিস্তি না হয় একটু কম করব।

[আবার যে যার অভিনয়ে মনোযোগ দেন। জেলার সাহেব এক কোণ থেকে ক মণ্ডলের মত আসেন।]

কমল—কে রে, খোকা এলি?

জেলার—হ্যাঁ।

কমল—সারাদিন কোথায় ঘুরিস রে খোকা?

জেলার—গরু চরাতে যাই রে বুড়ো। জানো না কি ধান্দায় আমি ঘুরি?

কমল—কি ধান্দায় ঘুরিস রে খোকা?

জেলার—রাবণের গুষ্টির জাবনার ব্যবস্থা করতে যাই রে বুড়ো। শোন, তোমার কাছে যে লুকোনো টাকা আছে, সেটা আমায় দাও।

কমল—টাকা? টাকা আমি কোথায় পাব রে খোকা?

জেলার—কোথায় পাবে আমি কি জানি। আমি মাল খাব, ব্যাস্, টাকা দাও।

কমল—আমি টাকা কোথায় পাব, বল?

জেলার—কোথায় পাবে? কেন, আমার যখন চাকরি ছিল তখন তো রোজ আমার পকেট থেকে সরাতে—সে টাকা কোথায়?

কমল—না বাবা, ধর্মত বলছি—কোনোদিনও আমি তোর পকেট থেকে টাকা নিইনি।

জেলার—ফের মিথ্যে বলছ বুড়ো? আমি নিজে চোখে দেখিনি?

কমল—সে তো বাবা, একদিন দেখেছিলি, তাও নিতে পারিনি। অন্ধ মানুষ, আন্দাজে আন্দাজে তোর পায়জামা মনে করে যেটা হাতড়েছিলুম সেটা ছিল বৌমার সায়া—তাতে তো বাবা পকেট থাকে না।

জেলার—ওসব জানি না—আমায় টাকা দাও, মাল খাব।

কমল—সত্যি বলছি বাবা, এক পয়সাও দিতে পারব না।

জেলার—পারবে না তো বাপ হয়েছিলে কেন? বাপ হয়ে ছেলেকে এক পাত্তর মাল খাবার পয়সা দিতে পার না তো জন্ম দিয়েছিলে কেন?

বাচস্পতি—এ আবার কেমুন ধরনের কতা? বাপের সঙ্গে অমুনভাবে কতা বলে নাকি নোকে?

জেলার—এই মেয়েছেলে—না sorry, এই মাগী, তুই চুপ করে থাক।

বাচস্পতি—ইঃ, চুপ করবে—চুপ করবো কেন শুনি?

নকুল—বাবা, আজ চাল এনেছ?

জেলার—না, চাল পাইনি।

কেষ্ট—আটা এনেছ?

জেলার—না, আটা পাইনি।

রামসিং—তব হামলোগ.কেয়া খায়গা?

জেলার—Idiot! ঘটে যদি একটু বুদ্ধি থাকে! ওর দুই মেয়ে বাঙালী হ'ল, আর ছেলেটা হিন্দুস্থানী? তুম একটা কথা নেই বোলেগা। খালি যব বোলেগা তব কাঁদেগা।

রামসিং—জি হাঁ।

নকুল—চাল আননি, আটা আননি, তবে আমরা খাব কি?

জেলার—আমার মাথা খা।

বাচস্পতি—ইঃ, যে না মাতা। গোবরপোরা মাতা—ওর আবার খাব কি?

জেলার—বাচস্পতি, এটা personal attack হয়ে গেল।

বাচস্পতি—কেন, personal attack হতে যাবে কেন? যে কথায় যে উত্তর।

জেলার—আমি জানি, আপনি আমার আড়ালে বহু জায়গায় বলেছেন যে, জেলার সাহেবের মাথায় গোবর পোরা আছে।

বাচস্পতি—সেটা তো আপনার গিন্নীরই কথা, আমি শুধু প্রচার করেছি।

জেলার—আপনি মহা ত্যাঁদড় লোক মশাই। সামনাসামনি তো বলবার সাহস নেই, তাই মওকা পেয়ে শুনিয়ে দিলেন। ঠিক আছে, আমিও মওকা পেলে এর শোধ তুলব। (আবার ক মণ্ডলের মতন) কি বললি মাগী, আমার মাথায় গোবর পোরা? তোর বাপের মাথায় গোবর পোরা।

বাচস্পতি—বাপ তুলে কথা বলবেনি বলে দিচ্ছি।

জেলার—বেশ করবো বলবো। কি করবি রে তুই মাগী? মারবি?

কেষ্ট—বাবা, মা—তোমরা ঝগড়া ক'রো না, আমার ভীষণ ভয় করছে।

কমল—অ খোকা, অ বউ, কি হ'ল রে তোদের?

জেলার—তোর সব কথায় কাজ কি রে বুড়ো? তুই চুপ করে বসে থাক।

বাচস্পতি—মিন্‌সের কথা শুনলে গা জ্বলে যায়! বুড়ো বাপ, তাকে বলে কি না চুপ করে বসে থাক!

জেলার—এই মাগী, তুই চুপ করবি?

বাচস্পতি—ইঃ, চুপ করবে! চুপ করবো কেন শুনি? ভাত দেবার কেউ নয়, কিল মারার গোঁসাই।

জেলার—তবে রে মাগী—

[এই বলেই জেলার সাহেব বাচস্পতির ওপর ঝাঁপিয়ে পড়েন। কনেষ্টবল তিনজন বাবাগো মাগো বলে চ্যাঁচাতে শুরু করে। এর মধ্যে রামসিং খালি হায় রাম হায় রাম করে কেঁদে যাচ্ছে। জেলার হুঙ্কার দিয়ে ওঠেন।]

আরে ধ্যুর, এ রকম হেঁড়ে গলায় বাচ্চার কান্না হলে কারো acting-এর মুড থাকে? (রামসিংকে) আর তোমার বুদ্ধিসুদ্ধি কবে হোগা? বাঙালীর ছেলে, কাঁদার সময় হায় রাম হায় রাম করতা হ্যায়? যাও—ফিন্ শুরু করো।

অহীন—আমি বলছিলাম কি স্যার—অনেক দূর তো হ'ল। এবার একবার ওকে জিজ্ঞেস করে দেখলে হয় না, ইতিমধ্যে ওর কিছু মনে পড়েছে কি না?

জেলার—হ্যাঁ, ঠিক বলেছেন। ডাক্তার সাহেব, একবার জিজ্ঞেস করে দেখুন তো—ওর কিছু মনে পড়েছে কি না?

ডাক্তার—ক মণ্ডল—ও ক মণ্ডল, তোমার কি কিছু মনে পড়েছে?

ক মণ্ডল—না।

ডাক্তার—Sorry. জেলার সাহেব—

বাচস্পতি—চালান—চালান, আমার তো খুব ভাল লাগছে। কবে বাল্যকালে যাত্রা করেছিলুম—এখনও দেখছি প্রতিভা মরেনি।

জেলার—আপনার কি মশাই, পেছন ফাটছে আমার। কত কষ্ট করে বানিয়ে বানিয়ে ডায়লগ বলতে হচ্ছে জানেন?

বাচস্পতি—কেন—কেন, এসব সংলাপ তো প্রত্যেকেরই মুখস্থ থাকা উচিত। বাড়িতে তো সকলেরই পত্নী আছেন।

জেলার—না, আমার পত্নী থাকলেও তার সঙ্গে আমার ঝগড়া হয় না। তিনি আমায় যথেষ্ট স্নেহ করেন। (অহীন খুক করে হেসে ওঠে) হাসলেন কেন অহীনবাবু?

অহীন—না—মানে, 'স্নেহ' কথাটা এখানে ঠিক প্রযোজ্য নয়। আসলে স্নেহ কথাটা বড়দের ক্ষেত্রে—

জেলার—আপনি বোধহয় জানেন না—আপনার বৌদি আমার চেয়ে তিন বছরের বড়। নিন, শুরু করুন।

বাচস্পতি—ভাত দেবার কেউ নয়—কিল মারার গোঁসাই।

জেলার—যা শালী, যেখানে ভাল ভাল খেতে পাবি সেখানে যা।

বাচস্পতি—যাবই তো, যেখেনে দু'চোখ যায় সেখেনে চলে যাব।

জেলার—চলে গেলেই তো পারিস। কে তোকে মাথার দিব্যি দিয়েছে থাকতে? তোর বাপের ক্ষমতা থাকে তো নিয়ে যাকনা তোকে।

বাচস্পতি—কেন—আমার বাপ নিতে যাবে কেন? ত্যাখন তো আমার বাপের পায়ে ধরে সেধেছিলে আমায় বে' করার জন্যি।

জেলার—বয়ে গিয়েছিল আমার। তোর বাপই আমার পায়ে ধরেছিল।

বাচস্পতি—মুখ খসে পড়বে তোমার। আমার বাপের নামে মিথ্যে কত্তা বললে মুখে পোকা পড়বে তোমার।

জেলার—এরপর আর না মেরে থাকা যায় না, কি বলেন ডাক্তার? তবে রে মাগী—

[জেলার ঝাঁপিয়ে পড়লেন বাচস্পতির ওপর। হাঁ হাঁ করে ছুটে আসে অহীন।]

অহীন—না-না-না, সমস্ত ব্যাপারটা গণ্ডগোল হয়ে গেল। আপনার তো প্রথমবারে চাঁপার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ার কথা নয়। আপনি মদ খাবার টাকা চাইবেন চাঁপার কাছে। সে দিতে চাইবে না, ছেলেমেয়েরা কাঁদতে থাকবে, আপনি তখন থালা বাসন চাইবেন বেচে মদ খাবার জন্য, সে দিতে চাইবে না—তখন আপনি ওর গলা টিপে ধরবেন।

বাচস্পতি—ওরে বাবা, এখনও এতো কাণ্ড বাকি? তাহলে জেলার সাহেব, এত জোরে ঝাঁপিয়ে পড়বেন না কিন্তু —বড্ড ব্যথা লাগে।

জেলার—আমার পক্ষে অমন কথা বলা সম্ভব নয়, acting-এর সময় আমার কি রকম মুড এসে যাবে, এখন কি করে বলব? এই যে ছেলেমেয়েরা, আমি ইশারা করলেই তোমরা কাঁদবে খাবার জন্য। শুরু করুন বাচস্পতি মশাই।

বাচস্পতি—আমার বাপের নামে মিথ্যে কথা বললে মুখে পোকা পড়বে! (জেলার ইশারা করতেই কনেস্টবল তিনজন কাঁদতে শুরু করে।)

নকুল—এ্যাঁ-এ্যাঁ-এ্যাঁ—খিদে পেয়েছে।

কমল—অ বউ, ঘরে কি কিছু নেই? ছেলেমেয়েদের দাও না।

বাচস্পতি—ঘরে আবার থাকবে কি? যেমন বাপ, ছেলেমেয়েদের খেতে দিতে পারে না—

কেষ্ট—এ্যাঁ-এ্যাঁ-এ্যাঁ, খিদে পেয়েছে।

রামসিং—ও হো হো, বড়ি জোরসে ভুখ্ লাগলবা।

বাচস্পতি—অন্য কোনো বউ হলে কবে চলে যেত। নেহাৎ আমার মতো সতীলক্ষ্মী

পেয়েছিলে, তাই বেঁচে গেলে।

জেলার—সতী? আমার কাছে আর সতীগিরি ফলাসনি। তুই যদি সতী হবি তাহলে তোর ছোট ছেলেটা মেড়ো ভাষায় কথা বলে কেন? ধ্যুর শালা, এ বাড়িতে আর থাকবই না। এই মাগী, টাকা দে—মাল খাব।

বাচস্পতি—এক পয়সাও নেই আমার কাছে।

জেলার—তবে ঐ থালাটা দে—ওইটা বেচে মাল খাব।

বাচস্পতি—খবরদার, ও থালা তুমি ছোঁবে না—ওটা আমার বিয়ের দানের থালা।

জেলার—ধ্যুর শালা, দানের থালা!

[জেলার এইবার একটি কাল্পনিক থালা তুলে নেন। বাচস্পতি সেই থালার অন্যদিকটা ধরে টানতে থাকে। দু'জনে কিছুক্ষণ টানাটানি করে। তারপর জেলার থালা ছেড়ে দিয়ে বাচস্পতির গলা টিপে ধরেন আর মুখে 'মর মাগী' 'মর মাগী' বলতে থাকেন। বাচস্পতির দেহ আস্তে আস্তে মাটিতে ঢলে পড়ে। ছেলেমেয়েরা কাঁদতে থাকে। কমল খালি খক্ খক্ করে কাশতে থাকে আর বিলাপ করতে থাকে। এমন সময় ক মণ্ডল একটু কান্নার মতন আওয়াজ করে। অহীনবাবু লাফ দিয়ে তার কাছে যান।]

অহীন—স্যার, কেঁদেছে।

জেলার—কেঁদেছে? (বাচস্পতিকে ছেড়ে উঠে আসেন) কই দেখি—দেখি। এই সর, সবাই সরে যাও।

[বাচস্পতি ছাড়া সবাই ক মণ্ডলকে ঘিরে নানান গুঞ্জন করতে থাকেন। বাচস্পতি পড়ে থাকে নিশ্চল মড়ার মতন। হঠাৎ কমলের চোখ পড়ে তার ওপর।]

কমল—বাচস্পতি মশাই—ও বাচস্পতি মশাই, উঠুন উঠুন, আর acting করতে হবে না—ক মণ্ডল কেঁদেছে। (বাচস্পতি নড়েন না) স্যার, শীগগির আসুন।

জেলার—কেন, কি হল?

কমল—বাচস্পতি মশাই নড়ছেন না—উঠছেন না।

জেলার—সেকি! ডাক্তার সাহেব, দেখুন তো কি হল?

[ডাক্তার পরীক্ষা করে গম্ভীর মুখে উঠে দাঁড়ান।]

ডাক্তার—I an sorry–He is dead.

জেলার—Impossible! (বাচস্পতির কাছে ছুটে যান) বাচস্পতি—ও বাচস্পতি—বাচস্পতি—উঠুন না মাইরি, কি ইয়ারকি করছেন! উঠছেন না! আপনারা বিশ্বাস করুন, আমি—আমি খুব আস্তে ওর গলাটা টিপে ধরেছিলাম। ও মরেনি—মাইরি বলছি, মরেনি। ডাক্তার—ডাক্তার, please, একটু দেখুন—আর একবার আপনার সেই হেঁইও মারি করুন—please.

ডাক্তার—কোন লাভ নেই—He is already dead.

জেলার—না-না-না, এ হতে পারে না। বাচস্পতি, বাপ আমার, ভাই আমার, দাদা

আমার, ওঠো ভাই—ওঠো, একবার চোখ খুলে তাকাও। ওঠো ভাই—ওঠো, ওঠ্ না রে শালা!

[এই কথা বলে জেলার সাহেব কাঁদতে কাঁদতে বাচস্পতির বুকের ওপর পড়েন এবং সরবে কাঁদতে থাকেন। তারপর হঠাৎ মুখ তুলে দেখেন সবাই তাঁর দিকে তাকিয়ে।]

একি! আপনারা সবাই আমার দিকে অমন করে তাকিয়ে আছেন কেন? বিশ্বাস করুন, আমি ওকে মারতে চাইনি। ওর ওপর আমার কোনো রাগ ছিল না—যা একটু খ্যাচ্ খ্যাচ্ করতাম ওকে শুধু সংস্কৃতের জন্য। ছেলেবেলায় আমি সংস্কৃতে বার বার ফেল করতাম—তাই সংস্কৃত-বলা লোক দেখলেই আমার রাগ হয়। কিন্তু তার জন্য কাউকে খুন করার কথা আমি ভাবতেই পারি না। আপনারা আমাকে বিশ্বাস করুন। হায় ভগবান! কেউ আমাকে বিশ্বাস করছে না!

অহীন—কমলবাবু, হেড কোয়ার্টারে ফোন করে ব্যাপারটা জানানো দরকার। Doctor, what is your opinion?

ডাক্তার—Well, you can call it a case of murder.

জেলার—না মাইরি, murder নয়—এটা একটা accident.

অহীন—তা কি করে হবে স্যার?

জেলার—Accident নয়? আমি আস্তেই ওর গলাটা টিপে ধরেছিলাম। ও যে আমাকে ফাঁসাবার জন্য মরে যাবে, কে জানত? বিশ্বাস করুন, এটা accident.

অহীন—তাহলে তো ক মণ্ডলের বেলাতেও ব্যাপারটা accident হতে পারত।

জেলার—দুটো case-এর motive সম্পূর্ণ আলাদা অহীনবাবু। ক মণ্ডল তার বউকে মেরেছিল, আর বাচস্পতি মরে গেছে।

অহীন—তার মানে, আপনি বলতে চাইছেন, বাচস্পতি সুইসাইড করেছেন?

জেলার—আমি যে কি বলতে চাইছি—আমি—আমি নিজেই জানি না। ডাক্তার সাহেব, আমাকে বাঁচান।

ডাক্তার—না, মানে, আমি আপনাকে কেমন করে বাঁচাব? মানে, আপনার তো কোনো অসুখ-বিসুখ করেনি।

জেলার—হায় ভগবান! কে বাঁচাবে আমাকে! (এদিক ওদিক তাকিয়ে হঠাৎ ক মণ্ডলের দিকে চোখে পড়ে) ক মণ্ডল—তুমি, তুমি পার আমাকে বাঁচাতে—তুমি—তুমি সাক্ষী—তুমি দেখেছ তো যে তোমাকে শুধু বোঝাবার জন্যেই আমি ওর গলাটা টিপে ধরেছিলুম। আমি ওকে ইচ্ছে করে মারিনি।

অহীন—ওকে সাক্ষী মেনে কি করবেন স্যার? একটু বাদেই তো ওর সব কথা মনে পড়ে যাবে, আর এক্ষুনি আমরা ওকে ফাঁসিকাঠে ঝোলাব।

জেলার—তাই তো! হে ভগবান! ওর যেন কিছু মনে না পড়ে। ক মণ্ডল, তুমি সব কথা ভুলে যাও। তুমি ক মণ্ডল নও—চাঁপা তোমার কেউ নয়—তুমি কাউকে

গলা টিপে খুন করনি।

কমল—সে কি স্যার! এই একটু আগেই তো আপনি অস্থির হয়ে উঠেছিলেন যাতে ওর সব কথা মনে পড়ে—

জেলার—আরে শালা, সে তো চাকরি বাঁচাবার জন্য, এখন যে প্রাণ বাঁচানো দরকার।

অহীন—সরি স্যার, কোনো উপায় নেই। ঘটনাটা আমাদের হেড কোয়ার্টারে জানাতেই হবে। কমলবাবু, একটা ফোন করুন।

জেলার—ও কমল, তোমায় আমি কত ভালবাসি—এখুনি ফোন ক'রো না। ওরে বাবারে, কী মুশকিলেই পড়লুম রে বাবা! ও নকুল, মেমসাহেবকে গিয়ে বল—ঘোল আর করতে হবে না।

[জেলার সাহেব ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে থাকেন। সবাই তাঁকে নানা রকম সান্ত্বনা দিতে থাকে। হঠাৎ রামসিং প্রচণ্ড ভয় পেয়ে মুখে গোঁ গোঁ আওয়াজ করতে থাকে, সবাই রামসিংয়ের দিকে তাকায় এবং ওর দৃষ্টি অনুসরণ করে দেখে বাচস্পতি নড়েচড়ে উঠে বসল।]

বাচস্পতি—কই, কতদূর এগুলো?

কমল—একি—বাচস্পতি মশাই! আপনি মারা যাননি?

বাচস্পতি—গিয়েছিলুম তো কিছুক্ষণের জন্য।

ডাক্তার—তার মানে?

বাচস্পতি—আমি যেই দেখলাম জেলার সাহেব একটু জোরে গলাটা টিপে ধরেছেন, বুঝলুম যে, ওঁর মুড এসে গেছে। আর অমনি দিলাম ৬৪নং যোগাসন প্রয়োগ করে। আধ ঘণ্টা স্বেচ্ছামৃত্যু—হেঁ-হেঁ-হেঁ—একেই বলে যোগবল, যোগবল।

জেলার—আপনি আর দাঁত বের করে হাসবেন না। রাগে আমাব গা জ্বলে যাচ্ছে। ইচ্ছে করছে পট্ পট্ করে আপনার দাঁতগুলো তুলে ফেলি। অহীনবাবু, দেখুন তো ব্যাটা কাঁদছিল কেন? ওর কিছু মনে পড়েছে?

অহীন—হ্যাঁ স্যার, মনে হয় কিছু মনে পড়েছে।

জেলার—চলুন দেখি। ও ক মণ্ডল, তোমার সব কিছু মনে পড়েছে তো?

ক মণ্ডল—হ্যাঁ গো বাবুরা, আমার সব মনে পড়ে গেছে।

জেলার—কি মনে পড়েছে?

ক মণ্ডল—বাবুরা, আমার একটা সোনার সোম্‌সার ছেলো।

বাচস্পতি—সোনার সংসারই তো। তিন ছেলেমেয়ে, এক বউ। আমার মতন তো নয়—নয় ছেলেমেয়ে, দুই বউ।

জেলার—আঃ, থামুন না মশাই! আপনার কেচ্ছা কে শুনতে চেয়েছে?

বাচস্পতি—কেচ্ছা বললেন কেন?

জেলার—কেচ্ছা নয়? মেয়ে বয়সী শালী, তাকে আবার বিয়ে করেছেন—

বাচস্পতি—ওঃ! এতেই আপনার শরীরে রক্ত উত্তপ্ত হয়ে পড়লো? তা আপনার বউ কেন ফি শনিবার শনি পুজো করান তা কি আপনি অনুমান করতে পারেন?

জেলার—কেন আবার, আমার মঙ্গলের জন্য।

বাচস্পতি—আপনার মঙ্গলের জন্য না হাতী। আপনার স্ত্রী নিজে আমায় বলেছেন, ঠাকুরমশাই, শনি ঠাকুরকে বলুন, যেন ওই রাক্ষুসীর নজর থেকে আপনার বড় সাহেবকে বাঁচিয়ে রাখতে পারি। আর রাক্ষুসীটি যে আপনার খুড়তুতো শালী, তা কি আর কম্পাউণ্ডের কারো জানতে বাকি আছে?

অহীন—স্যার, আপনারা যদি এ সময়ে personal ব্যাপার নিয়ে মাতামাতি করেন, তাহলে কাজের দেরি হয়ে যাবে।

জেলার—ঠিক আছে, আগে ক মণ্ডলকে ঝোলাই, তারপর দেখবেন আপনাকে কেমন ঝোলাব। হ্যাঁ, ক মণ্ডল, যা বলছিলে—তোমার একটা সোনার সংসার ছিল—তারপর?

ক মণ্ডল—আমার একটা চাকরি ছেলো।

অহীন—তারপর?

ক মণ্ডল—আমার ঘরে সুখ ছেলো—শান্তি ছেলো। রোজ সন্দেবেলায় ্যাখন আমার বউ উঠোনে তুলসী পিদিম লাগাত, ্যাখন আমার অন্ধ বুড়ো বাপ দাওয়ায় বসে তার নাতি-নাত্নীদের গল্প শোনাত—ত্যাখন আমি কাজ থেকে ঘরে ফেরতাম।

কমল—তারপর?

ক মণ্ডল—আমার ছোট ছেলেটা বাবু, আমার খুব ন্যাওটা ছেলো। আমি ঘরে ফিরলেই আমার পায়ে পায়ে পোষা বেড়ালের মতন ঘুরে বেড়াত। আর ত্যাখন বাবুরা, সুখে আমার বুকের মধ্যিটা উথাল-পাথাল করে উঠত।

ডাক্তার—তারপর?

ক মণ্ডল—তারপর হঠাৎ একদিন কারখানায় গিয়ে দেখি, কারখানার গেটে বিরাট তালা ঝুলতেছে। রাতারাতি তালা লাগায়ে মালিকরা নাকি পালায়ে গেছে।

বাচস্পতি—তারপর?

ক মণ্ডল—তারপর বাবুরা, দিনির পর দিন বসে থেকেছি কারখানার গেটের সামনে। ভেবেছি আজ না হোক, কাল তো তালা খুলবেই। আমাদের এতোগুলান মানুষের পেটের ভাত কেড়ে নিয়ে মালিকেরা নেশ্চয়ই পালায়ে যাবে না। তেনারাও তো মানুষ। আস্তে আস্তে কারখানার লোহার গেটে মরচে ধরে গেল বাবুরা—কারখানার ভেতরের সাজান ফুলের বাগানটা জঙ্গল হয়ে গেল বাবুরা। আমাদের প্যাটে টান পড়তে লাগলো। জমানো টাকা যে ক'টা ছেলো সব শেষ হয়ে গেল। বাড়ীর ঘটি বাটি একটা করে বেচতে শুরু করলাম। এ-কারখানা সে-কারখানা ঘুরি বেড়াতে লাগলাম একটা কাজের আশায়। কিন্তু কেউ কাজ দেলে না। ভাবলুম চাষীর ছেলে

আমি, চাষ করি খাব। নিজির জমি-জিরাত তো কিছু নি, তাই ভাবলুম পরের জমিতে লাঙ্গল দেব। কিন্তু এক ছটাক জমিও কেউ দেলে না। আর ইদিকে আমার ছেলেমেয়েগুলান দিন দিন নিস্তেজ হয়ে যেতি লাগল। আমার বুড়ো বাপটা আরও দুর্বল আর বুড়ো হয়ে যেতি লাগল। আমার ছোট ছেলেটা যে আমার দিকি চেয়ে খালি হাসত—সে হাসি ভুলে ড্যাব ড্যাব করি আমার দিকি তাকায়ে থাকত। যেন ওই চোখ দুটো দে আমায় বলত—বাপ্, আমার বড় ক্ষিদে লেগেছে রে বাপ্—আমাকে দুটো খাতি দে। আর কষ্টে আমার বুকের পাঁজরগুলান টন্ টন্ করে উঠত। বাবুরা—আমি চোরের মতন ওর চোখের সামনি থেকে পালায়ে যেতাম।

জেলার—তারপর?

ক মণ্ডল—তারপর একদিন অনেক রাতে চোরের মতন বাড়ী ফিরেছি, ভেবেছি ছেলেমেয়েগুলান বোধ হয় ঘুমিয়ে পড়েছে। ঘরে ঢুকে দেখি—আমার ছেলেমেয়েগুলান বসি বসি ভাত খাচ্ছে।

আমার বুকের মধ্যে ধক্ করে উঠল বাবুরা—চাল পেলে কোথায়? চাঁপা বললে ছেলেমেয়েদের ক্ষিদের কান্না সহ্য করতে না পেরে ও দু'মুঠো চাল চুরি করে এনেছে। আমার মাথার মধ্যে আগুন জ্বলে গেল বাবুরা—আমি দৌড়ে গেলাম ওদের ভাতের থালা টান মেরি ফেলি দিতে—না, চুরি করা চালের ভাত আমার সন্তানের মুখে তুলতি দেব না। চাঁপা ছুটি এসি আমার পায়ে পড়ে বলল—ওগো, ওদের বড্ড খিদে লেগেছে—ওরা যে অনেকদিন কিছু খায়নি। আমায় তখন দানোয় পেয়েছে বাবুরা। আমি জোর করে চাঁপাকে সরায়ে দিতি গেলাম, আমার হাতটা গিয়ে ওর গলায় পড়ল। বাবুরা, চাঁপাও ত অনেকদিন কিছু খায়নি—দুর্বল শরীর সে ধাক্কা সহ্য করতি পারল না, পড়ে গেল—আর উঠল না। আমার চাঁপা আর উঠল না। বাবুরা—তোমরা—তোমরা আমায় ফাঁসি দাও—আমার হাত বাঁধতে হবে না, আমার চোখ বাঁধতে হবে না—নে চল, ফাঁসিকাঠের কাছে। আমি নিজি ফাঁসির দড়ি গলায় পরি নেব। বাবুরা, তোমরা আমায় ফাঁসি দাও। আমি চাঁপার কাছে চলি যাই—চাঁপারে গিয়ে বলি—চাঁপা রে, আমি তোরে মারিনি, তবু ওরা আমায় ফাঁসি দেলে। যারা তোকে সত্যি মেরেছে—তাদের তো কেউ চেনে না—তাই তাদের ফাঁসি কোনদিনও হবে না।

জেলার—(হঠাৎ খুব চেঁচিয়ে) Hang him till death!

[এই কথা বলার সঙ্গে সঙ্গে মঞ্চ এক মুহূর্ত অন্ধকার। আবার আলো জ্বলতে দেখা গেল—পেছনে অপেক্ষাকৃত উজ্জ্বল আলোয় ক মণ্ডলের দেহটা ঝুলছে—আর সামনের অংশে আলো-আঁধারিতে বাকি সবাই ওর দিকে মুখ করে এ্যাটেনশান অবস্থায় ফ্রিজ হয়ে রয়েছে। আজকাল ট্রামে-বাসে অর্থনৈতিক অগ্রগতি সম্পর্কিত যে সব সরকারী পোষ্টার দেখা যায় তার অনুলিপি কালো পর্দার উপর রাখা যেতে পারে।]

□

ঝড়ের পাখী

(কবি আলেকজান্দার পুশকিনের জীবনের শেষ দুই দিন অবলম্বনে)

চন্দন সেন

(১৯৪৪)

চরিত্র

পুশকিন
নিকিতা
গেকার্ন
নাতালিয়া
ঝিকোভ্স্কি
কন্স্তান্তিন্

[১৮৩৭ সাল। ৭ই ফেব্রুয়ারী। রাশিয়ায় পিৎসবুর্গে জারের প্রাসাদ। পুশকিনের কক্ষ। অন্ধকার। আবহে সেই সময় অনুরণিত।]

নেপথ্যে বিভিন্ন কণ্ঠে—পুশকিন-পুশকিন-পুশকিন।

[আলো জ্বলে। কবি টেবিলে বসে লিখছিলেন]

পুশকিন—কে ডাকছে? কে? আবার কেউ ব্যঙ্গ আর বিদ্রূপের হুল ফোটাতে এসেছে নাকি? নাকি আবার কোন কদর্য ইংগিতবাহী বেনামী চিঠি অথবা অশ্লীল কুৎসিত কোন গুজবের বার্তা এল? না, আজ আর কারো কথা শুনব না, না—

[বালক ভৃত্য নিকিতা প্রবেশ করে]

নিকিতা—প্রভু, হল্যাণ্ড সম্রাটের দূত মাননীয় ব্যারন দেখা করতে এসেছেন।

পুশকিন—এ্যাঁ!—ও গেকার্ন? তাকে তো আসতেই হবে। অপত্যস্নেহ বলে কথা। আমায় এতক্ষণ ধরে কেউ ডাকছিল নিকিতা?

নিকিতা—না তো প্রভু, এখানে তো কেউ আসেননি। ম্যাডামও তো বেশ কিছুক্ষণ আগে মহামান্য জার-এর—

পুশকিন—ম্যাডামের কথা আমি তোমায় জিজ্ঞেস করি নি, নিকিতা, আমি লক্ষ করছি সমস্ত পরিস্থিতিটা ধীরে ধীরে আমার বিপক্ষে চলে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তোমরা সবাই কেমন অবুঝ হয়ে যাচ্ছ—নিকিতা, তুমিও—

নিকিতা—মাপ করবেন প্রভু। এমন স্পর্ধা, এমন জঘন্য কাজের ইচ্ছে যেন আমার কোনদিনও না হয়। আপনার প্রতি আমার শ্রদ্ধা আর ভালবাসা কোনদিন কেউ নষ্ট করতে পারবে না প্রভু,—আমি হয়তো না বুঝেই—

পুশকিন—(কাছে এসে পিঠ চাপড়ে) আমারই বোঝার ভুল নিকিতা। আসলে আমি এখন সারা পৃথিবীটাকেই সন্দেহ করি। ভাবি—সবারই—পৃথিবীর প্রত্যেকটা মানুষেরই বুঝি আজ একটাই কাজ—আলেকজান্দার নামের এক অসহায় প্রায় উন্মাদ মানুষকে ব্যঙ্গ আর বিদ্রূপের শলাকা দিয়ে খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে পুরো উন্মাদ করে তোলা।—তবে তুমি নও নিকিতা, নিশ্চয়ই তুমি নও—তোমার বয়স কম, পৃথিবীর কদর্য কাদাগুলো তোমার নিষ্পাপ মনটাকে এখনও নিশ্চয়ই কলংকিত করে নি। করতে পারে নি।

নিকিতা—আপনি আমার সম্পর্কে নিশ্চিন্ত থাকুন প্রভু!—এবার আমি কি মহামান্য ব্যারনকে পাঠিয়ে দেব?—তিনি অনেকক্ষণ অপেক্ষা করছেন।

পুশকিন—হ্যাঁ, হ্যাঁ, পাঠিয়ে দাও। আর সন্ধ্যায় যদি আজ আমার ওপর কোন ব্যস্ততা

চাপিয়ে না দেওয়া হয় তবে নিশ্চিত থেকো—তোমায় সেই অসমাপ্ত আফ্রিকান গল্পটা শোনাব নিকিতা।

নিকিতা—তা হবে এই ভৃত্যের প্রতি আপনার গভীর অনুগ্রহ প্রভু—

পুশকিন—ও হো হো—মহামান্য জারের এই প্রাসাদ আর প্রাসাদের পাশের সমস্ত অভিজাতদের ঘরেই ভৃত্য-প্রভুর সম্পর্কটা বুঝি এমনই নিষ্প্রাণ, কৃত্রিম হয়? এমন সব হৃদয়প্রতারক, সাজানো কথাবার্তা! (হাসি) কেন নিকিতা, তুমি বলতে পার না, আপনার গল্প বলা আমার দারুণ লাগে মাননীয় পুশকিন, আজও শুনতে দা-রু-ণ লাগবে—(হাসি) বল—

নিকিতা—(হাসি) দা-রু-ণ লাগবে। আমি ব্যারনকে পাঠিয়ে দিই।

[চলে যায়]

পুশকিন—আমরা সবাই যাত্রী ছিলাম একটি নায়ে—
পাল তুলে কেউ দিয়েছিল—উড়ন্ত পাল,
বাইতেছিল দাঁড়গুলো কেউ—সামাল, সামাল,
ছুটছিল নাও বাতাস ঠেলে ডাইনে-বাঁয়ে
আমরা সবাই যাত্রী ছিলাম একটি নায়ে—

[বৃদ্ধ গেকার্ন প্রবেশ করেন]

আসুন, আসুন গেকার্ন।

গেকার্ন—(অভিবাদন) একটা ব্যক্তিগত আবেদন নিয়ে এসেছি মাননীয় পুশকিন। রাজনীতিবিদ হিসেবে নয়, দূত হিসেবে নয়, হল্যাণ্ডের রাজকর্মচারী হিসেবেও নয়, একজন পিতা, শুধু একজন পিতা হিসেবেই আপনার কাছে এসেছি আজ।

পুশকিন—বসুন।

গেকার্ন—ধন্যবাদ। মাননীয় পুশকিন, আপনি আমার পুত্রকে দ্বন্দ্বযুদ্ধে আহ্বান জানিয়ে যে বার্তা পাঠিয়েছেন, একজন বৃদ্ধ পিতা হিসেবে আমি প্রার্থনা করতে এসেছি তা প্রত্যাহার করে নিতে।

পুশকিন—মহামান্য দূত কি জানেন না, বর্তমান চালু রীতি অনুযায়ী এই ডুয়েল মানে দ্বন্দ্বযুদ্ধ আহ্বান এবং গ্রহণ দুটোই বৈধ ও সম্মানীয়, অন্তত যেখানে দুজনের মধ্যে একটা ফয়সালা জরুরী হয়ে ওঠে। আপনি কি জানেন না—

গেকার্ন—জানি, জানি মাননীয় পুশকিন! তবু স্নেহান্ধ পিতার মন আমার। এই ডুয়েলের পরিণতি কি হতে পারে ভাবতে আমি শিউরে উঠছি। যদি দান্তেস এই দ্বন্দ্বযুদ্ধে নিহত হয় তবে জানবেন, ৬৫ বছরের এই বৃদ্ধের একমাত্র সম্বলটুকু শেষ হয়ে গেল,—আমার যে আর কেউ নেই পুশকিন—

পুশকিন—আর যদি আলেকজান্দার পুশকিন এই দ্বন্দ্বযুদ্ধে শেষ হয়ে যায় গেকার্ন, মানে আপনার পুত্র দান্তেস সমস্ত দিক দিয়েই বিজয়ীর শেষ হাসিটুকু যদি হাসতে

পারে, তবে নিশ্চয়ই ওলন্দাজ রাষ্ট্রদূত হিসেবে নয় পিতা হিসেবেই আপনি গর্ব অনুভব করতে পারবেন—

গেকার্ন—না, না, ভুল করছেন মাননীয় পুশকিন। এই বৃদ্ধ ভাল করেই জানে দান্তেস মরলে একটা অপদার্থ লোভী তরুণ শেষ হয়ে যাবে, পৃথিবীকে যার কিছু দেওয়ার নেই, পৃথিবী থেকে যে শুধু গ্রহণ করার অন্ধ লালসা নিয়েই এসেছে। কিন্তু আপনি শেষ হয়ে গেলে রাশিয়া তথা সারা পৃথিবী তার শ্রেষ্ঠ সন্তানকে অকালে হারাবে, মাত্র ৩৮ বছর বয়সে। পুশকিনের মত প্রতিভা পৃথিবীকে সমৃদ্ধ করতেই আসে—এ কথা এখানে স্বীকার করতে আমার কোন কুণ্ঠা নেই।

পুশকিন—অথচ আমরা দুজন—মানে এই পুশকিনের মত প্রতিভা আর আপনার সন্তান দান্তেসের মত, আপনার ভাষায় অপদার্থ, যখন দ্বন্দ্বযুদ্ধে মরণপণ লড়াই করবে তখন (হাসি) আমি জানি ঈশ্বরের কাছে আপনার প্রার্থনা কি হবে—মানে কি হতে পারে—

গেকার্ন—(চিৎকার) আমি নির্লজ্জের মতই সেক্ষেত্রে আপনার মৃত্যুই চাইব পুশকিন। আমার পৃথিবীটা ছোট, সংকীর্ণ—একটা সাধারণ মানুষের কাছে তার পুত্র, কন্যা স্ত্রীই সবচাইতে বড় সম্পদ।

পুশকিন—আর একজন অ-সাধারণ মানুষের কাছে তার স্বজন-পরিজন তার নিজের স্ত্রী, কোন সম্পদ হতে পারে না, মানে হওয়া উচিৎ নয়, তাই না?

গেকার্ন—আমাকে দান্তেস বলেছে, বিশ্বাস করুন পুশকিন। আমায় সে নিভৃতে অঙ্গস্পর্শ করে বলেছে যে সে আপনার শ্যালিকা কাৎরিণকেই বিবাহ করছে, তাকেই সে ভালবাসে, নাতালিয়াকে নয়—

পুশকিন—আপনি কি গেকার্ন তবে আপনার অপদার্থ ভীরু পুত্রের হয়ে ওকালতি করতে এখানে এসেছেন?

গেকার্ন—না, না, আমি এই দ্বন্দ্বযুদ্ধে আপনাকে নিবৃত্ত করার ব্যাকুল প্রার্থনাই জানাতে এসেছি।

পুশকিন—তাহলে তাকে নিরপরাধ প্রমাণের জন্য চেষ্টা করছিলেন কেন?

গেকার্ন—না, চেষ্টা নয়। আমি আমার ছেলেকে ভালমতই জানি পুশকিন। আপনার মত একজন মানুষ যখন তাকে দ্বন্দ্বযুদ্ধে আহ্বান জানাতে বাধ্য হয়েছেন, বুঝতে হবে তার অপরাধ নিশ্চয়ই আছে। তবু সে নিজেই একটা ব্যাখ্যা আমায় অযাচিতভাবে দিয়েছে...এবং...এবং একজন বৃদ্ধ স্নেহদুর্বল পিতা হিসেবে তাকে, মানে তার ব্যাখ্যাটাকে অবিশ্বাস করতে আমার কষ্ট হয়...খুব কষ্ট হয়...(মাথা নীচু করে)

পুশকিন—আমারও কষ্ট হয় গেকার্ন, আমারও। আপনার চাইতেও মর্মান্তিক সেই কষ্ট।—আসলে (হাসি) ঐ যে বল্লেন না, সাধারণ মানুষ, অসাধারণ মানুষ। (হাসি) খ্যাতি, বংশগৌরব, আভিজাত্য—ব্যাপারগুলো শুনতে খুবই মধুর, কিন্তু বড় ভয়ংকর

ভারী হয়ে ওঠে কখনো কখনো, দুঃসহ স্পর্শকাতরতার শিকার হয়ে ওঠে প্রায়শই। যাক্‌গে, আমার যন্ত্রণা একান্তভাবে আমারই এবং আপনার দুশ্চিন্তাও একান্তভাবে আপনার।

গেকার্ন—আমার ছেলে এখন বাইরে Dutyতে। অন্তত ২৪ ঘণ্টা তাকে সময় দিন দ্বন্দ্বযুদ্ধের জন্য।

পুশকিন—(স্বগত) আমার খুবই তাড়া ছিল—একটা অস্থির উন্মাদনা—গত ৭২ ঘণ্টা আমার চোখে ঘুম নেই। একটা কিছু হেস্তনেস্ত চাই—এখনই! কিন্তু না, ৩৮ বছরের এই যুবক তার আভিজাত্য, অহংকার আর মর্যাদার দিকে তাকিয়ে আপনার বিনীত প্রার্থনা মঞ্জুর করছে গেকার্ন। যান ২৪ ঘণ্টা সময় তাকে দেওয়া হোল—! তাকে চিরতরে নতজানু করবার আগে—অন্তত তার পিতার প্রার্থনা মঞ্জুর না করলে আমার সম্পর্কেই বা লোকে কি ভাববে? (হাসি)

গেকার্ন—আপনার অসীম অনুগ্রহ পুশকিন।

পুশকিন—আসলে, এই রাজধানীতে ফিরে আসার পর থেকেই এখানে প্রায় নিশ্চল কুৎসিত দুঃসহ এক জীবন-যাত্রায় অভ্যস্ত হতে হতে আমি...আমি ভুলে গিয়েছিলাম, আমিও কিছু দিতে পারি। না, নিষ্ফলা কিছু কবিতা নয়, ধূসর গদ্যও নয়। অনুগ্রহ গেকার্ন, আলেকজান্দার পুশকিন অনুগ্রহও বিতরণ করতে পারে। (হাসি)

গেকার্ন—সেই সঙ্গে একটা সুবিবেচনা, আর একবার ভেবে দেখুন, দ্বন্দ্বযুদ্ধে—

পুশকিন—না, না, গেকার্ন। তা আর সম্ভব নয়—দ্বন্দ্বযুদ্ধ হবেই—হবেই তবে আজ নয়, কাল—২৪ ঘণ্টা পর। হয় পুশকিন থাকবে নইলে একমাত্র পুত্রের জন্য বৃদ্ধ পিতার প্রার্থনাই ঈশ্বর শুনবেন।

গেকার্ন—এ দুয়ের মাঝখানে কিছুই নেই? মানে আমরা সবাই মিলে চেষ্টা করতে পারি—

পুশকিন—চেষ্টা? চেষ্টা করে পারেন ফিরিয়ে দিতে ৬ বছর আগের আমার সেই অবোধ প্রেমসঙ্গিনীকে? চেষ্টা করে পারেন নাতালিয়া গনচারভা নামক মহামান্য সম্রাটের অনুগ্রহধন্য একটি কিশোরী, না, না, মাননীয়া মহিলাকে পুনরায় পুশকিনের জীবনসঙ্গিনী করে তুলতে? চেষ্টা করে পারেন মস্কোর এক বলনাচের আসরে অসংখ্য প্রণয়িনীর হৃদয়ে আগুন জ্বালানো এক ঝোড়ো যুবক, যার চোখের তারায় জীবনে প্রথম সত্যিকারের আশ্রয়ের নোঙর খুঁজেছিল—তাকে—তার সেই চোখ, সেই শান্ত মদির দৃষ্টিটুকু ফিরিয়ে দিতে? পারেন না গেকার্ন—পারেন না। আমি জানি, আমি জানি। দান্তেস, আপনার অপদার্থ রূপবান পুত্র দান্তেস এই সর্বনাশা খেলায়, এই গভীর চক্রান্তের মধ্যে একটা অচেতন উপলক্ষ মাত্র! নাতালিয়ার সঙ্গে তার সম্পর্ক, তার সমস্ত ব্যাভিচার, আমাকে বোঝাবার জন্য যে আমিও হারার বস্তু, আমি হেরে গেছি...মহান সম্রাটের অনুগ্রহ আর ক্ষমতা সম্পর্কে আমি

সচেতন...আবার আমার এই পরাজয়, চারিদিকের এতসব উড়ো চিঠি, বদনাম, কুৎসিত গুজব...এসব—এসব সম্পর্কেও আমি সমান সচেতন গেকার্ন। এতবড় পরাজয়ের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে অন্তত একটা জয় বা জয়ের চেষ্টা না করলে তো বুঝতে হবে শারীরিকভাবে মৃত্যুর অনেক আগেই মানসিকভাবে পুশকিনের মৃত্যু ঘটেছে!—আপনি আসুন গেকার্ন, দ্বন্দ্বযুদ্ধ ২৪ ঘণ্টা পরই হবে।

গেকার্ন—(সামনে এসে) রাজনীতি আমার রক্তে পুশকিন। রাষ্ট্র ব্যবস্থার স্বার্থেই কখনো কখনো কোনো বিশাল মানুষের মর্মান্তিক পতন জরুরী হয়ে ওঠে। স্থিতাবস্থার পাহারাদারী করতে গিয়ে এমন অনেক জঘন্য ঘটনা আমি ঘটতে দেখেছি, হয়তো তার মধ্যে অনেক সময়ে নিজেকে জড়িয়েও ফেলেছি। তবু বলব, পুশকিনের এই পরিণতি আমি চাই নি। কোন সুস্থ মানুষই চাইতে পারে না।

পুশকিন—ধন্যবাদ গেকার্ন। আপনাকে আমার শুভেচ্ছা জানাচ্ছি—আসলে সেটাও তো আপনার সন্তানের প্রতি জানানো হোল (হাসি)।

[গেকার্ন অভিবাদন করে চলে যান]

অলৌকিক স্মৃতিস্তম্ভ তুলেছি আমার
সবটুকু কেড়ে নিতে পারে না মরণ, সাধের বীণায়
রবে প্রাণ যবে মৃতদেহ মোর হবে ছার—
রবে খ্যাতি যতদিন এই চাঁদিনায়
রবে একজনও কবি—একজন শ্লোককার ॥
(ডাকে) নিকিতা—নিকিতা—
...সর্বনাশে নেই ভয়, বরমাল্য পিছে
কারো ছোটেনাকো, নিন্দা যশে তাই থাকো নির্বিকার
নির্বোধের সঙ্গে তাই তর্ক করো মিছে।

[নিকিতা ঢোকে]

নিকিতা—ডেকেছেন প্রভু?

পুশকিন—ভাগ্য ভালো তোমার। সন্ধ্যাটুকু আজ পাওয়া গেছে। হাতের সব কাজ শেষ করে সন্ধ্যায় চলে এসো। অসমাপ্ত গল্পটা শেষ করা যাবে।

নিকিতা—আমি সন্ধ্যায় আসব। মাদাম এসে গেছেন প্রভু। পোষাক পালটে এখনই এখানে আসবেন। আমি যাই।

পুশকিন—দাঁড়াও। দ্বন্দ্বযুদ্ধ মানে Duel কাকে বলে জান নিকিতা?

নিকিতা—হ্যাঁ।

পুশকিন—দেখেছ?

নিকিতা—না।

পুশকিন—(হাসি) দেখতে পেলে কেমন হয় নিকিতা? দারুণ উত্তেজনাকর, জীবনমৃত্যুর

দুয়ার ছুঁয়ে ছুঁয়ে এক লোমহর্ষক ঘটনা...কেমন হয় যদি দেখতে পাও নিকিতা?

নিকিতা—ক্ষমা করবেন আমায়, এমন ভয়ংকর কিছু আমি দেখতে চাই না, মানে, আমি—আমার খুব ভয়—

পুশকিন—(হাসে) তুই একান্তই বালক নিকিতা (হাসি) যা—

[নিকিতা চলে যায়। পুশকিন ওঠেন, কলমটা তোলেন]

না, কলমের চাইতে অনেক ক্ষেত্রেই তরবারি বেশি শক্তিশালী। (ঘরের কোণ থেকে তরবারি নিয়ে) অতএব কলম থাক কবি পুশকিন। জেগে ওঠ আফ্রিকান হাবসীপুত্র, জেগে ওঠ ইথিয়োপীয় সংক্ষোভ আর তেজ নিয়ে। জেগে ওঠ মহামহিম পিত্‌র্-এর নিগ্রো এব্রাহাম হ্যানিবলের উত্তরপুরুষ—(তরবারি শূন্যে ঘোরায়)

[নাতালিয়া প্রবেশ করে]

নাতালিয়া—তরবারিটা নামিয়ে রাখো নিগ্রো হ্যানিবলের উত্তরপুরুষ! এখন তুমি আফ্রিকায় নেই। ক্রিমিয়া কিংবা ককেশাসেও নেই। তুর্কদের সঙ্গে যুদ্ধ বন্ধ হয়ে গেছে আপাতত। অতএব যুদ্ধের অস্ত্র হাতে এখন কবি সাহিত্যিক পুশকিনকে মানায় না।

পুশকিন—নাতালিয়া!—যুদ্ধের কোন শেষ নেই। সাইবেরিয়া, ক্রিমিয়া, ককেশাস পার হয়ে যুদ্ধ এখন পিত্‌সবুর্গের এই উপকণ্ঠে।

নাতালিয়া—পাগলামো কোরো না। ১৫ বছরের অভিজাত ধনিককন্যা নাতালিয়া একজন উন্মাদ কবিকে বিয়ে করে কৃচ্ছ্রসাধন করতে পৃথিবীতে জন্মায় নি।

পুশকিন—কাকে বিয়ে করেছিলে নাতালিয়া? একটা ঝোড়ো দামাল পোষ না-মানা তপ্ত তরুণকে, যার দেহে অরণ্যজয়ী আফ্রিকানের রক্ত, যার মস্তিষ্কে শতাব্দীর ঘুম ভাঙানো কবিতা আর গান, যার হৃদয়ে নতুন ভোরের রঙীন স্বপ্ন তাকে, না, পিত্‌সুবর্গের এই শান্ত প্রাসাদে সম্রাটের অনুগ্রহে পিঞ্জরাবদ্ধ একটা বিহঙ্গকে? আভিজাত্য, বিলাস, গৌরব এবং তোমার অন্তহীন কৌশল—আর চেষ্টায় উন্নত রাজকীয় জীবনযাত্রার একঘেয়ে দুঃসহ গণ্ডীতে বাঁধা একটা রুদ্ধবাক মানুষের ক্যারিকেচারকে তুমি বিয়ে করেছিলে নাতালিয়া গনচারভা?

নাতালিয়া—ভুল করছ। একজন মেয়ে হিসেবে...সব দিক থেকে সুখী একজন অভিজাত কন্যা হিসেবে তোমার কথা, তোমার দুরন্ত যৌবন আর তোমার বিশাল খ্যাতিই আমাদের সবাইকেই এই বিবাহে সম্মত হতে উদ্বুদ্ধ করেছিল। আশা ছিল, তুমি কবিতায় কিংবা লেখায় নয়, পদমর্যাদায়, সম্পদে, সম্মানে অনেক অনেক বড় হবে। আমাকে সুখী করবে।

পুশকিন—আমার বিশাল খ্যাতি কিন্তু আমার লেখার জন্যই, কবিতার জন্যই। যে লেখা যে কবিতা তুমি কোনদিন বোঝ নি—

নাতালিয়া—বুঝতে চাই নি পুশকিন। কবিতা কিংবা লেখায় নীরস খ্যাতি আসে। অর্থহীন অভিনন্দন পাওয়া যায়, কিন্তু সম্পদ বাড়ে না, পদমর্যাদা বাড়ে না। আমি সাধারণ মেয়ে, সাধারণ আমার চাওয়া—ঐ সম্পদ, মর্যাদা, উন্নতি—এ সবের বাইরে আমার চাওয়ার কিছু নেই।

পুশকিন—সম্পদ, মর্যাদা আমি না পারি, এখানে আসার পর তুমি তো কম অর্জন করো নি, বিশেষ করে সম্রাট যখন তোমার মত রূপসীর প্রতি অনুগ্রহ দেখাচ্ছেন প্রতিমুহূর্তে।

নাতালিয়া—তুমি কি সম্রাটকে সন্দেহ কর?

পুশকিন—(হাসি) সেই সাহস কোথায় আমার? সবাই জানে—সম্রাটের অনুগ্রহে এখানে ফিরে আসার পর—তোমার প্রেরণায় আমি রাজভক্তির কবিতা লিখেছি অন্তত এক ডজন। পড়োনি?—ও, তুমি তো কবিতা পছন্দ কর না। সম্রাট কিন্তু পড়েছেন এবং বাহবাও জানিয়েছেন।

নাতালিয়া—কিন্তু কোথায়? সেই কবিতা আর লিখলে কোথায়? আমার আবেদনে সেই কবিতাগুলো পড়েই সম্রাট তোমার আগের সব ভুল ক্ষমা করে বৈদেশিক বিভাগে মোটা মাইনের চাকরী দিলেন!—আশা ছিল আরো কিছু কবিতা লিখে—

পুশকিন—(হাসি) হবে না...হবে না নাতালিয়া গনচারভা; এ জন্মে আর এর চাইতে বেশি স্তাবকতার কবিতা সম্ভব হল না!—কলম চলে তো মন বিদ্রোহ করে। তুমি তো জান, তোমার কথা রাখতে, বংশগৌরব, পদমর্যাদা, সম্পদ বাড়ানোর উদগ্র জ্বালায় আমি রাতের পর রাত জেগে এমন আরো কিছু স্তাবকতার কবিতা রচনা করতে গিয়েছি, কিন্তু কলম কাগজ ঠিক থাকলেও, মনটা হঠাৎ ক্ষিপ্ত হয়ে উঠেছে, বলেছে 'পুশকিন, তোমার জন্ম 'ইয়েভ্গেনি অনেগনি', 'বরিস গদুনেভ', 'ব্রোঞ্চ অশ্বারোহী' রচনার জন্য, 'সোনালী মাছে'র মত রূপকথা শোনানর জন্য 'ইস্কাবনের টেক্কা' কিংবা 'কাপ্তেনের মেয়ে'র গল্প শোনবার জন্য, সম্রাটের স্তাবকতা মাখা একঘেয়ে ফরমায়েসি আত্মপ্রবঞ্চনার জন্য নয়।

নাতালিয়া—পুশকিন, এই কথাগুলো সম্রাটের কানে গেলে তার পরিণতি জান?

পুশকিন—আমি কথা বলছি, আমার এখনো বৈধ স্ত্রী নাতালিয়ার সঙ্গে, শুধু নাতালিয়ার সঙ্গেই, সম্রাটের কানে পৌঁছে দেবার দায়িত্ব আমার নয়, তোমার।

নাতালিয়া—এখন বুঝতে পারছি, সম্রাট আমায় একদিন সবার অলক্ষ্যে একটা ঠিক ইংগিতই দিয়েছিলেন, পুশকিনের মধ্যে প্রকৃত রাশিয়ান রক্ত নেই, হাবসী রক্ত। তাই দেশপ্রেম, আনুগত্য ওর কাছ থেকে খুব বেশি আশা করা যায় না।

পুশকিন—সম্রাট সঠিকভাবেই সেটা আশা করেছিলেন সমৃদ্ধশালী, বস্ত্রব্যবসায়ী অর্থগৃধ্নু পরিবারের রূপবতী নাতালিয়ার কাছ থেকে। পুশকিনের ঘাটতি তো একা নাতালিয়া দেশের প্রতি ভালবাসা, সম্রাটের প্রতি ভালবাসায় সম্রাটের অনুগ্রহ-ভাজন দান্তেসের

প্রতি ভালবাসার বন্যায় মিটিয়ে দিচ্ছে!—তবু আমাকে রেহাই দেওয়া হচ্ছে না কেন?

নাতালিয়া—তুমি নীচ, অকৃতজ্ঞ পুশকিন। আজ তুমি মাথা উঁচু করে সম্রাটের অনুগ্রহভাজনের পদমর্যাদায় সমাসীন আমারই জন্য, শুধু আমারই জন্য, তোমার কবিতার জন্য নয়—

পুশকিন—সেটাই আমার দুর্ভাগ্য! কবি পুশকিনের সেখানেই পরাজয়! প্রেমিক পুশকিনের আশ্রয়হীনতার প্রমাণ সেখানেই! আর তাই—তাই তুমি নিশ্চয়ই জেনেছ নাতালিয়া আমার দ্বন্দ্বযুদ্ধ তোমার ঐ দান্তেসের সঙ্গেই।

নাতালিয়া—দান্তেস? দান্তেস কেন? হ্যাঁ, দান্তেসকে আমার ভাল লাগে...কিন্তু সে তো আমার বোনকে বিয়ে করবে বলেছে—সম্রাটও মনে করেন দান্তেস ভাল ছেলে!

পুশকিন—তোমায় চুপিচুপি একটা কথা বলি নাতালিয়া, দান্তেস এবং দান্তেসই, কারণ পুশকিন তো সম্রাটের সঙ্গে দ্বন্দ্বযুদ্ধ করতে পারে না, তার সেই ক্ষমতা কই? তার হাতে একটা কলম ছিল, তারও তো কালিটুকু শুষে নেওয়া হয়েছে! (হাসি) দান্তেস—দান্তেস—সম্রাট নিকোলাসের জয় হোক, দান্তেসের সঙ্গেই দ্বন্দ্বযুদ্ধ—(তরবারি নেয়)

নাতালিয়া—সত্যিই তুমি উন্মাদ! তুমি নিজে ধ্বংসের পথে চলেছ, সঙ্গে আমাকেও নিয়ে চলেছ। না, তবে স্পষ্ট শোন, আমিও চাই, এই প্রতারণার শেষ হোক, মাতাল, লম্পট একটা ঠিকানাহীন কবিকে আমি মানুষ করে গড়তে চেয়েছিলাম—আমি ব্যর্থ। চারিদিকে নিন্দা, গুজব, কুৎসিত রটনায় আমিও ক্লান্ত। আমার পথ আমিই দেখব—তুমি তোমার সর্বনাশের পথই দেখো, দ্বন্দ্বযুদ্ধই তুমি করো—

পুশকিন—এইবার, এই একবার অন্তত খাঁটি সহধর্মিনীর মতো স্বামীর সংকল্পে রসদ যোগালে নাতালিয়া। তোমায় অভিনন্দন। তুমি এবার এসো, আমি অস্ত্রচর্চা করব। রাতে যদি দান্তেসের সঙ্গে ভোজসভায় দেখা হয় বোলো—পুশকিনের হাবসী রক্ত তোলপাড় করছে তার হৃদস্পন্দনকে, দ্বন্দ্বযুদ্ধে তাকে হারানো সম্ভব নয় দান্তেস (হাসি) সম্রাটকেও গোপনে কথাটা বোলো, কারণ বেঁচে থাকলে আবার আমায় 'চেদায়েভের প্রতি' কিংবা 'সাইবেরিয়ায়' জাতীয় কবিতাই লিখতে হবে, জারের স্তাবকতা নয়! আচ্ছা বিদায় নাতালিয়া, দুঃস্বপ্নের অবসান হোক।

নাতালিয়া—(যেতে গিয়ে ফিরে) পুশকিন, আমি, আমি আজ সমস্ত অন্তর দিয়েই তোমার মৃত্যু চাই!

[চোখ মুছতে মুছতে বেরিয়ে যায়]

পুশকিন—জীবনে কোন চাওয়াই তোমার পূর্ণ করতে পারব না—এমন নিষ্ঠুর আমায় কে করে ভাবছ নাতালিয়া!

[নিকিতা প্রবেশ করে]

নিকিতা—আসছি প্রভু। টেবিলে আপনার খাবার দেওয়া হয়েছে অনেকক্ষণ!

পুশকিন—তাহলে? তরবারির বদলে খাদ্য! নাঃ, তোমরা আমায় একাগ্রভাবে তরবারি চর্চা করতে দেবে না দেখছি। চলো। (তরবারি রাখে) দাঁড়াও, আজ খেতে খেতেই তোমায় গল্প শোনাব নিকিতা—

নিকিতা—আজও একাই খাবেন (চোখে চোখ পড়ে) আমায় ক্ষমা করবেন।

পুশকিন—একা-একা নিকিতা—

'আকাশে শরতের নিঃশ্বাস।
সূর্যের তেজ কমে আসছে ধীরে ধীরে
দিনের আয়ত সংকুচিত। ফিকে হয়ে আসছে
বনের পাতার ঘনীভূত রহস্য।—মাটিতে ঝরছে তুষার,
ফিকে হয়ে আসছে, দীর্ঘশ্বাসে!
এবার মুখর বলাকার যাত্রা শুরু—
দক্ষিণের দিকে।'—

(হাসি) নিকিতা, কোন পর্যন্ত গল্পটা কাল শেষ করেছি?

নিকিতা—ঐ যে ইথিওপিয়ার মরুভূমিতে ভয়ংকর মরুঝড়। একজন যাত্রী পাগলের মত সামনে ছুটছে।—

পুশকিন—চলো, বাকিটা খেতে খেতেই বলি। কথা বলার, আমার কথা শোনার অন্তত একটা দরদী লোক তো আছে নিকিতা—তুমি নিজেই—অতএব একা খাব কেন? এই কোটটা নাও, নাও তোমার ঠাণ্ডা লাগছে, চল তোমায় আজ অনেকক্ষণ ধরে গল্পটা বলব।—সেই নিঃসঙ্গ লোকটা পাগলের মত ছুটছে...ছুটছে...

[আলো নিভে যায়। পিয়ানোতে ঝড়]

[৮ই ফেব্রুয়ারী। পুশকিনের কক্ষ। সকাল। ঝিকোভ্স্কি ও কন্স্তান্তিন্ দানজাস]

ঝিকোভ্স্কি—না, আমি নিঃসন্দেহ কন্স্তান্তিন্, ভয়ংকর কিছু ঘটতে চলেছে। এভাবে পুশকিনকে সর্বনাশের দিকে ঠেলে দেওয়া যায় না।

কন্স্তান্তিন্—শুনেছি, দান্তেস স্বয়ং সম্রাটের সম্মতি নিয়েই এই দ্বন্দ্বযুদ্ধে নামছে। যদি তাই হয়, তবে বুঝতে হবে পুশকিনের বিরুদ্ধে এবার পাকা ব্যবস্থাই হয়েছে, ঝিকোভ্স্কি।

ঝিকোভ্স্কি—আমি তাই মনে করি, এখনই আমাদের শেষ এবং প্রবলতম চেষ্টা করা উচিৎ এই ডুয়েল থেকে পুশকিনকে নিবৃত্ত করার।

কন্স্তান্তিন্—আমার বন্ধু, রাশিয়ার মহান কবি মিখাইল লারমন্তভ্, যিনি আমাদের অনেকের মতই পুশকিনের গভীর অনুরাগী, সেই লারমন্তভ্ সেদিন বলছিলেন

সম্পূর্ণ উদ্বেগমুক্ত অবস্থায় পুশকিনের কবিতা লেখায় ফিরে যাওয়া যতখানি এখন জরুরী, ঠিক ততটাই জরুরী চারদিকের নানা চক্রান্তের হাত থেকে পুশকিনকে বাঁচিয়ে রাখা।

ঝিকোভ্স্কি—ঠিক, কিন্তু যে নিজে মৃত্যুর সঙ্গে সাপুড়ের খেলা খেলতে বেশি পছন্দ করে তাকে এমন প্রতিকূল পরিবেশে বাঁচিয়ে রাখবে কেমন করে কন্‌স্তান্‌তিন্?

[গেকার্ন প্রবেশ করে]

গেকার্ন—এই যে আপনারা এখানে? মহামান্য পুশকিন কোথায়?

ঝিকোভ্স্কি—এতক্ষণ তরবারি-চর্চা করছিলেন, এখন নাকি পিছনের মাঠে গেছেন রিভলভার চর্চা করতে। অন্তত নিকিতা, মানে তাঁর বিশ্বস্ততম কিশোর সঙ্গিটিতো তাই বলল।

কন্‌স্তান্‌তিন্—তবে আমরা বসে আছি ব্যারন, সে এখনই আসবে এই প্রত্যাশায়।

গেকার্ন—তা হলে আপনাদেরই বলে যাই, কারণ, আমি—মানে দান্তেসের পিতা—নিশ্চয়ই বুঝতে পারছেন, হয়তো তার উত্তেজনার কারণ হয়ে পড়ব—অন্তত এই মুহূর্তে। আপনারা তার ঘনিষ্ঠতম স্বজন, বন্ধু। আপনাদেরই কাছে শেষ আবেদনটুকু রাখছি—এই ডুয়েল যেভাবেই হোক্ বন্ধ করুন। আমি—আমি কথা দিচ্ছি—আমি হল্যাণ্ডের সম্রাটের সানুগ্রহ সাহায্য নিয়ে আমার একমাত্র পুত্র দান্তেসকে এখান থেকে অবিলম্বে—

ঝিকোভ্স্কি—আপনি উদ্বিগ্ন হচ্ছেন কেন মাননীয় গেকার্ন?

কন্‌স্তান্‌তিন্—আপনার মত প্রাজ্ঞ কূটনীতিবিদ্ কি বুঝতে পারছেন না, আপনার ছেলে সম্পূর্ণ নিরাপদ। কারণ যুদ্ধটা আসলে আপনার ছেলের সঙ্গে হচ্ছে না।

গেকার্ন—আপনার কথার ইঙ্গিতটা আমি বুঝি, মাননীয় কন্‌স্তান্‌তিন্। আমি জানি, দান্তেসের এই ডুয়েলে পরাজয়ের সম্ভাবনা নেই বল্লেই চলে।

ঝিকোভ্স্কি—আপনি জানেন?—তবু ডুয়েলের আগের মুহূর্তে পুশকিনের এই কক্ষে এমন নাটক করতে এসেছেন কেন গেকার্ন?

গেকার্ন—না, নাটক নয়। সত্যি আমি ভীষণ উদ্বিগ্ন। আমার ছেলে যদি এই ডুয়েলে মারাও যেত—বিশ্বাস করুন, তবে সেই শোকেও এতটা অস্থির হতাম না। কিন্তু এখন হচ্ছি। কারণ আপনাদের মতই আমিও জানি, এ যুদ্ধে কার মৃত্যুটা জরুরী, ভীষণ জরুরী, অন্তত সম্রাটের কাছে—মানে প্রশাসনের কাছে। দান্তেস অকর্মণ্য ভীরু একজন সুপুরুষ অপদার্থ। তাকে মারলে, মানে মারতে দিলে, পুশকিন জিতে যাবেন, সবদিক দিয়ে জিতে যাবেন। আর পুশকিনের জয় মানেই আবার উদ্বেগজনক কবিতা, সাইবেরিয়ায় কিংবা অ্যারিসন জাতীয় বিদ্রোহ-উদ্দীপক গান—এক কথায় ঝড়ের পাখীকে ঝোড়ো গান শোনাবার সুযোগ করে দেওয়া—

ঝিকোভ্স্কি এবং কন্‌স্তান্‌তিন্—অতএব পুশকিনকেই মরতে হবে।

গেকার্ন—এবং সেটাই আমার মানে আমাদের লজ্জা আর জঘন্য পরাজয়। আপনারা জানেন না—এমন কৌশলে জয়, এমন সংগুপ্ত প্রতারণার যন্ত্র হয়ে পুশকিনের মত একজন মহান ব্যক্তিত্বের বিরুদ্ধে বিজয়ীর হাসি হাসার মধ্যে যে আত্মপ্রতারণা, যে গোপন লজ্জা তাকে আমি—এই ৬৫ বছরের বৃদ্ধ ব্যারন, মনেপ্রাণে ঘেন্না করি। যদি পুশকিনের জয় হত তবে তা আমার কাছে যতখানি দুঃখের আর মর্মান্তিক শোকের হত, যদি দান্তেসের জয় হয় তবে তা হবে ততখানিই লজ্জার, আত্মপ্রতারণার!—অভিজাত ওলন্দাজরা এত নীচ হয় না ঝিকোভ্স্কি! আমার যন্ত্রণা আপনারা কেউ বুঝবেন না! কেউ না—

[নীরবে প্রস্থান]

কন্স্তান্তিন—দান্তেসের পিতা আমায় মানুষ সম্পর্কে নতুন করে মূল্যায়ন করতে উদ্বুদ্ধ করলেন ঝিকোভ্স্কি। কি হল ঝিকোভ্স্কি? কি ভাবছ একমনে! ঝিকোভ্স্কি—

ঝিকোভ্স্কি—(আনমনা ভাব ভেঙে) না, কন্স্তান্তিন্ দানজাস্ হল না, ঐ বৃদ্ধের কথায় স্পষ্ট হয়ে গেল, পুশকিনকে বাঁচানো গেল না।

কন্স্তান্তিন্—১৮২৫-এর রাশিয়ায় যে লেখে—

'জয়তু সূর্য! পালাও, পালাও হে মূঢ় অন্ধকার' সেই ভয়ংকর সূর্যতাপসকে বাঁচিয়ে রাখা যায় ঝিকোভ্স্কি? কিংবা মনে কর সেই রক্ত কাঁপানো পংক্তিগুলো—

'আমরা স্বাধীন পাখী, চলি মেঘপার
যাই দূরে—যেথা ডাকে ধবল পাহাড়
সমুদ্র যেখানে নীল নভে আমন্ত্রণ
পায়, সেথা মত্ত ঝড়ে করি বিচরণ'—

এমন ঝড়ের পাখীকে উনিশ শতকের রাশিয়ায় বাঁচিয়ে রাখা কি চলে?

[পুশকিন ঢোকেন]

পুশকিন—(ছুটে) আহো—কি আনন্দ! জীবনের সায়াহ্নবেলায় এই রণভূমে আমার দুই প্রিয় সঙ্গী! আমি এখনই ডুয়েল লড়তে যাব, তোমরা যেতে পার। আমার অশ্বযুগল তোমাদের দুজনের ভার আশা করি বহন করতে পারবে। চল—চল দেরী হয়ে গেল।

ঝিকোভ্স্কি—আর একটু ভাববে না পুশকিন?—আর একটু—

পুশকিন—(হাসি) কন্স্তান্তিন্, তুমি তো আমারই মতো কবি, আমার বন্ধুও বটে। বলতো—কবিরা কখনো এত ভাবনা করে কাজকম্মো করে।—তোমরা তো জান, ফরাসী ভাষাই আমার প্রথম ভাষা, রুশ ভাষা শিখেছি অনেক পরে। তো সেই ফরাসী ভাষায় একটা প্রবচনে বলা আছে—'মাছ যেমন জল ছাড়া থাকতে পারে না, কবিরাও আবেগ ছাড়া বাঁচতেই পারে না।'—চল, চল দেরী হয়ে যাচ্ছে। দান্তেস হয়তো সেই তুষারগলা মাঠে একাই আমার অপেক্ষায় থাকবে। চল।

ঝিকোভ্স্কি—পুশকিন!

কন্‌স্তান্‌তিন্—ঝিকোভ্স্কি! বাধা দিও না। চল আমরা ওর গাড়ীতে গিয়ে উঠি। তোমায় বাধা দিচ্ছি না পুশকিন। এই সময় বাধা দেওয়া অর্থহীন। আমরা এগোচ্ছি। তুমি এস।

[দুজনে চলে যায়]

পুশকিন—ধন্যবাদ বন্ধু—নিকিতা, নিকিতা—

[নিকিতা প্রবেশ করে]

নিকিতা, তুমি যাবে তো পিৎস্‌বুর্গের তুষার মাঠে? অনেকেই যাচ্ছে। সেখানেই আজ ঐতিহাসিক ডুয়েল! চল, চল, নিকিতা।

নিকিতা—না, প্রভু, মাপ করবেন।

পুশকিন—নিকিতা!

নিকিতা—(রুদ্ধ কণ্ঠে) ডুয়েলের যুদ্ধক্ষেত্র বড় ভয়ংকর জায়গা। ওখানে তো পোষাক দরকার হয় না, খাবার দরকার হয় না, শুনেছি, পড়ে গেলে উঠে দাঁড়াবার সাহায্যও নেওয়া যায় না। তাই নিকিতা সেখানে কেন? কি করবে সেখানে নিকিতা!

পুশকিন—বেশ, তবে যেও না। (হাসি)

নিকিতা—আমি আসি প্রভু?

পুশকিন—দাঁড়াও। তোমার একটা উপহার প্রাপ্য বহুদিন। (দেরাজ থেকে বের করে) আসলে নিকিতা এখন এর কোন দাম না থাকলেও এক সময় আমার কাছে খুব মূল্যবান সম্পদ ছিল এটা। বিয়ের পর নাতালিয়া নিজের হাতে হেম করে আমার একটা কবিতার দুটো লাইন এই দামী বস্ত্রখণ্ডে তুলেছিল। কবিতাটা ও বোঝে নি হয়তো, তবু আমার প্রতি অনুরাগবশতই, হয়তো আমাকে খুশী করতেই ও এদুটো লাইন নিজের হাতে এঁকে আমায় দিয়েছিল! তুমি নাও নিকিতা! এখানে লেখা—'আমরা স্বাধীন পাখী, চলি মেঘপার, সেথা মত্ত ঝড়ে করি বিচরণ'

নিকিতা—আমিও কবিতা বুঝি না প্রভু!

পুশকিন—কবিতা না বুঝলেও নিকিতা, তুমি তো আমায় বোঝ। তারজন্যই এই স্মৃতিচিহ্ন।

নিকিতা—স্মৃতি কেন? আপনি তো আবার ফিরে আসবেন প্রভু।

পুশকিন—আসব, নিশ্চয়ই আসব। তবু জীবন্ত লোকের স্মৃতিচিহ্ন নিতে আপত্তি কি?—নাও।

[নিকিতা চলে যায়]

পুশকিন—'জানি মানুষ তবু দেবে আমায় প্রাপ্য সে সম্মান,
কারণ দয়া এবং ভালবাসায় বাজিয়েছিলাম বীণা,
নিষ্ঠুরতার যুগের 'পরে স্বাধীনতার গান।
শুনিয়েছিলাম বিচার যখন আঁধারে মলিন।'

[অন্ধকার]

[১০ই ফেব্রুয়ারী। পুশকিনের মৃতদেহ সাদা কফিনে শায়িত। শোক পোষাক পরিহিতা নাতালিয়া পাশে বসে। একে একে মানুষ আসে। ফুল দিয়ে চলে যায়। অবশেষে আসে নিকিতা। মৃতদেহের মাথার কাছে মোমবাতি রাখে। এবং তারপর বড় অভিমানে, বড় বেদনায় সেই দামী বস্ত্রখণ্ডটি বুকের জামার আড়াল থেকে বার করে। নাতালিয়া বিস্ময়ে দাঁড়িয়ে ওঠে। নিকিতা ধীরে ধীরে কাপড়ের টুকরোটি কফিনের ওপরে রাখে। তারপর পায়ের কাছে বসে ক্রশ করে। ধীরে ধীরে পর্দা নামে। আর এই সমস্ত সময়টুকু জুড়ে মঞ্চের গভীরে কন্‌স্তান্‌তিন্‌ আবৃত্তি করে চলে মিখাইল লারমন্‌তভের লেখা পুশকিনের মৃত্যুতে একমাত্র প্রতিবাদের সেই দীর্ঘ কবিতাটি।]

কবি নেই আর
পড়ে আছেন তিনি
তাই দেখে জেগে ওঠে উষ্ণ প্রতিশোধ
তাঁর অভ্রংলিহ শির এই প্রথম আনত
কেননা তিনি আজ মৃত কিংবা নিহত।

লড়েছিলেন তিনি একা।
তাই এ হত্যা অবশ্যই প্রাপ্য তাঁর!
মৃত মানুষের জন্য শোক অর্থহীন,
অর্থ নেই শূন্যগর্ভ স্তুতিবর্ষণে,
মূল্য খোঁজা বৃথা তাই বিলম্বিত মূল্যায়নে।

বরং তার চাইতে ভালো অদৃষ্টেরে দোষ দেয়া।
বলো—বরাৎ মন্দ তাঁর, দিন তাই ফুরোলো দ্রুত
বা অদৃষ্টবাদী! তবে কি এ হত্যাতেও তুমি আছ অপাপবিদ্ধ!
দোষ নেই কোনো?
যারা তাঁর মুক্ত স্বাধীন মনকে পাও ভয়
তোমরা যারা এমন দৃপ্তদহন রুদ্রবহ্নির চেয়েছ শান্ত নির্বাপন
তোমরা যারা তাঁর মৃতদেহের চারপাশে নিরুচ্চার মুখে স্তুতিবাক্য করো উচ্চারণ
মৃত তিনি।—
মৃত তিনি আমাদের যুগের চারণ
কণ্ঠ তাঁর শব্দহীন আজ
এক নির্বোধ ঈর্ষায় নেমে আসে হত্যা তাঁর।
তবু সিংহাসন আর মসনদের চারপাশে ভীড় করা স্তাবকের দল
নিলাজ চাটুকারিতার মূল্যে যারা ভরছ উদর কিংবা ঝুলি,
এতবড় হত্যাতেও যারা আছ নিরুত্তাপ ভালোমানুষ;
তোমাদেরও বিচার হবে—

ক্রয়যোগ্য নয় সে বিচার।
যদিও নিশ্চিত জানি—
তোমাদের কালো রক্তে ধোয়া যাবে না—
ধোয়া যাবে না কবির পবিত্র শোণিত কোনোদিন,
না—কোনোদিন নয়—
কোনো দিন নয়।

□

'ঝড়ের পাখী' রচনায় কবি মঙ্গলাচরণ চট্টোপাধ্যায়ের কিছু অনূদিত কবিতাংশ ব্যবহৃত হয়েছে।

ইমন-কল্যাণ

দেবাশিস মজুমদার

(১৯৫০)

চরিত্র

নিভাননী
শৌভ
রমলা
মৈনু
মধুরাই
ছেলেটি

[সাধারণ মধ্যবিত্তের সাংসারিক উপকরণে সাজানো পাশাপাশি দুটি ঘর। ডান দিকের ঘরটিতে দাম্পত্য জীবনের ব্যবহারিক চিহ্ন স্পষ্ট, অপরটি সাধারণ। সেখানে চৌকির ওপর ঘরোয়া পোশাকে বছর ছাব্বিশ-সাতাশের একটি ছেলে বসে আছে। নাম শৌভ। সে বার বার জানালা দিয়ে বাইরের রাস্তা দেখার চেষ্টা করছে। বোঝা যায় কারো প্রতীক্ষায় সে কিছুটা অস্থির। ঐ ঘরের অপর দিকে দাঁড়িয়ে প্রায় বছর সত্তরের এক মহিলা, নিভাননী তথা শৌভের মা একটি পাট ভাঙা সাদা থান পরে তার ওপর তসরের চাদর জড়াচ্ছেন। একই সঙ্গে ডানদিকের ঘরটিতে ড্রেসিং টেবিলের সামনে দাঁড়িয়ে প্রসাধনে ব্যস্ত অপর এক বিবাহিত মহিলা—প্রায় শৌভের সমবয়সী, নাম রমলা। সম্পর্কে শৌভের বউদি।]

নিভা—তা হ্যাঁ রে, তোর কতজন আসবে?

শৌভ—ঠিক নেই, পনেরো-ষোলজন হবে।

নিভা—এই ঘরে ষোলজন? ওমা, আমায় তো আগে বলিসনি সে কথা।

শৌভ—তাতে তোমার কী সুবিধে হত?

নিভা—গোপালের আসন আমি তুলে রেখে যাব। ওর মধ্যে অজাত-কুজাত থাকবে কিনা তাও তো জানিনা।

শৌভ—না রে বাবা। তুমি নিশ্চিন্ত মনে যাও।

নিভা—সাধে কি আমি বাড়ির আগল খুলে যেতে চাই না। কত করে বলেছি, এ সব পাগলামো রেখে চ' আমাদের সঙ্গে—কিছুতেই শুনলি না। সেখানে গিয়ে আমি দু'দণ্ড স্থির হতে পারব ভেবেছিস? মন কাড়া থাকবে এ ঘরের জন্যে। (পাশের ঘরের উদ্দেশ্যে) বউমা—

[রমলা সাজের ব্যস্ততা থেকেই উত্তর দেয়]

রমলা—আসছি—

শৌভ—তোমার গোপাল গোপাল করে একটা বাতিক হয়ে যাচ্ছে মা।

নিভা—(বিগ্রহ ইত্যাদি গুছিয়ে রাখতে রাখতে) তোরা বুঝবি কী! এই আসন আজকে প্রতিষ্ঠা হয়েছে? কত কাটাকাটি মারামারি, মানুষগুলো প্রাণ নিয়ে পালাতে পারে না—তার মধ্যে থেকে তোর দাদু এক বস্ত্রে বুকে করে এই গোপাল নিয়ে এসেছেন। তিন রাত্রি জলটুকু পর্যন্ত মুখে দেয় নি। এখনও রেখেছি বলে আপদে-বিপদে সংসারটা টিকে আছে।

[দুটি ঘরের মধ্যকার দরজায় রমলা এসে দাঁড়ায়]

রমলা—কিছু বলছেন?

নিভা—হ্যাঁ। শোনো, এই গোপালের আসন গোছ করে তারপর আমি বেরুব।

রমলা—কেন হঠাৎ কী হল?

নিভা—তোমার দেওর এখন বলছে ষোল-সতেরজন আসবে। তা, যদ্দিন আছি চোখের সামনে তো আর অনাচার সহ্য করতে পারব না মা।

রমলা—তাহলে কিন্তু অনেক দেরি হয়ে যাবে পৌঁছতে। বেলা গড়িয়ে গেলে আবার অফিস টাইমের ভিড়!

শৌভ—কে বোঝাবে সে কথা। ঐরকম ভাঙা শরীরে পিসিমা নিজে এসে তাড়াতাড়ি যাবার কথা বলে গেল। সকাল থেকে যেতে না পারো, অন্তত দুপুরের মধ্যে তো পৌঁছুবে।

নিভা—শরীর তো আমারও খারাপ, সে কথা ওরা কোন দিন ভেবেছে? তোমার বাবা বেঁচে থাকতে আমায় অনেক জ্বালিয়েছে এই ঠাকুরঝি। মিতু হওয়ার পর ছ'মাস এ বাড়ীতে তিনটে ছেলেমেয়ে নিয়ে পায়ের ওপর পা দিয়ে কাটিয়ে গেলো। চলে যাবার দেড় মাসের মধ্যে বেণী ডাক্তার আমার বুকের দোষ ধরলো। তখন ওদের একটা কেউ এ মুখো হ'লো না পর্যন্ত! এখন আর আমি কারও মেজাজ রাখতে মরতে মরতে যেতে পারব না।

শৌভ—তো এই কথাটা পিসিমাকে বলে দিলেই পারতে!

নিভা—পিসির ওপর তোর যখন এত দরদ—তুই বসে রইলি কেন?

রমলা—আপনার বড় ছেলে বলছিল ওদের বাড়িতে নাকি বেশি কাজকর্মের লোক নেই, বরং শৌভ গেলে পিসিমার উপকার হ'তো।

নিভা—তখন তো সাত-সতের কাজ দেখাবে। আজকাল যে কী এক ফ্যাশান হয়েছে—আত্মীয়স্বজনের সঙ্গে সম্পর্ক রাখবে না। রাস্তায় বন্ধুবান্ধব সব থেকে আপনার হ'লো। আবার আনা-পাইয়ের সংসারে জমিদারের মত জলসা করছে। আমি বাপু তোমার শ্বশুরের চোদ্দগুষ্টির মধ্যে এমন গান বাজনার কথা শুনিনি।

রমলা—কী শৌভ, ভেবে দেখ—আমাদের সঙ্গে যাবে কী না?

শৌভ—দরকার নেই। বরং তুমি আপসোস করো; এই রকম একটা গ্রেট প্রোগ্রাম মিস্ করবার জন্যে।

রমলা—ওসব আপসোসের সময় শেষ হয়ে গেছে ভাই। আমার মত মেয়েদের জীবনে ঐ একটা প্রোগ্রাম ঠিক থাকে। আর তারপর থেকে শুধু মিস্-ই করতে হয়।

শৌভ—নারী জাগরণ শুরু হয়ে গেছে ম্যাডাম! ওঠ জাগো—

রমলা—জেগে উঠেও যে স্বামীর মুখের দিকেই চেয়ে থাকতে হবে। খাওয়াবে কে?

শৌভ—কেন, অর্থনৈতিক স্বাধীনতা অর্জন করো।

রমলা—অনেক হয়েছে। পাস করার পর নিজে ক'বছর বেকার ছিলে, মনে আছে? বরং এ দেশের নিয়মে বিয়ে করে একটা মেয়েকে স্বাধীন করতে পারো কিনা দেখ।

নিভা—তাই তো, স্বামী-সন্তান ছেড়ে মেয়েমানুষের আবার নিজের ঘর কিসের?

শৌভ—ওসব থিয়োরি পুরনো হয়ে গেছে।

রমলা—এই সব সংসারগুলোও পুরনো শৌভ। যতই তুমি বাড়িতে মিউজিক্যাল কনফারেন্স করো, তোমার বউ থাকলে—তাকেও আজ বিয়ে বাড়ি যেতে হতো।

নিভা—ওমা, শ্বশুরবাড়ির কাজে বউরা যাবে না?

রমলা—(শৌভকে) বুঝতে পারছ?

নিভা—এ তোমার অন্যায় রাগ বউমা, আজ যদি নিজের বোনের বিয়ে হ'তো—তুমি বাড়ি থাকতে পারতে?

রমলা—রাগের কথা তো হয়নি মা। আর ওসব কথা উঠছে কেন? আমার মামাতো ভাই বাপীর বিয়েতেও তো আমি যাইনি।

নিভা—এখন সে কথাটা আমাদের শোনাতে চাইছ?

রমলা—মোটেও না। শৌভ ঠাট্টা করেছিল তাই বললাম।

নিভা—ঠাট্টারও তো একটা সহবত থাকবে। কথার ঝোঁক আমরাও বুঝি।

রমলা—বললেই যদি উল্টো মানে হয়, তাহলে আমার চুপ করে থাকাই ভালো। (ব্যাগ নিয়ে নিজের ঘরে ফিরে আসে।। সেখান থেকেই শৌভকে বলে) শৌভ, তোমার যা-যা দরকার একবার দেখে নাও। আমি বার করে রাখছি।

[রমলা আলমারি খুলে বিভিন্ন জিনিস খাটের ওপর রাখে। নিভাননী কাজ করতে করতেই নিজের মনে কথা বলেন। হঠাৎ পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে কী করবে বুঝে উঠতে পারে না শৌভ।]

নিভা—কী জানি বাপু, আজকাল সব কার যে কোন কথায় মেজাজ খারাপ হয়ে যায়! আমরাও একদিন সংসার করেছি। এবেলা-ওবেলা বিশ বাইশটা পাত পড়ত। তবু তো কোনোদিন কেউ একটা শব্দ শোনেনি। (শৌভকে) তোরই বা এত কথা বলার দরকার কী?

শৌভ—আহ্ চুপ কর না।

[শৌভ রমলার ঘরের দিকে এগিয়ে যায়]

নিভা—চুপ করে করেই তো সব মাথায় উঠেছে। আমার দরকার নেই আর বিয়ে বাড়ি গিয়ে। ঠাকুরঝিকে আমি চিঠি লিখে দেব।

[নিভাননীর এই কথায় শৌভ প্রায় চমকে ঘুরে দাঁড়ায়। এগিয়ে আসে ওঁর দিকে]

শৌভ—কী হয়েছে? তোমরা না গেলে ব্যাপারটা খারাপ হবে...তাছাড়া, দাদা তোমাদের জন্যে অপেক্ষা করবে...

[শৌভ প্রচণ্ড নার্ভাস হয়ে নিভাননীর আরও কাছে এগিয়ে গেলেই—গোপাল ছুঁয়ে দেবার ভয়ে নিভাননী সরে যান।]

নিভা—দাঁড়া, দাঁড়া, ঠাকুর আছে এদিকে আসিস না।

শৌভ—ঠিক আছে। তুমি তাড়াতাড়ি করো, আমি বউদিকে বলছি—

নিভা—আমারও কপাল, কাজের মানুষটাকে ভগবান কবে টেনে নিল, আর আমি এখনো বেঁচে আছি।

[শৌভ রমলার ঘরে আসে]

রমলা—মা কী যাবেন না?

শৌভ—হ্যাঁ হ্যাঁ, যাবে।

রমলা—না গেলে তো, তোমার অতিথিরা এলে মুশকিলে পড়বে। আমি অবশ্যি ছাদে কিংবা টিঙ্কুদের বাড়ি চলে যেতে পারি।

শৌভ—না, না, তার দরকার নেই। মা পিসিমার বাড়ি যাবে।

রমলা—দেখ, শেষপর্যন্ত কী হয়! (খাটের ওপর থেকে ছড়ানো জিনিসগুলো এক এক করে হাতে নিয়ে) তুমি যেগুলো চেয়েছিলে, একবার দেখে নাও—এই বেড্‌কভার রেখে গেলাম খাটটায় পেতে দিও। ফুলদানী, দুটো ভালো গ্লাস, ট্রে, টেবিলক্লথ, আমি পেতে দিয়েছি। বাইরের দরজার জন্যে পর্দা রাখা আছে। মাদুর সতরঞ্চি সব ও ঘরে আছে, জান তো? তোমার আর কিছু লাগবে?

শৌভ—(বেশ কুণ্ঠা নিয়ে) আর কিছু...আর কিছু...ও হ্যাঁ, সাদা বা অন্য কোন রকম ভালো চাদর আছে?

রমলা—কী করবে?

শৌভ—আমাদের ঘরে মায়ের চৌকিটায় ঢাকা দিয়ে দিতাম।

রমলা—(কয়েক মুহূর্ত চুপ করে থাকে) মায়ের কাছে নেই?

শৌভ—না, ঠিক আছে, আমি দেখছি।

রমলা—কাপ-প্লেট সব রান্নাঘরেই আছে, দেখে নিও।

[শৌভ পাশের ঘরে ফিরে আসে। নিভাননী কাজ শেষ করে উঠে দাঁড়িয়েছেন। শৌভকে দেখে।]

নিভা—আমার ঠাকুরের কাজ হয়ে গেছে। তোর বউদিকে জিজ্ঞেস কর যাবে কিনা?

শৌভ—শোনো, তোমার কাছে কোনো পরিষ্কার চাদর আছে?

নিভা—বিছানার তলায় একটা রাখা আছে—দ্যাখ।

শৌভ—(নির্দিষ্ট স্থান থেকে চাদরটা বার করে দেখেই আবার রেখে দেয়) এ তো পুরনো, তালিমারা।

নিভা—নতুন আবার কোথায় পাব? চাকরি পাবার পর হাতে করে কোনোদিন সংসারের জন্যে একটা জিনিস এনেছিস তুই? কবে থেকে বলছি মাথার বালিশগুলো—

শৌভ—বুঝেছি—বুঝেছি। সে সব পরে করে দেবো। এখন কিছু আছে কি না বল।

নিভা—(চাপা স্বরে) ও ঘরে পেলি না? বউমার কাছে কী চাইতে গেসলি?

শৌভ—সে অন্য দু-একটা জিনিস।

নিভা—(পূর্বস্বরে) নিজে রোজগার করছিস—দরকারেরটা কিনতে পারিস না? একটা খুঁত হলে তখন বাড়ি মাথায় করবে। এই নিয়ে অশান্তি হলে তোমাকেই সামলাতে হবে—বলে রাখছি।

[বাইরের দরজায় কড়া নাড়ার শব্দ হয়। শৌভ কিছুটা চমকে উঠে ঘড়িটা দেখে। দ্বিতীয়বার শব্দ হলে দরজার দিকে এগিয়ে যায়। দ্বিধা নিয়ে দরজা খুলে দেখে নানান প্যাকেট হাতে দাঁড়িয়ে আছে ওরই বন্ধু মৈনু। শৌভকে কোনোরকম কথা বলার সুযোগ না দিয়ে প্রায় হুড়মুড় করে ঢুকে আসে]

মৈনু—কী রে, কী করছিলি? ডেকে ডেকে সাড়া নেই। মধুরাই এসে গেছে? আমি ভাবলুম সেই জন্যে তু—(শৌভের ধাক্কায় ঘরের ভেতরে ফিরে দেখে নিভাননীকে) মাসিমারা যাননি এখনো?

শৌভ—না। তুই এসব নিয়ে এলি কিসে?

মৈনু—(চৌকির ওপর জিনিসগুলো রেখে) লোকাল ট্যাক্সি, মানে, রিক্‌শা।

শৌভ—ছেড়ে দিয়েছিস?

মৈনু—না, কেন? আমি যাচ্ছি—

শৌভ—দরকার নেই। (নিভাননীকে) তোমাদের তো হয়ে গেছে বল্‌লে, তাহলে রিক্‌শাটা দাঁড়াতে বলছি। বউদি, রিক্‌শা এসে গেছে।

মৈনু—খবরদার, মাসিমা, ঐ রিক্‌শায় উঠবেন না।

শৌভ—ওমা কেন রে?

মৈনু—ওটা বলল, বর্ষাকালের রিক্‌শা। তিনটে চাকা তিন সাইজের।

শৌভ—ভ্যাট্, ফালতু বকছে।

মৈনু—হ্যাঁ রে, বলল রাস্তা ঘাট তো সব ভেঙে যায়, তাই ছোটবড় চাকা দিয়ে ব্যালেন্স করি।

শৌভ—চুপ কর। মা তৈরি হয়ে নাও। আমি রিক্‌শাটাকে বলে দিচ্ছি।

[শৌভ বেরিয়ে চলে যায়। ইতিমধ্যে রমলা যাবার জন্যে সম্পূর্ণ প্রস্তুত হয়ে এই ঘরে এসে দাঁড়িয়েছে]

নিভা—বউমা, মিতুর কাপড়-টাপড়গুলো ঠিক করে নিয়েছ তো?

রমলা—ব্যাগের মধ্যে একসঙ্গে সব আছে।

নিভা—গাড়ি ঘোড়ার পথ, একটু সাবধানে রেখো।

রমলা—সাবধানে রেখেও তো কত যাচ্ছে।

মৈনু—রাইট বউদি। এখন ভারতবর্ষে চোর-ডাকাতদের ক্যারেক্‌টার পাল্টে যাচ্ছে। কে ভালো, কে চোর আলাদাভাবে কাউকে চিনতে পারেন? শুনছি, বিদেশী কোন দেশের সাহায্যে ওরাও এবার কম্পিউটার ব্যবহার করবে। আশা করা যায় সেটাই হবে লাভজনক ইণ্ডাস্ট্রী!

রমলা—হঠাৎ তুমি এসব খবর রাখছ, কী ব্যাপার?

মৈনু—রাস্তাঘাটে বেরুলেই বুঝতে পারবেন। আরও শুনবেন? সেদিন একটা ভিখিরিকে পয়সা না দিতেই ধমকে বলে এখন ভাগিয়ে দিচ্ছেন—কিন্তু পার্লামেণ্টে অর্ডিনেন্স জারি হলে আপনাকেই ভিক্ষে দিতে হবে।

[মৈনুর কথার মধ্যে শৌভ ফিরে আসে]

শৌভ—ভিখিরিটা নিশ্চয়ই তুই?

মৈনু—আজ্ঞে না। আগামী নির্বাচনেই ওরা দিল্লিতে এম.পি. পাঠাবে। ভিখিরির মন্ত্রী হবে।

নিভা—সে কী রে সত্যি?

মৈনু—শুনুন না, বলে, বাস ট্রাম, সিনেমা, ট্রেন, বনজঙ্গল-জন্তু জানোয়ারের আলাদা আলাদা মন্ত্রী আছে। তাহলে এদেশে ভিখিরিদের একজন মন্ত্রী হবে না কেন?

[ওরা সকলে হেসে ওঠে]

রমলা—সত্যি মৈনু, তুমি গান না শিখে গল্প লিখতে পারতে।

মৈনু—গল্প না, গল্প না, ফিল্ম। ভিখিরি এম.পি. হয়েছে প্লটটা কেমন জমবে ভাবতে পারছেন, সঙ্গে যদি হিরো হয় আপনাদের সুপার স্টার?

শৌভ—ঐ ছবিতে প্লে-ব্যাক করিস। (রমলাকে) রিক্‌শাটাকে ভাড়া দিয়ে দিয়েছি। মা তাড়াতাড়ি করো—

নিভা—এই তো রিক্‌শা নিয়ে এলি, আমি তো দৌড়ে যেতে পারব না।

[নিভাননী সহ ওরা তিনজন দরজার দিকে এগিয়ে যায়—চৌকাঠে দাঁড়িয়ে ঠাকুর প্রণাম করে নিভাননী]

রমলা—চা-চিনি সব মিটসেফের ওপর রাখা আছে।

শৌভ—ঠিক আছে।

রমলা—স্বপনকে বলে দিয়েছি বেশি দুধ দিতে। সাবধানে কাজ করো। কাজ হয়ে গেলে মনে করে গ্যাস সিলিণ্ডারের মুখ বন্ধ করে দিও।

নিভা—রান্নাঘরে আবার কে ঢুকবে?

শৌভ—আরে বাবা, কেউ ঢুকবে না, তুমি নিশ্চিন্তে যাও।

[ওরা তিনজনে বেরিয়ে চলে যায়। মৈনু একবার দরজার দিকে দেখে চৌকির ওপর আরাম করে বসে একটা সিগারেট ধরায়। কয়েক মুহূর্তের মধ্যে শৌভ ফিরে আসে। ওকে এখন খুব নিশ্চিন্ত মনে হয়]

মৈনু—তুই যে মাসিমাদের একেবারে ঠেলে পাঠিয়ে দিলি রে।

শৌভ—ক্রমশ আমার টেনশন বাড়ছিল। বউদি সেদিন আমায় বলল দুটোর মধ্যে বেরিয়ে যাবে। তবু আমি হাতে সময় রেখে তিনটের মধ্যে আসতে বলেছি মধুরাইকে। ঠিক সময় এলে কী ঝামেলা হত বুঝতে পারছিস?

মৈনু—ছিঃ ছিঃ ছিঃ শৌভ, প্রেমিকা আসবে বলে—তোর মা বউদিকে বার করে দিলি বাড়ি থেকে? সেইজন্যে বাঙালী মায়েরা দুঃখ করে বলে, বিয়ে দিলেই ছেলে পর হয়ে যায়। আর তোর বিয়ে না হতেই এই অবস্থা।

শৌভ—বাজে বকিস না। মাঝে আবার শাশুড়ি-বউ বিবাদ, যাওয়াই বাতিল হয়ে যাচ্ছিল।

মৈনু—বাড়িতে আজ বললেই পারতিস, মধুরাই আসবে।

শৌভ—অত সহজে এ ঘোষণাটা আমাদের মত সংসারে করা যায় না।

মৈনু—মধ্যবিত্তের এই হয়েছে মুশকিল। প্রেম করবে, শেষ পর্যন্ত বিয়েও হবে, কিন্তু মনে মনে ঠিক একটা অপরাধবোধ বাঁচিয়ে রাখে। ভাবটা এমন—প্রেমিক প্রেমিকাকে সম্বন্ধ করে বাপ-মা বিয়ে দিলেই যেন বেশি সুখী হত।

শৌভ—তোর কথার সবটা সত্যি নয় রে মৈনু। কী জানিস, জীবনের এমন কয়েকটা ঘটনা থাকে, মুহূর্ত থাকে, যাকে আড়ালে রাখতে পারলে তবেই তো সম্পূর্ণ হয়ে বেরিয়ে আসে। দেখিস না, পৃথিবীর সব কিছু জন্মাবার আগে একটা আড়াল থাকে। বীজকে কতদিন মাটি গোপন রাখার পর একটা গাছ হয় তুই জানিস না?

মৈনু—শালা, তুই যে আজকে ফাঁকা বাড়িতে মধুরাইকে আসতে বলে শ্রীকৃষ্ণলীলার দার্শনিক ব্যাখ্যা দিচ্ছিস। শেষ পর্যন্ত যামিনীকান্তের সরোদ প্রোগ্র্যাম হবে তো?

শৌভ—তবে কি ফালতু সবাইকে বলেছি? (জানালা দিয়ে বাইরেটা দেখে) এত কাজ বাকি আছে, ওকে বার বার বলে দিলাম, তিনটের মধ্যে আসতে। অভ্যেস দেরি করা।

মৈনু—ঐ স্বভাবের জন্যে আজ তোর ফাঁড়া কেটেছে। রাগ না করে কিছু খাইয়ে দে আমাকে। কারণ, মধুরাই-এর পাওনা তো তোর ভাষায় গোপনে না আড়ালে কী সব হবে।

[ওরা দুজনেই হেসে ওঠে]

শৌভ—আচ্ছা, জয়ন্তদা তানপুরা বাঁয়া তবলা সব নিয়ে একা আসতে পারবে?

মৈনু—বলে দিয়েছে ট্যাক্সিতে চলে আসবে। তোর কি প্রিয়তোষের মত নিজের গাড়ি আছে?

শৌভ—এইসব ঝামেলার জন্যে অনেকে প্রোগ্র্যাম করতে বারণ করেছিল।

মৈনু—আমি বাবা তোমাকে ভয়ে বলিনি। প্রিয়তোষের বাড়ির প্রোগ্র্যাম শোনার পর থেকে তোর মাথায় ভূত চেপেছে। ওদের কত পয়সা জানিস? ওর বাবা চার না পাঁচটা কোম্পানীর ডিরেক্টর। প্রায় প্রতিদিন ইংরেজী কাগজের ন-এর পাতায় ছবির সঙ্গে বক্তৃতা ছাপা হয়। এসব কালচার হল ওদের ব্ল্যাকমানির হোয়াইট ড্রেন। তোর কী দরকার?

শৌভ—আসলে ঐ প্রোগ্র্যামটা আমার দারুণ লেগেছিল। প্রথমে আমিও ভেবেছিলাম

এসব লোক দেখানো ধান্দা। যামিনীদা নিশ্চয় দায়সারা বাজাবেন। তবু প্রিয়তোষের অনুরোধে গিয়েছিলাম। শুরুতেই কমলিকা ঘরের আলোটা নিবিয়ে দিল, দূরে শুধু দেওয়ালের গায়ে কাঠের কাজ করা ছোট্ট সাইড ল্যাম্প থেকে আলো এসে পড়েছে যামিনীদার মুখ আর সরোদের তারগুলোর ওপর, তখন হঠাৎ সব যেন পাল্টে গেল। যামিনীদার আঙুল তার ছুঁয়ে ছুঁয়ে বাতাসে ইমন-কল্যাণ মেশাচ্ছে। এক সময় আবছা আলোটুকু এড়িয়ে চোখ বন্ধ করেছিলাম। জানিস মনে হ'ল কয়েক কোটি সোনার নরম সরু তার অন্ধকার ভেঙে ঢেউ তুলছে, দ্রুত নয়, মাঝ সমুদ্রের মত ফুলে ফুলে উঠছে আর নানান বর্ণের আলোর বর্শা তার মাথা ছুঁয়ে যাচ্ছে বার বার। বিশ্বাস কর, তারপর বহুদিন ওরই মধ্যে ডুবে ছিলাম।

মৈনু—আশ্চর্য, আমি তো ভাবতেই পারি না, শুধু এইজন্যে তুই সাধ্যের বাইরে গিয়ে একটা আয়োজন করলি।

শৌভ—না। এর সঙ্গে আমার একটা চ্যালেঞ্জ আছে।

[হঠাৎ দরজায় কড়া নাড়ার শব্দ হয়। ওরা দুজনেই মুহূর্তের জন্য চেয়ে থাকে দরজার দিকে।]

মৈনু—যাও, এবার দুয়ার খুলে শ্রীলক্ষ্মীকে প্রতিষ্ঠা করো।

শৌভ—কে জানে, দুধ নিয়ে ছেলেটাও আসতে পারে।

[শৌভ মুখে চোখে কিছুটা কৃত্রিম রাগ নিয়ে দরজাটা খোলে। দেখা যায় মধুরাই দাঁড়িয়ে আছে। সুশ্রী চেহারায় একগাদা ফুল হাতে প্রায় উৎসব হয়ে সে উপস্থিত। কথা না বলে শৌভ সরে দাঁড়ায়, মধুরাই অল্প হেসে ঘরের মধ্যে ঢুকে আসে। সঙ্গে সঙ্গে মৈনু একটা বই বা কাগজ টেনে নিয়ে পড়তে শুরু করে]

মধুরাই—কীরে মৈনু, কখন এলি? (উত্তর না পেয়ে) তোরা কি আমার সঙ্গে কথা বলবি না ঠিক করেছিস?

মৈনু—হ্যাঁ।

মধুরাই—(ফুলের গোছাটি এক দিকে রেখে দেয়) অপরাধ?

মৈনু—প্রথমত তুই আসছিলি না বলে শৌভ আমাকে বকাবকি করছিল—সেটাও বিনা প্রতিবাদে সহ্য করেছিলাম একটা আশা নিয়ে—শেষ পর্যন্ত সেটাও নষ্ট করলি।

মধুরাই—ও বাবা, তোর আবার কী আশা নষ্ট করলাম আমি?

মৈনু—আজ যদি তুই না আসতিস, তোদের মধ্যে একটা ভুল বোঝাবুঝি তৈরি হত। তার মানে একটা ফাঁক সৃষ্টি। যার মধ্যে দিয়ে আমি অনায়াসে গলে গিয়ে তোর পাশের শূন্য স্থানকে পূর্ণ করতে পারতাম।

মধুরাই—আ-হা-হা-রে। এত ভালো সুযোগটা আমি হারালাম।

মৈনু—তাই হতভাগ্য যুবকের স্বাস্থ্যপানের কারণে শৌভকে অর্ডার কর চা করে আনতে।

মধুরাই—এখন আমি বললে হবে না। তুই চেষ্টা কর।

মৈনু—উঁহু, দোষ যখন তোর—শাস্তির ভাগ আমি নিতে পারছি না।

মধুরাই—দোষ আবার কী? এত দূর রাস্তা—তার ওপর ফুলের দোকানে এক ঘণ্টা চলে গেল।

মৈনু—আমি ট্রাফিক পুলিশ হলে আজ কত লোকের কাজ পণ্ড হত!

মধুরাই—কেন?

মৈনু—রাস্তা দিয়ে একজন সুন্দরী ফুল হাতে হাঁটছে দেখলেই—আমি দুপাশে দু হাত তুলে সব বাস-ট্রাম বন্ধ করে দিতাম। একটা বিদেশী সিনেমায় দেখেছি, নায়কের মৃত্যুদণ্ড শুনে একটি মেয়ে ফুল নিয়ে বধ্যভূমির দিকে দৌড়চ্ছে। চারিদিকে গাড়ি ঘোড়া আটকে সে এক কেলেঙ্কারি জ্যাম। দৌড়তে দৌড়তে মেয়েটি যখন বধ্যভূমিতে গিয়ে পৌঁছল—তখন কোথায় কী? সব ফাঁকা।

মধুরাই—এ নিশ্চয়ই তোদের আর্ট ফিল্ম! নায়িকা যাবার আগেই ফাঁসি হয়ে গেল?

মৈনু—দূর, নায়কের প্রিজনভ্যান তখন রাস্তার জ্যামে আটকে আছে না? নায়িকা রাগে দুঃখে ঘাতকের হাতে ফুল গুঁজে দিয়ে ফিরে এল।

[ওরা তিনজনেই হেসে ওঠে]

শৌভ—ঠাট্টা করছিস মৈনু? ছ'টার সময় দেখিস্ এই দুটো ঘরের বধ্যভূমিতে আসামী এবং ঘাতক থাকবে একই সঙ্গে।

মৈনু—তার কারণ দায়িত্বটা আছে আমার ওপর।

মধুরাই—সবাই বসবে কি এই ঘরে?

শৌভ—হ্যাঁ। পাশে বউদির ঘরটাও আছে।

মৈনু—আমি ভাবতে পারছি না, এইটুকু জায়গায় পঁচিশজনকে ঢোকাবি কি করে?

শৌভ—দেখ না সব পাল্টে দেব। আরে, মানুষ ইচ্ছে করলে নিজের ঘরটাকে পাল্টাতে পারবে না? সে যদি একটা স্বপ্ন দেখে, তাকে নিজের ঘরের মধ্যে আনতে পারাটাইতো চ্যালেঞ্জ। কল্যাণ, প্রদীপ ওরা আমায় বলেছিল, কোনো একটা নামকরা হল ভাড়া করে প্রোগ্র্যাম করবার জন্য। আমি রাজি হইনি, কারণ চারটে দেওয়াল আমি ভেঙে ফেলতে চাই। চাকরি পাবার পর প্রথমদিন অফিস থেকে ছুটির পর বেরিয়ে হাজার হাজার মানুষের দিকে তাকিয়ে বিশ্বাস কর, আমি ভয় পেয়েছিলাম। মনে হয়েছিল, ক্রমশ আমিও জীবনের শেষ বাঁধানো পথটায় এসে দাঁড়ালাম। এরপর প্রতিদিন প্রচলিত অভ্যেস আমাকে ধীরে ধীরে গ্রাস করবে, ঐ হাজার মানুষের মত। হঠাৎ সেই মুহূর্তে মনে পড়েছিল কয়েক কোটি সোনার নরম সরু তারে ফুলে ওঠা ঢেউ-এর কথা। মনে হল, আমি তো তোদের মত শিল্পী নই, তবু বাঁচতে হবে। ভাঙতে হবে পুরনো পথ—পুরনো ঘর। বেশি দেরি করলে হবে না।

মধুরাই—নিজের ক্ষমতা, নিজের ঘরকে না জেনেই কি ভাঙা যায় শৌভ?

শৌভ—আমি সবাইকে বলে দিয়েছি আমাদের ছোট ঘর, প্রিয়তোষের মত আরাম এখানে পাবেন না। যামিনীদা শুনে বললেন, 'আটত্রিশ বছর পর্যন্ত রেওয়াজ করেছি দশ বাই আট ঘরে। সরোদ হাতে দু' মাইল হেঁটে গেছি রোজ। তোমার আয়োজন কি তার চেয়ে কম? দরকার হলে আমি রিক্‌শায় যাব তোমার বাড়ি।'

মধুরাই—(মৈনুকে) যামিনী গোস্বামীকে তুই আনতে যাবি?

মৈনু—হ্যাঁ। আসলে আমি, নন্দিতার সঙ্গে থাকব।

মধুরাই—নন্দিতা কেন?

মৈনু—পদাধিকার বলে। কারণ ওর গাড়িতেই যামিনীদা আসছেন।

মধুরাই—এরপর নন্দিতা সকলকে বলে বেড়াবে এই অনুষ্ঠানের সব দায়িত্ব ওকেই নিতে হয়েছে।

শৌভ—কেউ বিশ্বাস করবে না। আমি সকলের সামনে নন্দিতাকে পেট্রোলের দাম অফার করেছিলাম।

মধুরাই—এটুকু পয়সার ওরা অন্য হিসেব করে শৌভ।

শৌভ—এই ধরনের দু-একটা সাহায্য তো নিতেই হবে। আব সব ব্যবস্থাই আমরা করেছি।

মৈনু—ইয়েস। আপনি দেখে নিতে পারেন—(মৈনুর আনা প্যাকেট খুলে ওকে দেখাতে থাকে।) দেখে নে, সব আছে। লবঙ্গ, বড় এলাচ, ধূপ থেকে মোমবাতি পর্যন্ত। (মোমবাতি হাতে নিয়ে) লোডশেডিং-এ এমারজেন্সি! শৌভ, হাত পাখার যোগাড় রেখেছিস তো?

শৌভ—একদম ভুলে গেছি। দাঁড়া খুঁজে দেখছি কী পাওয়া যায়।

[শৌভ ঘরের মধ্যে হাতপাখা খুঁজতে থাকে। মৈনু বাকি জিনিস দেখায়]

মধুরাই—কী যে হবে আমি জানি না।

মৈনু—ঠিক হয়ে যাবে। তুই এসে গেছিস, মানে আমার ইনডোর দায়িত্ব শেষ। সময় হয়ে গেছে এখন আমাকে ঝাঁপিয়ে পড়তে হবে বাইরের কাজে।

মধুরাই—সত্যি তোরা দুজনেই পাগল।

মৈনু—(অবাক স্বরে) আমি পাগল?

মধুরাই—কেন, সন্দেহ আছে?

মৈনু—(করুণ স্বরে) আমি পাগল এ কথা কেউ বিশ্বাস করে না রে। সেদিন একলা পেয়ে শুভ্রাকে শেক্সপীয়র থেকে শোনাচ্ছিলাম। The lunatic, the lover, and the poet/Are of Imagination all compact. ইত্যাদি ইত্যাদি। ও কি বলল জানিস?

মধুরাই—কী?

মৈনু—বলে, তুই তো খুব সেয়ানা রে মৈনু, বেছে বেছে প্রেমিক-পাগলের কোটেশন

মুখস্থ করেছিস। এদেশে গৃহস্থ পাগল মানে, দক্ষিণেশ্বরের ঠাকুর। তুই বরং সে পথেই এগিয়ে যা।

[মধুরাই হেসে ওঠে। শৌভ দুটি পুরনো-ব্যবহৃত পাখা আনে]

শৌভ—এই আছে।

মধুরাই—দুটোতে কী হবে?

শৌভ—আশ্চর্য, চারজনের সংসারে তুমি কি বারোটা পাখা আশা করেছিলে? হাত পাখা কিনে রাখতে হবে।

মৈনু—ঠিক আছে, আমি আসার সময় কিনে আনব।

[মৈনু উঠে পড়ে যাবার জন্যে]

মধুরাই—কি রে তুই চলে যাচ্ছিস, চা খাবি না?

মৈনু—কথায় বলে—যার চাল যে হাঁড়িতে, খেতে হবে সেই বাড়িতে। আমার দুর্ভাগ্যের স্বাস্থ্যটা নন্দিতা নিশ্চয়ই পান করাবে। সুতরাং দেরি করে লাভ নেই।

শৌভ—(ব্যাগ থেকে টাকা দেয়) দরকার হলে ট্যাক্সি করে চলে যাস।

মৈনু—অভ্যেস নেই তো, একা ট্যাক্সিতে উঠলে কেমন ফাঁকা ফাঁকা লাগে। বাসেই চলে যাব। (যেতে যেতে) তোরা তৈরি থাকিস। আমি ঠিক ছ'টার মধ্যে ওঁদের নিয়ে আসছি।

[মৈনু বেরিয়ে যায়। শৌভ দরজা বন্ধ করে ফিরে আসে]

শৌভ—সত্যি, তোমার ওপর আমার যা রাগ হচ্ছিল না।

মধুরাই—স্বাভাবিক। নিজের দোষে অন্যাকে রাগ দেখালে মনটা হাল্কা লাগে।

শৌভ—আমার কী দোষ? কবে থেকে বলে রেখেছি, এত কাজ—তুমি এলে তারপর হবে! ক'টা বাজে জান?

মধুরাই—দরকার নেই। কাজের হুকুমটা কী শুনি?

শৌভ—(উৎসাহ নিয়ে প্রায় ঘরের মাঝখানে দাঁড়ায়) আমাদের এই বুড়ো ঘরদুটোকে একেবারে অন্যরকম করে সাজিয়ে—একটা দারুণ চেহারা দিতে হবে। ধরে নাও, আজকে আমাদের এই কাজ হবে ভবিষ্যৎ সংসার তৈরির রিহার্সাল।

মধুরাই—গাছে কাঁঠাল, গোঁফে তেল।

শৌভ—আজ্ঞে না, ইদানীং দাদা প্রায়ই খোঁজ নিচ্ছে আমার প্রবেশন্যাল পিরিয়ডের পর মাইনে কত হবে। মা এবং বউদি রাগারাগি হলেই একে অন্যাকে ভয় দেখাচ্ছে। শৌভের বউ এলে বুঝবে। এই বড়বউ কত ভাল ছিল, অথবা শাশুড়ি হিসেবে মা কত আইডিয়াল। সুতরাং ধরে নাও তুমি এই সংসারে প্রায় ইন করে গেছ। বাকিটা আমার পারফরম্যান্সের ওপর নির্ভর করছে।

মধুরাই—যাক, তাহলে নিশ্চিন্ত।

শৌভ—মানে?

মধুরাই—তোমার ওপর নির্ভর করছে যে কাজ তার ভবিষ্যৎ আমার জানা আছে।

শৌভ—হায় রে বালিকা! পরিচয়ের চারদিনের মধ্যে আলাউদ্দিন কনফারেন্সে নিয়ে গেছি এবং সারা রাত প্রোগ্রাম শুনেছি। বাইশ দিনের মাথায় বন্ধুদের সাক্ষী রেখে ধর্মতলা থেকে গড়িয়াহাট পর্যন্ত ট্যাক্সি করে নিয়ে গেছি। ছ'মাসের আগেই এক নির্জনে—

মধুরাই—থাক।

শৌভ—এর পরেও তুমি আমাকে কুঁড়ে বলছ? বেচারা কল্যাণ এক বছর ধরে পর্ণাকে প্রস্তাবটা পর্যন্ত দিতে না পেরে সেদিন বলে শৌভের প্রজাপতিকে দুবার জন্মাতে হয়নি। আমাদেরটাই শুধু আটকে রইল শুয়োপোকা হয়ে।

মধুরাই—তবে যে শুনলাম ওরা আজকাল একসঙ্গে খুব ঘুরছে।

শৌভ—আবার দুজনেই মনে করে পরস্পরকে ওরা ঠকাচ্ছে।

মধুরাই—সে আবার কি?

শৌভ—এটাই নাকি আধুনিক জীবনের ফল। এবং পর্ণার মতে সেটাই আকর্ষণের কারণ। এসব আমি বুঝি না। জানো, যেদিন থেকে আমি এই প্রোগ্রামটার কথা ভাবছি, মনের মধ্যে একটা অদ্ভুত ছবি তৈরি হয়েছে। এই দুটো ঘর কি রকম যেন পাল্টে গেছে। তুমি আর আমি সব কিছু নতুন করে সাজিয়ে একেবারে অন্যরকম করে ফেলেছি। অনেক লোকজন আসছে, দুজনেই ভয়ঙ্কর ব্যস্ত হয়ে কাজ করছি। কে কোথায় বসবে, কী হবে, কে কী করবে সব ঠিক করছি। আবার দুজনেই ভয় পাচ্ছি, কারণ ভুল ত্রুটি হলে আমাদেরই তো দোষ দেবে সবাই—তোমাকে আর আমাকে। মনে হচ্ছে, বয়স, রেসপনসেবিলিটি—সব দ্বিগুণ বেড়ে গেছে। মধুরাই, আজ একটা দারুণ কিছু করতেই হবে। মৈনুটা ফিরে এসে যেন, এই ঘরটাকে চিনতে না পারে।

মধুরাই—ম্যাজিক দেখাবে?

শৌভ—জানি না। (হঠাৎ মধুরাই-এর হাতটা ধরে টেনে তোলে) চলো মধুরাই আমরা শুরু করি—দেরি হয়ে যাচ্ছে—

মধুরাই—আহ্ কি হচ্ছে কী, আস্তে। (হঠাৎ শৌভ প্রায় পাগলের মতো হেসে ওঠে।) কি হল?

শৌভ—(হাতটা ছেড়ে দিয়ে) এই ঘরটার মধ্যে তুমি আমি ভাবতেই কেমন অবাক লাগছে! এখানে আমার সাতাশটা বছর কেটেছে, তোমার সঙ্গে দাঁড়িয়ে কোনো কিছুই অচেনা মনে হচ্ছে না। শুধু তোমাকে ছুঁতেই মনে হল, এই ঘরটায় আমার এতদিনের হারিয়ে যাওয়া সব ছবি জেগে উঠছে। সত্যি, যে মানুষের কোনো অধিকারের জায়গা নেই—সে বড় দুর্ভাগা, মধুরাই।

মধুরাই—অধিকারের হিসেবটা না জানা বোধহয় আরও দুর্ভাগ্যের। (প্রসঙ্গ বদলায়

ইচ্ছাকৃত ভাবে) শোনো, ফুলগুলোর অধিকার এবার কিন্তু যাবে। অনেকক্ষণ আলগা পড়ে আছে।

শৌভ—দাঁড়াও, আমি ফুলদানী এনে দিচ্ছি।

[রমলার ঘর থেকে ফুলদানীটি নিয়ে আসে শৌভ। মধুরাই কিছুটা অবাক হয়ে সেদিকে চেয়ে থাকে]

মধুরাই—এটা তো খুব সরু—এতগুলো ফুল সাজানো যাবে?

শৌভ—(দ্বিধা নিয়ে) বউদি তো একটাই রেখে গেছে।...বউদির একটা বড় দারুণ ফুলদানী ছিল...কিন্তু...

মধুরাই—এটা কার?

শৌভ—আমাদের। ছোট পিসেমশাই জয়পুর থেকে মাকে এনে দিয়েছিল।

[মধুরাই কিছু না বলে ফুলদানীটা দেখতে দেখতে হাসে। শৌভ কিছুটা বিব্রত]

একটা কাঁচের গ্লাস দেব?

মধুরাই—হ্যাৎ। গাঁইয়া কোথাকার। দাস কেবিনের মত টেবিল সাজাবে?

শৌভ—তাহলে?

মধুরাই—বাড়িতে কোনো জল খাবার পুরনো ঘটি আছে?

শৌভ—ঘটি? মায়ের ট্রাঙ্কে একটা আছে। কিন্তু সেটা তো ব্যবহার হয় না, নোঙরা হয়ে আছে।

মধুরাই—তুমি বার করো, পরিষ্কার করে নেব। (দ্বিধা নিয়ে শৌভ দাঁড়িয়ে থাকে) কী হলো?

শৌভ—আসলে...মায়ের এসব জমানো স্মৃতির সম্পত্তি। নাড়াচাড়া হয়েছে জানলেই ক্ষেপে যাবে।

মধুরাই—(অল্প হেসে) কিন্তু ঘরটাকেই তো তুমি নতুন ভাবে সাজাতে চাইছ!

[শৌভ উত্তর না দিয়ে ঘরের এক কোণে সাবেকি প্রথায় সাজিয়ে রাখা ট্রাঙ্ক-বাক্সের মধ্য থেকে একটি নিয়ে আসে। মধুরাই কৌতূহল নিয়ে প্রাচীনতায় বিবর্ণ ট্রাঙ্কটি দেখে]

শৌভ—এই রে তালা দেওয়া। চাবির খবর তো জানি না।

মধুরাই—টেনে দেখ না, খুলে যেতেও পারে।

শৌভ—পাগল হয়েছ, আবার লাগাব কী করে?

মধুরাই—বউদির ড্রেসিং টেবিল থেকে অন্য কোনো চাবি বা মাথার কাঁটা থাকলে দাও—খুলে দিচ্ছি।

শৌভ—সেটা কি ঠিক হবে? এর মধ্যে দাদুর সব জিনিসপত্র আছে। কিছু একটা হলে—শেষে কেলেঙ্কারি।

মধুরাই—তাহলে থাক। বুঝতে পেরেছি।

[শৌভ ট্রাঙ্কটি পূর্বাবস্থায় রেখে আসে। কিছুটা সহজ মনে হয় ওকে]

শৌভ—আসলে এই ধরনের ঝামেলা আমার ভাল লাগে না।

মধুরাই—একপক্ষে ভালই হয়েছে, আমার কথায় ঘটিটা ব্যবহার করলে—আজ তোমার প্রাণটা রূপকথার মত ওর মধ্যে ভরা থাকতো।

শৌভ—অন্য কিছু দেব? অন্য কোনরকম শিশি?

মধুরাই—দরকার নেই। তুমি গ্লাসটাই দাও।

[শৌভ বাইরে থেকে একটি কাঁচের গ্লাস নিয়ে আসে। মধুরাই-এর সামনে সেটা রেখে কিছুটা দ্বিধা নিয়েই প্রসঙ্গ বদল করার চেষ্টা করে]

শৌভ—জানো, তুমি যেরকম বলেছিলে, সেদিন, খাবার মিষ্টি একেবারে সেই লিস্ট মিলিয়ে এনেছি।

মধুরাই—এত তাড়াতাড়ি? নষ্ট হয়ে যাবে না?

শৌভ—না না, ও ঘরে, বউদির ফ্রিজে রেখে দিয়েছি। মুশকিল হচ্ছে, প্রোগ্র্যাম শুরু হলে কিন্তু বার করা যাবে না।

মধুরাই—যামিনীবাবু কি ওঘরে বসবেন?

শৌভ—হ্যাঁ, তাই ত আমি ভেবেছি। চলো না, তুমি একবার দেখবে—

মধুরাই—দাঁড়াও, হাতেরটা শেষ করি।

[মধুরাই কয়েকটি ফুলের ডাল হাত দিয়ে ভাঙার বা ছেঁড়ার চেষ্টা করে]

শৌভ—আরে কী করছ? হাত দিয়ে হবে না, কাঁচি দিচ্ছি।

মধুরাই—হয়ে যাবে, দরকার নেই।

শৌভ—না, না, হবে না—

[শৌভ উঠে কাঁচি আনতে যায়]

মধুরাই—আমি আবার ভয়ে কাঁচির কথা বলিনি। কী জানি, কার ট্রাঙ্কে আছে?

শৌভ—ঠাট্টা করছ?

[শৌভ সহজ ভঙ্গীতে খুঁজতে শুরু করে। কিন্তু ক্রমশ না পেয়ে উত্তেজিত হয়ে ওঠে]

শৌভ—আশ্চর্য, একটা কাঁচি নেই বাড়িতে...আগে মায়ের কাছেই তো থাকত...কোথায় যে রাখে? দরকারের সময় পাওয়া যায় না...

মধুরাই—ছেড়ে দাও। তুমি পাবে না।

শৌভ—যাবেই বা কোথায়? তা ছাড়া একটা বড় পাঁউরুটি কাটার ছুরি ছিল।

মধুরাই—তাহলে দেখ, হয়তো রান্নাঘরে আছে—

শৌভ—ওটা দিয়ে আমরা কাগজপত্র কাটতাম। আমাদের টেবিলেই থাকত...

মধুরাই—সে নিশ্চয় বহু বছর আগে, এখন পাল্টে গেছে।

শৌভ—(রুক্ষভাবে) বাড়িটা আমার মধুরাই। সাতাশ বছর আমার এই দুটো ঘরে

কেটেছে। এর লোনা ধরা দেওয়ালে প্রত্যেকটা ছবি আমার চেনা। আজ আমি এই ঘর দুটো বদল করার যেটুকু স্বপ্ন দেখছি—আর কেউ সে চেষ্টা করেনি।

মধুরাই—তোমার এই চেষ্টাকে আমার ভয় করে শৌভ।

শৌভ—কীসের ভয়? এইরকম পাগলামো করে যামিনীদাকে নিয়ে আসছি বলে?

মধুরাই—জানি না। শুধু স্বপ্নের মধ্যে যারা ভেসে যায়—শেষ পর্যন্ত অন্ধকারই একমাত্র তাদের গ্রাস করে। আমাদের বাড়িটা দেখেও তুমি বুঝতে পার না?

শৌভ—সে তো রাজনীতির কথা। তুমি তো জানো, আমি ওসব বুঝি না।

মধুরাই—কিন্তু কিচ্ছু না বুঝে একটা বিচ্ছিন্ন দ্বীপের স্বপ্ন নিয়ে বাঁচা যায় না।

শৌভ—মধুরাই, তুমি চারপাশের হতাশা আর আধ ফাঁকা মানুষদের দেখে ভয় পাচ্ছ। কিন্তু তারই মধ্যে আমাদের বাঁচতে হবে। একটা নিজের ঘর যদি তৈরি করতে পার, দেখবে একদিন ঐ বিচ্ছিন্ন দ্বীপ থেকেই হয়তো লাইট হাউসের আলো ছড়িয়ে পড়বে চারিদিকে।

মধুরাই—কিন্তু যে মাটিতে ঘর তৈরি করতে চাও, আগে যে তাকে জানতে হবে শৌভ। যে ঘরে আছো—তাকে চিনতে হবে। শুধু স্বপ্ন দিয়ে কি সৃষ্টি করা যায়?

শৌভ—আশ্চর্য, তুমি কী ভাবো, সেটা আমি জানি না? আমার সঙ্গে রাজনীতির সম্পর্ক নেই বলে সমাজ পৃথিবী আমার থেকে দূরে থাকে?

মধুরাই—কেন তুমি আমার কথার ভুল ব্যাখ্যা করো শৌভ। আমি তোমাকে বলেছি আমার শুধু ভয় করে। আমাদের বাড়ির রাজনীতি করা মানুষটার আজকের পরিণতির দিকে চেয়ে এখন আমি যে কোনো শিকড়হীন স্বপ্নকে বড় ভয় করি। সেজদা একদিন সব কিছু তুচ্ছ করে স্বপ্নের স্রোতে ভেসেছিল—হাজার হাজার লাইট হাউসের আলো জ্বালাবার আশা নিয়ে ছুটেছে। কিন্তু যে মাটিটার ওপরে পা রেখে দাঁড়াতে হয়—তাকে পুরোপুরি না জেনে শুধু দৌড়েছে!

শৌভ—সারা পৃথিবীটার কথা আমি ভাবতে পারি না মধুরাই। চারপাশের বোবা অন্ধকারটার মধ্যে নিজের স্বপ্নের জন্যে একটা ঘর চাই।

মধুরাই—শোনো, হো ফেঙ বলে একজন চিত্রকর ছিল। তার ভারি ইচ্ছে হয়েছিল সে একটা ছুটন্ত ঘোড়ার ছবি আঁকবে আলো-ছায়ার মায়ায়। রাতদিন সে ছোট নোট বই আর পেনসিল নিয়ে ঘুরে বেড়াত যেখানে যত ঘোড়দৌড় হয় তার মাঠে। ছুটন্ত ঘোড়ার প্রতিটি ভঙ্গী পা দেহ মাথা কেশর আলাদাভাবে নকল করে রাখতো নিজের খাতায়। চার ঋতু কাটিয়ে অবশেষে এসে দাঁড়াল ছবি আঁকার পটের সামনে। কিন্তু কিছুতেই বুঝতে পারছিল না ঠিক কোথা থেকে শুরু করবে। তার সংগ্রহের ছবি তো বিভিন্ন ছুটন্ত ঘোড়ার এক একটা অংশ। কয়েক মুহূর্ত চোখ বন্ধ করে দাঁড়িয়ে সে ফিরে এল এক আস্তাবলের সামনে। সেখানে আসন পেতে বসে বলল, আজ থেকে আমাকে চিনতে হবে জানতে হবে একটা সম্পূর্ণ ঘোড়াকে।

তারপর শুরু হবে আমার ছুটন্ত ঘোড়ার ছবি আঁকা। সেজদা আজকাল প্রায়ই এই গল্পটা বলে।

[দরজায় আওয়াজ হয়। ওরা দুজনেই কয়েক মুহূর্ত চুপ করে থাকে। আবার আওয়াজের সঙ্গে দরজার অপর দিক থেকে একটি ছেলের কণ্ঠস্বর শোনা যায় : 'দুধ—'। শৌভ উঠে পড়ে। মধুরাই ফুল সাজানোর কাজ প্রায় শেষ করে আনে]

শৌভ—দাঁড়া, আসছি।

[শৌভ দরজা খুললে দেখা যায় বছর উনিশের একটি ছেলে ব্যাগ হাতে দাঁড়িয়ে আছে। শৌভকে সে ব্যাগ থেকে দুটি দুধের প্যাকেট বার করে দেয়]

ছেলেটি—বৌদি বাকি রাখতে বারণ করেছে। পাঁচ টাকা দেবেন।

শৌভ—(অপ্রত্যাশিত কথায় কয়েক মুহূর্ত চুপ করে থাকে) পাঁচ টাকা? বউদি তো এত দাম বলেনি।

ছেলেটি—আপনি তো একদিনের খদ্দের। বেশি দেবেন না?

শৌভ—ব্ল্যাক করছিস?

ছেলেটি—বাজারে ব্যালাক্‌টাই চলে দাদা। আপনি একদিনের সওদায় কী করে বুঝবেন?

শৌভ—ঠিক আছে দাঁড়া।

[শৌভ টাকাটা বার করে দেয়। ছেলেটি কথা বলতে বলতে চলে যায়]

ছেলেটি—আমরা তো চুনোপুঁটি। এদেশে রুগীর ওষুধ, বাচ্চার দুধ, সরকারের চাল-ডাল-বাড়ি-ঘর সব ব্যালাক্ হচ্ছে, কেউ ধরতে পারছে?

[শৌভ দরজা বন্ধ করে দুধের প্যাকেট দুটো পাশের ঘরে রেফ্রিজারেটরে রেখে আসে]

শৌভ—সত্যি দেশটা অদ্ভুত হয়ে যাচ্ছে, লোকের অভাব যেমন, আবার তেমনি জিনিসপত্রের চাহিদা। একদিন মাছের বাজারে ষাট টাকা ইলিশ মাছের কেজি শুনে ভেবেছিলাম, ঐখানে দাঁড়িয়ে দেখি কে কিনছে। এই অঞ্চলে ক'টা বড়লোক আছে?

মধুরাই—আজ তো তুমিও বেশি দাম দিলে।

শৌভ—কী করব উপায় ছিল না। এখন আমি কোথায় দুধ পাব?

মধুরাই—ঐ বাজারের লোকটার আগে নিজেকে দেখছ না কেন শৌভ?

শৌভ—(হঠাৎ ভিন্ন স্বরে) তুমি কি আজ শুধু আমায় ঠাট্টা করবে?

মধুরাই—রাগ করো না। দেখ এটা কোথায় রাখবে—

[মধুরাই ফুলদানীটা সাজিয়ে দেখায়]

শৌভ—দারুণ। ঐ তো বউদির ঘরে টেবিলটার ওপর। চলো-চলো ঐ ঘরে—

[ওরা দুজনে রমলার ঘরে গিয়ে দাঁড়ায়। মধুরাই ফুলদানীটা টেবিলের ওপর রাখে]

শৌভ—এই ঘরটা আমাদের আগে সাজাতে হবে।

মধুরাই—কিন্তু এত জিনিসপত্র কোথায় সরাবে?

শৌভ—(ঘরটা দেখতে দেখতে) ফ্রিজটাকে তো কানেকশন্ অফ্ করে সরানো যাবে না। আলমারীটা ঐ ফাঁকে টেনে দেব। শুধু ড্রেসিং টেবিলটা চালান করতে হবে পাশের ঘরে।

মধুরাই—তাহলেই হবে?

শৌভ—(ওর কথার অর্থ সম্পূর্ণ বুঝতে পারে না) টেবিলটা ফাঁকা করে ওর ওপর ফুলদানীটা থাকবে। বাঁ-দিকের দেওয়ালে আটকে দেব সাইড ল্যাম্প। দরকার হলে খাটটাও দরজার দিকে সরিয়ে দিতে পারি। তুমি কী অন্য কিছু বলছ?

মধুরাই—থাক না, যেরকম আছে।

শৌভ—অসম্ভব। আমি তো ভেবেছিলাম এই সব বার করে দেব। কিন্তু দুজনে পারব না?

মধুরাই—বা রে, তুমি বলেছিলে আমরা দুজনে মিলে চেষ্টা করব।

শৌভ—(কিছুটা দ্বিধা নিয়ে) হ্যাঁ, আসলে...ঠিক আছে, আগে আমরা ড্রেসিং টেবিলটা ফাঁকা করে সরিয়ে দি, তারপর দেখছি।

মধুরাই—যো হুকুম!

[ওরা দুজনে মিলে ড্রেসিং টেবিলটা ফাঁকা করতে শুরু করে। কাজ করতে করতে শৌভ কথা বলে]

শৌভ—এই ঘরে আগে বাবা আর মা থাকতেন। আমাদের দু ভাই ঐ পাশের ঘরটায়। বর্ষাকালে যখন দেওয়াল ভিজে উঠত—একদিন দুই ভাই মিলে কাগজে আগুন জ্বালিয়ে দেওয়াল শুকতে গিয়ে সমস্তটা কালো করে ফেলেছিলাম। অফিস থেকে ফিরে বাবার কী পিটুনী! (মধুরাই-এর হাতে একটা সুন্দর শিশি দেখে) দেখি ওটা কী?

মধুরাই—বিদেশী কফির শিশি। কীরকম খেতে গো?

শৌভ—কে জানে! বাড়িতে এরকম জিনিস আছে—তাই জানতাম না।

মধুরাই—(মধুরাই আরও কিছু বার করে) এভাবে বার করা কি ঠিক হচ্ছে?

শৌভ—কেন?

মধুরাই—এই দেখ, মাখনের কৌটো—

শৌভ—সে তো ফ্রিজে থাকে। এখানে?

মধুরাই—আলাদা ভাবে রাখা আছে, বিদেশী সাবান, কাজুর প্যাকেট, জলে বসানো একটা মিষ্টির বাক্স...আবার কাগজপত্র, বই— (টেনে বার করেই চমকে ওঠে) এ মা এ তো—

শৌভ—প্রাপ্তবয়স্কদের পত্রিকা। রেখে দাও। (হঠাৎ ঐ পত্রিকাগুলোর ওপর ঝুঁকে পড়ে) দেখি দেখি ওটা কী?

[শৌভ প্রায় ছোঁ মেরে মধুরাই-এর হাত থেকে কাগজটা টেনে নেয়। এক মনে দেখতে থাকে। মধুরাই কাজ বন্ধ করে দেয়]

মধুরাই—কী হ'ল বল, বাকি জিনিস কি করব?

শৌভ—(বেশ উত্তেজিত ভাবে) বুঝতে পারছ না? যেমন ছিল রেখে দাও। (মধুরাই কথা না বলে আবার সব পূর্বাবস্থায় রাখতে থাকে) দাদা আলাদা ফ্ল্যাট কিনছে।

মধুরাই—কে বললে?

শৌভ—এই তো, ফর্মের কপি। দু-কামরার ফ্ল্যাট। ডিসেম্বরে চলে যেতে পারে। আমি মা কেউ জানি না...সেই কারণে দাদা আমার মাইনের কথা জিজ্ঞেস করে মধুরাই। আর কিছু নয়—। যাক গে!

[মধুরাই কাগজটা ফেরত দেয়। ও যথাস্থানে রাখে]

মধুরাই—ঘরটার কি করবে?

শৌভ—(কিছুটা রুক্ষ ভাবে) একটা কিছু তো করতেই হবে। শোনো, টেবিলটা বার করে দিচ্ছি, ড্রেসিং টেবিলটা ওখানে ঠেলে দিয়ে ফুলদানীটা ওর ওপর রাখব। আলমারীটা সরিয়ে দিলেই অনেকটা জায়গা হয়ে যায়।

মধুরাই—আবার টেবিল থেকে যদি কিছু বের হয়?

শৌভ—আশ্চর্য, এটা ইঁদুর না সাপের গর্ত? আমি দেখছি। (শৌভ টেবিলটার কাছে গিয়ে বইপত্র সরাতে থাকে। প্রায় নিজের মনেই কথা বলে) বাবা মারা যাবার পর এগার দিন এই ঘরটায় আমি, মা আর দাদা খড় বিছিয়ে এক সঙ্গে শুয়ে ছিলাম। সেই বোধ হয় শেষ।

মধুরাই—কতদিন আগে?

শৌভ—তখন আমার ষোল বছর। জীবনে প্রথম শ্মশানে গেছি বাবার মৃতদেহ নিয়ে, এক পাশে খাটটা নামিয়ে রেখে আমাকে কে যেন বলল—শরীরটায় একটা হাত দিয়ে রাখ। আমি হাতটা দিতেই কী প্রচণ্ড ঠাণ্ডা লাগল—মনে হল আমার সমস্ত উষ্ণতাকে এক্ষুণি শুষে নিতে চাইছে ঐ শরীর। আমি ভয়ে হাতটা নামিয়ে খাটের ওপর রেখেছিলাম। আমি আজও বুঝতে পারি না সেদিন আমি ভয় পেয়েছিলাম কাকে। আমার বাবা না মৃত্যুকে? আমার মনে হয় মধ্যবিত্ত মানুষগুলোকে এই ঠাণ্ডা উত্তরাধিকার সব সময় ছুঁয়ে থাকে। চলো-চলো— (হঠাৎ শৌভ প্রচণ্ড তৎপর হয়ে ওঠে) চলো—আমাদের সময় নেই আলমারীটা সরাতে হবে।

[প্রচণ্ড দ্রুততায় শৌভ টেবিলটা সরিয়ে দেয়। ড্রেসিং টেবিলটা টেনে নির্দিষ্ট স্থানে রাখে। আলমারীটার কাছে যায়]

মধুরাই—দুজনে পারব?

শৌভ—পারতেই হবে।

মধুরাই—নীচে কিন্তু একটা করে ইঁট দেওয়া আছে—আগে সরাতে হবে।

শৌভ—ঠিক আছে, আমি তুলে ধরছি একদিক, তুমি ইঁট বার করে দাও—নাও আমি তুলছি—

[সর্বশক্তি দিয়ে শৌভ আলমারীর একদিকটা তুলে ধরতেই মধুরাই একটা ইঁট বার করে দেয়, হেলে যায় আলমারী। হুড়মুড় করে মাথা থেকে সশব্দে ভেঙে পড়ে একটা কাঁচ বাঁধানো ছবি]

মধুরাই—ইস্। এ কী হল? কার ছবি?

[হেলে পড়া আলমারীটার গায়ে এক হাত রেখে হতবাক্ শৌভ এগিয়ে আসে ছবিটার দিকে। শৌভ ছবিটা হাতে নিয়ে দেখতে থাকে]

শৌভ—এখানে ছিল ছবিটা? বাবা মা আর আমরা দুই ভাই। ছোট মামা তুলেছিল ছবিটা কতদিন আগে।

[শৌভ আলমারী সোজা করলেই আবার ভেতরে কিছু পড়ে যাবার শব্দ হয়। মধুরাই কান দিয়ে শব্দ শোনার চেষ্টা করে]

মধুরাই—এই, ভেতরে বোধহয় অনেক কিছু আছে। ভেঙেছে বোধহয়।

শৌভ—কী বলছ?

মধুরাই—আমার কিরকম মনে হল।

শৌভ—(প্রায় চিৎকার করে ওঠে) সোজা, সোজা কর মধুরাই। এক্ষুণি সোজা কর।

[আলমারীটা পূর্বাবস্থায় ফিরে আসে। কিন্তু ঘর তখন ছবির কাঁচে ভরা। কয়েক পলক মাথা নামিয়ে বসে থাকে শৌভ]

মধুরাই—এখন কী করবে?

শৌভ—জানি না।

মধুরাই—ছেড়ে দাও শৌভ, এভাবে হয় না।

শৌভ—(চিৎকার করে ওঠে) না, কক্ষনো না। শেষপর্যন্ত আমাকে দেখতেই হবে। জানতাম না এই ঘর আমার কাছে সম্পূর্ণ অচেনা অজানা হয়ে গেছে। কিন্তু আর একটা ঘর আছে। সেখানেই হবে। সেখানে এখনো আমি থাকি। এসব পড়ে থাক। চলো—আগে ঐ ঘরটাকে পাল্টাতেই হবে।

মধুরাই—শৌভ, লক্ষ্মীটি, শোনো আমার কথা। পাগলামো করো না—

শৌভ—বাধা দিও না মধুরাই, আমাকে জিততেই হবে। আমার একটি পরিচয় আমাকে পেতে হবে। কেন শুধু চারপাশের বোবা সময়টা আমাকে টেনে নিয়ে যেতে চায়। সাধারণ মধ্যবিত্তের সংসারে একটা ছেলের অনেক কিছু হয় না। অথচ তাকে আকাশভরে স্বপ্ন দেখায়। কৈশোরে আমায় এক কাকা বলেছিল চৌরঙ্গীর কোথায় নাকি ফ্রিতে বেহালা শেখায়, 'যা ওখানে'। শিখতে পারবি। শেষ পর্যন্ত আমি সেখানে পৌঁছতে পারিনি। কিন্তু কত রাত আর দিন যে আমি দেখেছি, একশ'

ছেলের সঙ্গে একটা বড় হলঘরে দাঁড়িয়ে কাঁধের ওপর রাখা বেহালা বাজাতে চেষ্টা করছি। হয়নি। মধুরাই আমাদের মতো মানুষগুলোর অনেক অনেক কিছু হয় না। এটা আমাকে পারতেই হবে।

[শৌভ দ্রুত মধুরাইকে টেনে নিয়ে যায় পাশের ঘরে]

মধুরাই—এখানে কি করবে?

শৌভ—এই ঘরটা একদম ফাঁকা করে দেব। তারপর সাজাতে হবে। (দ্রুত হাতে সব সরাতে থাকে) চৌকিটা বড্ড উঁচু, যামিনীদাকে বসানো যাবে না। বার করে দেব।

মধুরাই—ঐ চৌকিটা?

শৌভ—হ্যাঁ। ধরো, তুমি একদিকটা ধরো। এখানে আমি আর মা থাকি। কোনো ভয় নেই, তুমি শুধু এই দিকটায় ধরো—আমি টেনে তুলছি।

[চৌকি থেকে টেনে বিছানাপত্র নীচে ফেলে দেয়। আবরণহীন নগ্ন সাবেককালের বিশাল চৌকিটা শৌভ একাই প্রায় কাত করে ফেলে। সঙ্গে সঙ্গে টিনের কৌটো ইত্যাদি ফেলে চৌকির নীচ থেকে বড় ইঁদুর দৌড়ে পালায়। অস্ফুট শব্দ করে মধুরাই সরে আসে]

মধুরাই—ইঁদুর!

[শৌভ অবাক হয়ে চেয়ে থাকে চৌকির নীচে জমিয়ে রাখা অজস্র সাংসারিক জিনিস, স্মৃতির টুকরো—ধুলো মাকড়শায় ভরা একটা জগৎ]

শৌভ—(প্রায় ফিস্‌ফিস্ করে কথা বলে) কবে থেকে জমল এত জিনিস? আশ্চর্য, দেখ, সব কিছু কতদূর পর্যন্ত শেকড় ছড়িয়ে আছে। মধুরাই, আমার ভয় করছে—

মধুরাই—কেন শৌভ?

শৌভ—(স্বপ্নাচ্ছন্ন মানুষের মতো ঐ দিকে একটা হাত এগিয়ে ধরে) মনে হচ্ছে ঘরের মধ্যে ঐ ছড়ানো শেকড় আসলে আমাদেরই জড়িয়ে আছে। আমার নিজেকে ভয় করছে মধুরাই—

মধুরাই—না শৌভ, এখনি তো সময় তোমার দরজা খুলে যামিনীদাকে নিয়ে আসার। দেখো, এই ঘরের আবছা অন্ধকারে হাজার হাজার সোনার সুরের ঢেউ ভেঙে দেবে চারটে দেওয়াল। সম্পূর্ণ ঘোড়াকে যে দেখেছে—আলোর ঝরনায় ছুটে চলা ঘোড়ার ছবি তো সেই আঁকতে পারে। (হঠাৎ দরজায় কড়া নাড়ার শব্দ হয়) শৌভ, ওরা এসে গেছে—চলো আমরা সাজিয়ে ফেলি—শৌভ তাড়াতাড়ি—

[দরজায় শব্দ হয়। শৌভকে প্রায় টেনে এনে ঘরটাকে সাজাতে থাকে মধুরাই। দরজায় শব্দ ক্রমশ জোর হয়]

□□